সাধক-জীবন-সমগ্র

অবধূত

সাধক-জীবন-সমগ্র

অবধূত

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৫

—আটাশ টাকা—

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন—পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রণ—চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

বাংলাসাহিত্যে অবধূতের আবির্ভাব তাঁর কাহিনীগুলির বিষয়বস্তুর মতই বিস্ময়কর। এবং তাঁর বিস্ময়কর রচনাগুলির মধ্যে মরুতীর্থ হিংলাজের পরেই যে সব রচনা পাঠকের মনে শিহরণ ও রোমাঞ্চ জাগায় সে-গুলি হল তাঁর নিজের সন্ন্যাস-জীবনের পটভূমিকায় রচিত আত্মজীবনী-মূলক উপাখ্যানসমূহ। অনেকেরই জানা নেই, অবধূত প্রথম জীবনে সহিংস বিপ্লবী-দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ইংরেজ সরকার সে সময় তাঁকে ধরবার জন্যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেছিলেন। ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিতে অবধূত ঘুরে বেড়ান ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। এই ঘুরে বেড়ানোর সময়ই তিনি এলেন তাঁর গুরুর সংস্পর্শে। সেই গুরু অবধূতকে দীক্ষা দিলেন তন্ত্র-সাধনে।

তান্ত্রিক জীবনের রহস্যময় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লিখিত হয়েছে অবধূতের উদ্ধারণপুরের ঘাট, বশীকরণ ও কলিতীর্থ কালীঘাট। কখনও শ্মশানে, কখনও মঠ-মন্দিরে, কখনও বা লোকালয়ে নিজের বিভিন্ন জীবনা-ভিজ্ঞতার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন অবধূত তাঁর এই সব গ্রন্থে। তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলি যেমনই বিচিত্র, তেমনই বিচিত্র তাদের জীবন, জীবনের উল্লাস ও তার ব্যথা-বেদনা। এই সব কাহিনীতে নানা রসের সমাবেশ হয়েছে, কোথাও তা মধুর কোথাও আবার বীভৎস। কিন্তু রচনাশৈলীর গুণে ও উপাদান-বিন্যাসের বৈচিত্র্যে কাহিনীর নিটোল বুনন কোথাও পাঠককে থামতে দেয় না, শেষ পৃষ্ঠাটি পর্যন্ত সম্মোহিত করে রাখে। এই সংকলন একাধারে অবধূতের ব্যক্তিগত তান্ত্রিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও সেই সঙ্গে তন্ত্রসাধনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় অর্ধব্রাত্য সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়।

—সম্পাদক

সূচীপত্র

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

কান্না হাসির হাট।

ছত্রিশ জাতের মহাসমন্বয় ক্ষেত্র।

দুনিয়ার সর্বত্র দিনের শেষে নামে রাত, রাতের পিছু পিছু আসে দিন। উদ্ধারণপুরের ঘাটেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

উদ্ধারণপুরের দিন।

সুপ্তিমগ্না প্রকৃতির ধমনীতে নতুন জীবনের জোয়ার তুলে যে জ্যোতির্ময় উদিত হন ধরণীর বুকে তিনি উদ্ধারণপুরের ঘাটকে সভয়ে এড়িয়ে চলেন। উদ্ধারণপুরের দিন আসে ওস্তাদ জাদুকরের বেশ ধরে। ভেল্কি-বাজির সাজ-সরঞ্জাম-বাঁধা প্রকাণ্ড পুঁটলিটা পিঠে ফেলে আঁধার কালো যবনিকার অন্তরাল থেকে নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে আবির্ভূত হয় উদ্ধারণপুরের দিন। ধীরে ধীরে যবনিকাখানি চোখের ওপর মিলিয়ে যায়। আলোর বন্যায় ভেসে যায় রঙ্গমঞ্চ। হেসে ওঠে উদ্ধারণপুরের ঘাট। পোড়া কাঠ, ছেঁড়া মাদুর, চট কাঁথা, বাঁশ চাটাই, হাড়গোড়, ভাঙ্গা কলসী সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। হাড়গিলাদের ঘুম ভাঙ্গে। শকুনিরা ডানা ঝাপটে সাড়া দেয়। আকাশের দিকে মুখ তুলে শেয়ালেরা শেষবারের মত বলে ওঠে—হুক্কা হুয়া-হুয়া হুয়া-হুয়া হুয়া। অর্থাৎ কি না, হে নিশা, আবার ফিরে এস তুমি। দিনের আলোয় আমরা বড় চক্ষুলজ্জায় পড়ে যাই কাঁচা মড়া নিয়ে টানাটানি করতে। তার ওপর ওই ওরা জেগে উঠে পাখা ঝাপটাচ্ছে, এখনি ভাগ বসাতে আসবে আমাদের ভোজে।

ততক্ষণে উদ্ধারণপুরের দিন তার জাদুর পুঁটলি খুলে ফেলেছে। শুরু হয়ে গেছে মায়াবী জাদুকরের জাদুর খেল্। পুঁটলিটা থেকে কি যে বেরুবে আর কি যে না বেরুবে তা আন্দাজ করে কার সাধ্য? খেলার পর খেলা চলতেই থাকে। কথা আর কথা, কথার ইন্দ্রজালে সব কিছু ঘুলিয়ে যায়। যা জলজল করছে চোখের সামনে এক ফুঁ দিয়ে দেয় তা উড়িয়ে। কোথাও যার চিহ্ন মাত্র নেই—তুড়ি দিয়ে তা আমদানি করে তুলে ধরে নাকের ডগায়। সবই অদ্ভুত—সবই তাজ্জব কাণ্ড। আগের খেলাটির সঙ্গে পরেরটির কোনওখানে কোনও মিল নেই।

উদ্ধারণপুরের শ্মশান। পাকা ওস্তাদ জাদুকরের বেশে প্রতিটি দিন যেখানে আসে কালো যবনিকার অন্তরাল থেকে। চালিয়ে যায় তার ভোজবাজি যতক্ষণ না যবনিকাখানি আবার ধীরে ধীরে নামতে থাকে রঙ্গমঞ্চের ওপর। তখন সব ফাঁকা হয়ে যায়।

আর তখন গালে হাত দিয়ে বসে থাকতাম আমি, পুনরায় যবনিকা ওঠার অপেক্ষায়।

আজ বড় বেশী করে মনে পড়ে উদ্ধারণপুর শ্মশানের সেই জমজমাট দিন-

গুলিকে। প্রতি রাতে আমার সেই রাজসিক শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে হিসেব খতিয়ে দেখতাম, কি কি জমা পড়ল সেদিন আমার জমাখরচের খাতার পাতায়। কম কিছু নয়, আক্ষেপ করতে হত না কোনও দিন। তখন সারা দিনের উপার্জন—অমূল্য মণিরত্নগুলি সাজিয়ে তুলে রাখতাম আমার মনের গহন কোণের মণি-কোঠায়। একটি পরম পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত বুক খালি করে।

তারপর নিশ্চিন্ত আরামে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়তাম বুক-ভরা আশা নিয়ে। ঘুম ভাঙলেই এমন একটি দিনকে পাব যা রঙে রসে যেমন টইটম্বুর, আলোয় আঁধারে তেমনি রহস্যময়। এমন একটি দিনকে বরণ করবার বুক-ভরা আশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া কি কম ভাগ্যের কথা।

এখন রাত পোহায় আটকুড়ো দিনের মুখদর্শন করে—অর্থাৎ হাড় অযাত্রা। এখনকার এই দিনগুলির কাছে কোনও কিছু প্রত্যাশা করা বৃথা। জীবনের জোয়ালখানা কাঁধে নিয়ে টেনে বেড়াবার এতটুকু অর্থ আছে নাকি এখন। বহুবার পড়া পুরানো-পুঁথির পাতা উলটানো। না আছে তাতে চমক, না আছে উত্তেজনার রোমাঞ্চ। বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা ভোগ। এর নাম বেঁচে থাকা নয়, শুধু টিকে থাকা। মরা ফুল যেমন গাছের ডালে শুকনো বোঁটা আঁকড়ে ঝুলতে থাকে।

আজ মনের দুয়ারে ভিড় করে এসে দাঁড়ায়—উদ্ধারণপুর শ্মশানের কত কথা, কত কাহিনী। কোন্‌টিকে ফেলে কোন্‌টি বলি। এমন একটি দিনও তখন আসেনি যেদিন কিছু না কিছু কুড়িয়ে পেয়ে তুলে রাখিনি মনের মণি-কোঠায়। সেই সব ভাঙিয়ে এখন এই মরা দিনগুলোর গুজরান হচ্ছে। মহাশ্মশান-উদ্ধারণপুর-ঘাটে-কুড়িয়ে-পাওয়া মণি-মুক্তাগুলির আভা আজও এতটুকু ম্লান হয়নি।

কাটোয়া ছাড়িয়ে গঙ্গার উজানে উঠতে থাকলে আসবে উদ্ধারণপুর। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। তাঁরই নামের স্মৃতি বহন করছে উদ্ধারণপুর। কিন্তু সে কথা কারও মনে পড়ে না। উদ্ধারণপুর বলতে বোঝায় উদ্ধারণপুরের ঘাট। "যত মড়া উদ্ধারণপুরের ঘাটে"—এটা হচ্ছে ওদেশের একটা চলতি কথা। অবাঞ্ছিত কেউ এসে জ্বালাতে থাকলে বিরক্তি প্রকাশ করে এই কথাটা যখন তখন বলা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার যে অংশটুকু গঙ্গার পশ্চিম তীরে পড়েছে, সেখানকার আর বীরভূম জেলার প্রায় ষোল আনা মড়া আসে উদ্ধারণপুর ঘাটে। কাঁথা মাদুর চট জড়ানো, বাঁশে ঝোলানো মড়া দশ দিনের পথ পেরিয়ে আসে উদ্ধারণপুর ঘাটে পুড়তে। ওদেশের নিয়ম, স্বজাতিরা মড়া কাঁধে করে

গ্রামের বাইরে একটা নির্দিষ্ট গাছতলায় নিয়ে গিয়ে মুখাগ্নি করবে। মন্ত্র পড়া, পিণ্ডি দেওয়া, এ সমস্ত শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান সেখানেই সেরে ফেলা হবে। তারপর মড়াটিকে নিয়ে যাওয়া হবে উদ্ধারণপুরে গঙ্গায় দিতে। গঙ্গায় দেওয়া যদি সামর্থ্যে না কুলোয় তাহলে আত্মীয়স্বজনের আর আক্ষেপের অন্ত থাকে না। দশ বছর আগে যে মরেছে তার জন্যেও শোক করতে শোনা যায়—ওরে বাপ্‌রে, তোকে আমি গঙ্গায় দিতেও পারিনি রে বাপ্‌।

গঙ্গায় মড়া নিয়ে যাবার জন্যে প্রতি গাঁয়ে দু-একদল লোক আছে। মড়া বওয়া হচ্ছে তাদের পেশা। কে কোথায় মরো-মরো হয়েছে সে খোঁজ তারা রাখে। মরার সঙ্গে সঙ্গে জুটবে গিয়ে সেখানে। তখন দর কষাকষি চলবে। এত বোতল কাঁচি মদ, নগদ টাকা এত। আর যাওয়া-আসায় যে ক'দিন লাগবে সেই কদিনের জন্যে চাল ডাল নুন তেল তামাক মুড়ি গুড়! সব জিনিস বুঝে পেলে মড়াটাকে কাঁথায় মাদুরে জড়িয়ে একটা বাঁশে ঝুলিয়ে হাঁটতে শুরু করবে উদ্ধারণপুরের দিকে। এঁরাই হল কেঁধো। সব জাতের ঘর থেকেই কেঁধোর পেশার লোক জোটে। যে ছেলেটা বখে গিয়ে বাউণ্ডুলে হয়ে গেল, সে আর করবে কি? পরের পয়সায় মদটা ভাঙ্‌টা চলে এমন পেশা বলতে ঐ কেঁধোর পেশার তুল্য আর কোন্ কাজটি আছে! টাকাটা সিকেটা জোটে। পেট ভরে খাওয়াটা ত ফাউ, তার উপর নেশাটা। গাঁয়ে ফিরে একটি ফলারও জোটে বরাতে। যেমন তেমন করে মৃতের পারলৌকিক কর্ম করলেও কেঁধোরা বাদ পড়ে না। মুখাগ্নি হয়ে যাবার পর আর জাতি-বিচারের দরকার করে না। তখন বামুনের মড়াও এদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাসে যদি দু'তিনটে কাজও কপালে জুটে যায় তাহলে কেঁধোদের সচল বচল থাকে সব দিকে।

কিন্তু সব সময় ত আর সেরকম চলে না। হামেশা আর মরছে কটা লোক? একবারের বেশী দু'বার ত আর মরবে না কেউ ভুলেও, একবার মলেই একজনের মরার পালা সাঙ্গ হয়ে গেল জন্মের মত। তখন আবার আর একজনের দিকে তাকিয়ে কেঁধোদের দিন গুনতে হয়। আর এক-একটা লোক জ্বালায় ত কম নয়। ক্ষীরগোবিন্দপুরের ঘোষাল মশাই আজ মরি কাল মরি করে তের বছর পার করে তবে এলেন। তের বছর একজনের দিকে নজর রেখে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা কি সহজ কথা না কি!

মড়া কাঁধে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে মাঠের পর মাঠ ভাঙ্গতে থাকে কেঁধোরা। রান্না খাওয়ার সব কিছু সঙ্গে আছে। পথে কোথায় থেমে খাওয়াদাওয়া করা হবে তার জন্যে এক-একটা আম জাম বট পাকুড় গাছ ঠিক করাই আছে। ঘণ্টা পাঁচ-ছয়

সমানে চলে—সেই গাছতলায় পৌঁছে প্রথমে মড়াটাকে টাঙানো হবে সেই গাছের ডালে। নয়ত ওরা যখন ব্যস্ত থাকবে খাওয়াদাওয়ায়—তখন শেয়াল-কুকুর টানাটানি করবে যে। মড়াটা টাঙিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আশপাশের খানা ডোবা পুকুরে ডুব দিয়ে এসে সকলে রান্নাবান্নায় লেগে যাবে সেই গাছতলাতেই। তার সঙ্গে চলতে থাকবে মদ গাঁজার শ্রাদ্ধ। খাওয়াদাওয়ার পর সেই গাছতলাতে পড়ে লম্বা বেহুঁশ ঘুম। ঘুম ভাঙলে মড়া নামিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা। এইভাবে দশ দিনের পথ ভেঙ্গেও মড়া আনে উদ্ধারণপুর ঘাটে।

আবার এরই মধ্যে অনেক রকমের অনেক সব গড়বড়ও হয়। বর্ষার সময় বিচার-বিবেচনা করে মাঠের মধ্যে কোনও নালায় ফেলে দিলে মড়াটাকে। দিয়ে যে যার কুটুমবাড়ী চলে গেল দূর গাঁয়ে। কাটিয়ে এল কটা দিন। প্রাপ্যটা ষোল আনাই মিলে গেল দিগ্‌দারি না ভুগে।

আরও নানা রকমের কাণ্ডও ঘটে। তবে সে সমস্ত ব্যাপার হামেশা ঘটে না। উপযুক্ত শাস্ত্রসঙ্গত আধার পেলে শুরু হয় মড়া-খেলানো। মড়া-খেলানো অতি কঠিন শক্ত ব্যাপার। যার তার কর্মও নয়। পাকা লোক দলে থাকলে তবে এ খেলা চলে।

কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপার বড় একটা হতে পায় না। সব মড়াই আর কোঁধোদের হাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় না। আত্মীয়স্বজন সঙ্গে থাকেই। তার পর বড় ঘরের বড় কাণ্ড। খাটে করে মড়া যাবে। সঙ্গে লোকজন-আত্মীয়স্বজন এক পাল। যেন বিয়ের বরযাত্রী চলেছে। এ সমস্ত ব্যাপারে কেঁধোদের যদি ডাকা হয়ও, তবে তাদের পাওনা শুধু ঐ টাকা কটাই। এক ঢোক মদ বা এক বেলার ফলারও নয়।

সেই বিখ্যাত উদ্ধারণপুরের শ্মশানে যে ঘাট দিয়ে ওদেশের বাপ-ঠাকুরদার ঠাকুরদারাও পার হয়ে চলে গেছেন ওপারে, সেই ঘাটেই তখন আমি সাধ করে বাসা বেঁধেছিলাম। ছিলামও কয়েকটা বছর বড় নির্ঝঞ্ঝাটে। একেবারে রাজার হালে আর আমিরী চালে।

শ্মশান গঙ্গার কিনারায়—দক্ষিণে উত্তরে লম্বা। পশ্চিমে বড় সড়ক। সড়ক থেকে নেমে শ্মশানে ঢুকলে দেখা যাবে গঙ্গার জল পর্যন্ত সমস্ত স্থানটুকুময় ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসী, পোড়া কাঠ, বাঁশ চাটাই মাদুর দড়ি আর হাড়-গোড় ছড়িয়ে পড়ে আছে। ইয়া হামদা হামদা শিয়ালগুলো আধপোড়া মড়া নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে। দিনের আলোয় সকলের চোখের উপরেই তাদের খেয়োখেয়ির বিরাম নেই। ওদের চক্ষুলজ্জা বলতে কোনও কিছুর বালাই নেই একেবারে। রক্ত-চক্ষু

কেঁদো কেঁদো কুকুরগুলো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারিক্কী চালের মুরব্বী সব, ছোট দিকে নজর যায় না।

একেবারে গঙ্গার কিনারায় জলের ধারে শকুনগুলো পাখা মেলে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যা খেয়েছে তা হজম না হওয়া পর্যন্ত ওরা পাখায় রোদ লাগাবে।

শ্মশানেব উত্তব দিকের শেষ সীমায়—একটি উঁচ ঢিবি। ঢিবির পেছনেই আকন্দ গাছের জঙ্গল। সেই ঢিবির ওপরেই ছিল আমাব গদি।

তোশকেব ওপর তোশক, তার ওপর আবও তোশক, তাব ওপর অগুনতি কাঁথা লেপ কম্বল চাপাতে চাপাতে আমার সেই সুখাসন মাটি থেকে দু'হাতের ওপর উঁচুতে উঠে গিযেছিল। ওখানে গিযে প্রথম যেগুলো পেতেছিলাম সেগুলো ক্রমে ক্রমে মাটিতে পরিণত হচ্ছিল। তা হোক না, আমার কি তাতে? আমার ত অভাব ছিল না কোনও কিছুর। বোজই কিছু না কিছু নতুন জিনিস চড়ছেই আমার গদিতে। কাজেই একেবারে তলারগুলোর জন্যে মন খারাপ হত না।

বনকদমপুরের কুমার বাহাদুবেব বুড়ী ঠাকুরমাব গঙ্গালাভ হল মাঘ মাসে। আধ হাত চওড়া হাতেব-কাজ-করা কাশ্মীরী শালখানা এসে চড়ল আমার গদির ওপর। দিন কতক ঝুলতে লাগল আমার গদির দু'পাশে সেই অপূর্ব কারুকার্য করা পশমী শালের পাড। তার ওপর শুয়ে শরীব মন মেজাজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে। কয়েকটা দিন কাটতে না কাটতেই এসে গেলেন গোঁসাইপাড়ার সপ্ততীর্থ ঠাকুর মশাই। তাঁর শিষ্য-ভক্তরা প্রভুকে একখানা নতুন মটকা চাদর চাপা দিয়ে নিয়ে এল। দিলাম চাপিয়ে সেই মোলায়েম মটকাখানা কাশ্মীরী শালের ওপব। শাল নিচে যেতে শুরু করলে। মটকাব ওপব শুয়ে মন মেজাজ বেশ মোলায়েম হয়ে আসছে—এমন সময় এলেন পালবাবুদের বড বৌমা একখানি রক্তবর্ণ বেনারসী পরে। তা বলে বেনারসী পরে চিতায় ওঠা যায় না। বেনারসী ছাড়িয়ে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নতুন লালপাড শাড়ী পরিয়ে সিন্দুরে চন্দনে আলতায় সাজিয়ে যখন তাঁকে চিতায় তোলা হল, তখন সেই বেনারসীও এসে গেছে আমার গদির ওপর। পাল-বাবুর খোদ শালাবাবু আস্ত পূর্ণাভিষিক্ত কৌল। বিলাতী ভিন্ন দিশী জিনিস ছোঁন না তিনি। তবে আমার কাছে যা পেলেন তা হচ্ছে শোধন করা মহাকারণ। মহাপাত্র পূর্ণ করে মহাকারণ করে গেলেন তিনি। ভাগ্নে-বৌয়ের বেনারসীখানা নিজ হাতে আমার গদির ওপর বিছিয়ে দিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠলেন, "বোম্ কালী শ্মশানওয়ালী, যাকে নিলি তাকে পায়ে ঠাঁই দিস মা।" বলে ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিলেন মহাকারণ।

বেনারসীর ওপর শুয়ে রাতে ঘুম হল না। খস খস করে, গায়ে ফোটে। তার পরদিন বিরক্ত হয়ে তার ওপর চাপালাম একখানি পুরানো কাপড়ের নরম কাঁথা। কাঁথাখানায় বড যত্নে শাড়ীর পাড় থেকে নানা রঙের স্থতো তুলে ছুঁচ দিয়ে ফুল লতা পাতা আঁকা হয়েছে। কতদিন লেগেছে তৈরী করতে ওখানা কে জানে! এবার তার ওপর শুয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

এইভাবেই তখন আমার আমিরী মেজাজ গড়ে উঠেছিল। কোনও কিছুর জন্যই পরোয়া ছিল না তখন। গরজ বলতে কোনও বালাই ছিল না একেবারে। অফুরন্ত ভাণ্ডার—কে কার কড়ি ধারে?

আমার সেই গদির তিন পাশে দিয়েছিলাম বাঁশ পুঁতে। পর্যাপ্ত বাঁশ, চাঁচা ছোলা পরিষ্কার করা। যে বাঁশে মড়া ঝুলিয়ে আনে তা নাকি পোড়াতে নেই। সে বাঁশ পোড়ালে আর সহজে বয়ে আনার জন্যে মড়া জুটবে না। কেঁধো বন্ধুরা কায়মনোবাক্যে এ কথাটি বিশ্বাস করত। আর সেইজন্যেই তারা মড়া নামিয়ে বাঁশখানা এনে আগে পুঁতে দিয়ে যেত আমার গদির তিন পাশের দেওয়ালে। ঘরখানির ওপরে চাল দেওয়া হয়েছিল মাদুর আর চাটাই দিয়ে। মাদুরের ওপর মাদুর, তার ওপর চাটাই আর চাটাই। ঘরের ভেতর তিনদিকের বাঁশের দেওয়াল ঢেকে দিয়েছিলাম রঙ-বেরঙের শাড়ী দিয়ে। মাথার ওপর হরদম বদলে বদলে ঝুলিয়ে দিতাম নতুন নতুন চাঁদোয়া। চাঁদোয়াও শাড়ী দিয়ে বানানো। কোনও কিছুরই অভাব ছিল না কিনা তখন। এতে কার না মেজাজ চড়ে!

খাওয়াদাওয়ার কথা না বলাই ভাল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক কথা একশবার শুনতে হচ্ছে—'বাবা, এটুকু পেসাদ করে দিন!' গণ্ডা গণ্ডা বোতল সামনে নামিয়ে দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে মিনতি করছে—'বাবা পেসাদ করে দিন।' এক ঢোক করে গিলতে গিয়েও সারাদিনে অন্ততঃ এক পিপে গিলতে হত। তার ওপর গাঁজা। কলকেতে আগুন দিয়েই জোড় হাতে এগিয়ে ধরবে—'প্রভু, ভোগ লাগান। টান দিতেই হবে একটা। নয়ত ভক্তরা হায় হায় করতে থাকবে। বলবে—'ভৈরবের কিপা পেলুম না।'

বাজার থেকে কিনে আনল লুচি পুরী মেঠাই মোণ্ডা। তাও 'পেসাদ' করে দিতে হবে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মিলে গেল গঙ্গার ইলিশ। মাছ ভাজা আর গরম ভাত তৈরী হল। কলাপাতা পেতে সামনে সাজিয়ে দিলে আগে। তাও করে দাও প্রসাদ। ডোমপাড়া থেকে দুটো হাঁস কিনে এনে পালখ ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে ফেললে পেঁয়াজ-গরমমশলা দিয়ে। তার সঙ্গে খিচুড়ি। দাও পেসাদ করে। শ্মশান জাগিয়ে যে বসে আছে সেই ত সাক্ষাৎ ভৈরবের চেলা। প্রথমে তার মুখে

এর বীভৎস মুখ-গহ্বরেব মধ্যে কৃতান্তের কুটিল ইঙ্গিত। কোটরে-বসা তুই চক্ষের হিংস্র দৃষ্টিতে নিয়তির নির্মম আহ্বান, শ্বাসপ্রশ্বাসে হারিয়ে যাওয়া অতীতের জন্যে কুৎসিত হাহাকার। কিছুই দিতে আসে না আজকেব নিঃস্বা বিভাববী। শুধু নিতেই আসে। সাবা বাত এব সঙ্গে এক শয্যায কাটাবার মূল্য দিতে হয এক-দিনেব পবমায়ু।

আজও তারা আসে—যারা আসত আমাব কাছে উদ্ধাবণপুবের শ্মশানে। এসে ভিড কবে দাডায আমার চারপাশে। করুণ কণ্ঠে মিনতি করে বলে, "চল গোসাঁই, আবাব ফিবে চল আমাদেব সেই আড্ডায। তোমার জন্যে গদি পাতব আমবা। বাঁশেব দেওয়াল দিয়ে ঘর তুলে দোব, চাটাই আব মাদুর দিয়ে চাল বাঁধব। তুমি আমাদেব রাজা ছিলে। আবাব তোমায বাজসিংহাসনে বসিয়ে আমবা তোমার প্রসাদ পাব।"

আসে বিষ্ণুটিকুবীব জয়দেব ঘোষাল, দাডোন্দাব হিতলাল মোড়ল, বাঘডাঙ্গার ছুটকে বাগ্দী। নাকে বসকলি আঁকা, মাথায চুড়ো-কবে চুল বাঁধা নিতাই বোষ্টমী আসে মন্দিরা বাজিয়ে। চরণদাস বাবাজী আসে হাতে একতারা নিয়ে। আর আসেন ব্রহ্মবিদ্যা আগমবাগীশ খডম খট খট কবে। তাঁর পিছু পিছু আসেন টকটকে লালপাড শাড়ীপরা তাঁব নতুন শক্তি। আগমবাগীশ প্রতিবাবই নতুন শক্তি নিয়ে আসতেন শ্মশানে লতা-সাধনা কবতে। বলতেন—"জানলে গোসাঁই, বাসি ফুলে পূজো হয় না।" তখন ভেবে পেতাম না এত নতুন ফুল তিনি জোটান কোন বাগান থেকে, আর বাসি হয়ে গেলে ওদের জলাঞ্জলি দেনই বা কোথায।

এখনও মাঝে মাঝে দেখা দেয একমাথা-কোঁকড়া চুল রামহবি ডোম আব আধ-বিঘত চওড়া রূপার বিছা কোমরে পবে রামহবিব বউ। সঙ্গে নিয়ে আসত তাদেব পাঁচ বছরের উলঙ্গ মেয়ে সীতাকে। মেয়েটাকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে রামহরি বলত—"তোমায় সেবায় দিলুম গোসাঁই। তোমার পেসাদী ফুল না হলে যে শালা একে ছোঁবে তাকে জ্যান্ত চিতেয় তুলে দোব।" নিজের সুপুষ্ট নিতম্বের ওপর হাতখানা ঘষে মুছে আঁচল থেকে একখিলি পান খুলে দিয়ে বামহরির বউ বলত—"নাও জামাই, মুখে দাও

সাড়ে তিন মণ ওজনেব মোষের মত কালো রতন মোড়ল আসে। নিজের নাম বলত 'অতন'। চিৎ হয়ে মড়ার মত গঙ্গায় ভেসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অতন মোড়ল দলে না থাকলে সহজে কেউ চাটাই কাঁথা খুলে মড়া বার করে নাচাতে সাহস করত না। অতনকে কেঁধোরা সমীহ করে চলত। অতন মোড়ল কেউটে

সাপের বিষে পোস্ত ভিজিয়ে তাই শোধন করে খেত নেশা করবার জন্যে। লোকটি ছিল চণ্ডীর দেয়াসি। তিন তুড়ি দিয়ে ডাকিনী নামাতে পারত।

ঝাড়া পাঁচ হাত লম্বা খন্তা ঘোষ এসে দাঁড়ায় সামনে। একটা বিলিতী সাদা ঘোড়া বার করে তার লম্বা কোটের ভেতর থেকে। তারপর লাল টকটকে উঁচু দাঁত কখানা দেখিয়ে বলে—"চালাও গোসাঁই, খাস বিলিতী মাল। তোমার জন্যেই আনলুম। ভোগ লাগাও।" অন্তত বিশবার কান্দী মহকুমার তামাম চিনি মন্ত্র-বলে উড়িয়ে দিয়েছিল খন্তা ঘোষ। আবার মন্ত্রবলেই আসমান থেকে সব চিনি আমদানি করে বেচেছিল চল্লিশ টাকা মণ দরে। শেষবার ওরা খন্তাকে নিয়ে আসে চাটাই জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে। টপ টপ করে রক্ত ঝরছিল চাটাই ফুঁড়ে। তার আগের দিন রাত্রে পাঁচুন্দির শীলেদের বাড়ীর তিনতলার ছাদ থেকে নিচে শানবাঁধানো উঠোনের ওপর লাফিয়ে পড়ে পিণ্ডি হয়ে এল খন্তা ঘোষ। আরও কত লোকই এখন ভিড় করে এসে দাঁড়ায় আমার চারপাশে। সবাই চায়, আবার আমি ফিরে যাই সেই উদ্ধারণপুরের শ্মশানে—নয়ত ওদের বড় অসুবিধে হচ্ছে। অসুবিধে হচ্ছে গাজনতলার মেলার ঝুমরী মেয়েদের। আমার দেওয়া মাদুলি না পরলে ওদের গতর ঠিক থাকে না। আর অসুবিধে হচ্ছে কৈচরের বামুনদিদির। পাল-পার্বণে তাঁর যজমানদের নিয়ে তিনি গঙ্গাস্নানে আসতেন। আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতেন অনেকের জন্যে ছেলে হবার মাদুলি। আবার অনেক বড়ঘরের কুমারী আর বিধবাদের জন্যে অন্য জিনিস। তাদের সঙ্গে করে এনে গঙ্গাস্নান করাতেন বামুনদিদি, তখন আমার পায়ে পড়ত পাঁচসিকে করে দক্ষিণা।

আসে সবাই। টাট্টু চেপে দারোগা আসেন মদ ধরতে। রামহরির ঘরে রাতটা কাটিয়ে যান। রামহরি সে রাতটা গেয়ে নিয়ে আমার কাছে এসে থাকে আর সারারাত ঢক ঢক করে মদ গেলে। পরদিন সকালে রামহরির বউ গঙ্গাস্নান করে এসে আমার সামনে কাঁচা গোবর খায়। গোবর-গঙ্গায় সব শোধন হয়ে যায়।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

পতিতপাবনী মা গঙ্গা কুল কুল করে বয়ে যায় কালো মাটি ধুয়ে নিয়ে। ঘাটের উত্তরদিকে আকন্দ গাছের জঙ্গলের পরে উঁচু টিলার ওপর আমার দু'হাত পুরু গদি। সামনে চিতার পর চিতা সাজিয়ে তার ওপর তুলে দিয়ে যায়—ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী ছোকরা-ছুকরী যুবক-যুবতী। দমকা হাওয়া লেগে এক-একবার দাউ দাউ

করে জলে ওঠে চিতাগুলো। আবার ঝিমিয়ে পড়ে। শিয়ালেরা ছোঁক ছোঁক করে ঘুরতে থাকে। আগুনটা নিভে না এলে এগুতে সাহস পায় না ওরা। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটানে নামিয়ে আনে একটা মড়া। তারপর আর ওদের কে পায়! ছেঁড়া-ছিঁড়ি করে সাবড়ে ফেলতে ওদের বেশী সময় লাগে না। শূন্য চিতাটা জলে জলে নিভে যায়। সাদা হাড় কখানা এধারে ওধারে ছড়িয়ে পড়ে থাকে।

সাদা হাড় আর কালো কয়লা। উদ্ধারণপুর শ্মশানে কোনও ময়লা নেই। বর্ষায় গঙ্গার জল ওঠে শ্মশানে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় হাড়গোড় আর পোড়া কাঠ। তখন নেপথ্যে মহাসমারোহ লেগে যায়। পাপী-তাপী জ্ঞানী-মূর্খ মহাপুণ্যবান আর মহাধর্মিষ্ঠের দল স্বর্গারোহণ করে। সবাই হাত-ধরাধরি করে উদ্ধার হয়ে যায়।

আমি ঠায় বসে থাকি গালে হাত দিয়ে আমার সেই দু'হাত পুরু গদির ওপর চেপে। আমার উদ্ধার হয়নি উদ্ধারণপুরে গিয়েও।

আজও বসে বসে মালা গাঁথছি। এ শুধু কথার মালা নয়। চিতার আগুনে-পোড়ানো—কষ্টিপাথরে কষা সোনার মালা। এ মালা হীরে মুক্তা চুনী পান্না দিয়ে সাজাব আমি। হয়ত চোখধাঁধানো জেল্লা থাকবে না আমার মালায়। তবু এ হচ্ছে সাঁচ্চা জিনিস, মেকী ঝুটার কারবার নয় আমার। উদ্ধারণপুর শ্মশানে যা কুড়িয়ে পেয়েছি তা শহর গাঁয়ের হাটে-বাজারে মাথা খুঁড়ে মলেও মিলবে না। শহর-গাঁয়ে রঙের খেলা। রঙের জলুসে এখানে পচা মালও চড়া দামে বিকোয়। উদ্ধারণপুর শ্মশান একটিমাত্র রঙে রঙিন। সে হচ্ছে পোড়া কাঠ কয়লার রঙ—যে রঙের মাঝে পড়ে সব রকমের রঙই কালোয় কালো হয়ে যায়।

সেই কথাই বলে নিতাই বোষ্টমী। বলে—"বল না গোসাঁই, কি করে এই দেহটাকে একবার ঝলসে নেওয়া যায়। ঝলসে আঙার করে নিতে পারলে আর এটার দিক চেয়ে কারও জিভ দিয়ে লাল গড়াতো না। গলায় কণ্ঠি পরে নাকে রসকলি এঁকে জীবনটা কাটালাম শুধু মাংস বেচে। আর ভাল লাগে না এই রক্ত-মাংসের কারবার করা। তুমি মজা পাও দিনরাত মাংস পোড়ার গন্ধ শুঁকে। কাঁচা রক্ত-মাংসে তোমার রুচি নেই। চিতায় উঠে আগুনে ঝলসে কালো কয়লা হয়ে যাচ্ছে না দেখলে তোমার মন ওঠে না। তাই ত ছুটে ছুটে আসি তোমার কাছে। দাও না গোসাঁই একটা উপায় বলে, যাতে এই হাড় মাস পুড়ে কালো আঙার হয়ে যায়। যা দেখে আর কারও হ্যাংলামো প্রবৃত্তি হবে না।"

তা জিভ দিয়ে লাল গড়াবার মত সম্পদ ছিল বৈকি নিতাই বোষ্টমীর। কাঁচা হলুদের সঙ্গে অল্প একটু চুন মেশালে যে রঙ দাঁড়ায় সেই রঙে রঙিন ছিল নিতাই। তার ওপর তার সেই ছোট্ট শরীরখানির বাঁধুনি ছিল অটুট, সব খাঁজ-খোঁজগুলি তীক্ষ্ণ সুস্পষ্ট। পেছন ফিরে চলে গেলে ষাট বছরের তত্ত্বদর্শী মশাই থেকে তের বছরের ফচকে ছোঁড়া নাপিতদের মুলো পর্যন্ত সবাই একবার বোষ্টমীর কোমরের নিচে চোখ বুলিয়ে না নিয়ে স্থির থাকতে পারত না। 'জয় রাধে, দুটি ভিক্ষে পাই মা' বলে যখন গেরস্তের দরজায় গিয়ে দাঁড়াত নিতাই, তখন বউ-ঝিরা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত বাড়ীর ভেতর। পিঁড়ি পেতে বসিয়ে মুড়ি নাড়ু খাইয়ে পানের খিলি হাতে দিয়ে জেনে নেবার চেষ্টা করত, কি উপায়ে বুকের সম্পদ বোষ্টমীর মত চিরকাল বজায় রাখা যায়। মাথার চুল অত কালো হয় কি করে? কোমর ছাড়িয়ে চুল নামাবার ওষুধ কি? কি দিয়ে কাজল বানালে বোষ্টমীর মত চোখের পাতা কালো হবে? সবাই খোঁজ করত, ওর কুঁড়াজালির ভেতর পুরুষকে হাতের মুঠোয় পোরবার জড়ি-বুটি লুকোনো আছে কিনা।

দশ ক্রোশ পশ্চিমে নান্নুরের কাছাকাছি কোনও গ্রামে ছিল ওদের আখড়া। বাবাজী চরণদাস আখড়া বেঁধেছিল নিতাইকে নিয়ে না নিতাই ঘর তুলেছিল চরণ-দাসকে নিয়ে তা ঠিক করে বলা অসম্ভব। আখড়া বাঁধবার গরজ যারই আগে হয়ে থাকুক না কেন, আখড়া চালাত কিন্তু নিতাই দাসী। চরণদাস গাঁজা টেনে পড়ে পড়ে ঘুমোত। নেহাৎ কখনও কোনও কারণে ঠেকে গেলে তার হাতিয়ারের থলেটা নামিয়ে নিয়ে ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ত। মাসখানেক পরে যখন ঘুরে আসত আখড়ায় তখন অন্তত পাঁচ কুড়ি টাকা তার কোমরে বাঁধা। করাত চালিয়ে বাটালি ঠুকে রেঁদা ঘষে জঙ্গলের গাছকে গেরস্ত বাড়ীর দরজা জানলা বানিয়ে ছেড়েছে! নিশ্চিন্তে ঘুমোক এখন গেরস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে। চরণদাসও গাঁজা টেনে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ত। একবার চোখ মেলে দেখবেও না তার বোষ্টমী কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, কি দিয়ে কেমন করে চালাচ্ছে আখড়া।

মাত্র আমার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও ওরা দুজনে একসঙ্গে যাওয়া-আসা করত না। ফোঁটা তিলক কুঁড়াজালি এসব কোনও কিছুরই ধার ধারত না চরণদাস। কোথাও বৈষ্ণবসেবার নিমন্ত্রণ রাখতে যেত না সে। কচি বৈষ্ণবকে ডোর-কৌপীন দেবার সময় কিংবা কোনও আখড়ার মোহন্ত বাবাজীর সমাধি হলে সমাজের সকলের ডাক পড়ত। চরণদাসেরও নেমন্তন্ন হত। কিন্তু কোথাও ও যেত না। ওর খঞ্জনি আর একতারা আখড়ার দেওয়ালে লটকানোই থাকত। মাথার কাছে কলকেটা উপুড় করে রেখে চরণদাস নাক ডাকাতো। সেই চরণদাস

কেন যে আসত আমার কাছে তা অবশ্য আন্দাজ করতে পারতাম। দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর ঢালাও গাঁজা টানার সুযোগ আমার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও জুটত না তার। কিন্তু কিসের টানে যে নিতাই আসত উদ্ধারণপুর শ্মশানে, তার হদিস কোনও দিনই পাইনি।

বিস্তীর্ণ চারণভূমি ছিল নিতাইয়ের। জমিদার বাড়ীর অন্দরমহল থেকে ধরম কলুর কুঁড়ে পর্যন্ত সর্বত্র ছিল তার অবারিত দ্বার। তার ভক্তসংখ্যা যে কত তা সে নিজেও বলতে পারত না। মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর আর রাম-হরি ডোমের ছোট শালা—পঙ্কেশ্বর—সবাই তার চোখের ইশারায় সাপের মাথার মণি আনতে ছুটে যেত। আস্ত পূর্ণাভিষিক্ত কৌল পালবাবুর খোদ শালাবাবু আর বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষালের ছ'বারের পুঁচকে বউ বোষ্টমীকে দুটো মনের কথা শোনাবার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতেন। নিতাইয়ের ডবল লম্বা খন্তা ঘোষ ডাকত তাকে ছোড়দি বলে। চরণদাসের জন্যে কোথা থেকে কাঁচা গাঁজা আমদানি করত সে কে জানে। নিজের বোন বলেই তাকে মনে করত খন্তা। একবার বৈরাগ্যতলার মেলায় ঘুষিয়ে পাঁচটা লোকের নাক থেবড়ে দিয়েছিল সে। তারা নাকি বোষ্টমীর নাম নিয়ে রসিকতা জুড়েছিল খন্তার সামনে। সেই দুর্দান্ত খন্তাও বোষ্টমীর কাছে ছোট ভাইয়ের মত বসে মুড়ি চিবুতে চিবুতে মনের কথা বলত। এ হেন নিতাই কি লোভে শ্মশানে এসে আমার গদির পাশে মাদুর বিছিয়ে বসে এক-একবারে পাঁচ-সাতদিন কাটিয়ে যেত তা আজও আমার অজানাই রয়ে গেছে।

থুঃ থুঃ করে থুতু ফেলে নিতাই বলে—"খালি পচা পাঁক আর নোংরা জল। জলে রক্তশোষা জোঁক কিলবিল করছে, ছুঁতে গা ঘিন ঘিন করে। কোনও ঘাটে আমার কলসী ভরা হল না গোসাঁই—আমার কলসী শুকনোই থেকে গেল চিরকাল।"

আকাশে একখানা আস্ত চাঁদ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে বোষ্টমীর দিকে। গঙ্গায় গলানো রূপো টলমল করে বয়ে যাচ্ছে। সেই দিক চেয়ে একই মাদুরের এক পাশে পা ছড়িয়ে বসে আছে নিতাই, ওপাশে শুয়ে আবলুস-কাঠের-কুঁদো চরণদাস নাক ডাকাচ্ছে। অত গাঁজা টেনেও কি করে স্বাস্থ্যটি বজায় রাখে বাবাজী তা একটা রহস্য বটে।

সেইদিকে দেখিয়ে বলি, "ওই ত পাশেই রয়েছে তোমার কাজলা দীঘি। অমন দীঘির জলেও তোমার মন ওঠে না কেন গো সই?"

আঁচলের বাতাস দিয়ে চরণদাসের ওপর থেকে মশা তাড়িয়ে খিলখিল করে

হেসে ওঠে নিতাই। বলে—"আ আমার পোড়া কপাল, এ যে নিরেট পাষাণ গো গোসাঁই। এতে কলসী ডোবাতে গেলে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে যে। শাবল কোদাল চালালেও এক চাঙ্গড় কেটে ওঠানো যাবে না এর তলা থেকে। এই দীঘির পাড়ে কপাল ঠুকে শুধু রক্ত ঝরানোই সার, এক ফোঁটা তেষ্টার জলও মেলে না।"

চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। চাঁদের আলোয় ওর মুখখানি বড়ই করুণ দেখাচ্ছে। ওর অনুপম কালো ভুরু দুটি আরও যেন বেঁকে গেছে। ছোট্ট কপালখানা একটু কুঁচকেছে। অনাবৃত সুডৌল কাঁধ দুটি দু'পাশে নুয়ে পড়েছে। নিরাভরণ হাত দু'খানি পড়ে আছে কোলের ওপর। নিজের ছড়ানো-পায়ের আঙুলের ডগায় নজর রেখে চুপ করে বসে আছে। ওই দেহখানির মধ্যে যেন ডুব দিয়ে তলিয়ে গেছে নিতাই।

গঙ্গার ওপার থেকে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করা হল। শ্মশানের মধ্যে ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া আরম্ভ হয়ে গেল। ওই ওধারে একেবারে গঙ্গার জল ছুঁয়ে চিতা সাজিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় একটা বুড়াকে চড়িয়ে দিয়ে গেছে কারা। সেখান থেকে চড় চড় চটাস্ শব্দ উঠছে। সেইদিকে চেয়ে দেখি, বুড়াটা আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে উঠে বসছে জ্বলন্ত চিতার ওপর। তার মুখেও চাঁদের আলো এসে পড়েছে। এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মুখ। চোখ দুটোর মধ্যে আর কিচ্ছু নেই। মাংস পুড়ে গিয়ে কপালের আর নাকের সাদা হাড় বেরিয়ে গেছে। ঠোট দু'খানাও নেই। দাঁতও নেই একখানি। মুখের গর্তটার মধ্যে জমাট অন্ধকার। ওপর থেকে চাঁদের আলো আর নিচে থেকে আগুনের আভা পড়ে অদ্ভুত রঙ খুলেছে বুড়ার। বুড়ারও শূন্য চোখের দৃষ্টি তার ছড়ানো পায়ের আঙুলের ডগার ওপর।

সশব্দে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল এ পাশে। মুখ ফিরিয়ে দেখি বোষ্টমী তার রাশীকৃত চুলে চূড়ো বাঁধছে দু'হাত মাথার ওপর তুলে। সারাদিন তার পরনে থাকে একখানি সাদা থান আর তার তলায় গলাবন্ধ কাঁধকাটা শেমিজ। মাত্র হাত দুখানি ছাড়া সম্পূর্ণ শরীরটাই থাকে ঢাকা। বোধ হয় গরমের জন্যেই রাত্রে শেমিজটা খুলে ফেলেছে। দু'হাত মাথার ওপর তোলার দরুন দুই বাহুমূলের পাশ দিয়ে বুকের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার রূপালী আলোয় ভয়ানক রকম জীবন্ত পাতলা চামড়া-ঢাকা দুইটি রক্ত-মাংসের ডেলা।

আবার মুখ ফিরিয়ে নিলাম। চিতার ওপর বুড়ী সটান উঠে বসেছে। আগুনের

লাল আভা পড়েছে তার বুকে। চামড়া মাংস পুড়ে গিয়ে সাদা হাড বেরিয়ে পড়েছে। বীভৎস দৃশ্য—নিজে থেকে দুই চোখ বুজে গেল।

চূড়ো বাঁধা শেষ করে নিতাই বললে, "জল নেই গোসাঁই, কোথাও এক ফোঁটা তেষ্টার জল নেই। কাঁটার জ্বালায় মন বিষিয়ে উঠেছিল ঘরে, তেষ্টায় বুকের ছাতি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। মনে করেছিলাম পথের ধূলায় আছে মুক্তি। আকাশের জল মাথায় পডলে মনের জ্বালা আর বুকের তেষ্টা দুই-ই জুড়িয়ে যাবে। কে জানত যে সবচেয়ে বড শত্রু যে আমার, সেও সঙ্গে সঙ্গে পথে নামবে। পথও বিষিয়ে উঠল। কেউই আমায় চায় না। আমার খোঁজে কেউ আসে না আমার কাছে। সবাই আসে আমার এই শত্রুর কাছে। বাপ-মায়েব হাড মাংস থেকে পাওয়া এই হাড মাংসের বোঝাটার লোভে সবাই ছোঁকছোঁক করে ঘোরে আমার পেছনে। কানের কাছে ফিসফিস করে—সোনা-দানায় গা-গতর মুড়ে দেবে, বাডীঘর দাসী চাকর কোনও কিছুরই অভাব রাখবে না। খেংরা মারি সোনা-দানা বাডী-ঘরের মুখে—হ্যাংলা কুকুরের পাল।"

হেসে ফেলি। বলি—"খামকা গালমন্দ দিচ্ছ কেন সই দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে? সে বেচারাদের দোষ কি। লোভের জিনিস নাকের ডগায় ঘুরঘুর করে ঘুরলে কে কতক্ষণ মাথার ঠিক রাখতে পারে। আমারই মাঝে মাঝে লোভ হয়। মনে হয় যা থাকে কপালে, দুর্গা বলে ঝুলে পডি তোমার সঙ্গে। তারপর যেখানে হাত ধরে নিয়ে যাবে সেখানেই চলে যাই দু'চোখ বুজে। যা হুকুম করবে তাই করব, সারা জীবন ঘুরতে থাকব তোমার পিছু পিছু।"

ঘাড বেঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা করলে, "সত্যি বলছ?"

বললাম, "হ্যাঁ গো—বিশ্বাস হয় না? আচ্ছা, একবার ডাক দিয়েই দেখ না তু করে।"

"কিসের লোভে ছাডবে তোমার এই রাজসিংহাসন গোসাঁই?"

"শুধু তোমায় পাব বলে।"

হঠাৎ বোষ্টমী একেবারে ক্ষেপে গেল। ধাক্কার পর ধাক্কা দিতে লাগল চরণ-দাসের গায়ে—"ওঠ মোহন্ত, ওঠ শিগ্‌গির। রাজী হয়েছে গোসাঁই। এইমাত্র আমায় কথা দিলে, যাবে আমাদের সঙ্গে। আমরা যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যাবে। আমায় পাবার লোভে গোসাঁই ওই মড়ার বিছানা থেকে নামতে রাজী হয়েছে। আজ আমাদের জয় হল মোহন্ত। ওঠ, চল এবার গোসাঁইকে জোর করে তুলে নিয়ে যাই।"

' একবার আড়মোড়া দিয়ে চোখ না খুলেই চরণদাস জবাব দেয়, "কলকেতে আগুন চাপা বোষ্টমী। কোনও লাভ হবে না হুজ্জৎ করে। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখবি কোন্ খাঁচায়? ও পাখী কখনও পোষ মানবে না। আবার শেকল কেটে পালিয়ে আসবে।"

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে আমার একখানা হাত ধরে ফেলেছে নিতাই: "নাম, নেমে এস ওখান থেকে। আর ওখানে চড়ে বসে থাকবার কোনও অধিকার নেই তোমার। এইমাত্র কথা দিলে—যা হুকুম করব আমি তাই করবে। হাত ধরে যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যাবে। নাম—চল এখনিই। কথা রাখ তোমার গোসাঁই।" প্রবল উত্তেজনায় আর কিছু বেরুলই না তার গলা দিয়ে।

আচমকা উচ্ছ্বাসের তোড়ে আমিও বাক্যহারা।

চোখ মেলে উঠে বসল চরণদাস। ধরা গলায় বললে, "চল না গোসাঁই, ঐ মড়ার বিছানার মায়া ছেড়ে। যতকাল বেঁচে থাকব তোমার পিছনে ঘুরে বেড়াব ঝুলি বয়ে। এতটুকু কষ্ট অভাব হতে দোব না তোমার। দেখছ ত আমার শরীরখানা। তিনটে অসুরের শক্তি আছে এতে। গতর খাটিয়ে তোমায় খাওয়াব গোসাঁই। মিথ্যে ভড়ং আর নোংরা বুজরুকির এই খোলসটা ছেড়ে বাঁচব। চল গোসাঁই আমাদের সঙ্গে। যেখানে তুমি নিয়ে যাবে সেখানেই যাব আমরা। আজীবন তোমার সেবা করে কাটাব।"

আবার হাসতে হয়। বলি—লোভ দেখাচ্ছ মোহন্ত? কিন্তু তোমার ত সঙ্গে থাকবার কথা নয়। তেমন কথা ত হয়নি নিতাইয়ের সঙ্গে। নিতাই বলছিল তুমি নাকি একটা শুকনো দীঘি। ও বেচারা তোমার কাছ থেকে এক ফোঁটা তেষ্টার জলও পায় না। তোমার পাড়ে কপাল ঠুকে শুধু রক্ত ঝরানো সার হচ্ছে ওর। আর পাঁচজনে ওর মাংসের লোভে সোনা-দানা ঘর-বাড়ীর ফাঁদ পাতছে। কাজেই শেষ পর্যন্ত আমিই রাজী হয়ে গেলাম—দেখি, যদি আমায় পেয়ে সইয়ের তেষ্টা মেটে। কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে যে আমার সব রস শুকিয়ে যাবে মোহন্ত।"

উঠে এসে খপ্ করে দু'হাতে পা জড়িয়ে ধরে চরণদাস।—"তাই কর গোসাঁই, তাই কর। যাও তুমি নিতাইকে নিয়ে। আমি থাকি তোমার ছাড়া গদির উপর। তাতে আমারও কোনও দুঃখ হবে না। তবু যে তোমায় এই লক্ষ্মীছাড়া গদির মায়া ছাড়াতে পেরেছি এ কি কম কথা আমাদের। তোমাকে এখানে ফেলে রেখে গিয়ে আমরা কোথাও শান্তি পাই না। আমরা খেয়ে সুখ পাই না, ঘুমিয়ে শান্তি পাই না। অষ্টপ্রহর তোমার কথা মনে করে জ্বলেপুড়ে মরি। এখানেই আমায় রেখে যাও গোসাঁই। আমি খুব শান্তিতে থাকব। তবু ত জানব কোথাও

না কোথাও তুমি সুখে আছ নিতাইকে নিয়ে। তাতেই আমার মনের জ্বালা জুড়োবে।"

তখনও আমার হাত ধরে টানাটানি করছে নিতাই।—"উঠে এস গোসাঁই—আর তোমার একটি কথাও আমি শুনব না। এইমাত্র আমায় যে কথা দিয়েছ, আগে রাখ সেই কথা। নাও আমাকে, নাও এখনিই। আমাকে নিয়ে যা খুশি হয় কর। তবু উঠে এস ওখান থেকে, নয়ত এখনিই ঝাঁপিয়ে পড়ব একটা চিতায়।"

দুজনের হাত ধরে টেনে পাশে বসাই। বলি—"দেওয়া নেওয়া ত অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে ভাই। আজ আবার নতুন করে সে সব কথা উঠছে কেন? অনেক দিন আগেই ত আমি তোমাদের জিনিস হয়ে গেছি। এমন পাকা জায়গায় রেখে গিয়েও তোমরা শান্ত পাও না কেন? নিজের প্রাণের ধন গচ্ছিত রাখবার এমন ভাল জায়গা আর পাবে কোথায় তোমরা? এখানে না আছে চোর-ডাকাতের ভয়, না আছে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর যেখানেই নিয়ে রাখবে আমায়, সেখানেই গায়ে পাঁক কাদা লাগবার ভয়। এখানে শুকনো ভস্ম, এ গায়ে লাগলেও দাগ পড়ে না। ঝেড়ে ফেললেই ঝরে যায়। তোমাদের এত দামী সম্পত্তি এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ভিড়ের মাঝে রাখলে শেষে খোয়া যাবে যে। নয়ন দেখবে গায়ে কলঙ্কের দাগ লেগে গেছে। এখানে চিতার আঁচে তেতে থাকি বলে গায়ে কোনও দাগ লাগবার ভয় নেই। যতবার তোমরা ঘুরে আস তোমাদের সম্পত্তি দেখতে, দেখ ঠিকই আছে। তোমাদের মনের মতনটি হয়ে আছে। এখান থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে ক'দিন সামলে রাখতে পারবে ভাই? দেখতে দেখতে রঙ যাবে বদলে, তখন তোমরাই ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।"

চরণদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। বলে—"বোষ্টমী, আগুন দে কলকেতে। খামকা আমার নেশাটা ছুটিয়ে দিলি। এখানে মাথা খুঁড়ে কোনও লাভ হবে না রে। এ একেবারে ছিবড়ে হয়ে গেছে, এতটুকু রসকষ আর নেই এই পোড়া কাঠে।"

গঙ্গার এপার ওপার থেকে শেষ প্রহরের শেষ ডাকাডাকি অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। চাঁদখানার রঙ্‌ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, পেছন দিকে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে বড় সড়কের ওধারে। রাস্তার ওপরের বট পাকুড় গাছের লম্বা ছায়া পড়েছে শ্মশানের ভেতর। বুড়ী তার চিতার উপর শুয়ে পড়েছে আবার। চিতাটাও প্রায় নিভে এল। ভোরবেলা দু'গ্রাস মুখে দেবার জন্যে শুম্ভ-নিশুম্ভ উঠে

গেল। একটু পরে হাড়গিলে আর শকুনিরা জেগে উঠে লম্বা গলা বাড়িয়ে ডানা মেলে সব আগলে বসবে। তখন ওধারে এগোয় কার সাধ্য?

বড় সড়কের ওধারে কে সুর তুলছে, "কানু জাগো, কানু জাগো।"

আমার একখানা হাত নিজের কোলের উপর নিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে নিতাই। হঠাৎ আমার হাতের ওপর দু' ফোঁটা তপ্ত জল পড়ল।

এবার সত্যিই হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম—"এ কি করছ সই? শ্মশানে জ্যান্ত মানুষের জন্যে চোখের জল ফেললে নাকি তার ভয়ানক অকল্যাণ হয়।"

নিতাই রুদ্ধকণ্ঠে ঝাঁজিয়ে উঠল, "হোক—এর চেয়ে এই গদিটায় নুড়ো জ্বেলে দিয়ে এর মালিককে শুদ্ধ পুড়িয়ে রেখে যেতে পারতাম ত শান্তি পেতাম।"

চরণদাসকেই বললাম, "মোহন্ত, তুমিই ভাগ্যবান। চোখের জলের ঝরণা সঙ্গে রয়েছে তোমার। আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ তুমি, কিন্তু কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকলে ও ঝরণা তোমার শুকিয়ে যাবে। অতবড় লোকসান তখন সইবে কেমন করে? আর কি লোভেই বা আমি অমন ভয়ঙ্কর কাজ করতে যাব? এই দুনিয়ার একমাত্র খাঁটি জিনিস—বুকের আগুনে চুয়ানো ঐ চোখের জল, সব চেয়ে দুর্লভ মদ। কেউ কারও জন্যে ও জিনিসের এক ফোঁটাও বাজে খরচ করতে চায় না। আমার ওপর ভেতর এই শ্মশানের ভস্মে ছেয়ে গেছে। এর ছোঁয়া লাগলে সব শুকিয়ে যাবে। জানি না, কি লোভে তুমি আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে চাও। কিন্তু তোমার এই সবুজ লতাটিকে শুকিয়ে মেরে ফেলবার জন্যে আমি কোনও মতেই তোমার সঙ্গ নিতে রাজী হব না।

আঁচলে চোখ মুছে নিতাই উঠে দাঁড়াল। বললে,—"তাই ত বলছিলাম গোসাঁই, পুড়ে কালো অঙ্গার না হলে এই রক্ত মাংসের ওপর তোমার কিছুতেই লোভ হবে না। অনর্থক সারারাত মাথা খুঁড়ে মলাম।"

চরণদাস নিজেই কলকেটা নিয়ে আগুন চাপাতে গেল। ওপারে কিচিরমিচির করে উঠল কয়েকটা পাখী। নিতাই উঠে গেল গঙ্গার দিকে। বোধ হয় মুখে মাথায় জল দেবে। সামনে আধখানা বোতল পড়েছিল। তুলে নিয়ে গলায় ঢেলে দিলাম। আর একজন জাদুকর দিন আসছে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে তৈরী হলাম।

তখনও নিচেটা ভাল করে ফর্সা হয়নি। বড় সড়ক থেকে হরিধ্বনি শোনা

গেল। নামল এসে একজন শ্মশানে।

দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে একজন হাতের লাঠিগাছা আর পোঁটলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আছড়ে এসে পড়ল আমার পায়ের ওপর।

"ঠাকুর হেই বাবা, এবারও রক্ষে করতে পারলুম না বাবা। এবারও সোনার পিতিমে ভাসিয়ে দিতে এলুম গো—ভাসিয়ে দিতে এলুম।" বলেই ঢিপ ঢিপ করে কপাল ঠুকতে লাগল পায়ে।

নিচু হয়ে ভাল করে চেয়ে দেখে চিনতে পারলাম—বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষাল।

গঙ্গার ওপারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটি মেয়ে।

কপালে শুকতারার টিপ আঁকা, স্বচ্ছ কুহেলী ওড়নায় তনুখানি ঢাকা, বন-হরিণীর চকিত চাহনি চোখে নিশার অভিসারিণী।

উষা। অনিরুদ্ধ আনন্দের মূর্তিমতী প্রাণশক্তি।

ঘুমভাঙানি গান শুনিয়ে ঝরা শিউলীর ওপর দিয়ে লঘু চরণে পালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাল কেটে গেল গানের, চরণে চরণ জড়িয়ে গেল, থমকে দাঁড়িয়ে ঘোমটার ভেতর থেকে চোখ মেলে চেয়ে রইল গঙ্গার এপারে।

ও কি! মাদুর জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে কি এনে নামালে এই জাগরণের পরম লগ্নে। কি বাঁধা আছে ওর ভেতর! কার ভেট বয়ে এনেছে ওরা অত কষ্ট করে।

গঙ্গার এপার থেকে হা হা করে হেসে উঠল দিন, উদ্ধারণপুরের ওস্তাদ জাদুকর। বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে চেঁচিয়ে বললে, "দেখছ কি সুন্দরী থমকে দাঁড়িয়ে। এই দেখ এসে গেছে আমার জাদুর পুঁটলি। এস না এপারে, দাঁড়িয়ে দেখ না আমার জাদুর খেলা। খুলে দেখাচ্ছি তোমায় এই মাদুর চাটাইয়ের ভেতর কি জিনিস লুকানো আছে।"

লজ্জায় সরমে রাঙা হয়ে ছুটে পালিয়ে যায় উষা।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকি বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষালের দিকে। ওধারে ওরা ততক্ষণে দড়াদড়ি খুলে বাঁশ থেকে ছাড়িয়ে কাঁথা-মাদুরের ভেতর থেকে বার করে মাটির ওপর শুইয়েছে একটি মেয়েকে। মেয়েটির সারা কপাল মাথা সিঁথি ডগডগে সিন্দূরে লেপ্টা-লেপ্টি, পরনে একখানি লালপাড় কোরা শাড়ী, হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা, পরম সৌভাগ্য[illegible] সধবার সাজ[illegible] দিনের পথ ভেঙ্গে এসেছে, তাই একটু ফোলা ফোলা [illegible]খানি। দুই চোখ [illegible], অসীম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে আছে
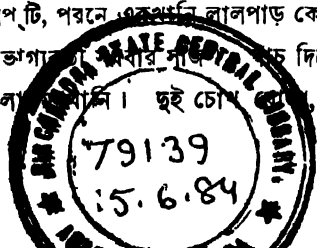
মেয়েটি। বিষ্ণুটিকুরির নৈকষ্য কুলীন জয়দেব ঘোষালের পঞ্চমবারের সহধর্মিণী।

জয়দেব তখনও পায়ের ওপর মুখ ঘষছে আর জড়িয়ে জড়িয়ে কাতরাচ্ছে—"হেই বাবা, তুমিই সাক্ষাৎ ভৈরব গো, জ্যান্ত কালভৈরব তুমি, কৃপা কর বাবা—এই অধম সন্তানের ওপর একটু কৃপার চোখে চাও। তুমি না দয়া করলে আমার বংশ রক্ষে কিছুতেই হবে না গো, আমার বাপ-পিতামো জল পিণ্ড না পেয়ে চিরটা কাল টা টা করে মরবে।"

"এবার নিয়ে কবার হল গো ঠাকুর মশাই?"

"হেই বাড়া দিদিমণি যে গো। তা ভালই হল বাপু, তোমাকেও পেয়ে গেলুম এখানে। এবারে গোসাঁইকে বলে কয়ে আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও গো দিদি ঠাকরুণ। আমার বংশ যে লোপ পায়। পাঁচ-পাঁচজনকে এখানে নিয়ে এলুম গো, কেউ আমার মুখের দিকে চাইলে না। ঝাড় বেইমান বজ্জাতের ঝাড় সব। একটা ছেলেমেয়ে যদি কেউ পেটে আসত তবে আর আমাকে বার বার নিজের হাতে এ গু ঘেঁটে হবে কেন? গোসাঁইকে ধরে একটা কিছু উপায় করে দাও গো দিদি, এবারে যে আসছে আমার ঘরে, সে যেন অন্তত একটা ছেলে আমাকে দিয়ে তবে এখানে আসে।"

পা ছেড়ে দিয়ে উঠে বসল জয়দেব। পাঁচদিন অবিরাম মদ গাঁজা টেনে ওর চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ির ভেতর [illegible] ময়লা [illegible] রয়ে গেছে। বোধ হয় [illegible] ওপর মুখ রগড়েছিল জয়দেব। বউয়ের শোকের জ্বালায় মুখ বুজে স্নান করতেও ভুলে গেছে বেচারা। ব্রাহ্মণের ঘরের পাঁচ পাঁচটি সতী সাধ্বী স্ত্রীর পতিদেবতা নৈকষ্য কুলীন জয়দেব ঘোষাল আমার সামনে বসে বুক চেপে ধরে হিক্কা সামলাতে আর থুতু ফেলতে লাগল।

"তা এবারে যিনি আসছেন তিনি কার ঘরের গো ঠাকুর মশাই?" বোষ্টমীর কথায় বিষের ঝাঁজ।

অত খেয়াল করবার মত অবস্থা নয় এখন ঠাকুর মশায়ের। এক ধেবড়া থুতু ফেলে হাতের পিঠে মুখ মুছে এক গাল হেসে সে আরম্ভ করলে—"ও, তুমি চিনবে বৈকি গো রাঙাদিদি। আমাদের নপাড়ার হেঁপো রুগী হারাধন চক্কোত্তীর ছোট মেয়ে ক্ষিরি গো। আজকাল বেশ ডাগর-ডোগরটি হয়ে উঠেছে যে। এ বউ রোগে পড়তে কথাটা একদিন মাকে দিয়ে পাড়ালাম চক্কোত্তীর কাছে। সহজে কি নচ্ছার হারামজাদা বাগ মানে। শালার ঘরের চালে খড় নেই, পাঁচ বিঘে ভুঁই আর ভিটেটুকু আজ তিন বছর আমার ঘরে বাঁধা রয়েছে। এক পয়সা সুদও

আজ পর্যন্ত ঠেকাতে পারেনি ব্যাটা। থালি বসে বসে হাঁপাচ্ছে আর মেয়েকে ঘরে রেখে ধুম্বী করছে। ভিটে-ভুঁই সব দখল করে পথে বসাব বলে মোচড় দিলুম। তখন ব্যাটা শয়তানি ছেড়ে সোজা পথে এল।"

এতক্ষণ আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল নিতাই, এবার সামনে এসে দাঁড়াল। স্নান সেরে এসেছে। পিঠ ছাপিয়ে কোমরের নিচে নেমেছে ভিজে চুলের রাশি। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তার দুই চোখে আগুনের ফিনকি ছুটছে।

হাত বাড়িয়ে পায়েব ধুলো নিয়ে নিতাই বললে—"এখনি আমরা উঠব গোসাঁই। এবারের মত অনুমতি কর আমাদের।"

"সে কি! এই ত সবে পরশু এলে তোমরা, এর মধ্যে যাচ্ছ কোথায়?"

মোহন্ত চরণদাস বাবাজী মাদুরের ওপর বসে দম লাগাচ্ছিল। আকাশের দিকে মুখ তুলে ধোঁয়াটা ছেড়ে দিয়ে কলকেটা উপুড় করে মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে জবাব দিলে মোহন্ত, "ঠাকুর যেথানে নেন। আমাদের জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না গোসাঁই। তুমি তোমার রাজসিংহাসনের ওপর বসে শান্তিতে রাজত্ব চালাও।"

মুখ ফেরাতেই আবার নজর পড়ল জয়দেবের ওপর। সামনে বসে বুক চেপে ধরে হিক্কা সামলাচ্ছে আর থুতু ফেলছে। একটু দূরে মাটির ওপর চোখ বুজে পড়ে আছে ওর বউ। রাজ্যের মাছি এসে ছেঁকে ধরেছে তার ফোলা ফোলা মুখখানা। যারা তাকে কাঁধে করে বয়ে এনেছে তারা চারজন পাশে বসে হ্যাংলার মত চেয়ে আছে মেয়েটার দিকে।

হঠাৎ খেয়াল হল যে আমি উদ্ধারণপুরের বিখ্যাত সাঁইবাবা নিজের গদির ওপর চেপে বসে আছি। কিন্তু আমার যা করা কর্তব্য ঐ সময় তা এখনও করাই হয়নি।

আরম্ভ করলাম গালাগাল। প্রথমে মা বেটীকে অর্থাৎ যার কানে কোনও কিছুই ঢুকবে না কোনও দিন সেই অদৃশ্য শ্মশানকালীকে। তারপর বেটা কালভৈরবকে। তারপর চোখ বুজে শোওয়া বেইমান বৌটিকে। সে পালা সমাপ্ত করে শ্রীমান জয়দেব ঠাকুরকে।

"শালার বেটা শালা, ফের তুই এ পাপ করতে গেলি কেন রে হারামজাদা? লজ্জা নেই তোর শুয়োরের বাচ্ছা? কতবার তোকে সাবধান করে দিয়েছি রে হারামজাদা যে তোর বংশরক্ষা কিছুতেই হবে না। তবে তুই কেন এ কাজ করতে গেলি রে আঁটকুড়ির বেটা?"

লাল চক্ষু দুটো ঘুরিয়ে কি ইশারা করলে জয়দেব তার সঙ্গীদের। তাড়াতাড়ি

তারা দুটো বোতল বার করে সামনে বসিয়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। জয়দেব আবার উপুড় হয়ে পড়ে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলে।

"ক্ষেপে যেও না বাবা, শাপমন্যি দিও না তোমার অধম সন্তানকে। তুষ্টু হয়ে একটু পেসাদ করে দাও বাবা। তুমি তুষ্টু থাকলে আমার সব হবে গো বাবা, সব হবে। দিনকে রাত বানাতে পার বাবা তুমি, তোমার দয়ায় এবার আমার বংশ-রক্ষে নিশ্চয় হবে। রোখে কার বাবার সাধ্যি।"

জয়দেবের বংশরক্ষে হবেই হবে। রোখে কার বাবার সাধ্যি, শুধু একটু যা আটকাচ্ছে আমার তুষ্টু হওয়া ব্যাপারটার জন্যে। আর তুষ্ট আমাকে হতেই হবে। সে ব্যবস্থা ওরা বাড়ী থেকেই করে এনেছে। ঘরে ভাঁটি নামিয়ে জলন্ত মদ এনেছে কয়েক বোতল। একবার ওর খানিকটা গলা দিয়ে নামলে পর আমি তুষ্টু না হয়ে যাব কোথায়। আর তখন পেসাদ পেয়ে ওরা নাচতে নাচতে গাঁয়ে ফিরে যাবে। সেখানে জগানো আছে আর একটি মেয়ে। যাকে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে আবার আমায় তুষ্টু করতে ফিরে আনবে জয়দেব কিছুদিন পরেই।

জয়দেব আমার বাঁধা খদ্দের। ওকে চটানো কাজের কথা নয়। একটা বোতল তুলে নিয়ে খানিকটা ঢেলে দিলাম গলায়, খাসা মাল। গলা দিয়ে যতদূর নামল, জলতে জলতে নামল

পেসাদ পাবার জন্যে জয়দেব পা ছেড়ে দিলে। বোতলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম। তার সঙ্গীরা চীৎকার করে উঠলো—"বোম্ বোম্ হরশঙ্করী মা।" তারপর দু' হাতে নিজেদের দু'কান আর নাকটা মুচড়ে গড় হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকালে।

বড় সড়কের ওপর থেকে চরণদাসের গলা ভেসে এল—

"গুরু—বলে দাও মোরে
কোনখানে সে মনের মানুষ বিরাজ করে।"

উদ্ধারণপুরের ঘাট

বিকিকিনির টাট।

পাপ-পুণ্য চরিত্র মনুষ্যত্ব জ্যান্ত মড়া ধড়িবাজ আর ধর্মধ্বজী সব একসঙ্গে সস্তা দরে নিলামে ওঠে সেখানে। নিলাম ডাকে স্বয়ং মহাকাল—ক্রেতা চারজন। ভবিতব্য, ভাগ্য, কর্মফল আর নিয়তি।

শ্মশানে ঝিরঝিরে বাতাসে, গঙ্গার ঢেউয়ের কুলকুল ধ্বনিতে, চিতার ওপর

আগুনের আঁচে মানুষের মাথা ফাটবার ফট্ ফটাস আওয়াজে শোনা যায়, সেই নিলামের ডাক। সপ্তগ্রামের বণিক কুলপতি উদ্ধাবণ দত্ত মশায় পাকা সদাগর ছিলেন। নিক্তির তৌলে আজও জোর কারবার চলেছে তাঁর ঘাটে। কড়াক্রান্তি এধার ওধার হবার জো নেই। যিনি নিলাম ডাকেন তাঁর কপালের ওপর আছে তিন-তিনটে চোখ। কার সাধ্য রেহাই পাবে সেই চোখ তিনটিকে ফাঁকি দিয়ে।

বলরামপুরের সিঙ্গীমশায় কিন্তু রেহাই পেয়েছিলেন সেবার। খোল খত্তাল বাজিয়ে ঘটা করে গঙ্গায় দিতে এনেছিলেন তিনি তাঁর বিধবা গুরুকন্যাকে। তিন মহলা সিঙ্গী বাড়ী বলরামপুরে, বাড়ীতে সিংহবাহিনীর নিত্য সেবা। তার সঙ্গে তাঁর গুরুদেবকেও সপরিবারে নিজের বাড়ীতে বাস করিয়ে সেবা চালিয়েছিলেন সিঙ্গীমশায়। গুরু দেহ রক্ষা করলেন, তারপরেও গুরুপত্নী আর বিধবা গুরুকন্যা রয়ে গেলেন তাঁর আশ্রয়ে। কোথায় ফেলবেন অসহায়া বিধবা দুটিকে সিঙ্গীমশায়? তাঁদের রক্ষা করাও তাঁর ধর্ম বটে।

ধর্মরক্ষা হল বটে তবে শেষরক্ষাটুকু হল না।

চিতায় আগুন দেবার পরমুহূর্তেই তাঁর জ্ঞাতি ভব সিঙ্গী পুলিসের দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়লেন শ্মশানে। পুলিস চিতার ওপর থেকে টান মেরে নামিয়ে নিলে শব। পাঁচ মাস গর্ভবতী ছিল মেয়েটি আর তার নরম তুল তুলে গলায় ছিল দাগ—বাঁশ দিয়ে নিষ্পেষণ করার স্পষ্ট দাগ ছিল তার গলায়। নতুন গরদের থান পরিয়ে, অজস্র শ্বেত পদ্মে ঢেকে, ধূপ চন্দনকাঠের গন্ধে চারিদিক মাত করে, খই-কড়ি-পয়সা ছড়াতে ছড়াতে, নাম সংকীর্তনের দল সঙ্গে নিয়ে, ঠিক যেভাবে গুরুকন্যাকে গঙ্গায় দিতে নিয়ে আসা উচিত, সেইভাবেই এনেছিলেন সিঙ্গীমশায়। কোনও দিকে এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় সেদিকে ছিল তাঁর কড়া নজর। কিন্তু তিনটে চোখ যে রয়েছে উদ্ধারণপুরের নিলামদারের কপালের ওপর

কাজেই সব চাল গেল ভেস্তে। চাটাই জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবেন তারা সদরে সিঙ্গীমশায়ের অত সাধের গুরুকন্যাকে। সেখানে হবে চেরা ফাড়া। তারপর—

তারপর ভয়ানক চড়া ডাক দিলেন সিঙ্গীমশায়। যার ফলে তার তিনখানা চারহাজারি মহাল হাতছাড়া হয়ে গেল। উদ্ধারণপুরের নিলামদার হল পরাভূত। কিন্তু গুরুকন্যা আর উঠল না চিতায়। গোলমাল চুকে গেলে কারও আর মনেই পড়ল না তার কথা। পড়ে রইল গুরুকন্যা উদ্ধারণপুরের ঘাটে, নরম সাদা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল শেয়াল-শকুনে। পেটটা ঠোঁট দিয়ে ফেড়ে ভেতরের পাঁচ মাসের ভ্রূণটাকেও তারা রেহাই দিলে না।

ঠিক দু'বছর পরে ছুটকে বাগ্দীর দল নামালে তাদের কাঁধের বোঝা উদ্ধারণপুরের ঘাটে। বিকট দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি মুচকে উঠে দম বন্ধ হবার উপক্রম। কপালের ঘাম মুছে বাঁশখানা খুলে নিয়ে পুঁতে দিতে এল ছুটকে আমার গদির দেওয়ালে।

"পেন্নেম হন্ন গো গোসাঁইবাবা। এক ঢোঁক প্যাসাদ দ্যান।"

বললাম—"গাজ ওটা কি আনলি রে ছুটকে—দ আগে এল যে। আজকাল শুয়োর পচা বইছিস নাকি তোরা?"

"হেই—শুয়োর কি গো। ক্ষ্যামা দাও গো বাবাঠাকুর—ক্ষ্যামা দাও ও কথায়। ও যে আমাদের বলরামপুরের সিঙ্গিমশাই গো। তিনদিন ধরে পড়েছেন ঘরে শুয়ে। কেউ ছাইলে না ছুঁতে মড়া। শেষে বউ ঠাকরেণ বেইরে এসে আমার হাত দুখানা জইড়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। সে কি কান্না গো গোসাঁইবাবা—বললেন—'ছুটকে, পেটের সন্তান নেই আমার, তো বই আজ থেকে ছেলে বলে মানলুম, কর্তার হাড় কখানা গঙ্গায় দিয়ে আসবি নে বাবা?' সে কান্না দেখে আর থাকতে পারলুম না গো। মড়া কাঁধে তুলে এ সাত ক্রোশ মাটি এক ছুটে পার হয়ে এনু আমরা। নামাবার কি জো আছে কোথাও—এমন বাস ছেড়েছেন যে গগনের শকুন টেনে নামিয়ে ফেলবে।"

ওরা চারজন—সবাই গোকলো ভুবলো আর ছটকে। একটা আস্ত বোতল এগিয়ে দিলাম। ওরা খায় পচাই আর এ হচ্ছে পাকা মাল। এক এক ঘটি জলের সঙ্গে খানিকটা করে মিশিয়ে নিয়ে ঢকঢক করে গলায় ঢালতে লাগল।

শুনলাম সিঙ্গী গিন্নীও আসছেন গরুর গাড়ীতে। তিনি এলে শব চিতেয় উঠবে।

বললাম—"তবে এখন সরিয়ে রেখে আয় ওটাকে। ওই উত্তর দিকের জাম গাছের ডালে লটকে বেঁধে আয়। দক্ষিণে হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যাবে গন্ধ। নইলে টেঁকা যাবে না যে এখানে।"

ওদের মাল উঠিয়ে নিয়ে গেল ওরা। আবার মড়াপোড়ার সোদা গন্ধে চারিদিক মাত হয়ে গেল। বুক ভরে শ্বাস টেনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

গঙ্গার কিনারায় গোটা চার পাঁচ চুলায় ভিয়ান চড়েছে। সব সময় রস পাক হচ্ছে ওখানে—নবরসের রসায়ন তৈরী হচ্ছে। মাথায় গামছা জড়িয়ে ভিয়ানকররা চুলায় খোঁচাখুঁচি করছে বাঁশ দিয়ে। উদ্ধারণপুরের সূয্যি ঠাকুর ঐ ওপরে এসে দাঁড়িয়ে হাঁ করে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন ভিয়ানের দিকে। এখানকার

যাদুকর চালিয়ে যাচ্ছে তার ভেলকি-বাজির চাল। বোতল বেরুচ্ছে, আগুন চড়ছে বার বার কলকের মাথায় আর কাঠ বইছে রামহরি আর পঞ্চেশ্বর। বল হরি—হরি বোল, হরি হরি বল। হরিবোল দিয়ে আসছে—হরিবোল দিয়ে চলে যাচ্ছে।

হরি গঙ্গা তিল তুলসী এই নিয়েই উদ্ধারণপুরের ঘাট মশগুল। আবার একখানি লাল রঙের ছোট্ট গীতাও অনেকে চাপিয়ে আনে মড়ার বুকের ওপর। যে বুকের ভেতর আগুন নেই, তুষারের মত শীতল হয়ে জমে গেছে যে বুকের ভেতরটা, সেখানেই ঝড় বহাবে গীতার গীতিকা।

অতন মোড়ল হাই তুলতে তুলতে হাতে তুড়ি দিয়ে বলে—এই ত সাক্ষাৎ কাশীক্ষেত গো। গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। এঁর তুল্য থান কি আর কোথাও আছেন?

নেইও।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ সিদ্ধির চৌকস বন্দোবস্ত রয়েছে উদ্ধারণপুরের ঘাটে। রক্তে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্যে রামহরির বউ এমন মাল জ্বাল দিয়ে নামায়—যা আর কোথাও মেলে না। আর যে দেহের রক্ত জমে শক্ত হয়ে গেছে তাতে আগুন ধরাবার জন্যে রামহরি কাঁধে করে বয়ে আনে মোটা মোটা তেঁতুল কাঠের কুঁদো। তারপর রামহরির শালা পঞ্চেশ্বরের পালা। তার আছে একখানি রঙিন চৌকো ছককাটা কাপড় আর তিনখানা হাড়ের পাশা। চাঁড়ালের পায়ের হাড় থেকে বানিয়েছে সে পাশা তিনখানা। পঞ্চা যখন তার ছকখানা গঙ্গার ধারে পেতে ডাক দেয় তখন না গিয়ে থাকতে পারে না কেউ সেখানে। আওয়াজ ওঠে সেখান থেকে—ব্যোম কালী নাচনেওয়ালী—চা বেটি একবার মুখ তুলে—শালার হাড়ে ভেলকি খেলিয়ে দি।

ভেলকিই খেলিয়ে দেয় পঞ্চা ডোম। সকলের সব ট্যাঁক খালি হয়ে সব রেস্ত গিয়ে ঢোকে পঞ্চার ট্যাঁকে। তাতে যায় আসে না কিছুই। তখন ডাক পড়ে পঞ্চার দিদিকে। পাঁচ বছরের উদলা মেয়ে সীতাকে নিয়ে এসে দাঁড়ায় সে। পরনে শুধু কস্তাপেড়ে পাতলা একখানি শাড়ী। তার আঁচলখানা বা কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে শক্ত করে বাঁধা থাকে কোমরে। মাজায় জড়ানো থাকে আধ বিঘত চওড়া রূপোর বিছা। সামনে উবু হয়ে বসে সে টাকা গুণে দেয়। যাকে দেয় সে চেয়ে থাকে। চেয়েই থাকে শুধু ওর দিকে। পাতলা শাড়ীখানা কিছুই ঢাকতে পারেনি। মাংস শুধু মাংস—টাটকা তাজা জ্যান্ত মাংস অনেকটা বয়ে বেড়াচ্ছে পঞ্চেশ্বরের দিদি।

আধ কুড়ি টাকা পর্যন্ত গুণে দেয় রামহরির বউ। ফিরিয়ে দেবার সময় দিতে হবে মাত্র দু' টাকা বেশী। তা ছ'মাস পরে ঘুরে এলেও তাই দিতে হবে। রামহরির বউ জানে যে এই ধর্মক্ষেত্রে হাত পেতে নিয়ে কেউ মেরে দেবে না তার টাকা।

সে উপায় নেই উদ্ধারণপুরের পাওনা দেনা। জন্মের শোধ চুকিয়ে দেওয়া যায় নিজে মরে। নয়ত বার বার ঘুরে আসতেই হবে এখানে। আসতেই হবে নয়ত চলবে কি করে আমাদের? শেয়াল শকুন কুকুর রামহরির পদ্মা আমি আর ওই ওরা, যারা মনে অং ধরাবার দোকান খুলে বসেছে ওই বড় সড়কের ওধারে। দরমার খোপ বানিয়ে বাঁশের মাচা পেতে দিয়েছে রামহরি জমিদারের কাছ থেকে জমির বন্দোবস্ত নিয়ে। রোজ সকালে ওদের দিতে হয় মাত্র এক আনা করে ভাড়া। তা আমাদের এতগুলি প্রাণীর চলবে কি করে যদি বার বার না ঘুরে আসে সকলে?

[illegible] ঘাটে পুরুত ঠাকুর সিধু চক্কোত্তী দেন দু' আনা করে রোজ। মনে অং ধরবার জন্যে যারা রয়েছে তাদের ওধারের কোনো ঘরে দোকান সাজিয়েছেন তিনি। [illegible] ঘুরিয়ে দেন, শ্বেত চন্দনের সঙ্গে [illegible] বড়ি খাওয়ান। ডাক দিলে ডাক শোনে সিধু কবরেজের গুলি [illegible] দিন তিনটি বড়ি আর এক ভাঁড় করে পাঁচন খান—কিন্তু মাছ মাংস পেঁয়াজ ডিম এ সমস্ত চলবে না অন্তত সাত দিন। তারপর যা খুশি চালাও। কিছু দিন পরে আবার ফিরে এসো সিধু কবরেজের কাছে। যত্ন করে [illegible] খাইয়ে দেবেন আবার। একেবারে নবকলেবর পাবে।

নবকলেবর ধারণ করবার আশায় নিত্য লোক আসে উদ্ধারণপুরের ঘাটে। সারা জীবন জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়েই আসে। চিতার ওপর সামান্য ঝলসে ওঠে মাংসটা যখন তখন শেয়ালেরা টেনে নামায়। তারপর ওদেরই পেটে চলে যায় নবটুকু। তখন তারা আবার জন্মায় নবকলেবর ধারণ করে।

কিন্তু আবার কি জন্মায় ওরা? সাক্ষাৎ কাশীক্ষেত্রে গঙ্গায় দিয়ে গেলে আবার জন্ম হয় কখনও? অতন মোড়ল চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে পারে যে সব কটা উদ্ধার হয়ে 'সগ্গে' চলে যায়। আর যারা তা যায় না, তাদের জন্যে অন্য সগ্গের ব্যবস্থা ত করেই রেখেছে এখানে রামহরি।

বিষ্টুটিকুরির জয়দেব ঘোষাল বউকে সগ্‌গে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চলে গেল রামহরির তৈরী এই মর্ত্যের সগ্‌গে। বউটাকে চিতায় তুলে একটা মুড়ো জ্বালিয়ে দিয়ে ওরা উঠে গেল রামহরির সঙ্গে। আজ রাতে ওরা আর ফিরবে না। অঙ চড়াবে মনের পর্দায়। ওধারে ত জয়দেবের পথ চেয়ে বসেই আছে হেঁপো রুগী হারাধন চক্কোত্তীর মেয়ে ক্ষিরি।

থাকুক আরও কয়েকটা দিন সে পথ চেয়ে বসে। কিন্তু ছুটকে নবাই গোকুলো ভূষণো আর পথ চেয়ে বসে থাকতে পারলে না সিঙ্গী গিন্নীর জন্যে। গাছে টাঙ্গানো সিঙ্গীমশাইকে আমার জিম্মায় রেখে তারা নেয়েধুয়ে নিজেদের পথে পা বাড়ালো। নগদ দেড় কুড়ি টাকা আগেই গুণে পেয়েছিল, কাজেই আরও এক রাত সিঙ্গী গিন্নীর অপেক্ষায় বসে থেকে লাভ কি। কাল সেই জলখাবার বেলা হবে তাঁর গরুর গাড়ী এসে পৌঁছতে।

বড়ই নিরাশ হয়ে মুখ আঁধার করে বড় সড়কের ওধারে নেমে গেলেন আকাশের দেবতা। সারাদিন এত অভিযান চড়ল উদ্ধারণপুরের ঘাটে কিন্তু কিছুই জুটল না তাঁর ভাগ্যে। শুধু হ্যাংলার মত চেয়ে থাকাই সার হল সারাদিন। কেউই কিছু নিয়ে যেতে পারে না এখান থেকে। মুঠো মুঠো শুকনো ভস্ম ছাড়া কারও কপালে কিছুই জোটে না এখানে।

গঙ্গার পূর্বতীরের তালগাছের মাথাগুলো লাল হয়ে উঠেছে। কালো যবনিকা-খানি ধীরে ধীরে নেমে আসছে রঙ্গমঞ্চের উপর। চিতার আগুনের আলো আরও লাল আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নিঃসাড়ে পা ফেলে অলক্ষ্যে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে উদ্ধারণপুরের রাত্রি। কুহকিনীর চোখে ভীরু লজ্জা, নিঃশ্বাসে কামগন্ধ, আর্দ্র ঠোঁটে নির্লজ্জ লালসা। থমকে দাঁড়িয়ে সভয়ে দেখছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। অনায়াসে কেমন গলগল করে গলায় ঢালছি আমি জ্বলন্ত মদ। সেই জিনিস জ্বলতে জ্বলতে নামছে পেটের মধ্যে। ঢালব গলায় যতক্ষণ হুঁশ থাকবে। অনেক-গুলো বোতল আজ ভরতি পড়ে রয়েছে এখনও। জয়দেব আমার বড় উঁচুদরের খদ্দের। ওর সুদ আদায় করা সার্থক হোক।

এইবার আর একলা নই আমি। সারাটা দিন বড় একা একা মনে হয়। ঐ ত এসে দাঁড়িয়ে আছে অভিসারিণী। এইবার ঢুলে পড়ব ওর নরম বুকের ওপর। তিমির কেশজালে ও আমায় ঢেকে ফেলবে। ওর দেহের অতল রহস্যের মাঝে তলিয়ে যাব। মিশে যাব ওর আঁধার অন্তরের সঙ্গে। তখন আর থাকবে না কিছুই এখানে, উদ্ধারণপুরের রঙ্গমঞ্চের ওপর তখন যে খেলা দেখানো হয় তা দেখবার জন্যে একমাত্র রাত্রি ভিন্ন কেউ জেগে থাকে না।

সেদিনও কেউ সাক্ষী ছিল না সিঙ্গীমশায়ের গুরুকন্যার পক্ষে। শুধু এক ভয়ঙ্করী রাত্রি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছিল। তিন মহলা বাড়ীর কোন এক অন্ধকার ঘরের মধ্যে একান্ত সঙ্গোপনে স্বহস্তে কার্যটি সমাধা করেন সিঙ্গী মশায়। ভোরে রটিয়ে দিলেন হঠাৎ কলেরায় তাঁর গুরুকন্যা দেহত্যাগ করেছেন। জ্ঞাতিশত্রু বাদ না সাধলে অত চড়া ডাক দিতে হত না তাঁকে উদ্ধারণপুরের নিলামে। তিন-খানা মহালও নিলামে চড়ত না। কিন্তু তাতেও কি তিনি রেহাই পেলেন? অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে সেই সর্বনাশী রাত্রি মুখ টিপে হাসলে। সেই হাসির জের চলল দু' বছর। নিবিড় আঁধার ঘনিয়ে এল তাঁর জীবনে। দু' বছর মশারির ভেতর শুয়ে কাটাতে হল তাঁকে। সেই মশারির ভেতর বসে তাঁর স্ত্রী তার অঙ্গ থেকে একটি একটি করে পোকা বাছতে লাগলেন। খসে গলে পড়তে লাগল নাক কান হাত পায়ের আঙুল। দুর্গন্ধের চোটে তাঁর বাড়ীর ত্রিসীমানা দিয়ে কেউ হাঁটত না। শুধু সিঙ্গী গিন্নী নির্বিকারভাবে মুখ টিপে বসে রইলেন স্বামীর বিছানায়, আর পোকা বাছতে লাগলেন।

একদিন শেষ হল তার পোকা বাছা। গরুর গাড়ী এসে পৌঁছল ভোর বেলায়। শাঁখা সিঁদুর পরেই নেমে এলেন সিঙ্গী গিন্নী। স্বহস্তে স্বামীর মুখাগ্নি করে শাঁখা সিঁদুর ভেঙে মুছে ফেললেন এখানেই। আর একপ্রাণীও তাঁর সঙ্গে আসেনি। মহাপাতক যে—এমন কি একঘরে হবার ভয়ে গাঁয়ের পুরুতে প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র পর্যন্ত পড়ায়নি।

সিঙ্গীমশায়ের সাধ্বী স্ত্রী পাগলের মত মাথা খুঁড়তে লাগলেন, "বলে দাও—ওগো বলে দাও কেউ আমায়—কি করলে ওর প্রায়শ্চিত্তটা করানো যায়।"

জানা নেই কারও প্রায়শ্চিত্তের বিধান। গুরুকন্যায় [illegible] সন্তান উৎপাদন করে তার গলায় বাঁশ দিয়ে ডলে মেরে ফেললে কি জাতের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন, তার বিধান হয়ত এখনও কোনও পণ্ডিত লিখে উঠতে পারেননি কোনও পুঁথিতে। পুরো দু'বছর বিছানায় শুয়ে যে প্রায়শ্চিত্ত চালাচ্ছিলেন সিঙ্গীমশায় তার ওপরেও আরও কিছু করবার আছে কিনা তাই জানবার জন্য তিনি সদা সর্বক্ষণ আকুলিবিকুলি করতেন। কিন্তু কেউ জানে না, কেউ বিধান বলে দিতে পারেনি তাঁকে।

হয়ত জানতে পারেন আমাদের সিধু ঠাকুর। তাঁকেই ডাকা হল। তিনি এসে দান করলেন প্রায়শ্চিত্তের শাস্ত্রীয় বিধান।

একটি সবৎসা গাভী দান করতে হবে। সেই গাভীর ভাত খাবার জন্যে থালা গেলাস বাটি চাই। তা ছাড়া গাভীর শয্যা বস্ত্র পাদুকা ছত্র সবই প্রয়োজন। মন্ত্র

পড়ালেন সিধু কবরেজ সিঙ্গী গিন্নীর হাতে তিল তুলসী গঙ্গাজল দিয়ে—"ইদং সালঙ্কারা সবৎসা ও সবস্ত্রা শয্যা পাদুক। ছত্র ভোজ্য গামছা সহিতং গাভীমূল্যং ব্রাহ্মণাহং দদামি।" তারপর স্বামার জন্যে মস্তক মুণ্ডন করলেন সিঙ্গী গিন্নী, পঞ্চ গব্য পান করলেন। কিন্তু চিতায় উঠল না সিঙ্গীমশায়ের পচা দেহখানি, গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হল। গোটাকতক কলা গাছ নিয়ে এল পঙ্কা। সেগুলো একসঙ্গে বেঁধে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল সিঙ্গীমশায়কে। তারপর বুঝে নিন কলুষ-নাশিনী মা গঙ্গা। গাভীর মূল্য আর বস্ত্র পাদুকা ছত্র শয্যা দক্ষিণা ইত্যাদি বাবদ মাত্র বিয়াল্লিশটি টাকা গ্রহণ করলেন সিধু কবরেজ। রামহরি অবশ্য সম্পূর্ণ চিতার খরচই পেলে। জলে ভাসিয়ে দিলেও চিতার খরচ দিতে হয়।

পার হয়ে গেলেন সিঙ্গীমশায় সিধু পুরুতের সজীব মন্ত্রের জোরে। যথাসময়ে কৈচরের বামুনদিদির শরণাপন্ন হলে নির্বিঘ্নে পার হয়ে যেতেন অনেক আগেই। কাকে-বকে টের পেত না কিছুই। অনেক বড ঘরের বড় কথা জমা আছে বামুন দিদির পেটে। তাঁর বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না।

সিঙ্গী গিন্নীও কম পাকা নন। সেদিন রাত্রে তারও বুক ফেটেছিল কিন্তু মুখ ফোটেনি। নিজের বাড়ীর অন্দরমহলে যে খেলা খেলেছিলেন তাঁর স্বামী, তাতে তাঁর হাত ছিল না বটে তবে মুখ ফুটিয়ে তিনি বাধাও দিতে যাননি। বরং তাঁর বুকের জ্বালা কিছুটা হয়ত জুড়িয়েছিল। চোরকুঠারটার বাইরে দাঁড়িয়ে একবার তিনি সামান্য চাপা আর্তনাদও শুনেছিলেন। তারপর নিজের হাতেই সযত্নে ফুলে চন্দনে সাজিয়েছিলেন গুরুকন্যাকে, নিজের হাতেই গুরুঠাকুরুণকে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিলেন। সবই সেদিন করেছিলেন স্বামীর জন্যে, স্বামীর নাম মান বাঁচাবার জন্যে। আর তা করাও তাঁর কর্তব্য, নয়ত তিনি কেমন করে নিজেকে সিঙ্গীমশায়ের উপযুক্ত সহধর্মিণী বলে পরিচয় দেবেন।

তারপর তাঁর অত বড বাড়ী-ভর্তি আত্মীয়স্বজন আশ্রিত-আশ্রিতার দল যখন একে একে বিদায় নিলে, সারা বাড়ীটা খাঁ খাঁ করতে লাগল, আর সন্ধ্যা হলেই সেই চোরকুঠরিটার ভেতর থেকে নানারকম অদ্ভুত শব্দ বার হতে লাগল, তখনও তিনি মুখ বুজে পড়ে রইলেন সেই বাড়ীতে। সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য করে গেলেন মশারির ভেতর বসে—স্বামীর দেহ থেকে পোকা বেছে। আজ তাঁর সব কর্তব্যের শেষ হল এখানে, স্বামীর সঙ্গেই তিনি জন্মের-শোধ বেরিয়ে এসেছেন সেই বাড়ী থেকে। আর ফিরবেন না সে বাড়ীতে, ফেরবার উপায়ও নেই।

শাঁখা সিন্দুর ঘুচিয়ে মাথা মুড়িয়ে থান পরে আমার সামনে এসে বসলেন তিনি।

তাঁর দিকে চেয়ে মনে হল এবার জুড়িয়েছে তাঁর বুকের জ্বালা, নিভে গেছে যে চিতাটা তাঁর বুকের মধ্যে হু হু করে জ্বলছিল। দুঃখ শোক উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই তাঁর চোখে মুখে কোথাও। যেন মস্তবড একটা দেনাপাওনা মিটিয়ে ফেলে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এলেন। বড ঘরের মেয়ে তিনি, বড ঘরের বৌ। বয়সও এমন কিছু বেশী হয়নি তাঁর, শরীরের বাঁধুনিও নষ্ট হয়নি তেমন। যে বয়সে মেয়েরা মেয়ে জামাই ছেলে বৌ নিয়ে জাঁকিয়ে সংসার করেন সেই বয়স তাঁর।

কিন্তু কিচ্ছু নেই, পেছন ফিরে তাকাবার মত কোনও আকর্ষণ নেই তাঁর। তাই আর ফিরবেন না তিনি, এগিয়েই চলবেন সারাজীবন।

বললেন—"গাডী ত অনেকক্ষণ ফিরে গেছে বাবা। ওতে আর আমার দরকার নেই। পা দুটোই ত রয়েছে, এতদিনে ঘুচেছে পায়ের বেড়ি। এবার শুধু হাঁটব। যেখানে নিয়ে যাবে এই পা দু'খানা সেখানেই যাব। আর কোনও খাঁচায় ঢুকছি না আমি।"

তারপর যা বললেন তা শোনার জন্যে আমার কান দুটো তৈরী ছিল না। একেবারে . . . জোড করে বললেন—"এবার দয়া করে আমায় একটু প্রসাদ দিন বাবা।"

"প্রসাদ। কি প্রসাদ?"

"ঐ যে রয়েছে বোতল-ভর্তি আপনার সামনে। দিন বাবা দিন, একটু জুড়োক বুকের ভেতরটা। আজ কতদিন গলা দিয়ে এক ফোঁটা জলও নামেনি। দয়া করুন এই হতভাগী মেয়েকে।"

দিলাম।

হাতে তুলে দিলাম একটা বোতল। তারপর . . . করে চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে। বলরামপুরের সিঙ্গী বাড়ীর বড বৌ, যাঁর রূপের খ্যাতি ও তল্লাটে একদিন লোকের মুখে মুখে ছড়াত, খোল বেহারার পালকির মধ্যে বসে যিনি চলাফেরা করতেন একদিন, তিনি উদ্ধারণপুরের ঘাটে বসে সকলের চোখের সামনে অনায়াসে বোতলটা গলায় ঢেলে দিলেন। শ্মশানসুদ্ধ সবাই কাঠ হয়ে চেয়ে রইল নতুন থান-পরা মাথা-কামানো সদ্য বিধবার দিকে। আর যারা মরে কাঠ হয়ে পড়ে ছিল তারাও যেন একটু নড়েচড়ে উঠল চিতার ওপর।

শিপ্রা নদীর তীরে মহাকালের বিরাট ঘণ্টাটা বাজছে। চিতাভস্মে স্নান হচ্ছে এখন মহাকালের। প্রত্যহ একটি শব পুড়বেই উজ্জয়িনীর শ্মশানে। সেই ভস্ম এনে প্রত্যহ মাখানো হয় মহাকালকে। ঘি গঙ্গাজল চন্দন—কিছু লাগে না তাঁর

স্থানে, লাগে মানুষ-পোড়া ছাই। কেউ জানে না সেই স্থানের মন্ত্র।

হয়ত তারা জানে, যারা এখন নিশ্চিন্তে বাড়ছে নারীর গর্ভকোষের মধ্যে ঘোর অন্ধকারে। সেই অন্ধকার ছেড়ে আলোয় শুভাগমন করলেই সব যায় ঘুলিয়ে। ভুলে যায় মহাকালের মহামন্ত্র। যোনিদ্বার দিয়ে এই জগতে পদার্পণ করেই তাই ককিয়ে কেঁদে ওঠে মানুষ।

ব্রহ্মবিদ্যা আগমবাগীশ স্তব পাঠ করতে করতে বড় সড়ক থেকে নেমে আসছেন

ওঁ যোনিরূপে মহামায়ে সর্বসম্পৎপ্রদে শুভে।
কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।
সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে।
কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।
মহাঘোরে মহাকালী কুলাচারপ্রিয়ে সদা।
কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।
যোনিরূপে মহাবিদ্যে সর্বদা মোক্ষদায়িনী।
কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।
হে যোনে হর বিঘ্নং মে সর্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে।
আধারভূতে সর্বেষাং পূজকানাং প্রিয়ং বদে।
স্বর্গপাতালবাসিন্যৈ যোনয়ে চ নমো নমঃ।

আগমবাগীশের গলায় খোলে ভাল স্তোত্রটা। গমগম করতে লাগল উদ্ধারণপুরের রঙ্গমঞ্চ। রামহরি পঙ্কা বয়ে নিয়ে এল তাঁর মোটঘাট। উত্তর দিকের বড় পাকুড় গাছের তলায় মস্ত বড় বাঘছাল বিছিয়ে বসলেন তিনি। বাঁয়ে বসলেন তাঁর শক্তি, সামনে সিন্দুর মাখানো ত্রিশূল পুঁতে।

রামহরির বউকে ডেকে খোঁজ নিলাম কত মাল মজুদ আছে ঘরে, ভাঁটি নামবে কবে। হাতের কাছে তখনও যে দুটো বোতল বসানো ছিল তাই নিয়ে নেমে গেলাম গদি থেকে। সিঙ্গী গিন্নী একভাবে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেই রইলেন সেইখানে।

উদ্ধারণপুরের আকাশ।

ছায়াপথে ঘুরে ফেরেন মায়াবিনী দুই যমজ ভগিনী।

বাসনা আর বঞ্চনা—দুই চিরজাগ্রতা দেবী উদ্ধারণপুর শ্মশানের। গঙ্গার

কাকচক্ষু জলে ধরা পড়ে তাঁদের প্রতিবিম্ব, যা দেখে ওঁরা নিজেরাই সভয়ে শিউরে ওঠেন। অবিরাম চিতার ধোঁয়া লেগে লেগে কালোয় কালো হয়ে গেছে ওঁদের মুখ। সেই পোড়া মুখ নিয়ে কেমন করে আর লোকের মন ভোলাবেন তাঁরা!

কালামুখীদের মুখে হাসির আলো ফোটাবার আয়োজন হয়েছে। উদ্ধারণ-পুরের ঘাটের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাঁদের পূজার মন্ত্র—

"শুধ্যন্তাং শুধ্যন্তাং শুধ্যন্তাং—"

নিশীথ রাতের গোপন অনুষ্ঠান—রহস্যপূজায় বসেছেন আগমবাগীশ শ্মশানের ঈশান কোণে। রক্তবস্ত্র পরে, জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে তাঁর শক্তি আসন গ্রহণ করেছেন তার বামে। সামনে শ্রীপাত্র গুরুপাত্র যোগিনীপাত্র ভোগপাত্র আর বলিপাত্র স্থাপন করা হয়েছে।

একে কৃষ্ণাষ্টমী তায় মঙ্গলবার। মোক্ষম যোগাযোগ মিলে গেছে আগম-বাগীশের। [illegible] করছেন—তত্ত্বশুদ্ধি হবে মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে।

ওঁ প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা
ভূয়াসং স্বাহা।

আমার প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান শোধন হোক, রজোগুণশূন্য পাপশূন্য জ্যোতিঃস্বরূপ হই যেন আমি।

জ্যোতিঃস্বরূপ হবার প্রধান উপচার আস্ত এক ভাঁটি টিনে [illegible] এনে দিয়েছে রামহরি ডোম। সাধক মানুষ সেও, বউকে একখানি রক্তবর্ণ কাপড় পরিয়ে নিয়ে এসেছে সঙ্গে। মেয়েটাকে রেখে এসেছে পঙ্কেশ্বরের কাছে। আজ রাতে পঙ্কাও ঢুকতে পাবে না শ্মশানে। পঙ্কা হচ্ছে অনধিকারী শক্তিহীন পশু। অবশ্য আমিও তাই। আমারও শক্তি নেই সুতরাং অধিকার নেই রহস্যপূজায় বসবার। কিন্তু আগমবাগীশ আশা রাখেন যে একদিন আমার পশুত্ব ঘুচবে। বীরভাব জাগবে আমার প্রাণে, সেদিন আমিও একটি শক্তি জুটিয়ে নিয়ে লেগে যাব শোধন-ক্রিয়ায়। তাই আমাকে একরকম জোর করে এনে বসিয়েছেন আগমবাগীশ ওঁদের সামনের আসনে।

বসে আছি আর বেশ বুঝতে পারছি অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাদের। আজ সন্ধ্যায় উদ্ধারণপুরে পৌছে চিতায় উঠে শুয়েছিল যারা, তারা চিতা থেকে

উঠে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের চার পাশে। দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে আগম-বাগীশের শোধন করার মন্ত্রপাঠ আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে চিতাগুলো থেকে। দুনিয়ায় আলো বাতাস আনন্দ ভালবাসা বিষাক্ত করে তুলেছিল ওদের পঞ্চপ্রাণ। শেষ পর্যন্ত সেই অশোধিত নোংরা প্রাণের মায়া কাটিয়ে ওরা পালিয়ে এসেছে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। পালিয়ে এসেছে এই আশা বুকে ভরে নিয়ে যে চিতার আগুনে সব শোধন হয়ে যাবে।

কিন্তু তা হবে না, হতে পারে না শোধন চিতার আগুনে। কি করে চব্বিশ তত্ত্বের শোধন করা যায় তার গুহ্য তত্ত্ব জানেন আগমবাগীশ। জানেন তিনি অনেক বিশুদ্ধ মন্ত্র, যে মন্ত্রের আগুনে পুড়িয়ে নিলে অশোধিত তত্ত্বগুলি পাকা হয়ে যায়। আর তখন সেই পাকা তত্ত্বগুলিকে নিয়ে চিতায় চড়লে চিতা থেকে বিষাক্ত কালো ধোঁয়া উঠে আকাশের মুখ কালোয় কালো হবার ভয় থাকে না।

ওঁ পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশানি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।

ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম শোধন হয়ে গেল।

এধারে প্রথম প্রহর শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। উদ্ধারণপুরের আকাশের কালো চোখ আরও কালো হয়ে উঠল, আমার সামনে বসা আগমবাগীশের শক্তির নিবিড় কালো চোখ দুটির মত। লালে লাল হয়ে আছেন আগমবাগীশের শক্তি। তার মধ্যে বড় বেমানান দেখাচ্ছে হাড়ের মত সাদা ওঁর হাতের শাঁখা দুটিকে। শাঁখাপরা হাত দু'খানির আঙুলে জড়াজড়ি লেগে গেছে। আবার মাঝে মাঝে কাঁপছে হাত দু'খানি। কেঁপে উঠছে তার সারা দেহখানিও। যেন ভিতর থেকে কে ঝাঁকানি দিচ্ছে ওঁকে। ঝাঁকানির চোটেই বোধ হয় ওর কালো চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছে একটা অজানা আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা। আগমবাগীশের এবারের শক্তিটি নেহাৎ কাঁচা, বলির পশুর দৃষ্টি ওর কাজল-কালো অবোধ চোখে।

ওঁ প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রাণি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।

প্রকৃতি অহঙ্কার মন বুদ্ধি আর শ্রোত্র শুদ্ধ হোক।

হওয়াই একান্ত প্রয়োজন, নয়ত কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছি। আগম-

বাগীশের শক্তির চক্ষু দুটিই করছে সর্বনাশ, আমার অহঙ্কার মন বুদ্ধিকে কিছুতেই ঘুমোতে দিচ্ছে না। ওর ওই অতল চোখের চাহনি যেন অনবরত খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলছে আমার প্রকৃতিকে। সামনে বসানো ঘৃতপ্রদীপের উজ্জ্বল শিখাটি অল্প অল্প নাচছে। তার ফলে যেন ঢেউ খেলছে ওর শরীরের শীতল শ্যামলতায়। বেশ একটি সকরুণ আবেদন আছে ওর মেটে মেটে বর্ণের। যেন মৌন মিনতি জানাচ্ছে—এস, নামো, ডুব দাও। ডুব দিয়ে দেখ জুড়োয় কিনা গায়ের জ্বালা।

সুতরাং ঐ আপদগুলোকে আর একবার ভাল করে শোধন করবার জন্যে হাত বাড়ালাম। একটা মস্ত বড় মাথার খুলিতে ভর্তি করে আগমবাগীশের মন্ত্রগুণে শোধন-করা এক পাত্র কারণ হাতে তুলে দিলে রামহরি। এইটিই বোধ করি পঞ্চত্রিংশৎ পাত্র আজ সকাল থেকে গণনা করলে। রামহরির বউ উঠে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে—"এবার ক্ষ্যামা দাও জামাই।" কি রকম যেন কাকুতি ফুটে উঠল ওর গলায়।

হাঁ—ক্ষ্যামাই দোব এবার। এই পাত্রটিকে শেষ করে—এই রাতের মত ক্ষ্যামা দোব। এই শোধন করা পাত্রটি শেষ করলেই শোধন হয়ে যাবে আমার চব্বিশ তত্ত্ব। তখন ঘুমিয়ে পড়ব। ঢলে পড়ব বিস্মৃতির কোলে। বিস্মৃতি উদ্ধারণপুরের কুহকিনী নিশাচরী।

কিন্তু আজ ত সে আসেনি। এসে দাঁড়ায়নি সে আমার পিছনে। আজ আমার পিছনে হাঁটুতে মাথা গুঁজে ঠায় চব্বিশ ঘণ্টার ওপর বসে আছেন যিনি তিনি কিছুতেই নড়বেন না সেখান থেকে। আজ সন্ধ্যাবেলায় যখন আমি আমার গদি ছেড়ে এসে বসলাম চক্রে, সিঙ্গী গিন্নীও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে বসলেন আমার পিছনে। ভাগ্য ভাল তাঁর যে চক্রে অনধিকারিণীর উপস্থিতি গ্রাহ্য করলেন না আগমবাগীশ।

সামনে আগমবাগীশের শক্তি আর পিছনে নলরামপুরের সিঙ্গী বাড়ীর সদ্য-বিধবা বৌ। এ অবস্থায় পড়লে পঞ্চত্রিংশৎ পাত্রের পরেও চব্বিশ তত্ত্বের নাড়ীর স্পন্দন কিছুতেই বেচালে চলে না। পাত্রটা প্রায় শেষ করে বাকিটুকু সিঙ্গী গিন্নীকে প্রসাদ দিলাম। ঠেলা দিয়ে তুলে পাত্রটা ধরিয়ে দিলাম তাঁর হাতে। বিস্তর পচা বিষ জমা হয়ে আছে ওঁর মনের মধ্যে। ভাল করে ধুয়ে সাফ হয়ে যাক্ উদ্ধারণ-পুরের পাকা ভাঁটির শোধন-করা তরল আগুনে।

ওঁ ত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবচাংসি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।

গণ্ডারের মত পুরু কি আগমবাগীশের গায়ের ত্বক! ওঁর চক্ষু দুটিতে কিসের আগুন দপ দপ করে জ্বলছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর লকলকে জিহ্বাটি। সেই জিহ্বা দিয়ে উনি ওঁর পাশে বসা শক্তির সর্বাঙ্গ লেহন করছেন যেন। উদ্ধারণপুর ঘাটের মাংস পোড়ার গন্ধ আগমবাগীশের থ্যাবড়া নাকে প্রবেশ করে না। ওঁর শক্তির মেটে মেটে বঙের সজীব মাংসের ঘ্রাণ পান উনি নাকে। মুখ ব্যাদান করে তিনি বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। আমার শুম্ভ-নিশুম্ভ কান খাড়া করে শুনছে ওঁর সজীব মন্ত্র-উচ্চারণ।

ওঁ পাণিপাদপায়ুপস্থশব্দা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা
ভূয়াসং স্বাহা।
ওঁ স্পর্শরসরূপগন্ধাকাশানি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা
ভূয়াসং স্বাহা।
ওঁ বায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মানো মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা
ভূয়াসং স্বাহা।

গঙ্গার ওপারে আকাশ থেকে একটি তারা খসে পড়ল। তীব্র বেগে নামতে নামতে হঠাৎ গেল মাঝপথে মিলিয়ে। এপারে ঐ ওধারের শেষ চিতাটা থেকে ছিটকে পড়ল একখানা জ্বলন্ত কাঠ। অনেকগুলি স্ফুলিঙ্গ লাফিয়ে উঠল আকাশের দিকে। কিছু দূরে উঠে ওরাও মিলিয়ে গেল। আকাশ থেকে যে নেমে এল সে পেল না মাটির স্পর্শ, আর আকাশ ছুঁতে উঠল যারা তারা পেল না আকাশের নাগাল। মহাশূন্য সবই গ্রাস করল।

আমাকেও।

অসীম অনন্ত আকাশ।

অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র মহাবেগে অবিরাম ঘুরে মরছে আপন আপন কক্ষপথে। কেন? কেন তা কেউ জানে না। কেউ বলতে পারবে না কিসের টানে ওরা ঘুরছে, কার কোন্‌ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে ওদের ঐ নিরন্তর আবর্তনে।

ক্ষীরোদ সাগর। নিস্তরঙ্গ অবিক্ষুব্ধ অচেতন। শেষনাগ সহস্র ফণা বিস্তার করে ভাসছে। অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত অনন্তদেব, অতি সন্তর্পণে পদসেবা করছেন মহালক্ষ্মী।

সহস্র মুখে সহস্র ফণা দিয়ে বিষাক্ত শ্বাস ত্যাগ করছে নাগেশ নারায়ণের মুখের ওপর। তারই বিষক্রিয়ায় বিশ্বম্ভর আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে আছেন। কালকূটের

প্রমত্ত প্রভাবে সর্বাঙ্গ নীল হয়ে গেছে তাঁর। সেই নীলাভায় মহাব্যোম নীলে নীল হয়ে আছে। তার মাঝে উঠেছে প্রলয়ঙ্কর ঝড। সেই ঝড়েও বাসুকির সহস্র ফণা-নিঃসৃত হলাহলের নিশ্বাস। কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র সেই বিষের মাঝে পড়ে বিষের নেশায় মত্ত হয়ে দুর্নিবার গতিতে অনন্তকাল আবর্তিত হচ্ছে।

বহুদূর থেকে ভেসে আসছে আকুল আকতি।

"ওগো আমায় ছেড়ে দাও। আমার যে ছেলেমেয়ে আছে গো ঘরে। সর্বনাশ কোর না গো আমার, সর্বস্ব কেড়ে নিও না। সব খুইয়ে এখান থেকে ফিরে গিয়ে কোন্ মুখ নিয়ে আমি মা হয়ে দাঁড়াব তাদের সামনে?"

উদাত্ত স্বরে শোনা গেল মন্ত্র উচ্চারণ—

ওঁ যোনিবিদ্যাং মহাবিদ্যাং কামাখ্যাং কামদায়িনীং।

তৎস্বসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং কামবীজাত্মিকাং পরাং॥

গাল ফুলিয়ে তুবড়ি বাঁশিতে সুর তুলেছে সবনিয়ন্তা সাপুড়িয়া। সুরের তালে তালে বাসুকির সহস্র ফণা দুলছে। ঘুমোক সবাই, কিন্তু ঘুমোয় না যেন ফণীন্দ্র। ও ঘুমোলে ওর শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যাবে যে। তখন আর বইবে না বিষাক্ত ঝড, নারায়ণের নেশা টুটে যাবে। স্তব্ধ হয়ে যাবে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবেগ। নিমেষে জেগে উঠবে সকলে, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে জেগে উঠবেন স্বয়ং চক্রপাণি।

কিন্তু ক্রমাগত উঠছে মর্মন্তুদ আর্তনাদ ধরণীর বুক থেকে। তাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে মহাকাব্যের মহাপ্রশান্তি।

"ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মেরে ফেল না। এই জন্যে আমায় এখানে আনছ, এ যদি বুঝতে পারতাম তা'হলে মরে গেলেও আমি আসতাম না গো তোমার সঙ্গে, কিছুতেই এখানে মরতে আসতাম না।"

সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে উঠল যুগ্ম মহাদেবী বাসনা আর বঞ্চনার বলি-মন্ত্রধ্বনি।

ওঁ ক্লীঁ কামেশ্বরি মহামায়ে ক্লীঁ কালিকায়ৈ নমঃ।

কুলাকুলাদিবিজ্ঞানে কালীনামতয়োর্মতে॥

হঠাৎ সাপুড়িয়ার বাঁশির সুরের তাল কেটে গেল। নিমেষে বাসুকির সহস্র ফণা গুটিয়ে গেল। নারায়ণ পাশ ফিরলেন। চমকে উঠলেন পদসেবারতা মহালক্ষ্মী। আপন কক্ষপথ থেকে গ্রহনক্ষত্রগুলো ছিটকে পড়ল। উল্কা বেগে

নামতে লাগল ধরার বুকে।

তখনও কোথায় কে দুমদাম করে মাথা খুঁড়ছে আর অবিরাম আর্তনাদ করছে।

"আমায় ছেড়ে দাও, ওগো আমায় যেতে দাও আমার ছেলেমেয়ের কাছে। তারা যে পথ চেয়ে আছে আমার। পূজার প্রসাদ নিয়ে আমি ঘরে ফিরব। সেই প্রসাদ খেয়ে তাদের বাপ ভাল হয়ে যাবে। প্রাণের মায়ায় সে আমাকে তোমার হাতে দিয়েছে। এ সর্বনাশ করতে আমায় নিয়ে আসছ তুমি, তা জানতে পারলে মরে গেলেও সে আমাকে পাঠাত না তোমার সঙ্গে।"

অচঞ্চল কণ্ঠে তখনও ধ্বনিত হচ্ছে মন্ত্র।

কামদা কামিনীজ্ঞেয়া তত্ত্বমধ্যে মহামতা॥

হাহাকার করে উঠল অসহায়া ধরিত্রী, নক্ষত্রগুলোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হবার ভয়ে আঁতকে উঠল। বুকে যত জোর আছে সব উজাড় করে উন্মাদ সাপুড়িয়া ফুঁ দিলে তার তুবড়ি বাঁশিতে। সেই ধাক্কায় জেগে উঠল শেষনাগ। প্রলয়ঙ্কর বিষনিশ্বাস ত্যাগ করলে। বিষে বিষে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মহাব্যোম। গ্রহনক্ষত্রগুলো নেশায় মত্ত হয়ে ফিরে পেল আপন গতিবেগ! মোহাচ্ছন্ন হয়ে আবার ঘুরতে লাগল আপন কক্ষপথে।

নীরন্ধ্র অন্ধকার। অন্ধকারের বুক থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরছে তাজা রক্ত। রক্ত নয়, রক্তাক্ষরে ফুটে উঠেছে অন্ধকারের বুকে মহামন্ত্র।

ওঁ সৌঃ বালে বালে ত্রিপুরাসুন্দরি যোনিরূপে মন সর্বসিদ্ধিং দেহি
যোনিমুক্তিং কুরু কুরু স্বাহা।

উদ্ধারণপুরের আকাশ।

কালো হয়ে উঠেছে আকাশের কালো চোখ। গুমরে গুমরে কাঁদছেন তাঁরা, মোচড় দিচ্ছে আকাশের মর্মস্থলে সেই সকরুণ বিলাপ। কাঁদছেন উদ্ধারণপুরের দুই চিরজাগ্রতা দেবী—বাসনা আর বঞ্চনা। তিথি বার নক্ষত্র সবই মেলবার মত মিলেছিল দৈবাৎ। তবু সুসম্পূর্ণ হল না ওঁদের পূজা। বলিদানে বাধা পড়ল। আগমবাগীশের শোধনক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে গেল। এরই নাম বোধ হয় দৈববিড়ম্বনা।

কিন্তু না, অত সহজে ব্যর্থ হয় না কিছুই উদ্ধারণপুর শ্মশানে। সারা দুনিয়া উজাড় হয়ে ব্যর্থতা এসে জমা হয় যেখানে আগুনে পুড়ে চরিতার্থ হবার আশায়, সেখানে বসে কিছু করলে তা ব্যর্থ হয় কি করে! তা'হলে যে দৈব হবে জয়ী, আর যার তুবড়ি বাঁশির সুরের তালে দৈব নাচে মাথা দুলিয়ে, সেই সর্বনিয়ন্তা সাপুড়িয়ার

বাঁশি বাজানো হবে নিষ্ফল।

শেষ পর্যন্ত স্থানমাহাত্ম্য বজায় রইল। মুখ রক্ষা হল উদ্ধারণপুর ঘাটের।

ধীরে ধীরে মাথা তুললে এক কালনাগিনী। নিজের বিষের জ্বালায় নিজেই জ্বলে পুড়ে মরছে সে। তাই সে চায় শান্তি, চায় বিস্মৃতি, বিষে ডুবে থেকে বিষের জ্বালা ভুলতে চায়।

থরথর করে কেঁপে উঠল উদ্ধারণপুরের আকাশ। স্বেচ্ছায় গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলি।

"আমায় নাও ঠাকুর। আমায় নিলে যদি তোমার চলে তা'হলে নাও আমায়। পূর্ণ হোক তোমার পূজা, আমারও জন্ম সার্থক হোক। ও হতভাগীকে আর অভিসম্পাত দিও না ঠাকুর, ও ফিরে যাক ওর ছেলেমেয়েব কাছে। তোমার পূজার প্রসাদে ওর স্বামী নীরোগ হয়ে উঠ্‌ক।"

ক্ষীরোদসাগরের নিস্তরঙ্গতা কিছুতেই বিক্ষুব্ধ হয় না। কোন কিছুতেই পদ-সেবায় ছেদ পড়ে না মহালক্ষ্মীর। বিষে বিষে নীল হয়ে গেল বিশ্বচরাচর। মহাবিষ্ণু কিন্তু ঘুমে অচেতন।

রামহরির বউয়ের বড় প্রাণ কাঁদে তাব ভবিষ্যৎ জামাইয়ের জন্যে। ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বয়ে নিয়ে এল আমাকে আমার গদির ওপর। শুনতে পেলাম রামহরির বউ বলছে—"মুয়ে আগুন মাগীর, আজ সকালে শাঁখা সিঁদুর খোয়ালি, আর রাতটা পোযাতে তব সইল না তোর, এব মধ্যে নুড়ো জ্বেলে দিলি নিজের মুখে।"

আমায় গদির ওপর তুলে দিয়ে ওবা ঘবে ফিরে গেল। অ প্রবৃত্তি নেই রামহরির—আগমবাগীশের অনুষ্ঠানে থাকবার। বললে—"চল আমরা ঘরকে চলে যাই বউ। ঠাকুরেব ধাষ্টামো আর সহ্যি হয় না।"

বামহরির বউ কাকে বললে—"এখানে গোসাঁইয়ের কাছে বসে থাক গো ঠাক্‌রুণ। রাত পোয়ালে গোসাঁই তোমার ব্যবস্থা করবে'খন।"

আগমবাগীশের অনুষ্ঠানে আর একটি প্রাণীও উপস্থিত রইল না, তার নবলব্ধ শক্তি ছাড়া। চিতা ছেড়ে উঠে গিয়ে যারা দাঁড়িয়েছিল অনুষ্ঠান দেখতে, তারা ফিরে গেল তাদের জ্বলন্ত চিতার ওপর। থাক যেমন আছে তেমনিই থাক ওদের অশোধিত চব্বিশ তত্ত্ব। আর কোনও আক্ষেপ নেই ওদের মনে। মহাশান্তিতে চিতায় শুয়ে পুড়তে লাগল সকলে।

কোন্ একটা গাছের ডগায় বসে কেঁদে উঠল একটা শকুন। তার সঙ্গে গলা

মিলিয়ে সুর তুললে অন্য সবাই। সেই নাকী সুরের মড়াকান্না চলতেই লাগল।

তারপর খুব দূরে ভাঁয়রোয় টান দিলে কে।

জাগো—মোহন প্যারে।

কে জাগবে তখন? একমাত্র রাত্রি ভিন্ন আর কারও উদ্ধারণপুরের শ্মশানে জেগে থাকা নিষেধ।

উদ্ধারণপুর ঘাটের নিশীথ রাতের গোপন অনুষ্ঠান—বাসনা আর বঞ্চনার রহস্যপূজা নির্বিঘ্নে চলতে থাকুক। অনর্থক 'মোহন প্যারে'কে জাগাবার জন্যে গলার কসরত করা, মিছামিছি মরণের দরজায় জীবনের মাথা খুঁড়ে মরা। তার চেয়ে ঘুমোও। মুছে ফেল জীবনের লক্ষণ উদ্ধারণপুরের ভস্ম চাপা দিয়ে।

পায়ের কাছে মাটিতে অন্ধকারে বসে ছিল যে মূর্তিটি তাকে বললাম—"ঘুমিয়ে পড। পার ত একটু ঘুমিয়ে নাও এই বেলা।"

বেচারা আশা করে নি যে আমি জেগে আছি। চাপা গলায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—"ওগো আমার কি হ'ব গো।"

বললাম—"কিছুই হবে না। কাল সকালে লোক সঙ্গে দিয়ে তোমায় বাড়ী পাঠিয়ে দোব।"

আবার কানে গেল মন্ত্র উচ্চারণ।

ওঁ ধর্মাধর্ম-হবিদীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।

সুষুম্নাংবর্তনা নিত্যমক্ষ-বৃত্তির্জুহোম্যহং স্বাহা॥

আগমবাগীশ পূর্ণাহুতি প্রদান করলেন।

আলো—আলো—আলো।

আলোয় আলোয় ছেয়ে গেছে উদ্ধারণপুরের শ্মশান। আলোর হাসি চলকে চলেছে গঙ্গার স্রোতে। শেয়াল শকুন কুকুর—সকলের মুখে ছোঁয়াচ লেগেছে সেই হাসির। চিতাগুলো তখনও ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। মাল সব সাবাড। বাসি পচা পড়ে থাকে না উদ্ধারণপুর ঘাটে। প্রতিদিন টাটকা নিয়ে কারবার। যা ছিল—তা আর নেই। থাকে না, থাকতে পারে না। অন্ধকার নেই, তার বদলে এসেছে আলো। সুতরাং একদম ভুলে মেরে দাও অন্ধকারের আব্দার। নিজেকে তৈরী করে নাও নতুনের স্বাদ পাবার জন্যে। নতুন হচ্ছে জীবন, বাসি পচা যা কিছু তা হচ্ছে মৃত্যু। তা নিয়ে মাথা ঘামানো, মন খারাপ করা, হায় হায় করাও মৃত্যু। উদ্ধারণপুর শ্মশানে মৃত্যুর প্রবেশ নিষেধ। নতুন জীবনের জয়গান উঠছে

উদ্ধারণপুর শ্মশানে। ভাঁয়রোঁর শেষ টান দিচ্ছে কে খুব কাছ থেকে।
"উঠ উঠ নন্দকিশোর।"

খন্তা ঘোষ।

ঝাড়া পাঁচ হাত লম্বা খন্তা ঘোষের গলা। পা.প টকটকে চারখানা দাঁত বার করা খন্তা ঘোষ কালোয়াতি গান গায়। খন্তা এসে গেল। যাক্ বাঁচলাম এবার। খন্তাই করবে একটা ব্যবস্থা। ওই পৌঁছে দেবে'খন বউটাকে ওর স্বামীর কাছে। গোলমাল চুকে যাবে।

উঠে বসলাম গদির ওপর। হঠাৎ কি খেয়াল হল, দু'হাত জোড করে আলোর দেবতাকে একটি প্রণাম জানালাম: "দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাও তুমি, তোমার আলো অসহায়তার অন্ত ঘটায়—তাই হে জীবন দেবতা, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছি।"

তারপর চোখ খুললাম। মূর্তিমান খন্তা ঘোষ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। আরও গোটাকতক দাঁত বেরিয়ে পড়েছে তার।

"তা'হলে তুমিও আজকাল ঘুমোচ্ছ গোসাঁই?" দরাজ গলায় হা হা হা হা হাসতে লাগল খন্তা। একেবারে ষোল আনা জীবন্ত খন্তা ঘোষ—তার মত হাসতে পারে অনর্থক উদ্দেশ্যহীন হাসি।

হাসি থামিয়ে তার লম্বা কোটের লম্বা পকেট থেকে টেনে বার করলে একটি চেপ্টা বোতল। বোতলটির মুখ খোলা হয় নি তখনও, ভেতরে টল টল করছে সাদা জল।

"নাও গোসাঁই—চালাও। আসল জাহাজী মাল, এ তোমার ডোম বউয়ের মা গঙ্গার পানি নয় বাবা—এ হচ্ছে গিয়ে—"

মাল সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা চালিয়ে যাবে খন্তা, যদিও নিজে ও কখনও মাল গেলে না। নেশার মধ্যে ওর আছে মাত্র দুটি নেশা। এক—টাকা রোজগার করা, আর দুই—টাকা ওড়ানো। ওই দুটি কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার জন্যে ওর মগজে হাজার রকম ফন্দিফিকির খেলা করে। যে কাজে ঝুঁকি কম সে রকম কাজে খন্তা সহজে হাত দিতে চায় না, মোটা লাভের লোভেও না। বলে—"দূর দূর, ওভাবে দু'দশ কুড়ি কামাতে ত বেলতলা ন্যাড়া ভট্‌চাযও পারে, চুনো পুঁটি মেরে শুধু শুধু হাতে গন্ধ করে কে? চেপে বসে থাক না বাবা, বাঘা মাছ ঘাই দেবেই।" হয়ত বাঘা মাছের জন্যে দু'দশ মাস গড়িয়ে চলে গেল। কুছ পরোয়া নেই খন্তার, নেহাৎ অচল হলে চুপচাপ শুয়ে থাকে গিয়ে ওর দিদির আখড়ার চরণ

দাস বাবাজীর পাশটিতে। সে সময় খন্তার মাথায় তেল পড়ে, অত লাল দেখায় না দাঁতগুলো, চোখের কোল অত কালো থাকে না। আর মুখের চেহারাও বেশ বদলে যায়। "কুছ পরোয়া নেই" তখন বেঁচে থাকে না ওর চোখে। নিতাই বোষ্টমীর সবুজ শিমগাছের দিকে ঠায় চেয়ে থাকার ফলেই বোধ হয় ওব চোখেও সবুজের আভা দেখা যায়।

তারপর একদিন আবাব সংবাদ আসে। কাটোয়া শিউড়ি কান্দি বেলডাঙ্গা এমন কি কলকাতা পর্যন্ত ছুটতে হয় খন্তাকে। বড মাছ ঘাই দিয়েছে, খেলিয়ে তুলতে হবে।

আবার একদিন খন্তা ফিরে আসে। ফিরে কোথাও আসে না সে। তার চলার পথে হয়ত পড়ল উদ্ধারণপুরের ঘাট। তাই থামকা ঢুকে পড়ে শ্মশানে। গায়ে একটা লম্বা কোট, পবনে একখানা দশ-বাবো টাকা দামের কোরা তাঁতের ধুতি আর এক জোড়া চীনে-বাড়ীর জুতো। জুতো জামা কাপড সবই নতুন। অর্থাৎ নতুন কেনা হয়েছিল যেদিন, সেদিন অঙ্গে চডিযেছে খন্তা। পোশাক-পরিচ্ছদ ও একবারই পরে আর একবারই ছাড়ে, পরা-ছাডাব মাঝেব সময়টুকু হযত বা ছ'-মাস ন'মাস বা কয়েক বছরও হতে পারে। খন্তাব তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না।

কিছুতেই কিছু আসে যায় না খন্তার। পঙ্কা এসে জানালে যে দুটো খাসি পাওয়া গেছে। দাম বড বেশী চাচ্ছে। এক কুড়ির কমে কিছুতেই ছাডতে চায় না।

খিঁচিয়ে উঠল খন্তা—"তবে কি পাঁচ টাকায দেবে নাকি রে শালা? জানিস, শিউড়িতে চাল উঠেছে এগাবোয। লিয়ে লে খাসি দুটো, সের পনেরো মাল হাওয়া চাই। বানিয়ে ফেল্ ঝট্‌পট্, সিধু ঠাকুরকে চাপিয়ে দিতে বল্‌গে যা।"

বুঝলাম—এখন জাঁকিযে দু'চার দিন থাকবে এখানে খন্তা। তার মানে চলল এখন মহোৎসব উদ্ধারণপুর ঘাটে। উদ্ধারণপুর ঘাটে এখন বিকিকিনি বন্ধ। দর-মার খোপে বাঁশের মাচায় যারা মনে অঙ্ ধরাবার বেসাতি চালায়, সেই হতভাগীরা ছুটি পাবে কয়েকদিনের জন্যে। চেনা খদ্দের উঁকি দিলেও শুনিয়ে দেবে তাকে—'ফের বাবু এখন, ঘরের ছেলে ঘবে যাও। আমাদের ভাই এসেছে যে, ভাই না গেলে মুখে অঙ্ মাখতে সরম লাগে যে।'

সকলের বড ভাই খন্তা ঘোষ এসেছে। এসেছে তার অভাগী বোনেদের জন্যে এক গাঁটরি কাপড় নিয়ে। এসেই হুকুম দিয়েছে—"খুলে ফেলে দে ওই নচ্ছার সাজ-পোশাকগুলো, গঙ্গা নেয়ে এসে নতুন কাপড় পর্ সবাই। নতুন উনুন পেতে ফেল্ বড বড কয়েকটা। সকলের রান্নাবান্না একসঙ্গে হবে। রাঁধবে সিধু ঠাকুর।

আমরা সবাই প্রসাদ পাব।"

কয়েক বোতল রসায়নও নিশ্চয়ই এনেছে খন্তা ঘোষ। খেলে রক্তের দোষ নষ্ট হয়। সেগুলো সে ভাগ করে দেয়—যাদের শরীর বড্ড ভেঙে পড়েছে তাদের মধ্যে।

আমার মুখের দিকে চেয়ে খন্তা বললে—"অত কি ভাবছ গোসাঁই? তুমিও যদি ভেবে মর তা'হলে আমরা যাই কোথায়?"

বললাম—"না ভাবছি না কিছুই, আগে একটু ধোঁয়া-মুখ করা।"

পকেটে হাত পুরে এক মুঠো সস্তা সিগারেট বার করলে খন্তা। একটা ধরিয়ে চোখ বুজে টানতে লাগলাম।

রক্তবর্ণ লালপাড় শাড়ীপরা কে সামনে দাঁড়াল। মুখের দিকে চেয়ে থ হয়ে রইলাম। কপালে এত বড় সিঁদুরের ফোঁটা, মুখে এক মুখ পান, দুধের মত রঙ, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মূর্তি! কে উনি?

হঠাৎ মাথার ঘোমটা সরে গেল। কিচ্ছু নেই, সাদা ধপধপ করছে মাথাটাও। ভয়ানক চমকে উঠে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম।

"এবার একটু পায়ের ধুলো দিন বাবা, আমরা বিদেয় হই!"

এ সেই গলার স্বর! আবার ফেরাতে হল মুখ। নিবিড় কালো চোখের পল্লবগুলি আর তার ওপর অতি যত্নে আঁকা ভুরু দুটি—ভাগ্যে কামানো হয় নি! বুকের মধ্যে একটা নিঃশ্বাস ঠেলে উঠল। তাড়াতাড়ি সেটাকে সামলে বলে ফেললাম—"কোথায়! কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

সামান্য একটু হাসি খেলে গেল তাঁর ঠোঁটে। চিবুকের নি সামান্য একটু টোল পড়ল। দৃষ্টি নত করে উত্তর দিলেন—"আগে আমার ঐ বোনটিকে ওর স্বামীর হাতে পৌঁছে দোব, তারপর চলে যাব কাশীতে।"

নিজের ওপর আর এতটুকু কর্তৃত্ব নেই আমার। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"আগমবাগীশ! আগমবাগীশ কোথায়?"

নত চোখেই তিনি উত্তর দিলেন জড়তাহীন কণ্ঠে—"ঠাকুর আলাদা গাড়ীতে আগেই রওয়ানা হয়ে গেছেন, তিনি স্টেশনে থাকবেন যতক্ষণ না আমি ওকে ওর বাড়ীতে রেখে ফিরে আসি।"

আমার পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের ঘোমটার ওপর হাত রাখলেন। তারপর আর একজনও পায়ের ধুলো নিলে।

খন্তাকে হুকুম করলাম—"বোতলটা খোল এবার খন্তা। গলাটা ভেজাই।"

উদ্ধারণপুরের বাতাস।

বাতাস শিঙা ফোঁকে।

বহুদিনের পুরানো শূন্যগর্ভ নরমুণ্ড আর মোটা মোটা ফোঁপরা হাড়ের শিঙায় ফুঁ দেয় বাতাস। নিশুতি রাতে শোনা যায় সেই শিঙাধ্বনি। শুনে শিহরণ জাগে চিতাভস্মের বুকে। জেগে উঠে তারা, পাখনা মেলে উড়ে যায় বাতাসের সঙ্গে। শকুনরা পাখা ঝাপ্‌টে বিদায়-অভিনন্দন জানায়, আকাশের দিকে মুখ তুলে শিয়ালরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরে—"জয়যাত্রায় যাও গো।" গান শুনে ওদের জ্ঞাতি গোত্র যে যেখানে থাকুক সেখান থেকে উল্লাসে উলুধ্বনি দিতে থাকে।

উদ্ধারণপুরের বাতাসের সঙ্গে শ্মশান-ভস্মের মধুর মিতালি। দুই মিতার জয়যাত্রা শুরু হয়। এপারে শিউড়ি সাঁইথে কাটোয়া কান্দী, ওপারে বেলডাঙা বহরমপুর লালগোলা কৃষ্ণনগর—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে উদ্ধারণপুরের চিতাভস্ম। নামে মানুষের মাথায়, নামে ক্ষেত-খামারের বুকে, নামে সকলের তৃষ্ণার জলের আধার দীঘি সরোবরে। মিশে যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। সবার কাছে চিতাভস্মের সাদর আমন্ত্রণ পৌছে দেয় উদ্ধারণপুরের বাতাস। কেউ টের পায় না কবে কখন উদ্ধারণপুরের অমোঘ আহ্বান এসে পৌছে গেল হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। সেই নির্মম পরোয়ানা অগ্রাহ্য করার শক্তি নেই কারও। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সবাই গুটি গুটি এগিয়ে আসতে থাকে উদ্ধারণপুরের দিকে।

উদ্ধারণপুরের বিশুদ্ধ সুগন্ধ গায়ে মেখে শৌখীন সমীরণ দিক্‌দিগন্তে উড়ে চলে যায়। রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ নাকি মিশে থাকে হাড় মাংস রক্ত মজ্জা মেদের সঙ্গে। যতক্ষণ না সেগুলোকে চিতায় তুলে জ্বাল দিতে আরম্ভ করা হয় ততক্ষণ গন্ধের হদিস মেলে না। উৎকৃষ্ট অগ্নিশুদ্ধ মানবীয় সুবাসে সুবাসিত হয়ে উদ্ধারণপুরের মত্ত মারুত ভস্মলিপি হাতে নিমন্ত্রণ করতে রওয়ানা হয়। সেই লিপির মাথায় ভস্মাক্ষরেই লেখা থাকে—

ধর্মাধর্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম।
দহেয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু।

দিব্যলোকের যাত্রীরা একে একে এসে নামছে। ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ী যুবক যুবতী, সব জাতের সব বয়সের যাত্রী এসে পৌছচ্ছে। পারঘাটে বেজায় ভিড়, গান-গল্প হৈ-হল্লা ফষ্টিনষ্টির ফোয়ারা ছুটছে। স্ফূর্তির ঝড় বইছে তাদের

মধ্যে, যারা যাত্রীদের ঘাটে পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। প্রকৃত যাত্রীরা কাঁথা-মাদুর-জড়ানো পড়ে রয়েছে এখানে ওখানে। কাঁথা মাদুরের ভেতর থেকেই দিব্যচক্ষে দেখছে এদের হ্যাংলাপনা। হদ্দ বেহায়ার মত কেমন করে চাটছে এরা জীবনের রস, তা দেখে ওদের হিমশীতল শরীর শিউরে উঠছে। রসটুকু নিঃশেষে শুকিয়ে যাবে যেদিন, সেদিন এরাও হবে দিব্যলোকের যাত্রী, সেদিন এরাও বাঁশে ঝুলতে ঝুলতে যাত্রী সেজে আসবে এখানে।

উদ্ধারণপুরের পূবসীমানা থেকে দিব্যলোকের দিব্যপথের শুরু। পশ্চিমের বড় সড়কের ওপর বসে গালে হাত দিয়ে জীবন কাঁদে। দিব্যপথে পা দেবার অধিকার নেই জীবনের। তাই খন্তা ঘোষ সিধু কবরেজের দাওয়াইখানার সামনে জীবন-মচ্ছব দিচ্ছে। জীবনের মুখে হাসি ফোটাবে এই তার বাসনা। হারমোনিয়ম তবলার সঙ্গে নারীকণ্ঠে ভেসে আসছে ওখান থেকে—

"শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।'

[illegible] মিশিয়ে মুটকি সুবাসী মড়াকান্না জুড়েছে আমার গদির সামনে বসে। তার রোজগেরে মেয়ে লক্ষ্মীকে ফুসলে নিয়ে গেছে খন্তা। খন্তা উদ্ধারণপুরে এলেই সুবাসী আমার কাছে মড়াকান্না কাঁদতে বসে। আমি হুকুম করলেই নাকি খন্তা তার মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। তা কাঁদবে বৈকি সুবাসী। মড়ার চুলের পাঁচ গণ্ডা গুছি দিয়ে দু'কুড়ি রঙ-বেরঙের কাঁটা আর ক্লিপ গুঁজে মস্ত খোঁপা বেঁধে মুখে খড়ি আলতা মেখে সারা দিনরাত পথে বসে থাকলেও কেউ ফিরে তাকায় না সুবাসীর দিকে। জীবনের রস ফুরিয়ে এসেছে তার। এই বয়সের সম্বল ছিল মেয়ে। খন্তা ওর বাড়া-ভাতে ছাই [illegible]য়েছে। খন্তা শাপমন্দ দিয়ে মাথা খুঁড়ে সুবাসী নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে

একটা ভাঙা মাটির ভাঁড় পড়ে ছিল সামনে। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে তাতে ছটাকখানেক মদ ঢেলে আবার মাটিতে নামিয়ে দিলাম। মরবার ভয়ে সুবাসী আমার গদি ছোঁয় না, কাজেই আমার হাত থেকে ও নেবে না কিছুই।

বললাম—"নে, ওটুকু গলায় ঢেলে দে বেটী। আর কেঁদে কি করবি বল্' মেয়ে ত তোকে টাকা পাঠাচ্ছে মাসে মাসে খন্তার হাত দিয়ে। খামকা কাঁদিস নি আর, টের পেলে খন্তা মেরে ধামসে দেবে গা-গতর।"

ভাঁড়টা আলগোছে তুলে নেয় সুবাসী। [illegible] হাতে নাক টিপে ধরে পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে বিরাট হাঁ করে তরল পদার্থটুকু গলার মধ্যে ঢেলে দেয়। দিয়ে বিদঘুটে মুখ করে চোখ বুজে থুতু ফেলতে থাকে।

ওধারে গঙ্গার কিনারায় একটা চিতার পাশে হাতাহাতি হবার উপক্রম। বাছাই বাছাই সম্বোধনের তুবড়ি ছুটছে ওখানে। তড়পানোর চোটে উদ্ধারণপুরের ঘাট সরগরম। কিছুক্ষণ পরে রামহরি আর পঞ্চেশ্বর একজনকে ধরে নিয়ে এল। পিছন পিছন এল হিতলাল মোড়ল, ছকড়ি বায়েন, কঙ্কালি ঠাকুর, আরও অনেকে। যাকে ধরে নিয়ে এল তার বেশ বয়স হয়েছে। নাদুসনুদুস চেহারা, গলায় একগোছা ময়লা পৈতে, নাভির নিচে খাটো নোংরা থান পরা, দু'-চোখ-বোজা লোকটির দুই কশ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। টানতে টানতে নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে লোকটিকে। ওরা ছেড়ে দিতেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটির ওপর। পড়ে মাটিতে মুখ রগড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

রগড় দেখবার আশায় যে যেখানে ছিল ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। হিতলাল মোড়ল মাটিতে পড়ে গড় হয়ে উঠে নাকে কানে হাত দিয়ে নিবেদন করলে তার আরজি।

"একটা বিচার করে দেন বাবা। এই ব্যাটা বিট্‌কেল বামুনা আমাদের হাড় জ্বালিয়ে খেলে। দু'দুবার এই অলপ্পেয়ে ঠাকুর আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। এবারও সেই মতলব করেছে ব্যাটা। এবার আর ওকে আমরা ছাড়ছি না, টাকা না পেলে ওকেও ওর ছেলের সঙ্গে চিতেয় তুলে দোব।"

কঙ্কালি ঠাকুর হিতলালের হাত জড়িয়ে ধরলে।

"থামকা আর খিট্‌কেল কোর না মোড়ল। কাজ শেষ করে চল ঘরে ফিরে যাই। বাড়ী গিয়ে দশ মণ ধান দোব আমি তোমায়।"

এক হেঁচকায় হাত টেনে নিয়ে হিতলাল গর্জে উঠল—"থাম ঠাকুর, ম্যালা ক্যাচ্‌ ক্যাচ্‌ করতে এস না বলছি। ঢের জানা আছে তোমার মুরোদ। দশ মণ ধান কখনও চোখে দেখেছ এক সঙ্গে?"

ইতিমধ্যে ঘটে গেল মহা অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। যে ব্যক্তিটি উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে মুখ রগড়াচ্ছিল সে গড়াতে গড়াতে গিয়ে হিতলালের পা জড়িয়ে ধরেছে। আর যাবে কোথা—তিড়িং করে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল মোড়ল। ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনলে একখানা তিন হাত লম্বা পোড়া কাঠ। সেখানা মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে লাফাতে লাগল।

"খুন করে ফেলব আজ বামুনাদের। মা-গঙ্গা সাক্ষী করে আমার পা ধরলে শালা বামুনা, আমার চোদ্দ পুরুষকে নরকে ডোবালে। আজ আর ওদের আমি জ্যান্ত ফিরতে দিচ্ছি না ঘাট থেকে—"

পিছন থেকে রামহরি ছিনিয়ে নিলে কাঠখানা, পঙ্কা জড়িয়ে ধরলে ওর

কোমর। যা মুখে এল তাই বলে চেঁচাতে লাগল হিতলাল। দেখাদেখি ছুকড়ি বায়েনও গরম হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে খপ করে কঙ্কালি ঠাকুরের কাপড় ধরে ফেললে।

"টাকা না পেলে আজ এক শালাকেও ফিরতে দিচ্ছি না এখান থেকে।"

একটা বছর আষ্টেকের ছেলে এক পাশে দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। এক মাথা রুক্ষ চুল, কোমরে একফালি ন্যাকড়া জড়ানো, রোগা ডিগডিগে ছেলেটির কচি মুখখানিতে, দু'চোখের অসহায় দৃষ্টিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, নিদারুণ আতঙ্ক আর অবসাদ। তার অবস্থা দেখে মনে হ'ল বহুক্ষণ বোধ হয় এক ফোঁটা জলও গলা দিয়ে নামে নি। দু'পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কাদামাটি মাখা, পা দুটো বেশ ফুলেও উঠেছে। বুঝতে বাকি রইল না যে ভাগ্যদেবতা একটু মজার খেলা খেলছেন ছেলেটির সঙ্গে।

একটা খালি বোতলের গলা ধরে ঝাঁ করে ছুঁড়ে মারলাম আকাশের দিকে। বোতলটা ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল গঙ্গার জলে। আর একটা হাতে তুলে নিই। ঝপ করে সবাই বসে পড়ল। আর টুঁ শব্দটি নেই কারও মুখে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম—"কিরে, কি ভেবেছিস সব?"

কারও মুখে রা নেই।

দাঁত কিড়িমিড়ি করে দাঁড়িয়ে উঠলাম গদির ওপর। কোথা থেকে শুম্ভ নিশুম্ভ ছুটে এল বিকট ঘেউ ঘেউ করে। যারা রগড় দেখতে জুটেছিল তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলে। সামনে বসে রইল হিতলাল, ছুকড়ি, কঙ্কালি। বুড়ো লোকটাও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ছেলেটা এসে জাপটে ধরলে হিতলালকে। হিতলাল দু'হাতে তার মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরলে। ও-ধারে হরি পঞ্চেশ্বর চিৎকার করে উঠল—"জয় বাবা কালভৈরব, জয় বাবা পাগলা ভোলা।"

কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। তারপর আবার হুঙ্কার ছাড়লাম একটা।

"জয় মা শ্মশানচণ্ডী, আজ তুই রক্ত খাবি মা রক্তখাকী!"

হিতলালের বুকের ভেতর ছেলেটা ডুকরে কেঁদে উঠল।

সেই এক সুরে বলে গেলাম—"পঞ্চা, ছুটে যা। ডেকে আন্ খুড়োকে, দু'কুড়ি টাকা আনতে বলিস সঙ্গে!"

পঞ্চা ছুটল।

"ছুকড়ে, তোর বড্ড বাড় হয়েছে, আমার সামনে বামুনের গায়ে হাত দিলি।"

ছুকড়ি নিজের হাঁটুতে মুখ গুঁজে কান্না জুড়ে দিলে।

"মোড়লের পো—ঐ ছেলেটা কার?"

হিতলাল কোনও রকমে উচ্চারণ করলে—"দোহাই বাবা, এই ছেলেটার ওপর নজর দিও না বাবা। আমাদের এই ঠাকুরের বংশে বাতি দিতে আর কেউ নেই গো। গত দু'সনে আমরা ছ'বার যাওয়া আসা করলাম ঠাকুরের জন্তে। ঠাকুরের ঘর ভরা ছেলে-বউ নাতি-নাতনী সব উজোড হয়ে গেল। আজ নিয়ে এসেছি ঠাকুরের বড ব্যাটাকে। এই একরত্তি ছেলেটাকে রেখে সে-ও চোখ বুজলে। দু'সন ম্যালোরিতে ভুগছিল, শেষে রক্ত—"

আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম—"চোপবাও ব্যাটা চামার। তা টাকা না বুঝে পেয়ে তোরা বইতে গেলি কেন ঠাকুবের মড়া? গাঁয়ের বাইরে শ্মশান ছিল না?"

এবার হিতলালও রুখে উঠল।

"কি করি বলুন গোসাঁই বাবা! হাড মাস জ্বালিয়ে খেলে ঐ নচ্ছার বামুনা। আমরা যত ওকে বোঝাই যে, ঠাকুর, তোমার ঘরে এক বেলার খাবার নেই, তোমার কেন শখ হয় সকলকে গঙ্গায় দেবাব, ততই ঠাকুর হাতে পাযে ধরতে আসে। এই করে দু'দুবার ফাঁকি দিয়েছে। এবার এই নাতির মাথায হাত দিযে দিব্যি করলে যে ঘাটে পৌছেই টাকা মিটিয়ে দেবে। কে ওর বডলোক যজমান আছে সে নাকি টাকা নিয়ে ঘাটে আসবে।"

আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম—"চোপরাও ব্যাটা গো-হাডগেল। এই নে মহাপ্রসাদ। গিল্‌গে যা ওধারে বসে। এত ছোট নজর তোর, তোরা না শ্মশান-কালীর সন্তান! মায়েব দযায় কিসের অভাব তোদের শুনি? গাঁযেব বামুন, গঙ্গায় দিযে গেলি, একটা সৎ কম্ম করলি। এর ফল দেবে তোদের মা শ্মশানকালী। সে বেটীর কি চোখ নেই নাকি মনে করেছিস? তোদের গাঁয়ের বামুন, তোদের আপনার লোক, ফেলবি কোথায় তাই শুনি?"

হিতলাল দু'হাত জোড করে নিলে বোতলটা। কঙ্কালিকে বললে—"খুড়ো. এইবার এই বাচ্চা ঠাকুরের মুখে কিছু দাও বাপু। এও কি জল না খেয়ে মরবে নাকি? বাপের মুখে আগুন দেবার পর ত আজ আর এক ঢোঁক জলও খেতে পাবে না।"

খন্তা এসে দাঁড়ালো সামনে।

"হুকুম কর গোসাঁই, কোন্ শালাকে লম্বা করতে হবে।"

"দু'কুড়ি টাকা ফেলে দে খন্তা। বামুন ঘাটে এসে চিতেয় উঠছে না। মোড়লের পো, টাকা নিয়ে এখানকার কাজকম্ম করে গাঁয়ে ফিরে তোমাদের ঠাকুরকে একটু দেখো। খন্তা, ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়া। ওকে নতুন কাপড় চাদর পরিয়ে দিস যাবার সময়।"

এক মুঠো দলাপাকানো নোট আমার গদির ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে দৌড় দিলে খন্তা।

রামহরি আর পঞ্চা আর একবার চিৎকার করে উঠল।

"জয় মা শ্মশানকালী, জয় বাবা কালভৈরব।"

উদ্ধারণপুরের বিশ্ববিদ্যালয়।

মানবহৃদয়ের যজ্ঞবেদীতে—স্বার্থবুদ্ধির সমিধ্ দিয়ে স্বয়ং বিশ্বদেব অগ্ন্যাধান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো হয় পূর্ণাহুতির মহামন্ত্রটি।

ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মা ধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎস্মৃত তৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক শ্রীমৎ শ্মশানকালিকায়ৈ সমর্পিতম ওঁ তৎসৎ॥

গিজ্‌তা [illegible]—গিজ্‌তা গিজাং। নাম সংকীর্তন আসছে।

কয়েক গণ্ডা খোল খত্তালের আওয়াজ ছাপিয়ে হুহুংকার উঠছে—বল হরি হরি বোল। কোন বড়মানুষ আজ [illegible] চাপে চুল্লায় চড়তে আসছেন। ঐ চাপটুকু ছাড়া সব চালাকি বিসর্জন দিয়ে আসছেন। চালাকি পোড়ানো যায় না চুল্লায়।

ছুটল রামহরি পঞ্চেশ্বর শুম্ভ নিশুম্ভ। খোল খত্তালের সামনে খই কড়ি পয়সা কুড়তে কুড়তে ডোমপাড়ার গুষ্টিগোত্র সবাই ছুটে আসছে। তাদের রুখতে হবে। শ্মশানের ভেতর হুড়মুড় করে নেমে পড়বার আগেই তাদের ফেরাতে হবে। শ্মশানের সীমানার মধ্যে যা পড়বে তা কুড়াবার অধিকার নেই কারও। বড় সড়কের ওপর ওদের রুখতে না পারলে কি আর রক্ষে আছে। কানা কড়িটা পর্যন্ত চোখে দেখা যাবে না, চিল-শকুনের মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে সব।

বড় সড়ক থেকে নেমে আসছে শোকযাত্রা। বহু লোক অতি সাবধানে নামিয়ে আনছে একখানি চকচকে পালিশকরা খাট। খাটে বহুমূল্য মশারি খাটানো। মশারির চারধারে ঝুলছে ফুলের মালা। বড় বড় ধুনুচি নিয়ে নামছে কয়েকজন। ধুনা গুগ্‌গুল চন্দনকাঠের গন্ধে উদ্ধারণপুরের দুর্গন্ধ লজ্জায় মুখ লুকালো। শিয়ালগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো, শকুনগুলো বহু ঊর্ধ্বে উঠে পাখা মেলে চক্কর দিতে লাগল আকাশের গায়ে। আমার গদির পিছনে লুকিয়ে পড়ল শুম্ভ নিশুম্ভ। শ্মশানের মাঝখানে সন্তর্পণে নামানো হল খাটখানা। সঙ্গে সঙ্গে চরমে গিয়ে পৌঁছল গিজ্‌তা গিজাং। খোল খত্তাল খেই খেই করে নাচতে লাগল

খাট ঘিরে। বল হরি হরি বোল—মুহুর্মুহুঃ চিৎকারের চোটে কানের পর্দা ফাটবার উপক্রম। যার নাম ধূমশোক, প্রিয়জনবিয়োগসম্ভূত সন্তাপের মহাসমারোহ কাণ্ড।

তৈরী হয়ে নিলাম। ঢকঢক করে সামনের বোতলটা খালি করে ফেললাম। মাথার মাঝখানে একটা মস্ত বিঁড়ে পাকালাম জটা জটা চুলগুলো দিয়ে। পাকিয়ে শিরদাঁড়া টান করে হাঁটু মুড়ে গদির মাঝখানে বসে রইলাম।

কেউ না কেউ আসবেই এধারে। নয়ত ওদের এত জাঁকজমক সব ব্যর্থ হয়ে যাবে যে। উদ্ধারণপুরের ঘাটে জাঁকজমকের সাক্ষী শেয়াল শকুন রামহরি পঙ্কা আর আমি। শেয়াল শকুন জাঁকজমকের রসাস্বাদনে অক্ষম। বরং মড়াটা না পুড়িয়ে ঝল্‌সে ফেলে রেখে গেলে ওরা বাহবা দিত! রামহরি পঙ্কা ভাবছে খাট বিছানা বেচে কত টাকা মারবে। একমাত্র আমিই ওদের ভরসা। যুগযুগান্ত মড়ার বিছানায় বসে গাইতে থাকব ওদের কীর্তিকাহিনী। সুতরাং আমাকে হাতে রাখতেই হবে।

হঠাৎ ঝপ করে থেমে গেল খোল খত্তালের আওয়াজ। ধেই ধেই করে যারা নাচছিল তারা দিগ বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। কতক মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে, বাকি সকলে পড়ি-ত-মরি করে উঠে গেল বড় সড়কের ওপর। কয়েক বোঝা মালমশলা, কয়েকটা বড় বড় হাঁড়ি, ডেক কড়াই আর মশারি ঢাকা খাটখানা পড়ে রইল শ্মশানের মাঝখানে। জন পাঁচ-ছয় লোক খাটের দিকে নজর রেখে পিছু হেঁটে আসতে লাগল আমার গদির দিকে। একা রামহরি ডোম অনেকটা তফাত দিয়ে খাটখানার চারপাশে ঘুরতে লাগল আর মাঝে মাঝে এক এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে কি সব বিড বিড করে বলতে বলতে মশারির গায়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে আছড়ে পড়ল পঙ্কা।

"গোসাঁই বাবা, বাঁচাও গো, রক্ষে কর আমাদের।"

পিছু হেঁটে আসছিল যারা তারা ঘুরে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সকলে চেয়ে রইল আমার দিকে। সজোরে ধমক দিলাম পঙ্কাকে।

"উঠে দাঁড়া হারামজাদা। ন্যাকামি রাখ্। কি হয়েছে কি? অমন করে আঁতকে মরছিস কেন? হল কি তোর ছেরাদ্দ?"

ধীর সংযত কণ্ঠে জবাব এল—"ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি হয়েছে, খাটের ওপর শব পাশ ফিরেছে। আমরা সবাই দেখেছি।"

বক্তার দিকে চাইলাম। অতি সুশ্রী চেহারা। রঙ রূপ চোখের চাহনি কণ্ঠস্বর পরিচয় দিচ্ছে যে ইনিই হুজুর। খালি পা, গায়ে একখানি গরদের চাদর জড়ানো,

শরীরে অনাবশ্যক মেদ নেই। দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়—এই মানুষটি হুকুম করতে জন্মগ্রহণ করেছে, হুকুম তামিল করতে নয়।

কয়েক মুহূর্ত তিনি এবং আমি পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। তাঁর পিছন থেকে কে একজন ভীতি-বিহ্বল খোশামুদে গলায় বলে উঠল—"একটিবার উঠুন বাবা কৃপা করে। আমাদের হুজুরের—"

বক্তার দিকে মুখ ফেরালেন হুজুর। কথা আটকে গেল তার গলায়।

আমার দিকে ফিরে সামান্য একটু হাসবার চেষ্টা করলেন হুজুর। তারপর সহজ গলায় বললেন—"অবশ্য আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমাদের অন্যায় হবে—"

আর বাড়তে দিলাম না তাঁর বক্তব্য। তড়াক করে লাফিয়ে পড়লাম গদি থেকে। বললাম—"দাঁড়িয়ে থাকুন এখানেই। এক পা নড়বেন না।" বলতে বলতে ছুটে গেলাম খাটের পাশে।

আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল রামহরি। বন্ধ হল তার মন্ত্র পড়া। হাত তুলে ইশারা করলাম তাকে গদির কাছে যেতে। বিনা ওজরে ধুলো মুঠো ফেলে সে সরে গেল।

তখন মশারির ভেতর নজর করে দেখলাম।

সত্যিই ত! দিব্যি ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে মড়া। গলা থেকে পা পর্যন্ত ফুল আর ফুলের মালায় ঢাকা। শুধু মাথার পিছনটা দেখা যাচ্ছে। মেয়ে কি পুরুষ না বোঝা গেল না।

খাটের ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মশারির বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা গেল না। মশারি তুলে ভেতরে মাথা গলিয়ে দেখলাম। একটি বৃদ্ধা ছোট করে চুল কাটা, কপালময় শ্বেতচন্দন লেপটানো, বহুমূল্য গরদের চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন। ছোটখাটো শুকনো মানুষটি, বোধ হয় এমন কিছু রোগভোগও করেন নি।

তাঁর সামনে থেকে ফুলগুলো সরিয়ে ফেললাম। একটি ছোট পাশবালিশ। কিন্তু এ কি! পাশবালিশটি অনেকটা নেমে গেছে। বালিশের নিচে হয়েছে বেশ একটি ছোটখাটো গর্ত। তাড়াতাড়ি খাটের তলায় হাত দিয়ে দেখলাম। ঠিক সেখানেই ব্যাটমটা গেছে সরে।

তৎক্ষণাৎ মালুম হল ব্যাপারটা। ফুল মালা দিয়ে পাশবালিশটা তাড়াতাড়ি ঢেকে দিয়ে দু'হাতে শুধু মৃতদেহটা তুলে নিলাম। তারপর মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে ঘুরে এসে দাঁড়ালাম খাটের এপাশে।

আমার গদির কাছ থেকে কেউ এক পা নড়ে নি। সেখান থেকে চক্ষু

বিস্ফারিত করে চেয়ে আছে আমার দিকে। দেখে মনে হয় যেন পাথরের প্রতিমূর্তি, শ্বাস প্রশ্বাসও বইছে না কারও।

হাঁকাব দিলাম—"রামহরে পঙ্কা এগিয়ে আয এধারে। এখনই খুলে ফেল্ খাট বিছানা সব। খুলে সরিয়ে ফেল্ এখান থেকে। ওখানেই দাঁড়িযে থাকুন আপনারা। এক পা এগোবেন না।"

রামহরি পঙ্কা দৌড়ে এল। মড়া নিযে আমি গিযে দাঁড়ালাম ওঁদের সামনে। একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখে হাটু গেড়ে বসে শুইযে দিলাম মড়াটা মাটির ওপর। শুইযে দিয়ে মড়ার গাযে হাত রেখে বললাম।

"আসুন একজন, ছুঁযে বসে থাকুন এঁকে।"

কেউ এগোয না। হুজুর একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। দেখে স্বয়ং এগিযে এসে মাটির ওপর বসে পড়লেন মড়ার পায়ের কাছে। ডান হাতখানি রাখলেন মড়ার পাযের ওপর।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কে ইনি?"

"আমার মা।"

"জানেন না, শ্মশানে শবদেহ নামিয়ে ছুঁযে থাকতে হয?"

উত্তর না দিযে নত চোখে মাযের পাযের দিকে চেযে রইলেন।

সহসা হুজুরের সঙ্গীরা চাঙ্গা হযে উঠলেন। হুজুর মাটির ওপর বসে পড়েছেন এ দৃশ্য তাঁরা সহ্য করেন কেমন করে। সকলে একসঙ্গে এগিযে এসে বসে পড়লেন হুজুরের পাশে। একজন বলে উঠলেন—"আহা হা, তুমি এখানে বসে পড়লে কেন বাবাজী? আমরা থাকতে তুমি কেন—"

তার দিকে চেযে তার মুখ বন্ধ করলেন হুজুর। সংযত কণ্ঠে হুকুম দিলেন—"এবার ডাকুন সকলকে, এখন ত আর কোনও ভয় নেই।"

ওধারে চেয়ে দেখলাম, রামহরি আর পঙ্কেশ্বর মশারি খুলে বিছানা নামিয়ে খাট খুলতে শুরু করেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে গিয়ে বসলাম গদির ওপর চেপে।

ছুটতে ছুটতে এল খন্তা ঘোষ।

"কি হল? হয়েছে কি গোসাঁই?"

"তোর কেন মাথা-ব্যথা তা জানবার? নে গলাটা ভেজা এবার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে এধারে।"

হুজুর হুকুম দিলেন একজনকে—"খুড়ো, এনে দাও ওকে দুটো বোতল। বসে থেকো না হাঁ করে।"

বকের মত লম্বা গলা আর লম্বা ঠ্যাং একটা বাঁকাচোরো লোক লাফাতে

লাফাতে ছুটল যেখানে মোটঘাট পড়ে আছে। সেখান থেকে তার খ্যানখেনে গলা শোনা গেল।

"কোথায় গেল সব আবাগীর ব্যাটারা? রাখলে কোথায় মালের বাক্সটা ছাই!"

ততক্ষণে আবার হুড়মুড় করে সকলে নামতে শুরু করেছে বড় সড়ক থেকে। বল হরি হরি বোল দিয়ে ফাটিয়ে ফেললে উদ্ধারণপুরের আকাশ।

আসল স্কটল্যাণ্ডের পানীয় দু বোতল এসে নামল গদির সামনে।

"খোল্ একটা খন্তা। মা বেটী অনেকক্ষণ গেলে নি কিছু। জয় মা ভীমা ভবানী।"

দূর থেকে পঞ্চা রামহরি চিৎকার করে উঠল—"জয় বাবা শ্মশান-ভৈরব—জয় বাবা সাঁই গোসাঁই।"

অনেকক্ষণ ধরে অনেকের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল জয়ধ্বনি। বোতলে মুখ লাগিয়ে অর্ধেকটা শেষ করে ফেললাম।

[illegible]

ভেলকি-বাজির খেল [illegible]-বাজির বিজয়বৈজয়ন্তী উড়ছে উদ্ধারণপুরের ঘাটে [illegible] ভৌতিক ব্যাপার ভুতুড়ে কাণ্ড সব। জ্বলন্ত চিতার ওপর মড়া উঠে বসে খাটের ওপর মড়া পাশ ফিরে শোয়, উদ্ধারণপুরের ঘাটের আনাচে কানাচে নরকঙ্কাল ধেই ধেই করে নাচে [illegible] ঐ যে বড় নিম গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্মশানে ঢোকবার পথের মুখে, কতবার কত মড়া ঐ গাছটার ডাল ধরে দোল খেয়েছে। একবার একটা মড়া তো উঠেই বসে রইল গাছে পাঁচ দিন পাঁচ রাত। লালগোলা থেকে লালু ফকির এসে ধুলো পড়া দিয়ে সে মড়া নামায়। এ সমস্ত ব্যাপার ঘটত তখনকার দিনে, যখন ওই 'এল' লাইন খোলে নি। লোকে 'এল'-এ [illegible] চেপে ফস করে গয়া গিয়ে পিণ্ডি দিতে পারত না। অতন মোড়ল দেখেছে সে সব কাণ্ড। এখনও জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে মোড়ল। বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা কর গিয়ে তাকে।

অতন মোড়ল বলবে, তাড় দেওয়া আর তুড়ে দেওয়ার মধ্যে এতটুকু তফাত নেই বাপ। এইমাত্র যে গোবেচারার নাকের ডগায় তুড়ি দিয়ে একেবারে উড়িয়ে দিলে তাকে, পরমুহূর্তেই সে মরে গিয়ে আবার জ্যান্ত হয়ে তোমায় তুড়ে দিতে পারে। একেবারে চাক্ষুষ সব দেখা কিনা অতন মোড়লের, কাজেই মোড়ল যা বলে সে সব কথা একেবারে ফেলনা নয়।

খন্তাও বললে সেই কথা।

বললে—"ওই রাঙা মুলো গোবর গণেশটাকে চিনে রাখ গোসাঁই। ওই মিটমিটে শয়তান একবার তুড়ি দিতে চেয়েছিল চরণদাস বাবাজীর নাকের ডগায়। তখন আমি তুড়েছিলাম ব্যাটা ছুঁচোকে। আবগারি দারোগা দু'টি হাজার গুণে নিয়ে তবে ওর ঘাড় থেকে হাত তুলে নিয়েছিল। হারামজাদা রক্ত-শোষা জোঁক, মান্ধাতা-আমলের তৈরী গাঁ-জোড়া ইঁটের পাঁজাব ভেতর মুখ লুকিয়ে থাকে, দিন রাত ফরাসে গা গড়ায় আর ছুঁচোর মতলব ভাঁজে। ওই মাকাল ফলের জন্যে লোকে ঝি-বউ নিয়ে শান্তিতে বাস করতে পারে না গাঁয়ে। ইচ্ছে করছে, দি ব্যাটাকে ওর মায়ের সঙ্গে চিতেয় তুলে। মা-ব্যাটা দু'জনে গোল্লায় যাক্ একসঙ্গে। লোকের হাড় জুড়োক।"

খন্তার কপালের ওপর কয়েকটা নীল শির দাঁড়িয়ে উঠেছে, নাকের গর্ত দুটো আরও মোটা দেখাচ্ছে, দাঁতগুলো আরও অনেকটা বেরিয়ে পড়েছে। যেন একটা ক্ষ্যাপা ঘোড়া, ঐ দাঁত দিয়ে দেবে এক কামড় আমার ঘাড়ে।

বললাম—"মালটা কিন্তু বড় খাসা এনেছে রে। খোল্ দেখি আর একটা বোতল, টেনে নি বাকীটুকু।"

খপ্ করে বোতলটা তুলে নিয়ে মারলে আছাড় খন্তা ঘোষ। বোতলটা চুরমার হয়ে গেল, মালটুকু শুষে নিলে উদ্ধারণপুরের শুকনো ভস্ম। আমার দিকে এক নজর রক্তচক্ষু ফেলে দুমদাম করে চলে গেল খন্তা। বিশুদ্ধ বিলিতী মালের স্বর্গীয় সুবাসে উদ্ধারণপুরের বাতাস মাতাল হয়ে উঠল।

ভারি দমে গেল মনটা। লোকটা না হয় মাকাল ফল, রাঙা মূলো, ছুঁচো শয়তান, তা'বলে তার দেওয়া বোতলটা কি এমন দোষ করলে যে আছাড় মারতে হবে মাটির ওপর। লোকটার ভেতরে যাই থাকুক, বোতলের ভেতরে ত খাঁটি মাল ছিল। নাঃ, খন্তাটা চিরকালই গোঁয়ারগোবিন্দ রয়ে গেল।

নীলাঞ্চলের ঘোমটা-ঢাকা নীলাঞ্জনা সন্ধ্যা সেদিন এসে পৌছল না উদ্ধারণপুরের ঘাটে। বাসকসজ্জায় সজ্জিতা রাত্রি গঙ্গার ওপারে দাঁড়িয়ে রাগে হতাশায় ফোঁপাতে লাগল। এত জোড়া চোখের সামনে দিয়ে এতগুলো অত্যুজ্জ্বল আলোর চোখ-ধাঁধানো জলুসের মাঝখানে কি করে অভিসারে আসে বেটারা চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে! এল না সুপ্তি, জেগে রইল উদ্ধারণপুরের শ্মশান, জেগে রইল গঙ্গা, আর একান্ত নির্দয় ক্ষমাহীন সত্যের মত তন্দ্রাহীন চোখে বসে রইলাম আমি—আমার সেই তিন হাত পুরু গদির ওপর চেপে। মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুরের জননী চন্দনকাঠের চিতার ওপর চড়ে মহাসম্মানের সঙ্গে পুড়তে লাগলেন। যে

বহুমূল্য গরদের চাদরখানি চাপা দিয়ে এসেছিলেন তিনি, সেখানি তখন বিছানো হয়েছে আমার গদির ওপর। চাঁপা ফুলের গন্ধ বার হচ্ছে তা থেকে, আর ওধারে চন্দন কাঠ পোড়ার গন্ধে উদ্ধারণপুরের বাতাস ঘুলিয়ে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত সবই নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল। বড় বড় গামলায় এসেছিল রসগোল্লা, ঝোড়ায় ঝোড়ায় এসেছিল লুচি আর বাক্স ভর্তি এসেছিল বিলিতী মদ। সব গেল ফুরিয়ে, চিতা নিভে এল, আরও গোটা দুই বোতল দিয়েছিলেন ওঁরা আমাকে, তাতে আর কিছু রইল না। একশ কলসী জল দিয়ে ধোয়া হল চিতা। দুধের মত সাদা করে ধুতে হবে কিনা, কারণ কুমার বাহাদুরের মা আবার যদি জন্মান কোথাও তবে যেন রাজরানীর রূপ নিয়েই জন্মান।

ম্লানমুখী শুকতারা বিদায় নিচ্ছে উদ্ধারণপুরের আকাশ থেকে। কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিচ্ছে। আঁধার পর্দার আড়ালে রোজ যে খেলা দেখানো হয় উদ্ধারণপুর ঘাটে, সৌভাগ্যবতী শুকতারা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে তার দিকে। ওই তার একমাত্র সাক্ষী। কিন্তু বড় নিরাশ হতে হয়েছে বড় লোকের মায়ের জন্যে, সেদিন আর কোনও কিছুই দেখতে পেল না শুকতারা। তার বদলে আলো গান হৈ হল্লায় বেচারার মেজাজ বিগড়ে গেছে।

চমকে উঠলাম।

কোথায় পালিয়ে গেল এক গণ্ডা বিলিতী বোতলের মহামহিম মর্যাদা। কান পেতে শুনতে লাগলাম—

"পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াই
পাড়ার লোকে মন্দ কয়।
ও সে পরের মন্দ পুষ্প-চন্দন
অলঙ্কার পরেছি গায়।"

নেমে আসছে বড় সড়ক থেকে। একতারা আর খঞ্জনী বাজছে। আবার শোনা গেল নারীকণ্ঠ—

"গৌর-প্রেমে হইয়াছি পাগল
ঔষধে আর মানে না।
চল সজনী যাইগো নদীয়ায়।"

তারপর নারীপুরুষ দ্বৈত-কণ্ঠে—

"ও সে গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশিয়াছে আমার গায়।"

কাছে এসে পড়েছে। খালি বোতল কটা লুকিয়ে ফেলে কুমার বাহাদুরের মা'র গায়ের গরদখানা গদি থেকে তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বেশ ভক্তিযুক্ত হয়ে বসলাম।

এসে পড়ল দু'জনে আমার সামনে। মাথা দুলিয়ে নাচতে লাগল চরণদাস —

"ও সে গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশিয়াছে আমার গায়।"

দু' চোখ বোজা নিতাই হেলেদুলে ঘুরতে লাগল তার চারিদিকে —

"ও সে পরের মন্দ পুষ্প চন্দন অলঙ্কার পরেছি গায়।"

উদ্ধারণপুরের আলো।

আলো আঁকে আলপনা।

গঙ্গার কিনারায় ঝাঁকড়া পাকুড় গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আলো-আঁধারি রঙের পোঁচ টানে উদ্ধারণপুরের খামখেয়ালী পটুয়া। সাদা হাড় আর কালো কয়লার ওপর উদ্ভট সব কল্পনার কারসাজি খেলিয়ে আপন প্রিয়ার চোখে ধুলো দিতে চায়।

আলোর প্রিয়া ছায়া।

ছায়া আসে নাচতে নাচতে। নির্ঝঞ্ঝাট নির্বিকার নির্বিরোধী ধ্বংসের বুকে চটুল চরণে নাচে রূপসী আলোক-প্রেয়সী। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ওঠে এক-একটি স্বর্ণকমল। ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে যায় অবিনশ্বর ধ্বংসের শাশ্বত স্বরূপ। রাশি রাশি প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমলের মাঝে আলো ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে।

আলোক মিথুন নৃত্য দেখতে অলক্ষ্যে এসে দাঁড়ায় অসংখ্য ছায়াদেহ। নৃত্যের ছন্দে দোলা ওঠে সেই সব রক্তমাংসবর্জিত ছায়া দিয়ে গড়া কায়ার বুকে। তারাও নাচে, নাচে এক অশরীর অশ্লীল নাচ। সেই নাচের হুল্লোড়ে রাশি রাশি স্বর্ণ কমলের মাঝে হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হয় একটি কন্যা।

আশা।

ছায়ার গর্ভে আলোকের ঔরসে তার জন্ম। ভূমিষ্ঠ হয়েই ককিয়ে কেঁদে ওঠে সেই মেয়েটি। কচি কচি হাত দু'খানি বাড়িয়ে জননীকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

সভয়ে দূরে সরে যায় ছায়া। আপন গর্ভজাতা কন্যার নাগালের বাইরে পালায়। আলোর আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

কন্যার কুৎসিত কান্নায় শিউরে ওঠে আলো। ঘৃণায় বিদ্বেষে কালোয় কালো

হয়ে যায় তার মুখ। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একটা অস্বাভাবিক দ্যুতি।

আলোর চোখের আঁচে শুকিয়ে যায় স্বর্ণকমলগুলি, তার সঙ্গে শুকিয়ে যায় তার কন্যাটিও। আলোক-কন্যা আশা ভস্মীভূতা হয় আপন পিতার চোখের আগুনে। তার সঙ্গে অশ্লীলতাও ভস্ম হয়ে মিশে যায় উদ্ধারণপুরের ভস্মের সঙ্গে।

হয় কি ষোল আনা ভস্মসাৎ?

কিছুতে হয় না, হতে পারে না। উদ্ধারণপুরের ভস্মের গর্ভে আশা আর অশ্লীলতা ধিকিধিকি পুড়ছে। ছাই চাপা আগুন—একটু হাওয়া পেলেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।

জ্বলে ওঠে মানুষের দুই চক্ষে।

গঙ্গার কিনারায় ঝাঁকড়া পাকুড় গাছটার তলায় জ্বলছে দুটি চক্ষু। চক্ষু দুটিতে আশা আর অশ্লীলতা ফণা ধরে নাচছে। শ্বেতবরণী সাপিনী দুটি। শ্বেতবরণী সাপিনীর চোখে চোখে বিষ। চোখ দিয়ে ছোবলায় ওরা। যাকে ছোবলায় তার আর হুঁশ জ্ঞান থাকে না।

"নিতাই বোষ্টমী দু'চোখ বুজে নেচে নেচে ঘুরছে আর মন্দিরা বাজাচ্ছে।

"ঐ সে গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশিয়াছে—"

কখন দংশন নিতাইকে। ফিরে ফিরে বড় বড় চোখে নিতাই মন্ত্রমুগ্ধা ফণিনীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার নূপুর গেল স্তব্ধ হয়ে, হাতের মন্দিরা গেল থেমে। একদৃষ্টে সে চেয়ে রইল আশা আর অশ্লীলতার দিকে। একেবারে অচৈতন্য বেহুঁশ।

বাবাজী তখনও চোখ বুজে মাথা দুলিয়ে গাইছে—

"চল সজনী যাইগো নদীয়ায়।"

কোথায় সজনী! কে যায় নদীয়ায় তার সঙ্গে। সজনীর সাড়া মেলে না। সাড়া না পেয়ে চোখ মেলে চাইলে বাবাজী।

পরমুহূর্তেই তার একতারায় পঞ্চম সুরের ঝঙ্কার উঠল। নিতাইয়ের চতুর্দিকে নেচে নেচে ঘুরতে লাগল চরণদাস।

"মধুবনেতে কালো বাঘ এসেছে
বাঘে যাসনে যাসনে।
কদম্বতলে সে যে থানা করেছে
বাঘে যাসনে যাসনে।"

বাঘের বর্ণ কিন্তু কালো নয়। নিতাইয়ের মতই বর্ণ বাঘের। প্রায় কাঁচা হলুদের রঙ। সন্ত কাছা গলায় দিয়েছে। পাতলা ফিনফিনে কাপড় আর চাদরে গায়ের রঙ চাপা পড়ে নি। অবিন্যস্ত ভিজে কোঁকড়ানো চুল কপাল ছাপিয়ে মুখের ওপর নেমেছে। ক্লান্তিতে বিরক্তিতে চেহারাটা হয়ে উঠেছে করুণ। মায়ের শোকে হুজুরকে যেমন দেখানো উচিত ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে। ছোটলোকেরা শোকে বুক চাপড়ে কাঁদতে পারে, কিন্তু হুজুর তা পারেন না। কাজেই তিনি হয়ে উঠেছেন আরও গম্ভীর, শোকের মহিমায় আরও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছেন হুজুর।

ধীর পদে এগিয়ে এলেন তিনি। ওদের পাশ দিয়েই চলে এলেন। এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে।

চরণদাস তখনো গাইছে—

"পথে যেতে আছে ভয়,
একা যাওয়া ভাল নয়
রমণী-হরিণীধরা ফাঁদ পেতেছে,
রাধে যাসনে যাসনে।"

আর "যাসনে যাসনে।"

কে শোনে কার মানা!

ত্রস্ত পদে এগিয়ে এল নিতাই। এসে দাঁড়ালো তাঁর পাশে। চোখ দুটি ছল-ছল করছে বোষ্টমীর, নাকের ডগাটি লাল হয়ে উঠেছে। রুদ্ধকণ্ঠে ডাক দিলে—"কুমারবাবু!"

মুখ ঘুরিয়ে চাইলেন কুমার। অতি মৃদুস্বরে বললেন—"হাঁ বোষ্টমী, মাকে আজ রেখে গেলাম এখানে।"

বোষ্টমীর গলা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

"কিন্তু রানী-মা যে বলেছিলেন, মা যে আমায় কথা দিয়েছিলেন—"

নত চোখে উত্তর দিলেন কুমার—"আমি জানি সে কথা। তোমায় নিয়ে বৃন্দাবনে যাবেন বলেছিলেন মা। যাও তোমরা বৃন্দাবনে, আমি খরচ দোব।"

নিতাইয়ের মাথা নুয়ে পড়েছে তখন।

শেষ পদটি গাইছে চরণদাস।

"ও বাঘের চোখে চোখে হলে দেখা
নিশ্চয়ই মরণ লেখা গো—"

আমার দিকে চেয়ে বললেন কুমার—"এবার আমাদের আদেশ দিন, আমরা

যাই, যদি কখনও প্রয়োজন হয়, অধমকে স্মরণ করবেন কৃপা করে।"

মুখ তুলে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে নিতাই, "বউরানী! বউরানী! এখন—"

হাসলেন কুমার। উদ্ধারণপুরের ঘাটে যে রকম হাসি মানায়, সেই জাতের হাসি হাসলেন তিনি।

অবিশ্বাস্য রকম নিস্পৃহ কণ্ঠে বেশ থেমে থেমে বললেন—"আর ত ফিরবে না সে বোষ্টমী। আমার মত মানুষকে পা দিয়ে ছুঁতেও যে তার ঘেন্না করবে।"

বড় সড়কের ওপর একসঙ্গে বহু কণ্ঠ গর্জন করে উঠল

"বল হরি হরি বোল।"

অর্থাৎ সাঙ্গপাঙ্গোরা তাদের হুজুরকে ডাক দিচ্ছে।

জোড় হাতে আমায় প্রণাম করে কুমার পা বাড়ালেন। ছায়ার মত নিতাই চলল তার পিছু পিছু।

চরণদাসের [illegible] শুদ্ধ হয়ে গেছে। একতারা হাতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে—"পেসাদ দাও গোসাঁই। বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেছে। ধোঁয়া দিয়ে না তাতালে চলছে না আর।"

তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

[illegible] সুবর্ণ মসৃণ নধর চামড়া বড্ড বেশী শুকিয়ে গেছে যেন। কোনও কালেই চরণদাসের গোঁফ দাড়ি কিছু নেই, মনে হয় ঐ সমস্ত আপদ কোনও দিন গজায়ও নি ওর মুখের ওপর। বয়স ও দেহের তুলনায় মুখখানি বেশ একটু মেয়েলি ধাঁচের বলে মনে হয়। অহর্নিশ গাঁজা টানার ফলে আঁখি দুটিও [illegible] ঢুলুঢুলু হয়ে থাকে। মনে হল, এ যেন সেই চোখ সেই মুখ নয়। হাতের কাঁধের বুক পিঠের সদাজাগ্রত পেশীগুলোও যেন কেমন ঢিলে ঢিলে দেখাচ্ছে।

হাতের একতারা আর কাঁধের ঝুলিটা একান্ত অবহেলায় মাটিতে ফেলে তার পাশে বসে পড়ল চরণদাস। দেহটাকে পায়ের ওপর খাড়া রাখবারও আর শক্তি নেই যেন তার। বসে পড়ে মাথা হেঁট করে দু'হাতে কপালটা সজোরে টিপে ধরে রইল।

গদির তলায় খুঁজতে খুঁজতে এক চাপড়া গাঁজা বার করলাম। চরণদাস চেয়েও দেখে না, মাথাও তোলে না। কাজেই নিজেই টিপতে লাগলাম গাঁজাটা।

উদ্ধারণপুরের আলো।

আলো জ্বালায় আগুন।

যে আগুন চিতার বুকে দাউ দাউ করে জ্বলে আর হাড় মাংসও খায়, এ আগুন সে আগুন নয়। চিতার আগুনের রঙ লাল, আলোর আগুনের রঙ সাদা। চিতার আগুনের দিকে চেয়ে থাকলে চোখ জ্বালা করে না, আলোর আগুনে চোখ ঝলসে যায়। চিতার আগুনের বুকভরা করুণা, একবার তার বুকে আত্মসমর্পণ করলে নিঃশেষে শেষ করে ছাড়ে। আলোর আগুনের বুকে দয়া নেই, মায়া নেই। সে আগুন শুধু জমায়, টলটলে তরল পদার্থকে জমিয়ে কঠিন করে ছাড়ে। এমন কঠিন করে ছাড়ে যে তখন সেই পদার্থের ওপর ভেতর নিরেট নীরন্ধ্র অন্ধকারে একেবারে বোবা হয়ে যায়।

আর একবার বড় সড়কের ওপর হুঙ্কার শোনা গেল।

"বল হরি হরি বোল।"

দূরে সরে যেতে লাগলো ওখানকার শোরগোলটা। হাতের তেলোয় টিপতে লাগলাম রসকষশূন্য গাঁজাটুকু। নরম করতে হবে, দু' ফোঁটা জল চাই। কিন্তু জল কোথায়—আমার দু' হাত পুরু গদির ওপর। দোব নাকি কয়েক ফোঁটা বোতলের জল।

না, এ জিনিসের সঙ্গে ও জিনিস অচল। এ বড় সাত্ত্বিক জাতের দ্রব্য, দু' ফোঁটা কাঁচা গো-দুগ্ধ দিয়ে টিপতে পারলে তবে এর পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা হয়। গো-দুগ্ধ অভাবে মনুষ্য-দুগ্ধ। তাই করেছিলেন একবার আগমবাগীশ। তাঁর শক্তির কাছ থেকে দুধ চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে বানিয়েছিলেন এই কালভৈরবের ভোগ। অতন মোড়ল নাকি স্বচক্ষে দেখেছিল আর প্রসাদও পেয়েছিল সেই কলকের। তারপর থেকে অতন যখন আসে রামহরির বউ দেয় তাকে কয়েক ফোঁটা দুধ।

অন্য চেষ্টাও করে দেখেছে অতন মোড়ল। কিন্তু কোনও ফল হয় নি। কাজেই রামহরির বউ দুধ দেয়। অতন মোড়ল ন্যাংটা চণ্ডীর দেয়াসি, তিন তুড়ি দিয়ে ডাকিনী নামাতে পারে। সে চাইলে কোন্ সাহসে না বলবে রামহরির বউ।

চরণদাস বাবাজী কিন্তু জল দিয়েই গাঁজা ডলে। কারণ নিতাই বোষ্টমী পাষাণে বুক বেঁধেছে।

"আমি পাষাণে বাঁধিয়া বুক
নীরবে সহি যে দুঃখ গো
আমার বন্ধু যদি পারিত গো জানতে।"

ফিরে আসছে নিতাই। বন্ধুকে বিদেয় দিয়ে ফিরছে। বড় সড়ক থেকে নেমে আসছে নিমতলা দিয়ে।

"সখী গো
কেমনে ভুলিব প্রাণকান্তে।"

আহা, প্রাণকান্তের জন্যে বেচারীর বুক মুচড়ে গলা দিয়ে সুর বার হচ্ছে।

"অভাগী রাধারে ভুলে
বন্ধুয়া রইল গোকুলে গো
বিধি আমায় জনম দিল কানতে।"

চরণদাসের পিছনে এসে দাঁড়ালো নিতাই। বোধ হয় নেহাৎ অভ্যাসদোষেই হাত বাড়িয়ে একতারাটা তুলে নিলে চরণদাস। চোখ বুজে মাথা হেঁট করেই বসে রইল সে। শুধু একটা আঙুল ঠিক তালে তালে চলতে লাগল একতারার ওপর। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মন্দিরায় বোল তুলে নিতাই গাইলে—

"আমি অবলা কুলের বালা
কত বা সহিব জ্বালা গো—"

একতারা হাতে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো বাবাজী। মন্দিরার সঙ্গে একতারা তখন সমানে ঝঙ্কার দিচ্ছে।

আবার নিতাই গাইলে—

"আমি অবলা কুলের বালা
কত বা সহিব জ্বালা গো—"

বাবাজী আর থাকতে পারলে না। তখনও তার দু'চোখ বোজা, মাথা দুলিয়ে শরীর দুলিয়ে সে গেয়ে উঠল —

"এক জ্বালা বাঁশের বাঁশী
আর এক জ্বালা বসন্তে।"

তারপর দু'জনেরই গলা মিলে গেল—

"সখী গো—
কেমনে ভুলিব প্রাণকান্তে।"

তখনও পর্যন্ত শুকনো গাঁজাটা রয়েছে আমার হাতের তেলোয়। সেটার দিকে নজর পড়তে নিজের ওপর বিরক্তিতে ভরে গেল মনটা। না, এ জিনিস থেকে রস বার করা আমার কর্ম নয়। চরণদাস বাবাজী পারে, পাষাণ থেকেও রস ঝরাতে

পারে ও। জল দুধ কিছুই ওর লাগে না। লাগে যা তার নাম মধু। চরণদাসের মধু জমা আছে নিজের বুকের মধ্যে। তাই দিযে ও পাষাণ-বাঁধা বুকেরও মধু ক্ষরণ করতে জানে।

দূর ছাই, গাঁজাটুকু টেনে ফেলে দিলাম একটা চিতার দিকে।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

ঘাটের উত্তর সীমায় আকন্দ গাছের জঙ্গলের সামনে উঁচু ঢিবির উপর অজস্র লেপ কম্বল তোশক কাঁথার তৈরী রাজপাট। রাজপাটে বসে রাজঠাট বজায রেখে চলতে হয। রাজতন্ত্রে হৃদয-দৌর্বল্যের স্থান নেই। মাযা-মমতা প্রেম-প্রীতি মান-অভিমান মিলন-বিরহ এই সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাণ্ডকারখানা রাজধর্মের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। এগুলোকে বাদ দিযে যা থাকে তার নাম রাজঠাট।

উদ্ধারণপুরের আকাশ বাতাস আলো ঘোল আনা রাজঠাট বজায রাখে। আকাশে ওঠে কান্নার রোল—"ওগো আমার কি হ'ল গো, আমায ছেড়ে কোথায তুমি গেলে গো।" বাতাসে শোনা যায গান—"কেমনে ভুলিব প্রাণকান্তে।" আর উদ্ধারণপুরের আলো—আলো ক্ষুব্ধ আক্রোশে জ্বলতে থাকে—কোথা গেল ছায়া? ছায়া নেই। ছায়া অন্তর্ধান করেছে। আলোকপ্রিয়া আপন বল্লভের অঙ্গের আঁচে পুড়ে ছাই হযে গেছে। রাজশক্তির আলো ছায়া সহ্য করতে পারে না।

খন্তা ঘোষ সইতে পারে না কান্না। কোথা থেকে তেড়ে এসে এক ধমক লাগালে।

"আঃ, কান ঝালাপালা হযে গেল বাপু তোমাদের মড়াকান্নার জ্বালায়। এখানে এসে একটু জুড়োর তারও উপায রাখলে না তোমরা। গেলেই পারতে তোমাদের প্রাণকান্তর সঙ্গে। পালকির পাশে দাঁড়িযে আঁচলে চোখ মুছছিলে ত। ফিরে এলে কেন আবার? একবার যাব বললে সে তোমাদের দু'জনকেই পালকিতে তুলে নিযে যেত। খামকা এখানে নেচে নেচে মড়াকান্না জুড়েছ কেন?"

কটাং করে একতারার তার গেল কেটে। একটা মন্দিরা খসে পড়ল বোষ্টমীর হাত থেকে। চেঁচাতে লাগল খন্তা ঘোষ।

"তোমাদের জাতের ত কিছু আটকায় না। ঘরভাঙানো তোমাদের ব্যবসা। যাও না যাও, গিয়ে ওঠ ঐ বাবুর মান্ধাতা-আমলের ভূতুড়ে বাড়িতে। চৌদ্দ

পুরুষ যাতে ভূতের নাচ নাচতে পারে সেই জন্যে অত বড় বাড়ি বানিয়ে গিয়েছিল ওর ঠাকুরদাদার বাবার বাবা। এখন সব দিকে সুবিধে, সেই বউ ছুঁড়িও সহ্য করতে না পেরে বাবুর মুখে লাথি মেরে পালিয়েছে। এক আপদ ছিল মা, তিনিও গেলেন। এখন বাবুর পোয়া বারো। এমনও হতে পারে, বাবু মোহন্তকে তাঁর বৃন্দাবনের ঠাকুরবাড়ির সেবায়েত করে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন। এখানে নিরালায় নিঝঞ্ঝাটে বোষ্টমীর কাছে দুটো রাধা-কেষ্টর প্রেমকথা শুনবেন বাবু। আর—"

চিলের মত চিৎকার করে উঠল নিতাই।

"থম্বা—"

উদ্ধারণপুরের আলো ঠিকরে পার হচ্ছে নিতাইয়ের দু'চোখ দিয়ে। যে আলোর আগুনে টলটলে তরল পদার্থ জমে কঠিন হয়ে যায়।

হঠাৎ একেবারে খাঁড়ার চোপ পড়ল থম্বার গলায়। অদ্ভুতভাবে সে সামান্যক্ষণ চেয়ে রইল নিতাইয়ের মুখের দিকে। তারপর আমার দিকে ফিরে আমাকেই একটা ধমক লাগিয়ে দিল।

"মজা করে নাচ গান দেখে ত সময় কাটাচ্ছ। ওধারে দারোগা এসে বসে আছে যে তোমার জন্যে। তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছিল সেপাইদের। তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা করে বসিয়ে রেখে এসেছি। নাও, এখন চল আমার সঙ্গে। একটা দুটো নয়, তিনটে মানুষ খুন হয়েছে, সে সম্বন্ধে তোমায় জিজ্ঞেস-পড়া করবে দারোগা সাহেব।"

আঁতকে উঠলাম—"খুন! কে হল? কোথায়?" বলতে বলতে লাফিয়ে পড়লাম গদি থেকে।

"চল্ চল্, দেখি গিয়ে, কে আবার খুন হল কোথায়?"

ওপাশ থেকে ভেঁড়ে গলায় কে বললে—"আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না বাবা, আমিই এসে গেছি।"

খাকী কাপড়ে মোড়া সাড়ে-তিন-মণী একটা সচল মাংসপিণ্ড সামনে এসে দাঁড়ালো বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে। দুই থাবা কচলাতে কচলাতে হেঁ হেঁ করে হাসতে লাগল বিদ্ঘুটে হাসি। নিরীহ হরিণের বুকের ওপর চেপে বসে হায়নারা বোধ হয় এই জাতের হাসি হাসে।

"আমিও আপনার একটি অধম সন্তান বাবা। এ অধমের নাম হচ্ছে সাধুরাম সমাদ্দার। লোকে বলে সমাদ্দার দুঁদে দারোগা। দুঁদে না হলে কি পুলিসের

কাজে উন্নতি করতে পারে রে বাবা। কিছুতেই পারে না। অন্য দারোগা যেখানে সাত ঘাট জল খাবে, সমাদ্দার সেখানে এক চালে বাজিমাৎ করে দেয়। এই যে একটি ঢিলে দু'টি পাখী বধ করে বসলাম, এ কি খেলত অন্য কারও মাথায়? এই বেটা খন্তারও ত দুঁদে বলে নামডাক আছে। ও ব্যাটাও ত ধরতে পারলে না আমার মতলব। দিব্যি ফাঁদে পা দিলে। আর আমিও চলে এলাম ওর পিছু পিছু। আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বকর্ণে শুনলাম, খন্তা কি বললে আপনাকে। স্বচক্ষে দেখলাম, খুনের কথা শুনেই কি ভাবে আপনি আঁতকে উঠে ছুটেছিলেন পুলিসের কাছে। ব্যস, হয়ে গেল। সমাদ্দারের এক আঁচড়েই সব সাফ হয়ে গেল। কি রে বেটা ঘোষের পো, হাঁ করে চেয়ে আছিস যে মুখের দিকে। মাথায় ঢুকল কিছু?"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে খন্তা শুধু মাথা নাড়লে।

দারোগা সাহেব আবার হাসতে লাগলেন তাঁর সেই হায়না-মার্কা হাসি। হাসির চোটে পেটের মাংসপিণ্ড ওঠানামা করতে লাগল। হাসি সামলে বললেন —"সাধে কি লোকে বলে যে চার কুড়ি বয়স না হ'লে তোদের মগজে কিছুই ঢোকে না। এই মগজ নিয়ে লোক চরিয়ে খাস কি করে—এঁ্যা। এটুকু আর বুঝলি না যে খুন সম্বন্ধে তোর বা গোসাঁই বাবার যদি কিছু জানা থাকত তাহলে তুই বেটা এসেই গোসাঁইকে সটকাবার মন্তর দিতিস। আর বাবাও কে খুন হল তা জানবার গরজে পুলিসের কাছে ছুটতেন না।"

ফাঁক পেয়ে আমিই জিজ্ঞাসা করে বসলাম, "কিন্তু কে খুন হল? কোথায় হল খুনটা?"

দারোগা সাহেব তাঁর ধামার মত মাথাটা এপাশে ওপাশে দোলাতে দোলাতে বললেন—"সে আমরা জানতে পারবই। লোক তিনটে এই শ্মশান থেকে ফিরে যাচ্ছিল। তাদের খানা থেকে তুলে থানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ডাক্তারবাবু আমাদের খুব কাজের মানুষ। যে করে হোক ওদের তাজা করে তুলবেনই। আজ হোক, কাল হোক, জ্ঞান ফিরে আসবেই ওদের। এমন কিছু বেশী চোট নয়। বেমক্কা লাঠি ঝেড়েছে ওদের ঠ্যাঙে। আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে তিনজনেরই ঠ্যাং ভেঙেছে একভাবে। যারা ভেঙেছে তারা টাকা-কড়ি কাপড়-চোপড় কিছুই নেয় নি।"

খন্তা বললে—"শ্মশান থেকে যারা ফিরে যাচ্ছিল তাদের কাছে থাকবেই বা কি হাতি-ঘোড়া। তারা যে শ্মশান থেকে ফিরছিল এ আপনারা জানলেন কি করে?"

সমাদ্দার সাহেব বললেন, "রাস্তায় যে গ্রামে তারা রাত কাটিয়েছে সেই গ্রামের লোকে বললে। আরে বাপু, সন্ধান না করেই কি এখানে এসে পড়েছি আমি? অত কাঁচা ছেলে নই। বাবার কাছেই একেবারে এসে গেলাম। বাবাকে দর্শন করাও হল। পুলিসের চাকরি করি হাজার ইচ্ছে থাকলেও ত সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করতে পাই না। বাবার কৃপা হলে হয়ত লোক তিনটের পরিচয়ও পেয়ে যাব। মানে লোক তিনটেকে হয়ত বাবা চিনে ফেলতেও পারেন।"

বললাম—"দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারব। কবে মার খেয়েছে তারা, কোথায় মার খেয়েছে?"

"কবে যে মার খেয়েছে তা ত বলতে পারব না বাবা।" শক্তিপুরের মাঠের পশ্চিম দিকে বাঁধা বটতলার ওধারে একটা থানার ভেতর ওদের পাওয়া গেছে পরশু দুপুর বেলা। একজনের গলায় পৈতে রয়েছে, আর এই এত বড একটা সোনার কবচ ছিল তার গলায়। দেখুন ত বাবা এই কবচটা। এত বড একটা কবচ গলায় ঝুলিয়ে যে মডা পোডাতে এসেছিল তার ওপর সকলের নজর পডবেই।"

বলতে বলতে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কালো সুতোয় বাঁধা একটা সোনার কবচ বার করলেন তিনি। দূর থেকে ওটা দেখেই আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম—"জয়দেব, জয়দেব ঘোষাল। বিষ্ণুটিকুরির জয়দেবকে আমি ঐ কবচ তৈরী করে দিয়েছিলাম। ওটা গলায় ঝুলিয়েই ও সেদিন ওর পাঁচবারের বউকে পোডাতে এনেছিল। কবে যেন? কবে যেন এল জয়দেব?"

মনে করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম।

দুঁদে দারোগা সমাদ্দার নিজের উরুর ওপর একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের থাপ্পড মেরে বললেন—"ব্যাস ব্যাস, কাম ফতে হো গিয়া। আর আপনাকে কষ্ট দোব না বাবা। ওতেই আমার কাজ হয়ে গেল। বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষাল। ব্যাস, এর বেশী আর জেনে লাভ নেই পুলিসের। ডায়েরীতে লিখে রেখে দোব। জ্ঞান হলে জয়দেবরা যদি কারও নাম করে ত তাকে ধরে টানা-হ্যাঁচডা করা যাবে তখন। মাতাল তিনটাকে কারা ঠ্যাঙালে তার জন্য পুলিসের মাথাব্যথা নেই। যাক গে যাক, ও সমস্ত নোংরা ব্যাপার।"

সাধুরাম সমাদ্দার ঠ্যাং-ভাঙার প্রসঙ্গটা একেবারে চুকিয়ে দিয়ে ভুঁড়ির ওপর থেকে আধ বিঘত চওড়া চামড়ার পেটিটা খুলে ফেললেন। খুলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বললেন—"এখন একটু বসি বাবার চরণের তলায়। শালার এমন কপাল নিয়ে এসেছি যে মরবার ফুরসৎটুকুও জোটে না কপালে। আর যখন এসে পড়েছি তখন জুড়িয়েই যাই প্রাণটা।"

বিনয়ের অবতার মোহন্ত চরণদাস তাড়াতাড়ি তার বগলে ঝোলানো সরু মাদুরখানা খুলে পেতে দিলে। বহু কষ্টে তার ওপর দেহভার রক্ষা করলেন দারোগা সাহেব।

খন্তা তার সব ক'খানা দাঁত বার করে বললে—"তা'হলে এখন একটু ইয়ের ব্যবস্থা করি হুজুর?"

হুজুর বললেন—"আলবৎ করবি। বাবার প্রসাদ না পেয়ে কি উঠব নাকি মনে করেছিস এখান থেকে? খাঁটি জিনিস আনবি রে ব্যাটা, এমন জিনিস আনবি যা জ্বলে। বাবার মুখের মহাপ্রসাদ পাব আজ। শালার রাজারাজড়ার কপালে যা কখনও জোটে না সেই জিনিস খেয়ে আজ আমার জন্ম সার্থক হবে।"

খন্তা ছুটল।

এবারে ওধারে চেয়ে দেখলাম। নিতাই গেল কোথা? বোধ হয় গঙ্গায় গেল মুখ হাত ধুতে।

যাক গে—নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে বসলাম গদির ওপর।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

ঘাটের প্রান্তে অবিশ্রান্ত কপাল কুটছে গঙ্গা। কপাল কুটছে আর কাঁদছে। অভিমান উথলে উঠছে ছলছল ছলাৎ করে। গঙ্গা সঙ্গের সাথী করে নিয়ে যেতে চায় উদ্ধারণপুরের ঘাটকে। নিয়ে যাবে সাগরে, সাগরের অতল তলে গিয়ে আশ্রয় নেবে দু'জনে।

সাগরের অতল তলে মড়া পোড়ে না। শেয়ালে শকুনে ছেঁড়াছিঁড়ি করে না, জ্যান্ত মানুষের তাজা বুক-মাংসের লোভে মানুষে মানুষে কামড়াকামড়ি করে না সেখানে। হাহাকার হাহুতাশ রেষারেষি পৌঁছতে পারে না সাগরের জলের তলে। মুক্তির নির্মল আনন্দে শুক্তিরা ঘুরে বেড়ায় সেখানে। তাই ত তারা দিতে পারে মুক্তার জন্ম। আসল মুক্তায় কলঙ্ক পড়ে না কখনও। উদ্ধারণপুরের কালো মাটির কলঙ্ক ঘোচাবার জন্যে গঙ্গা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে চায় সাগরে।

গঙ্গার কিনারায় একেবারে জলের ধারে গালে হাত দিয়ে বসে নিতাই একমনে

শুনছে গঙ্গার কান্না। বেচারী আজ সাথীহারা। চরণদাস গেছে খন্তা ঘোষের মচ্ছবে খোল বাজাতে। কেষ্ট যাত্রার দল খুলবে খন্তা ঝুমরী মেয়েদের দিয়ে। তাতে যদি ওদের পোড়া পেটের দাবি মেটে তাহলে আর মুখে "অঙ্" মেখে মানুষের মনে "অঙ্" ধরাবার ফাঁদ পাততে হবে না ওদের।

নিতাইয়ের বাইরেটাও রঙীন। দুধে-আলতার রঙে ছোপানো ওর বাইরেটা। ভেতরটা অন্ধকার, উদ্ধারণপুরের রাতের মত অন্ধকার। সেই অন্ধকার রাতেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওর বাইরেটার রঙ্। গদির ওপর বসেই বেশ দেখতে পাচ্ছি, একেবারে জলের ধার ঘেঁষে বসে আছে নিতাই। সন্ধ্যা থেকে ঠায় একভাবে বসে আছে ওখানে।

আর এক প্রাণীও জেগে নেই শ্মশানে। শুম্ভ-নিশুম্ভ ঘুমুচ্ছে, শেয়াল-শকুনরা কে কোথায় লুকিয়ে শুয়ে পড়েছে, চিতাও একটা জ্বলছে না কোথাও। এরকম নিঝুম নিস্তব্ধ হয় না কখনও উদ্ধারণপুরের ঘাট। রাতে জ্যান্ত মানুষ থাকে না কেউ বটে, কিন্তু যারা জ্যান্ত নয় তারা ত থাকে তাদের অশরীরী শরীর নিয়ে আমার চার পাশে। আজ যেন তারাও নেই কেউ। বড় একা একা মনে হতে লাগল নিজেকে। ওই গঙ্গার কিনারায় বসা রক্ত-মাংসের মানুষটির মত একা একা মনে হতে লাগল।

ডাক দিলাম—"সই, ও সই।"

মাথা তুলে মুখ ঘুরিয়ে চাইল আমার দিকে। তারপর উঠে এল। গদির সামনে দাঁড়িয়ে বললে—"আমায় ডাকছ?"

বললাম—"তোমায় ডাকব না ত আর ডাকব কাকে? কে আর আছে এখানে?"

অনেকগুলো আধপোড়া কাঠ দিয়ে একটা ধুনি করে রেখে গেছে রামহরি। ওটাকে খোঁচালে আলো পাওয়া যায়। ওই হচ্ছে আমার আলোর ব্যবস্থা। গদির ওপর বসে যাতে খোঁচাতে পারি তার জন্যে হাতের কাছে একখানা লম্বা সরু বাঁশও রেখে যায় রামহরি। বাঁশ দিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করলাম ধুনটাকে।

একটু চুপ করে থেকে নিতাই বলল—"কি জন্যে ডেকেছ বললে না ত?"

তাই ত। কি জন্যে ডাকলাম ওকে? কেন ওকে ডেকে তুলে আনলাম ওখান থেকে? কেন? কি বলবার আছে আমার? বলব কি ওকে এখন? কিছু-না বলতে পারলে ও ভাববে কি?

ধুনিটা এবার বেশ জ্বলে উঠল। আগুনের লাল আভা পড়ল নিতাইয়ের মুখের ওপর। সেদিকে একবারটি চেয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। নিয়ে আবার একমনে

খোঁচাখুঁচি করতে লাগলাম ধুনিটায়।

খিলখিল করে হেসে উঠল নিতাই। বললে—"কি করে খুঁচিয়ে আগুন জ্বালাতে হয় তাই দেখবার জন্যে ডাকলে বুঝি আমাকে?"

তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চেষ্টা করলাম ওর প্রশ্নটায়ঃ "না না, তা কেন, তা কেন। মানে একলাটি ওভাবে বসে আছ ওখানে, মানে ওধারে সাপখোপের ভয়ও ত আছে।"

একান্ত ভালমানুষি গলায় নিতাই বললে—"ও তাই বল, সাপখোপের ভয় আছে বুঝি জলের ধারে। কিন্তু তোমার ঐ গদির ভেতরেও ত অনেকগুলো সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে গোসাঁই।"

বাঁশটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল আমার। সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, "সাপ! সাপ থাকবে আমার গদির ভেতর লুকিয়ে?"

"কেন? থাকতে নেই নাকি? আছে গোসাঁই আছে, সাপ আছে সর্বত্র, কোনটা ছোবল দিতে আসে, কোনটার ছোবলাবার ক্ষমতা নেই, কোনটা নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে শেকড়-বাকড় মন্ত্রতন্ত্রের জোরে। বিষ আছে, ছোবলাতে জানে অথচ কিছুতে ছোবলাতে পারে না, তেমন খেলা দেখানোই ত পাকা সাপুড়ের ওস্তাদি গোসাঁই।"

নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। নিতাইয়ের মুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। যা বলবার তা বলে শেষ করবেই ও।

অল্প একটু হেসে কপালের ওপর থেকে চুলগুলো এক হাতে সরিয়ে দিয়ে ও বললে—"গোসাঁই, খুঁচিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বড় মজা পাও তুমি। আগুন জ্বলে আর তার তাপে তুমি গরম হও। কিন্তু এমন একজাতের আগুন আছে যা বরফের মত শীতল। সে আগুন একবার যদি জ্বলে ওঠে তা'হলে ঐ মড়ার গদি, যার ওপর বসে তুমি রাজঠাট বজার রাখছ, সেই গদি এমন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে উঠে পালাতে পথ পাবে না। তেমন আগুনের নাম শুনেছ কখনও?"

অনেকটা সময় কেটে গেল। একভাবে চেয়ে রইল নিতাই আমার মুখের দিকে, বোধ হয় উত্তরের আশাতেই চেয়ে রইল।

অনেক চেষ্টায় অনেক কষ্টে শুধু বলতে পারলাম—"কিন্তু কি করেছি আমি তোমার সই?"

ধীরে সুস্থে ওজন করে এক-একটি কথা বলতে লাগল নিতাই—"কই না, কিছুই ত কর নি। কিছু করবার গরজ আছে নাকি তোমার? কেন কিছু করতে যাবে আমার জন্যে? সুখে বসে আছ তুমি রাজসিংহাসনে, পথে পথে ঘুরে

বেড়াচ্ছি আমি সাত দরজায় ঝাঁটা লাথি খেয়ে। আমার মত রাস্তার কুকুরের জন্যে তুমি কিছু করতে যাবে কেন? তোমার সুখশান্তির ব্যাঘাত হবে যে তাহলে।"

আঁকড়ে ধরবার মত একটা কিছু পেয়ে বর্তে গেলাম। বেশ অনুতপ্ত হয়েও উঠলাম। বললাম—"তা তোমরা রাগ-অভিমান করতে পার বৈকি আমার ওপর। সত্যি তোমাদের জন্যে কিচ্ছু করতে পারি নি আমি। বাবাজী ফিরে এলে আজ রাত্রেই পরামর্শ করে দেখব তিনজনে। সত্যিই তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে এই দেশে। কাশী বৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র এই রকম কোনও ধামে-টামে যদি একটি আখড়া হয় তোমাদের, যেখানে শান্তিতে বসে সাধন-ভজন করে তোমরা জীবনটা কাটাতে পারো, তার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে এবার আমাকে। ও আমি খুব পারব সই। একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। এত বড়লোক ভক্ত আছে আমার, সবায়ের কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবই কোনও তীর্থস্থানে। আর যাতে কারও দরজায় গিয়ে তোমায় না দাঁড়াতে হয় তার জন্যে—"

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল নিতাই—"কি। কি বললে? টাকাকড়ি ভিক্ষে চাইছি আমি তোমার কাছে? আমাকে টাকাকড়ি সোনাদানা দেবার লোকের বড় অভাব পড়েছে, না?"

"না না না বোষ্টমী। সে কথা বলছি না আমি। চরণদাস আমায় প্রায় বলে কিনা, কোনও তীর্থস্থানে গিয়ে যদি জীবনটা শান্তিতে কাটানো—"

দাঁতে দাঁত চেপে নিতাই বললে—"তীর্থস্থানে গিয়ে শান্তিতে জীবন কাটাক না চরণদাস বাবাজী, কে তাকে আটকে রেখেছে। মরা গাছ ও, ওর শান্তিতে আমার কি? ওর বেঁচে থেকে লাভ কি? শকুনের মত আগলে বসে আছে কেন আমায়? কি সম্বন্ধ ওর সঙ্গে আমার?"

একটু রসিয়ে বলবার চেষ্টা করি—"আহা, তাও ত বটে। কি এমন সম্বন্ধ চরণদাস বাবাজীর সঙ্গে তোমার? আচ্ছা সই, তোমাদের শাস্ত্রে এই অবস্থার নামটা যেন কি। খণ্ডিতা না প্রোষিতভর্তৃকা?"

অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর শোনাল নিতাইয়ের গলা: "গোসাঁই—ভুল করছ। না-বোঝার ভান করে আমায় ঠকাতে পারবে না তুমি। ঐ মড়ার গদির ওপর বসে গর্বে অহঙ্কারে তুমি মানুষকে মানুষ বলে মনে কর না। কিন্তু এই অহঙ্কার যেদিন তোমার ভাঙবে, সেদিন—আচ্ছা দেখা যাক—"

কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো নিতাই। আগুনের আভা পড়ল

ওর পিঠের ওপর। সামান্য একটু সামনের দিকে ঝুয়ে পড়েছে যেন। কিন্তু ওকি? কাঁদছে যে!

কেন কাঁদছে নিতাই? এমন কি বললাম যার জন্যে ও অমন করে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল?

আমার গলার মধ্যেও যেন একটা কি ঠেলে উঠতে লাগল। একটা কিছু বলতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। কিছুতেই একটিও কথা বার হল না গলা দিয়ে।

হঠাৎ একখানা পর্দা উঠে গেল চোখের সামনে থেকে।

ঐ যে নারী, একাকিনী—অন্ধকারে শ্মশানে দাঁড়িয়ে কান্না সামলাবার চেষ্টা করছে, মনে হল—এ কান্না নতুন কান্না নয়। অনেকদিনের জমানো অনেক কান্না আজ শ্মশানের তাপে গলে ঝরছে। মনে হল, এই দুনিয়ায় এমন কেউ নেই ওর, যাকে ও ঐ বেদনার সামান্য অংশও দিতে পারে। তা যদি পারত তা'হলে এতটা করুণ এতটা নিষ্ঠুর বলে মনে হত না ওর ঐ নিঃশব্দ রোদনকে।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

সে রাত্রে অনেক অশ্রু ঢেলেছিল নিতাই উদ্ধারণপুর ঘাটের ভস্মে। সাক্ষী ছিলাম একমাত্র আমি। একটি চিতাও জ্বলছিল না সে রাত্রে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। মড়ার বিছানার স্তূপের ওপর মড়ার মত কাঠ হয়ে বসে রইলাম। নির্বিকার নিরাসক্ত নিরপেক্ষ সাক্ষীর আদর্শ হয়ে। একটি আঙুল তুলতে পারি নি। একটি বাক্য গলা দিয়ে বার হয় নি আমার। যেন একটা বিষের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম।

উদ্ধারণপুরের অশ্রু।

অশ্রাব্য অশুদ্ধ অশুচি বুকফাটা হাহাকারের বিয়োগান্ত বিভীষিকা নয়, অনিবার্য অন্তর্দাহের পায়ে বিফল বিলাপের বিহ্বল মাথা-কোটাকুটি নয়, করুণাহীন কাটফাটা রোদে ঝুলো তালগাছের হা-হুতাশ চুয়ানো গাঁজলাওঠা তপ্ত তাড়ি নয়। উদ্ধারণপুরের অশ্রুতে ঝরে মাধ্বী মধু। আকণ্ঠ পান করেও গায়ে মাথায় জ্বালা ধরে না। দেহ-মনের তন্ত্রীগুলো প্রসন্ন প্রশান্তিতে জুড়িয়ে শীতল হয়ে যায়।

উদ্ধারণপুরের অশ্রু।

একূল ওকূল দুকূল-নাশিনী উচ্ছ্বসিত উর্মিমালা নয়—অন্তঃসলিলা অনুরক্তির অনিরুদ্ধ অন্তর্বেদনা।

লেলিহান লালসার রুচিহীন রোমন্থন নয়—মূর্তিমতী মমতার মুমূর্ষু মিনতি। বিক্ষত বিক্ষোভের বিগলিত বিজ্ঞাপন নয়—বিকৃত বিড়ম্বনার ব্যথিত বাড়বানল। কিছুই সিক্ত হয় না উদ্ধারণপুরের অশরীরিণী অশ্রুতে, নরম হয় না উদ্ধারণপুরের সাদা হাড় আর কালো কয়লা। সে অশ্রুতে অনুভূতির অনুনয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু উদ্দীপনার উত্তাপ নেই। উদ্ধারণপুরের অশ্রু কিছুই ভাসিয়ে নিতে পারে না, শুধু খানিক নাকানি চোবানি খাইয়ে হায়রান করে ছাড়ে।

উদ্ধারণপুরের অশ্রু।

অশ্রু নয়, অশ্রুমুখী অনুশোচনা। শ্মশানের ধোঁয়াটে আকাশে নিষ্প্রভ নীহারিকাপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে থাকলে যে ভাষাতীত ভাষ্য বুকের মাঝে গুমরে ওঠে, সেই ভাষায় আশার কথা শোনাতে চায় উদ্ধারণপুরের অশ্রুমুখী অনুশোচনা।

বলে—“জানলে গোসাঁই—পিঁপড়ের পাখা গজালে সে মরবেই। না পুড়লে যে তার স্বস্তি নেই জীবনে। তাতে আগুনের দোষ কি? আগুন ত তাকে উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে সাধতে যায় নি।”

নড়ে-চড়ে বসি। ধড়ে প্রাণ এল ওর কথা কানে যেতে। তাড়াতাড়ি দুটো খোঁচা দিয়ে ধুনিটাকে আবও চাঙ্গা করে তুলি।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে বোষ্টমী। আমার মড়াপোড়া কাঠের ধুনি থেকে লাল আভা পড়েছে তার ভিজে মুখ-চোখের ওপর। নিশীথিনী-নিন্দিত চক্ষু দুটির অতলস্পর্শী চাউনিতে জ্বলছে দু'টি নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা—প্রত্যাশা আর প্রদাহ। কিন্তু এতটুকু উষ্ণতা নেই সেই চাউনিতে, পাখা-গজানো কোনও হতভাগা ঝাঁপ দেবে না সেই আগুনে। ও দীপ কাছে টানতে জানে না, শুধু দূরে সরিয়ে রাখে।

কিন্তু সাধ্য নেই চোখের ওপর চোখ রাখার, মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের মধ্যে। কোথায় যেন একটা বোবা বেদনা টনটন করে ওঠে।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলি—“মাঝে মাঝে অমন করে ভয় দেখাও কেন সই? যে মরে আছে তাকে মেরে কি সুখ পাও তুমি?”

আরও দু'পা এগিয়ে এল নিতাই। একটু সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললে—“কি দিয়ে বিধাতা তোমায় গড়েছিল গোসাঁই? কি ধাতুতে তৈরী তুমি? সুখের কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না তোমার? তোমায় ভয় দেখাব আমি!

ভয় কি বস্তু—তা তুমি জান ? লজ্জা ঘেন্না ভয় এই সব আপদ বালাই আছে নাকি তোমার শরীরে ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণভাবে বোঝাই ওকে—"সহজ কথা কিছুতেই সোজাভাবে নিতে পার না তুমি সই ? মড়ার গদির ওপর যে শুয়ে আছে সেই মড়ার সঙ্গে থামকা ঝগড়া করে নিজে দুঃখ পাও। কাঞ্চন নজরে ধরে না তোমার, কাঁচ নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে নিজের হাত পা কেটে জ্বলে পুড়ে মরছ। কি অশুভ লগ্নেই যে তোমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল।"

খপ্‌ করে আমার কথাটাই পাল্‌টে দেয় বোষ্টমী—"মনে পড়ে গোসাঁই ? এখনও তোমার মনে আছে সেই দিনটিকে ? তোমায় আমায় দেখা হবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি এখনও মন থেকে মুছে যায় নি তোমার ?"

খপ্‌ করে প্রশ্ন করা সহজ কিন্তু টপ্‌ করে তার জবাব যোগায় না আমার মুখে। আগুনের দিকে চেয়ে উত্তর খুঁজতে থাকি। আমার মড়া-পোড়া কাঠের ধুনির লাল আগুনের মাঝে কি লুকিয়ে আছে নিতাইয়ের প্রশ্নের উত্তর ? না এতদিনে নিঃশেষে ছাই হয়ে গেছে উদ্ধারণপুরের আঁচে।

যায় নি।

অত সহজে কিছুই মুছে যায় না মনের মুকুর থেকে। যে বস্তু নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায় চিতার আগুনে, সেই বস্তুই বুকের আগুনে পুড়ে আরও লাল, আরও উজ্জ্বল, আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া কেমন করে ভোলা যায় সেই অতি বিখ্যাত পুণ্যধামটির কথা, যেখানে মানুষ এখনও দলে দলে ছুটছে শান্তি পাবার আশায়, সংসার-জ্বালায় জলেপুড়ে খাক হয়ে পাপ তাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে মানুষ যেখানে গিয়ে আছড়ে পড়ছে আজও। ধর্ম যেখানে ওজন-দরে বিক্রি হয়, টাকা আনা পাই দিয়ে পাইকারি দরে মাল কিনে আড়ত খোলা যায় যেখানে, যে আড়ত থেকে অনায়াসে হরিনামের হট্টগোলের আড়ালে তাজা রক্ত-মাংসের ভেজাল দেওয়া মধুর রসের জোর কারবার চলে।

কি করে ভোলা যায় আড়তদারদের মূল আড়কাঠি খাঁদু বোষ্টমীর পৌনে এক হাত লম্বা সেই শ্রীমুখখানি, আর সেই মুখের ঠিক মাঝখানে এক আনার ফালি দেওয়া কুমড়োর মত সেই গোপীচন্দন-চর্চিত নাসিকাটি। সেই মুখে সেই আশ্চর্য নাকটির দু'পাশে অতটুকু দুটি চক্ষু—সত্যিই দেখবার মত বস্তু। সকালে বিকেলে আড়তের চালাও হলে যখন হরিনামের নামতা পড়া চলে, কয়েক শত পনেরো থেকে পঁচাত্তর বছর বয়সের সাদা থানপরা হতভাগিনী সারবন্দী বসে সপ্তাহান্তে

পেট-মাপা চাল নুন পাবার আশায় সুর করে নামতা মুখস্থ করে, তখন তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্দারনী থাঁদু সেই এক হাত লম্বা মুখখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নজর রাখে কোনও পড়ুয়া ফাঁকি দিচ্ছে কিনা। একঘেয়ে প্রাণহীন চিৎকার বন্ধ করে মাথা হেঁট করে বসে আছে কিনা কেউ। ফাঁকি দিক বা না দিক তাতে কিছু আসে যায় না। থাঁদু বোষ্টমীর কুতকুতে চোখের কুনজর যার ওপর গিয়ে পড়বে তার আর রক্ষে নেই। সারাটা সকাল বিকেল প্রাণপণে চেঁচালেও গদি-ঘরের খেরো-বাঁধানো লাল খাতায় তার নামের পাশে ঢ্যারা পড়বে। অর্থাৎ সে-সপ্তাহের চাল নুনের বরাদ্দ থেকে অর্ধেকটা ছাঁটা হয়ে গেল।

নামে রুচি আর জীবে দয়া—কলির জীবের জন্য এই সহজ পন্থাটি বাতলে দিয়ে যিনি জগৎকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, তিনি কল্পনা করতে পারেননি যে তাঁর সেই প্রেম নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে কি চমৎকার ফাঁদ পাতা যাবে। আর সেই ফাঁদে পা দেবার জন্যে বাঙলার নিভৃত পল্লী থেকে দলে দলে হতভাগিনীরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে পোড়া পেটের দায়ে। টাকা জুটলে জীবে দয়া দেখাবার জন্যে জীব খরিদ করা যায়, তাদের দিয়ে নামে রুচির ফলাও কারবারও ফাঁদা যায়। এ বড় অদ্ভুত যন্ত্রটা চালু থাকবার রসদ যন্ত্রটাই জুটিয়ে চলেছে। আখের রস জ্বাল দেওয়া হচ্ছে আখের ছিবড়ে দিয়ে। মাছের তেলে মাছ ভাজা যাকে বলে।

নিতাই দাসী তখনও নিতাই হয় নি, আর পাঁচটা গাঁয়ের মেয়ের মত ওরও একটা ঘরোয়া নাম ছিল নিশ্চয়ই। সেই নামটুকুমাত্র সম্বল করে থাঁদু বোষ্টমীর নজরে পড়ে গেল সে। থাঁদু তার বাৎসরিক সফরে গিয়েছিল গ্রামে। প্রতি-বারের মত এবারও দু'একটি অসহায়া বিধবা যুবতীকে ধর্মপথে টেনে আনার সৎ-বাসনা নিয়ে দেশে গিয়েছিল সে। গুটি পঁচিশেক নগদ টাকার লোভ সামলাতে না পেরে নিতাইয়ের কাকা তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাইঝিটিকে থাঁদু বোষ্টমীর হাতে গৌর-গঙ্গা করবার জন্যে সমর্পণ করে দায়মুক্ত হলেন। তারপর যথাকালে যথা-নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে নামগানের আখড়ায় নাম লেখালে নিতাই। গদি-ঘরের লাল খেরোবাঁধানো মস্ত খাতায় আর নতুন নাম উঠে গেল নিতাই দাসী। সবই সুশৃঙ্খলে সমাধা হয়ে গেল, যেমনটি ঘটা উচিত ঠিক তেমনিভাবে বিনা ওজর-আপত্তিতে ঘটে গেল সব কিছু। গদিঘরে বসে তিলক চন্দন তুলসী মালায় বিভূষিত ভক্তবর আখড়ার মালিক দেখলেন মুঠোর মধ্যে যায় এমন একটি কোমর। আরও যা দেখলেন তাতে তিনি নেপথ্যে থাঁদু বোষ্টমীর তারিফ না করে পারলেন না। কিন্তু কে জানত যে—যে-ফুল মধুতে টসটস করছে, তার কাঁটায় অত বিষ!

ধর্মপ্রাণ আখড়া পরিচালকের বিরাট অট্টালিকায় ভাগবত পাঠ শোনাবার জন্য

খাদ্য নিয়ে গেল তার ছোট্ট শিকারটিকে। কিন্তু শিকার ছোট্ট হলে কি হবে, জাল কাটতে জানে সে। ফলে ঘটে গেল এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার। সেই অসময়ে সকলের শ্রদ্ধেয় শহর-বিখ্যাত গুণী ব্যক্তিটির শান্তিকুঞ্জের সামনে বিরাট ভিড জমে গেল। দারোয়ানদের কাবু করে মার মার শব্দে মানুষ ঢুকে পডল বাডির ভেতরে। পাওয়া গেল নিতাইকে, অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া গেল। নখ আর দাঁত এই দুটি অহিংস অস্ত্রের সাহায্যে সে বাঁচিয়েছে নিজেকে। তার ওপর আর যা করেছে তার জন্যে তামাম মানুষ তাকে মাথায় তুলে নাচতে লাগল। পাঁচ-পঞ্চাশ বছরের নাদুসনুদুস সেই ভক্তপ্রবরটিকে জন্মের মত কানা করে দিয়েছে নিতাই, দু'হাতে তার দু'চোখ খাবলে তুলে নিয়েছে।

কেলেঙ্কারি যতদূর হবার হয়ে গেল। ক্রমে লোকের উচ্ছ্বাসে ভাঁটার টান দেখা দিল। তখন পিছিয়ে গেল সকলে। কে নেয় মেয়েটার ভার? সহজে কেউ এগোয় না ও মেয়ের দিকে হাত বাড়াতে। যারা এগোয় তাদের নজর দেখে নিতাই দন্তনখর বার করে। তারপর খোলা রাজপথ। এ হেন চরম দুর্দিনে, যখন একগাছা খডকুটো ধরতে পারলেও নিতাই বর্তে যায় তখন এল সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণটি। আমার নিতাইয়ের চার চোখের মিল হয়ে গেল।

মনে মনে কি মতলব ভেঁজে সেদিন নিতাই সেই পুণ্যধামের শ্মশানের মধ্যে ঢুকে পডেছিল তা সে-ই জানে। হঠাৎ আমার নজর পডল তার ওপর। নজর না পডে পারে না। ঢাকবার মত সম্পদ রয়েছে অথচ তার উপযুক্ত আবরণটুকুও নেই, রুক্ষ চুল, বদ্ধ পাগলের মত চোখ-মুখের অবস্থা—একটি বহ্নিশিখা শ্মশানসুদ্ধ সকলের লোলুপ চাউনিকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে ঘুরে বেডাচ্ছে। আমি দেখলাম —কি দেখেছিলাম ওর মধ্যে আজও বেশ মনে আছে। আমার মনে হয়েছিল যে চিবুবার মত এক মুঠো কিছু, আর এক পেট ঠাণ্ডা জল ওকে তখুনি দেওয়া প্রয়োজন। ভুলে গেলাম নিজের হীন অবস্থার কথা, নেংটি-চিমটে-কলকে-সম্বল হাডহাভাতে শ্মশানচারীর চালাকি নিমেষের মধ্যে ছুটে গেল আমার দেহমন ছেডে। আমার সেই বীভৎস মূর্তি নিয়ে সোজা উঠে গিয়ে দাঁডিয়েছিলাম ওর সামনে। বলেছিলাম—মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ছোট একটা অনুরোধ—"এস আমার সঙ্গে।"

চোখ তুলে নির্জলা নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে কয়েকটি মুহূর্ত চেয়ে ছিল নিতাই আমার দিকে। তারপর কয়েকবার আমার আপাদমস্তকে সে বুলিয়েছিল তার সেই অস্বাভাবিক বুভুক্ষ দৃষ্টি। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল—"চল—কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে।"

আমার মত আর যে কটি ফালতু মানবসন্তান শ্মশানে পড়ে মজা লুটছিল, তাদের ঠোঁটকাটা টিপ্পনীর ঝড় গায়ে না মেখে নিতাইয়ের পিছু পিছু মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিন সেই শ্মশান থেকে।

কিন্তু তারপর ?

রাজপথ শ্মশান নয়, রাজপথের ইজ্জৎ আছে। তার বুকের ওপর দিয়ে নেংটি-চিমটে-সম্বল শ্মশানচারী পিছনে একটা জ্বলন্ত যৌবন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না। অযথা ফেউ লেগে গেল। এল একটা মর্মান্তিক ঘৃণা নিজের ওপর। ওর পাশে নিজেকে মনে হল হীনতম হীন চরম অপদার্থ জীব, তুচ্ছাতিতুচ্ছ রাস্তার ঘেয়ো কুকুর বলে মনে হল নিজেকে। শ্মশানে বসে যা বাগিয়েছিলাম তাই দিয়ে তাড়াতাড়ি ওকে কিনে দিলাম দই মিষ্টি খাবার। হাত পেতে নিলে নিতাই, গঙ্গার ধারে বসে ধীরে সুস্থে গিললে সব খাবার। গিলে আঁজলা আঁজলা জল খেয়ে এল গঙ্গায় গিয়ে। ফিরে এসে ছেঁড়া আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে সেই প্রথমবার ওর রহস্যময় ভঙ্গিমায় জিজ্ঞাসা করলে—"কি গো ঠাকুর, সম্বল তো তোমার ফর্সা হয়ে গেল। এবার আমার ক্ষিদে পেলে খাওয়াবে কি ?"

জবাব—হ্যাঁ—তৎক্ষণাৎ দিতে পেরেছিলাম তার জবাবটি। বলেছিলাম—"তুমি সঙ্গে থাকলে কোনও কিছুর অভাব হবে নাকি ?"

তারপর আর কোনও কথা নয়, ছেঁড়া আঁচল পেতে আমার পাশে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়েছিল নিতাই। ওর শেষ কথা দুটি এখনও বাজছে আমার কানে—"তা'হলে আমি এবার ঘুমিয়ে নিই একটু। তুমি বসে পাহারা দাও আমাকে। দেখো, যেন শেয়াল শকুনে খাবলে না খায়।" বলে সত্যিই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আর চোরের মত কিছুক্ষণ পরেই পালিয়ে গিয়েছিলাম আমি।

দীর্ঘ পাঁচটা বছর পিছনে পার হয়ে গেল। এঘাট ওঘাট সে-ঘাট—সাত ঘাটের পানি গিলে শেষে উদ্ধারণপুরের ঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম। সগৌরবে আসীন হলাম এই রাজঘাটের রাজপাটে। ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শিখলাম। নিজেকে নিজে রাজাধিরাজ জ্ঞানে পুজো করতে শুরু করলাম। ছোট্ট নিতাই কোথায় তলিয়ে গেল। চাপা পড়ে গেল যুগযুগান্ত ধরে সঞ্চিত উদ্ধারণপুরের শ্মশানভস্মের তলায়।

তারপর আচম্বিতে একদিন মন্দিরা আর একতারা বেজে উঠল আমার রাজপাটের সামনে। কষ্টিপাথরে কোঁদানো চরণদাসকে নিয়ে চুড়ো-বাঁধা নিতাই বোষ্টমী এসে দাঁড়ালো উদ্ধারণপুরের ঘাটে। কি গান যেন গাইছিল ওরা সেদিন? হাঁ—মনে পড়েছে—

"কুল মজালি ঘর ছাড়ালি
পর করিলি আপন জনে।
বঁধু তোর পিরিতির এই কি রীতি,
কাঁদি নিশি নিরজনে॥"

ঝিমিয়ে-পড়া আগুনটার দিকে চেয়ে—নিজেই ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। চমকে উঠলাম। আবার কথা বলছে চুড়ো-বাঁধা নিতাই বোষ্টমী। আরও কাছে সরে এসে প্রায় আমার গদি ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সে।

ও কি। কৌতুক না পরিহাস? না অন্য কিছু নাচছে বোষ্টমীর দুই কালো চোখে! কোথায় যেন একবার দেখেছিলাম ঐ চাউনি!

হাঁ—মনে পড়েছে, দেখেছিলাম একটা বেঁজির চোখে। রাধু মল্লিক আমার ছোটবেলার বন্ধু। তার পোষা বেঁজিটি সদাসর্বদা তার কাঁধের ওপর চড়ে থাকত। ঠাট্টা করে আমরা সেই বেঁজির নাম রেখেছিলাম মল্লিকা। একবার মল্লিকা একটা হাত-দেড়েক লম্বা গোখ্‌রোকে ঘিরেছিল। ফণা-ধরা সাপটার সামনে দাঁড়িয়ে গায়ের রোঁয়া ফুলিয়ে ঠিক ঐ দৃষ্টিতে চেয়েছিল তার শত্রুর দিকে। দূর থেকে সেই সাপে-নেউলের খেলা দেখেছিলাম আমরা।

বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। বহুদিন পরে আবার নিতাইয়ের সামনে নিজেকে একান্ত অসহায়, হীনতম হীন, চরম অপদার্থ জীব বলে মনে হল। দেড় হাত পুরু মড়ার বিছানার মৃত মর্যাদা বুঝি গোল্লায় যায় এবার।

শেষবারের মত শেষ চেষ্টা করলাম নিজেকে বাঁচাবার। শেষবারের মত একবার চতুর্দিকে নজর ফেলে দেখলাম, না, একটাও চিতা জ্বলছে না, একটি প্রাণীও পুড়ছে না কোনও চিতার ওপর। কেউ নেই যে আমায় রক্ষা করে।

অবশেষে আত্মসমর্পণ। যা খুশি ওরা করুক এবার। আর পারি না।

বললাম—"সই, বস না একটু আমার পাশে। তোমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নিই। উঃ, কতকাল যে ঘুমোই নি। একা একা বড্ড ভয় করে এখানে, চোখের পাতা এক করতে পারি না কিছুতে। উঃ—"

বলে ছু' চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম গদির ওপর।

সফল হল আমার আত্মসমর্পণ। অসঙ্কোচে বসে পড়ল নিতাই আমার পাশে। তুলে নিলে আমার মাথাটা নিজের কোলে। খুব ধীরে ধীরে বোলাতে লাগল তার হাতখানি আমার চোখে কপালে। ঝল্সানো মাংস পোড়ার গন্ধ নয়, এ গন্ধে কেমন যেন নেশা ধরে যায়। গন্ধটা আসছে নিতাইয়ের নরম হাতের আল্তো স্পর্শ থেকে। সন্তর্পণে চোখ বুজে পড়ে রইলাম ওর সেই নরম কোলে মাথা রেখে।

অনেকক্ষণ পরে গুনগুনিয়ে উঠল ওর গলা। সামান্য ঝুঁকে পড়েছে নিতাই, ওর ঈষৎ তপ্ত মৃদু শ্বাস পড়ছে আমার মুখের ওপর। চাপা গলায় গাইতে লাগল—

এ কি! এ যে সেই সুর! সেই গান।

"জ্বালা হল মোহন বাঁশি
আর জ্বালা তোর রূপের রাশি
আমার নয়ন মন উদাসি
বিনা কালা দরশনে।
কুল মজালি ঘর ছাড়ালি
পর করিলি আপন জনে
বঁধু তোর পিরিতির এই কি রীতি
কাঁদি নিশি নিরজনে॥"

নিরজনে কাঁদে কে!
কেন কাঁদে? কাঁদবার মত কোথাও একটু স্থানও কি মেলে নি?
কেন কাঁদতে আসে উদ্ধারণপুরের ঘাটে?

কাঁদে আমার রাজশয্যা।

লেপ তোশক কাঁথা আর কাঁথা তোশক লেপের স্তূপের ভেতর থেকে গুমরে উঠছে কান্নার কলরোল। ওরা কাঁদে কারণ ওদের ফেলে রেখে তারা চলে গেছে। একদা যারা এই সব লেপ তোশক কাঁথার সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে স্বপ্নের জাল বুনত তারা আর নেই। আছে শুধু তাদের স্বপ্ন—শয্যার প্রতি অণু-পরমাণুতে মেশানো।

তাই এরা কাঁদে। কাঁদে আর আমাকে শোনায় এদের ছুঃখের কাহিনী।

শোনায় এদের মর্মছেঁড়া দুঃখের কাহিনীগুলিও। শোনায় কে কবে ওদের ওপর শুয়ে কার গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে কি কথা শুনিয়েছিল, কবে কোন্ বঁধুয়া তার বিরহিণীর মান ভাঙাতে কি ছলনায় ছলেছিল,—একজনের নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝে শুয়ে অপরের স্মৃতি বুকে নিয়ে বিষের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে কাটত কার রাত। লেপ তোশক কাঁথারাও কাঁদতে জানে, নিরজনে কাঁদে তারা। শুধু আমি শুনি তাদের কান্না আর শুনি নির্লজ্জ লোলুপতার উলঙ্গ ইতিহাস। রক্ত মাংস মজ্জা মেদের জন্যে রক্ত মাংস মজ্জা মেদের কাঙালপনা। সে ইতিহাস রাগ-অভিমান ছল চাতুরী উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর হা হুতাশ দিয়ে গড়া, আগাগোড়াটাই বিড়ম্বনাময়। কবিরা সেই বিড়ম্বনা দিয়ে গান রচনা করেন—

"আমার এ-কূল ও-কূল দু কূল গেল
অকূলে ভাসি এখনে॥"

অকূলেই ভেসে গেছে তারা। এই উদ্ধারণপুরের ঘাট দিয়েই করেছে সবাই শেষ যাত্রা। সে যাত্রার এ-কূল ও কূল দু কূলই নেই। কিছুই সঙ্গে নিতে পারে নি। সব পড়ে আছে এ কূলে। এমন কি প্রতি রাতের প্রতিটি প্রেম-অভিমান বিরহ-মিলন সোহাগ ভালবাসা আর ছলা-কলা,—এই সমস্ত তিক্ত মধুর লীলাখেলার জলজ্যান্ত সাক্ষী—লেপ কাঁথা তোশকগুলিকেও সঙ্গে নিতে পারে নি। রেখে গেছে আমার জন্যে এই শয্যা, যে শয্যার সর্বাঙ্গে কিলবিল করছে কোটি কোটি জীবাণু, ক্ষুধার্ত আর বিষাক্ত কামের জীবাণুগোষ্ঠী। আর সেই জীবাণুগোষ্ঠীর সঙ্গে শুয়ে আমি গান শুনছি

"একি হল, হায় রে মরি—
ধৈরজ ধরতে নারি—
আমি পলকে প্রলয় হেরি—
এমনে বাঁচি কেমনে॥"

কেমনে বাঁচা যায়?

ক্ষুধার্ত জীবাণুর বিষাক্ত দংশনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?

উপায় ব্যবধান।

উপাধান সেই ব্যবধান রচনা করেছে। নিতাইয়ের নিখুঁত নিটোল বাম উরুর ওপর ডান কানটা চেপে শুয়ে আছি। বাঁ কানের ঠিক এক বিঘত উঁচু থেকে

নিতাই গান ঢেলে দিচ্ছে। অতএব জীবাণুর ক্রন্দন আর কানে যাচ্ছে না। কিন্তু শান্তি নেই তাতেও। সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর গাইছে বোষ্টমী। সামান্য একটু চাপ পড়ছে আমার মাথায়, অতি কোমল নিতাইয়ের বুকের চাপ। কিন্তু শীতলতা নেই সেই মৃদু স্পর্শে। নিতাইয়ের নিটোল উরু আর বোধ হয় তার বুকও জ্বলছে। সর্বাঙ্গ জ্বলছে তার। সে গাইছে—

"উপায় কি করিবে—
অঙ্গ জ্বলে কৃষ্ণ-পিরিতে।"

যে অঙ্গ জ্বলছে কৃষ্ণ পিরিতে সেই অঙ্গ হল আমার উপাধান। সুতরাং শান্তি কোথায়?

দুধে-আলতায় গোলা রঙের নিটোল নিখুঁত শিল্পকলা, কাঁচা মাংসের অপরূপ ভাস্কর্য। মানুষের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে দুধের মত সাদা সামান্য আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। গলাবন্ধ আধ কাঁচা শেমিজ আর সাদা থান, ও আবরণে কিছুই আবৃত হয় না। প্রতিটি রেখা আরও তীক্ষ্ণ আরও প্রখর ওঠে। আরও দুর্বার হয়ে ওঠে ওর আকর্ষণ, মানুষ বড় বেশী সচেতন হয়ে ওঠে নিজের সম্বন্ধে ওর দিকে চেয়ে। এই কাঁচা মাংসের পাকা শিল্পকলা যেন গ্রাস করতে চায় মানুষের মন বুদ্ধি আর হিতাহিত জ্ঞানকে।

লক্ষ কোটি ক্ষুধার্ত জীবাণু মারামারি করছে আমার উপাধানে। প্রতি মুহূর্তে গ্রাস করছে একে অপরকে, প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি প্রাণের বিনাশ ও কোটি কোটি প্রাণের জন্ম। এই অসাধ্য সাধন হচ্ছে যে অমোঘ মন্ত্রবলে সেই মন্ত্রটি শুনছি আমি ডান কান দিয়ে, যে কানটা চাপা আছে নিতাইয়ের নিটোল নিখুঁত উরুর ওপর। শুনছি—

ওঁ ব্রহ্মাণ্ডরসসম্ভূতমশেষরসসম্ভবং।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ॥
অখণ্ডৈকরসানন্দ কলেবর সুধাত্মনি।
স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহি কুলরূপিণি॥
অকুলস্থামৃতাকারে সিদ্ধজ্ঞানকলেবরে।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি॥

শ্রীপাত্র। প্রাণস্পন্দিত মহাপাত্র। এই পাত্রের মন্ত্রপূত বারি-সিঞ্চনে নিষ্প্রাণ উপচারে প্রাণ সঞ্চার হয়। এই পাত্র অতি নিখুঁত আর অতি সুদর্শন হওয়া চাই। এই 'আপূরিতং মহাপাত্রং' যথাবিহিতরূপে স্থাপন করতে পারলে সাধকের সিদ্ধিলাভ হয় সাধনায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বটুকু জেনে মানুষ এ-কূল ও-কূল দু-কূলের জন্যে আর হা-হুতাশ করে না।

কিন্তু আমার পোড়া কপালে শ্রীপাত্র জুটলেও তা স্থির থাকতে চায় না। চলমান চঞ্চল শ্রীপাত্রে পূজা সুসম্পূর্ণ হয় না আমার।

বাঁ কানে ঢালতে থাকে বিষ নিতাই বোষ্টমী—

"বন্ধু আমার চিকণ কালা
সঙ্কেতে বাজায় বাঁশি কদমতলা
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশি—"

অসম্ভব রকম নড়ে উঠল আমার শ্রীপাত্র। লাফিয়ে উঠে বসলাম গদির ওপর। আমার একটা হাত সজোরে চেপে ধরেছে নিতাই। অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে আমার চোখের দিকে। তার দুই চোখে ফুটে উঠেছে সন্ত্রাস। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, একেবারে কাঠ হয়ে গেছে সে।

একটু পরে আরও কাছে, প্রায় আমার কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে খুব চুপি চুপি বললে—"শুনছ গোসাঁই? শুনতে পাচ্ছ?"

আমিও কাঠ হয়ে গেছি। কি শুনব? কি শুনে অত ভয় পেয়েছে ও?

"শুনছ না কিছু? ঐ যে একটা কচি বাচ্চা কাঁদছে—ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে—। এইবার শুনছ?"

কান ঠিক করে তাক করলাম। হাঁ, এবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। গঙ্গার ভেতর থেকে আসছে ছোট ছেলের কান্নার শব্দ। ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া।

ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া।

ঠিক একটা কচি ছেলে কাঁদছে। আওয়াজটা আসছে গঙ্গার ভেতর থেকে।

এ কি ব্যাপার। কেউ ফেলে দিয়ে গেল নাকি কচি ছেলে? কোথা থেকে এলো ঐ কচি শিশু মহাশ্মশানে?

"শুনছ গোসাঁই? এবারে শুনতে পাচ্ছ ঐ ডাক? আমায় ডাকছে, আমায় যেতে হবে। তোমাকেও যেতে হবে গোসাঁই। কিছুতেই আমি ছেড়ে যাব না তোমায় এখানে। নিশ্চয়ই তারা টের পেয়েছে। তোমাকে সুদ্ধ টানাটানি করবে।

চল গোসাঁই, ওঠ শিগ্‌গির। এখুনি এসে পড়বে তারা।"

দু'খানি হাত দিয়ে চেপে ধরেছে নিতাই আমার ডান হাতখানা। বেশ বুঝলাম ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে সে।

উৎকণ্ঠায় উত্তেজনায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর।

"ওঠ গোসাঁই, নেমে পড এখান থেকে। এখনও উপায় আছে। চল এখনিই নেমে পড়ি গঙ্গার জলে, চল—"

হঠাৎ চুপ করে স্থির হয়ে রইল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে রইল বড় সড়কের দিকে। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে আমিও চেয়ে রইলাম।

"ঐ যে, ঐ দেখ, ঐ তারা আসছে, আলো দেখা যাচ্ছে।"

টপ করে নেমে দাঁড়াল গদির সামনে বোষ্টমী। তখনও দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে আমার একখানা হাত। এবার আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম বড় সড়কের ওপর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যেন এগিয়ে আসছে অনেকগুলো আলো। তারপর কানে গেল অনেক লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। সত্যিই কারা এগিয়ে আসছে এধারে।

কিন্তু এত রাত্রে কার এত বড় সাহস হল শ্মশানের মধ্যে নামবার? কে ওরা? কি উদ্দেশ্যে আসছে এধারে?

"আমাদের ধরতে আসছে গোসাঁই, নিশ্চয়ই ওরা ধরতে আসছে আমাদের। এস নেমে। এখনও উপায় আছে, চল পালাই।"

"কে ধরতে আসছে? কেন আসছে ধরতে?"

কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে রইল নিতাই। তারপর কান্নায় আর মিনতিতে ভেঙে পড়ল তার কণ্ঠস্বর।

"সব তোমায় বলব গোসাঁই। সব তুমি জানতে পারবে। এখন নেমে এস। চল পালাই।"

দু'হাতে সজোরে টান দিলে আমার দু'হাত ধরে।

আরও শক্ত হয়ে বসলাম। হাত ঘুরিয়ে ছাড়িয়ে নিলাম নিজের হাত দু'খানা। বললাম—"পালাও তুমি সই। আমার দরকার নেই পালাবার। কোনও অন্যায় করি নি আমি। কেউ ধরতে আসছে না আমাকে।"

মাথা হেঁট করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিচু হয়ে ওদের ঝোলা দুটো, একতারাটা আর সরু মাদুর দু'খানা তুলে নিয়ে দ্রুতপদে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। গঙ্গার দিক থেকে তখনও কচি ছেলের কান্না শোনা যাচ্ছে—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া।

ঠিক সেই মুহূর্তে বড় সড়কের ওপরে শোনা গেল খত্তার গলা।

"শেষবারের মত সাবধান করছি দারোগাবাবু। খবরদার নেমো না রাতে শ্মশানের ভেতর। ডাকিনী যোগিনী নিয়ে খেলা করেন বাবা এখন। কখনও এক প্রাণী নামে না শ্মশানে সন্ধ্যার পর। মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরবে কেন খামকা!"

প্রচণ্ড এক দাব্ড়ি শোনা গেল।

"চোপরও ব্যাটা ছুঁচো। ফের একটি কথা কইবি ত তোকে সুদ্ধ চালান দোব। সেই ছুঁড়ি বোষ্টমীকে নিয়ে এখন কেলি করছেন তোর ভৈরব বাবা। ব্যাটা ভণ্ড সাধু, ডাকাতের সর্দার। সেই হারামজাদা বোষ্টম বাবাজীকে দিয়ে মানুষ খুন করায় আর ঐ ছুঁড়িকে দিয়ে মানুষকে ফাঁদে ফেলে। অনেকদিন ধরে আমি লক্ষ্য করছি ঘুঘুদের চালচলন। আজ গুষ্টিসুদ্ধ সব ধরা পড়বে।"

আরও কাছে এসে পড়ল। এবার নামছে বড সড়ক থেকে। নিমগাছতলা আলোয় আলো হয়ে উঠল। একজন দু'জন নয়, এক পাল মানুষ নেমে আসছে।

কিন্তু তাদের জন্য বসে অপেক্ষা করার সময় একদম নেই বাবা শ্মশান-ভৈরবের। অগত্যা নেমে আসতে হল সেই গদি থেকে। বহির্বাস খুলে রেখেই আসতে হল।

শ্মশানের দক্ষিণ দিকে সদ্য-নেভানো একটি চিতার ওপর রাশীকৃত কালো কয়লা বেদীর মত উঁচু হয়ে রয়েছে। আজকের মত ঐ আসনেই বসতে হবে।...

ওধারে আমার গদির সামনে থেকে হাঁকার শোনা গেল।

"কই, গেল কোথায় সে হারামজাদা? ভেগেছে হারামজাদীকে নিয়ে! এই পাঁড়ে, তুম দেখো উধারমে, দো আদমী দেখো পিছুমে, আউর তিন আদমী আও হামারা সাথ। আর এই শালা বামনা কোথায় তারা? দেখা শিগ্গির কোথায় লুকলো তারা?"

সিধু কবরেজের গলা শুনতে পেলাম। সে কাঁই কাঁই করে উঠল—"আজ্ঞে হুজুর, ছিল ত তারা এখানেই। বোষ্টমী ছুঁড়ি ত আগাগোড়াই ছিল এখানে। বাবাজী বেটা এই কিছুক্ষণ আগে খোল বাজিয়ে এল ওখান থেকে।"

এক সঙ্গে বহু নারীকণ্ঠ ঝাঁজিয়ে উঠল—"নুড়ো জেলে দোব মুখপোড়া ঘাটের মড়ার মুখে। খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব বামনার। দাঁড়া না মুখপোড়া, আগে যাক্ তোর দারোগা বাবা, তারপর আমরা তোর কি খোয়ার করি ছাখ্।"

সমাদ্দার দারোগা হুংকার দিলে আর একটা, "চোপরও হারামজাদীরা, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব এখনিই।"

সমবেত কণ্ঠে হারামজাদীরাও রুখে উঠল—"আয় না আয়, এগিয়ে ভাখ্ না রক্তখেকোর ব্যাটা—"

সকলের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে শোনা গেল খন্তা ঘোষের গলা—"দারোগা বাবা, আগে প্রাণ বাঁচাও নিজের। তোমার সব বিদ্যে এবার গোল্লায় গেছে। বাবা অদৃশ্য হয়েছেন, সেখান থেকে তোমার ঘাড় ছিঁড়ে রক্ত খাবেন এবার।"

অশ্রাব্য ভাষায় আবার গালাগালি দিয়ে উঠল সাধুরাম সমাদ্দার। দিয়ে গজরাতে লাগল—"তখনিই ধরতাম শালা শালীদের। ভাবলাম দেখাই যাক না ব্যাটার ভিটকিলিমি—রাতে ছুঁড়িটাকে পযন্ত ধরব, যখন কেলি করবে তার বাপের সঙ্গে। তাই দু'পাত্র টেনে দাঁত-ছিরকুটে পড়ে রইলাম। কে জানত শালা আমার চেয়ে ধড়িবাজ। ঠিক সটকেছে—আমাব নাকের ডগা থেকে।"

এবার রুখে উঠল ময়না। ময়না সবচেয়ে কম বয়সের ঝুমুরী মেয়ে। দারোগা ওর ঘরেই পড়ে ছিল এতক্ষণ। চিলের মত গলা ময়নার, সে চেঁচাতে লাগল প্রাণ-পণে—"তোর মুখে ছাই পড়ুক অলপ্পেয়ে মিনসে, শেয়াল শকুনে ছিঁড়ে খাক তোর জিব। যে মুখে তুই বাবার নামে ও-সব কথা বলছিস সে মুখ দিয়ে যেন গু-রক্ত ওঠে। হে মা শ্মশানকালী, যেন তেরাত্রি না পেরোয় মা—"

যা মুখে এল তাই সুর করে আওড়াতে লাগল ময়না। এধারে মস মস জুতোর শব্দ শোনা গেল গঙ্গার দিক থেকে। একটু পরে দু'মূর্তি লাঠি ঘাড়ে করে আলো নিয়ে বেদীটার সামনে এসে উপস্থিত হল। পরমুহূর্তেই আর্তনাদ করে উঠল ওরা। লাঠি আলো ছিটকে চলে গেল এক দিকে। বিকট চিৎকার করতে করতে ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলে।

সমস্ত শ্মশান নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় কি সব আলোচনা হল ওখানে। শেষে দু'তিনটে আলো নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল কয়েকজন।

সামনে সমাদ্দার দারোগা। ডান হাত বাগিয়ে ধরে আছে পিস্তলটা। ডাইনে বাঁয়ে ঘন ঘন চাইতে চাইতে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে জনা-দশ বারো মানুষ। বেদীর সামনে এসে পৌঁছল সকলে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। দারোগা সাহেব বু বু বু বু করে তোৎলাতে লাগলেন। তোৎলাতে তোৎলাতে পিস্তল হাতে টলতে লাগলেন। দুম দুম করে দুটো আওয়াজ হল। দু'বার আগুনের শিখা দেখা দিল পিস্তল থেকে। তারপর দারোগা সাহেব দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়লেন গাছ-পড়া হয়ে।

ওধার থেকে ঝুমরী মেয়েরা আকাশ ফাটিয়ে হাহাকার করে উঠল।

শ্মশানের একেবারে দক্ষিণ সীমায় একটা নেভানো চিতার রাশীকৃত পোড়া কাঠকয়লার ওপর উলঙ্গ এক মূর্তি বসে আছে। একখানা মড়ার হাড, বোধ হয় কারও কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত, তার মাঝামাঝি কামড়ে ধরে আছে, মুখের দু'ধারে বেরিয়ে আছে হাডখানা। আর দুটো আধ-খাওয়া মড়ার মাথা ধরে আছে দু' হাত দিয়ে বুকের কাছে। লোকটি শিবনেত্র, যেন এতটুকু বাহ্যজ্ঞান নেই তার।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখেই দারোগা সাহেব আর সামলাতে পারেন নি নিজেকে।

ধীরে ধীরে সামনে পেছনে দুলতে লাগল সেই মূর্তিটি। রামহরি পণ্ডা আর খন্তা ঘোষ বুক ফাটিযে চিৎকাব করে উঠল—"জয় বাবা শ্মশানভৈরব, জয় বাবা মহাকাল।"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম চিতার ওপর। তখনও মুখে সেই মানুষের হাত কামড়ে ধবে আছি, দু'হাতে আছে দুই মড়ার মাথা। সেই অবস্থায় নেমে এলাম চিতার ওপব থেকে। নেমে এসে মড়ার মাথা দুটো নামিয়ে রাখলাম দারোগার পিঠের ওপর। তারপর মুখ থেকে হাডখানা নামালাম। পবম আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। খুব চুপি চুপি যেন নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলাম— "কে? কে তোরা?"

উত্তর নেই কারও মুখে। সবাই এক পা দু' পা পিছিযে গেল। আমি এগোলাম এক পা দু' পা করে। আর একটু গলা চড়িয়ে বললাম—"কি চাস তোবা এখানে? কেন এ সময় মরতে এলি এখানে তোরা?"

দুর্দান্ত খন্তা ঘোষের গলা দিয়ে মেনী বেড়ালেব সুর বার হল।

"বাবা গো, দয়া কর বাবা, আমি তোমার অধম সন্তান খন্তা গো বাবা। আমাক চিনতে পারছ না তুমি?"

গ্রাহ্যও করলাম না ওর কথা। আরও দু' পা এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। ধীরে সুস্থে চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম—

"হায় হায় রে, কেন মরতে এলি তোরা এখন শ্মশানে। এখন যে আমি বলি-দান দেব মা চামুণ্ডার। যা যা যা, এখনও পালা এখান থেকে। ঐ দেখ্ রক্ত খাবার জন্যে তাথৈ তাথৈ নাচছে ডাকিনী-যোগিনীরা। ঐ দেখ্ মা এসে দাঁড়িয়েছে। যা যা যা, এখনও পালা এখান থেকে। নয়ত সবাইকে নিবেদন করে দেব আমি। কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাবে সব—"

নিমেষের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল শ্মশান। সমাদ্দারের সাড়ে-তিন-মণী বপুটা টেনে হেঁচড়ে তুলে নিয়ে গেল ওরা। দু দে দারোগা সাধুরাম সমাদ্দার অচৈতন্য বেহুঁশ অবস্থায় প্রস্থান করলেন। পিস্তলটা কিন্তু তখনও তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন হাতের মুঠোয়।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

মহাশ্মশানের মহাশয্যার ওপর আবার গিয়ে বসে পড়লাম। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে তখনও বার হচ্ছে সেই হাড়খানার গন্ধ। দু'হাতের চেটোয় চটচট করছে মানুষের পচা মাংস।

একটা বোতল তুলে নিলাম গদির পাশ থেকে। তারপর সেই বোতলের জলন্ত জল দিয়ে হাত দুটো ধুয়ে একটা কুলকুচো করলাম। বাকিটুকু ঢেলে দিলাম গলায়। গলা দিয়ে নামতে লাগল জ্বলতে জ্বলতে সেই তরল পানীয়।

কিন্তু তবু যেন তেষ্টা মিটল না। সেই শয্যা, সেই সব কিছু ঠিক রয়েছে। কিন্তু কোথা গেল [illegible] উপাধান? এই ত ছিল, এখনও আমার ডান কানটা আর ডান গালটা যেন চাপা রয়েছে সেই উপাধানে। এখনও যেন ঈষৎ তপ্ত মৃদু শ্বাস পড়ছে আমার বাঁ গালের ওপর। আর অতি নরম একটা চাপ বোধ করছি মাথায়।

চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম গদির ওপর। লক্ষ কোটি জীবাণুর ক্রন্দন নয়, মর্মে মর্মে অনুভব করলাম জীবনের স্পন্দন।

কানে বাজতে লাগল সেই সুর—

"সই লো তার কাজল আঁখি
ডাকে আমায় ইশারাতে থাকি থাকি।"

উদ্ধারণপুরের হাসি।

সে হাসির চাউনি বড় তেরছা। সেই তেরছা চাউনির মদির সংকেতে মানুষ নাহোক নাস্তানাবুদ হয়। জাঁহাবাজ জুয়াড়ীর হিসেবের জারিজুরি জড়িয়ে জট পাকিয়ে যায়। ফলে তখন সে যা তা দর হেঁকে ফস্ করে ফতুর হয়ে বসে। বাঘা বাঠপাড় বুক উজাড় ক'রে কান্না ঢেলে দিয়ে সেই মূল্যে উদ্ধারণপুরের তেরছা হাসি কিনে নিয়ে ঘরে ফেরে।

দারোগা সাধুরামের একটি সাধু উদ্দেশ্য ছিল বুকের মধ্যে। ঠিকে-ভুল করবার

মানুষ নন তিনি। উপায়ও ঠাওরেছিলেন সঠিক। উদয় বোঝাই উৎসাহ উগরে দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন উদ্ধারণপুরের হাসি। অর্ধেক রাতে শ্মশান থেকে নিতাইয়ের তাজা দেহটা ছোঁ মেরে নিয়ে সটকাতে পারলে তাঁর অনেক দিনের মনের সাধ মিটত। কিন্তু সে সাধে ছাই পড়ল। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন উদ্ধারণপুরের তেরছা হাসির ঠসক দেখে।

উদ্ধারণপুরের হাসি।

সে হাসির ঠসক বড় ঠাণ্ডা। সংশয় আর সন্ত্রাসের মিশ্রণে যে সুর্মা তৈরী হয় সেই বেরঙ্ সুর্মায় সুশোভিত উদ্ধারণপুরের হাসির আঁখিপল্লব। সে আঁখিপল্লব সিক্ত হয় না কখনও। সেই নির্জলা নির্নিমেষ নয়ন দুটির সঙ্গে নয়ন মিললে মানুষ নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায় নিঃসঙ্গ নিঃস্ব জ্ঞান করে।

কিন্তু এমন চোখও আছে যে চোখের পর্দা নেই। অতন মোড়লের রক্তবর্ণ চোখ দুটো হেলে-গরুর মত এত বড় বড়। সে চোখের চোরা চাউনিতে চিতার ক্ষুধা। ও চোখ অনেক দেখেছেন—অনেক চেখেছেন। মোড়লের নিজের কথায় 'পেত্যক্ষ' করেছেন। ঠসক দেখিয়ে ঠকানো অসম্ভব অতন মোড়লের দৃষ্টিকে। মোড়লের চোখের ওপর চোখ পড়লে উদ্ধারণপুরের হাসির চোখও চুপসে যায়।

আমঅতন আর তার উপযুক্ত ভাইপো আমজীবন। ওরা দুজনেই একটা দল। ভাগ দেবার ভাবনায় আর কাউকে দলে রাখে না—পাঁচ ক্রোশ ভুঁই ঠেঙিয়ে স্রেফ দু'জনে বয়ে এনেছে ওদের মাল। মোড়লের পাকা হাতের পাকা কাজ। বাঁশের সঙ্গে মড়া আর মাদুর এমনভাবে জড়িয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে এনেছে যে কার সাধ্য সন্দেহ করবে, ওর ভেতর আস্ত একটা মানুষের হাড়-মাংস লুকিয়ে রয়েছে। একেবারে জলের ধারে বোঝা নামিয়ে বাঁশখানা খুলে নিয়ে খুড়ো ভাইপো এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। আকর্ণব্যাদিত হাঁ করে মোড়ল একচোট বাহবা দিয়ে নিলে আমায়।

একটা কাজের মত কাজ দেখিয়েছি আমি, মোড়লের মনের মত কাজ একটি করে ফেলেছি এতদিনে। একেবারে চক্ষু চড়কগাছে উঠে গেছে সকলের। যৎপরোনাস্তি খুশি হয়েছে মোড়ল। এই জাতের এক-আধটা খেল্ মাঝে-মধ্যে না দেখালে জব্দ থাকবে কেন মানুষ? আর এ সমস্ত না হ'লে যে শ্মশানচণ্ডীর মাহাত্ম্যে মরচে ধরে যাবে দিন দিন।

অর্থাৎ।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম ওদের শ্রীমুখ দু'খানি। নাঃ, এতটুকু ধোঁকার ধোঁয়া নেই ওদের চোখেমুখে কোথাও। অর্থাৎ আমার এত চোখালো চালটাও বানচাল হয়ে গেল ওদের খুড়ো-ভাইপোর চোখে। ওদের চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব।

বেশ একটু চোট লাগল আমার যোগ-বিভূতিগুলোর গায়ে। অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, এঁরা আটজন আমার আট দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে গা-জ্বালানে হাসি হাসতে লাগলেন আমার দিকে চেয়ে। কিন্তু উপায় কি? মোড়ল যে অনেক "পেত্যক্ষ" করেছেন, মানুষের দুধে তামাকের তোয়াজ করে তিনি নেশা করেন। তাঁর চোখে নেশা ধরানো সহজ কথা নয়।

সুতরাং গদির তলা হাতড়ে বার করলাম আমার তামাকের পুঁটলি। নিঃসম্বল হয়ে সবটুকু তুলে দিলাম মোড়লের হাতে। আরও খুশি হলেন মোড়ল মশায়। থেবড়ে বসে পড়লেন সেখানে। ভাইপোকে হুকুম করলেন বাঁশখানার সদ্‌গতি করে আগুন আনবার জন্যে। জল নেই, দুধও নেই, শুকনো তামাক খানিকটা তাঁর বিরাট থাবার নিষ্পেষণে জব্দ হয়ে গেল। সেই ফাঁকে গোটা কতক সদুপদেশও দিলেন আমায়।

"জানলে গো গোসাঁই বাবা, এবার তোমায় শিখিয়ে দোব মড়া-খেলানোর মন্ত্রটা। সে বিদ্যেটি একবার শিখে নাও যদি তা'হলে যমেও ডরাবে তোমায়। তবে বড় কঠিন ব্যাপার বাপু। যার তার কম্ম নয় সেসব কাজে হাত দেওয়া।"

একান্ত বাধিত হয়ে দাঁত বার করে হাসতে চেষ্টা করলাম। যদিও ভাল করে জানি যে কিছুতে ও বিদ্যে দেবে না মোড়ল কাউকে। আর দিলেও কোনও লাভ হবে না আমার। কারণ মড়া খেলাতে গেলে উপযুক্ত আধার চাই। একবার মাত্র মোড়ল বলেছিল আমায়, উপযুক্ত আধারের লক্ষণ কি কি। ডোম চাঁড়ালের মেয়ে হওয়া চাই। বয়স বিশ-বাইশের বেশী হলে চলবে না। ছেলেমেয়ের মা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শরীর বেশ 'টনকো' থাকা আবশ্যক। বেশী রোগে ভুগে মরেছে, হাড়গোড় বেরিয়ে গেছে এ রকম হ'লে চলবে না অর্থাৎ খুব তাজা হওয়া চাই মড়াটা।

উপযুক্ত আধারের লক্ষণাদি শুনে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। ও-রকম সর্বগুণান্বিতা পাত্রী জুটছে কোথায়?

এবং যতক্ষণ না জুটছে ততক্ষণ মোড়ল কিছুতে দেবে না সেই গুহ্য মন্ত্রটি—যে মন্ত্রবলে সেই সর্বসুলক্ষণা মৃতা যুবতী নড়েচড়ে উঠে বসবে। উঠে বসে দু'হাত

বাড়িয়ে দেবে। অর্থাৎ সোজা কথায় দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরবে তাকে, যে মন্ত্রবলে সেই মড়াকে জ্যান্ত করবে।

এরই নাম মড়া-খেলানো। মড়া-খেলানো যার তার 'কম্ম' নয়। আর উপযুক্ত আধার না হলে মড়া মড়াই থেকে যাবে। কিছুতে খেলবে না কোনও খেলা।

অত্তন মোড়ল পারে। পারে মৃতা যুবতীর বুকে প্রাণস্পন্দন আনতে। পারে যে একথা সবাই জানে, সবাই বিশ্বাস করে। কিন্তু কেউ কখনও চাক্ষুষ করে নি। করবে কি করে? সে যে বড গুহ্য ব্যাপার, লোকচক্ষুর অগোচরে ঘটবার মত—গুহ্যাতিগুহ্য কাণ্ড-কারখানা সেসব। উপযুক্ত বিশ্বাসী পাত্র না পাওয়ার দরুনই মোড়ল কাউকে দিতে পারছে না তার গুহ্য বিদ্যে।

তার নিজের ভাইপো আমজীবন, ভাইপোব মত ভাইপো। শুধু কাঠামো-খানিই নয়, খুড়োর মত গায়ের রঙ্, গলার স্বর সবই তার আছে। ছায়ার মত সে ফেরে খুড়োর পেছনে। তবু সে কিছু পায় নি। মোড়ল বলে—"সবুর হও গো, আগে বাড়ুক খানিক। দিন ত আর পালিয়ে যেচ্ছে না। আগে ভয়-ডর ঘুচুক, নয়ত আঁত্‌কে কাঠ হয়ে যাবে যে।"

তামাককে হাতের তেলোর চাপে নরম তুলতুলে বানিয়ে যত্ন করে তুলে দিলে মোড়ল কলকেতে। এবার আগুন চাই।

"কই র‍্যা—আগুন কই—আন না হয় চকমকিটা।"

জবাব নেই।

চড়তে শুরু করল মোড়লের মেজাজ।

আবার এক হাঁকার—"ম'লি নাকি র‍্যা ভ্যাকরা—রা কাড়িস নে ক্যানে?"

রা কাড়া হল ওধার থেকে। রা নয়, একেবারে রাসভনিন্দিত কণ্ঠে রোমহর্ষণ রোদন-ধ্বনি উঠল গঙ্গার দিক থেকে।

"হেই—আমকাকা গো দেখ'সে—আমাদের মাল কুথায় পাচার হয়েছেন।"

কান নয়, ঘাড় খাড়া করে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল মোড়ল। তারপর তামাক সুদ্ধ কলকেটা পেট-কাপড়ে গুঁজে হন্তদন্ত হয়ে ছুটল গঙ্গার দিকে।

উদ্ধারণপুরের হাসি।

হাসির চোখে পর্দা নেই। সে হাসি হাসবার নিয়ম মানে না। স্থান কাল পাত্রের বাছবিচার নেই তার। সে হাসি ভবিতব্যের ভিটকিলিমিকে ভেংচি কাটে,

পুরুষকার পৌরুষকে। হাঁ করে গিলতে তাড়া করে। ছোবল মারে অহংকারের আবদারের মুখে। তার চুম্বনে চির-রহস্যের চিরন্তন চাতুরী চির-নিদ্রায় ঢলে পড়ে।

হাঁক ডাক হুংকারে সরগরম হয়ে উঠল উদ্ধারণপুরের ঘাট। এল রামহরি, এল পঞ্চেশ্বর, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সিধু ঠাকুর। ময়না, সুবাসী, কালো, ভোমরা আর বাতাসী থাঁদু, ওরা কেউ নামল না শ্মশানে। বড় সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগল শ্মশানের ভেতর কি হচ্ছে। নেমে এল রামহরির বউ মেয়ে কাঁখে করে। ডোম গুষ্টির বাকী রইল না কেউ আসতে। বড় বড় লাঠি বাঁশ দিয়ে ধপাধপ পিটোতে লাগল সকলে আশপাশের ঝোপঝাড়। আর সকলের সবরকম হট্টগোল ছাপিয়ে ওরা দুই খুড়ো-ভাইপো আমঅতন আর আমজীবন দাপিয়ে বেড়াতে লাগল উদ্ধারণপুরের ঘাট।

দেশছাড়া হয়ে ছুটতে লাগল শেয়ালগুলো। শকুনগুলো চক্কর মারতে লাগল আকাশের গায়ে। বড় সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ তাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে পাবত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল।

এল না শুধু খন্তা ঘোষ।

আসবে কি করে?

সংজ্ঞাহীন সাধুরামের অনড় অচল অঙ্গখানি নিয়ে সে বেচারা হিমশিম খাচ্ছে রাত থেকে। সমাদ্দারের শাগরেদরা ছুটছে থানায়। আসবেন সমাদ্দারের স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন। হোমরাচোমরা বড় সাহেবরাও এসে পড়তে পারেন সদর থেকে। তারপর কার কপালে কি ঘটবে না ঘটবে সে ভাবনায় সকলেরই মুখ চুন হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আবার ঘটল এই কাণ্ড। মাদুর-চাটাইমো আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আস্ত একটা মানুষের ধড়-মুণ্ড হাত-পা সমস্ত লোপাট হয়ে গেল দিনপুপুর বেলায় শ্মশানের ভেতর থেকে।

কেলেঙ্কারি আর কাকে বলে!

এধারে এক ফোঁটা গলা দিয়ে গলে নি কাল রাত থেকে। শেষ রাত থেকেই তোড়জোড় করে সব সরিয়ে ফেলেছে রামহরির বউ। বড় বড় হুজুররা আসছেন। এ সময় সাবধান হওয়া ভাল। সরকারী ভাটিখানা নয়, কাজেই আইন মেনে চলতে হয়।

হায় আইন। আইন-আক্রোশের অষ্টপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় উদ্ধারণ-পুরের ঘাটে এসে ডেরা গেড়েছি। সেখানেও শান্তি নেই, আইনের আগুন সেখানেও সকলকে জিভ বার করে তেড়ে আসছে।

তেড়ে আসছে আইন আদালত।

আমাদের সিধু ঠাকুর আইনজ্ঞ মানুষ। সর্বপ্রথম তিনিই সচেতন করলেন সকলকে। তাঁর কাঁকড়া জাতীয় মুখখানি কাঁচুমাচু করে সামনে এসে দাঁড়ালেন দু' হাত কচলাতে কচলাতে। মাটির দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলেন তাঁর আরজি।

"হুজুররা আসছেন বাবা। এ সময় এই খিটকেলটা আবার—

থেমে গেলেন। একেবারে লজ্জাবতী লতাটি। এ কেলেঙ্কারির জন্যে যেন উনিই ষোল আনা দায়ী। নেকামি দেখে গা জ্বলে উঠল। তেড়ে উঠলাম— "হুজুররা আসছেন ত করতে হবে কি আমাকে? পাদ্য অর্ঘ্য সাজিয়ে বসতে হবে নাকি?"

মরমে মরে গেলেন একেবারে কবরেজ মশায়। বহু কষ্টে শুধু বলতে পারলেন—"আজ্ঞে, একটা লাস লোপাট হয়ে গেল কিনা, তাই বলছিলুম। মোড়ল মশায়রা এ সময় যদি একটু চেপে যেতেন। লাসটার কথা হুজুরদের কানে না উঠলে—"

এতক্ষণে আমার মগজেও ঢুকল মামলাটা। চাঙ্গা হয়ে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। সত্যিই ত। লাস লোপাট হওয়ার সঙ্গে যে উদ্ধারণপুরের সুনাম দুর্নাম জড়িয়ে আছে। উদ্ধারণপুরের ঘাটে লাস আনলে যদি তা লোপাট হবার সম্ভাবনা থাকে তবে যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এ ত সোজা কথায় কারবারই নষ্ট, যাকে বলে— এতগুলো মানুষকে পথে বসতে হবে।

চিৎকার করে ডাক দিলাম—"রামহরে, পঙ্কা, এধারে আয়। বড় মোড়ল— আগে শুনে যাও আমার কথা। আর এই, এই ব্যাটারা ঠ্যাঙ্গাড়ের গুষ্টি, থামা শিগ্‌গির তোদের বাঁশ-বাজী। দূর হয়ে যা এখান থেকে। নয়ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলব সব কটা মাথা।

থামল সকলে। রামহরে পঙ্কা এগিয়ে এল। বড় মোড়ল তখনও দু'হাতে নিজের বুক চাপড়াচ্ছে, আর যা মুখে আসছে তাই আওড়ে গাল পাড়ছে অদৃশ্য শত্রুকে, যে শত্রু তার এতবড় অপমানটা করলে।

বড় মোড়লকেই জিজ্ঞাসা করলাম—"ফাটক খাটতে চাও এই বয়সে?"

বন্ধ হল বুক চাপড়ানো আর গলাবাজী। হাঁ কিন্তু বন্ধ হল না। হাঁ করে চেয়ে রইল আমার দিকে মোড়ল।

সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলাম আইনের মারপ্যাঁচটুকু। আইন যাঁদের হাতে সেই হুজুররা এলেন বলে। এখন বুঝে দেখ সকলে, মাদুরে জড়ানো লাস উধাও হয়েছে

শুনলে সেই হুজুররা কি ছেড়ে কথা কইবেন ? সুতরাং যদি ভাল-চাও—

ভাল সবাই চায়। তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া গেল। রামহরে পণ্ডা আর রামহরির বউ বেটী ছাড়া এক প্রাণী আর রইল না শ্মশানে। যেখানে দু' মিনিট আগে রই-রই চলছিল সেখানটা হঠাৎ নীরব নিস্তব্ধ নিশীথ রাতের শ্মশানে পরিণত হল। আমরতন আর ভাইপো আমজীবন মাথা নীচু করে শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকের মত গঙ্গায় গিয়ে নামল। গঙ্গা থেকে উঠে কোনও দিকে না চেয়ে সোজা প্রস্থান। মড়া খেলানো যার কাছে ছেলেখেলা, সেও জ্যান্ত খেলাতে ভয় পায়।

উদ্ধারণপুরের হাসি।

হাসির চটুল চাউনিতে চতুরালির চমকানি। ক্ষুরধার ক্ষুরের ওপর রোদ পড়লে যেমন চোখ-ধাঁধানো চমকানি লাগে সেইরকম চমকানি লাগে উদ্ধারণপুরের চটুল চাউনির দিকে চাইলে। ক্ষুরধার ক্ষুরের ধারালো দিকটার ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটাও হয়ত সম্ভব কিন্তু উদ্ধারণপুরের চটুল হাসির চতুরালির ধারে কাছে ঘেঁসতে গেলে কেটে দু'খণ্ড হবার ভয়। সে চাউনির চোরাবালিতে পড়লে পাকা পাটুনীরও পরিত্রাণ নেই।

আর খস্তা ঘোষের দাঁতালো হাসির পেছনে যে দুর্জ্জয় দুরভিসন্ধি লুকিয়ে থাকে তার লীলাখেলা বোঝা উদ্ধারণপুরের উগ্রচণ্ডীরও অসাধ্য।

মুখে গালা লাগানো মা-কালী মার্কা ঢুটো বাজারে-বোতল বগলে করে খস্তা দেখাতে এল তার দু'গণ্ডা দাঁতের দেমাক। দূর থেকেই দরাজ গলায় চেঁচিয়ে বললে —"খস্তা ঘোষ লুকোছাপার ধার ধারে না, এ বাবা খাস আবকারি আঁচে ভিয়ান করা ভদ্রলোকের হাতে দেবার মাল। আইনে আটকায় কোন শালা? নাও গোসাঁই—গণ্ডুষ করে ফেল এটুকু। গলাটা ভিজিয়ে নাও চট করে। বাবার বাবারা এলেন ব'লে, তাঁদের মুখ দর্শন করলে গলা দিয়ে আর নামতে চাইবে না কিছু।"

প্রসন্ন হলাম।

খস্তা ঘোষের নজর থাকে সব দিকে। এইজন্যে ওকে এত ভাল লাগে। বললাম—"কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ? এধারে শ্মশানও যে শুকিয়ে উঠল, শয়তানদের জ্বালায় শেয়াল শকুনগুলোও পালিয়েছে শ্মশান ছেড়ে। কাল থেকে চিতাগুলো আছে নিবে। কারবার গুটোতে হবে এবার দেখছি।"

রামহরির বউ ব্যবসা বোঝে। সে বললে—"হক কথা বললে জামাই। চিতে সব ঝিমিয়ে পড়েছেন। ওনাদের না চেতালে আমাদের দিন চলা বন্ধ। কাল মঙ্গলবার, আমি খরচা দোব। কাল রেতে তুমি মা শ্মশানকালীর পুজো দাও চিতের ওপর।"

রামহরি দাবড়ি দিলে বউকে—"তুই মুখ থামা ত সীতের মা। থামকা বকে মরিস ক্যানে। আগে দেখ্, থানা পুলিসের হুজ্জৎ কতদূর গড়ায়।"

"গড়িয়ে গিয়ে পড়বে ঐ মা গঙ্গার জলে।" খন্তা ঘোষ খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল, "বলে—কত হাতি গেল তল—এখন মশা বলে কত জল!" ঘাবড়াচ্ছ কেন বাবা ডোম। তোমাদের কারবার মারে কে? আগে এসে পৌঁছক কে আসছে! এসে পৌঁছলে দেখবে মা গঙ্গার দয়ায় সব গঙ্গাজল হয়ে যাবে।"

ইতিমধ্যে একটা বোতলের গলা ভেঙে নিজের গলাটা ভিজিয়ে নিয়েছি। বোতলের শেষটুকু ওদের শালা-ভগিনীপতিকে প্রসাদ দিলাম। আর একটা বোতল তুলতে দেখে খন্তা এক থামচা দলাপাকানো নোট বার করলে পকেট থেকে। নোটের দলাটা পঙ্কার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—"গুণে দেখ্ পঙ্কা, কত আছে? যে ক'টা বোতল হয় ওতে, নিয়ে আয় কেলো শুঁড়ীর দোকান থেকে। মাল কিছু মজুদ রাখা ভাল। বাবারা এলে দেখতে পাবেন, বেআইনী নেই বাবা উদ্ধারণপুরের ঘাটে।"

ভগিনীপতির হাত থেকে বোতলটা নিয়ে দু' ঢোঁক গলায় ঢেলে পঙ্কা ছুটল। কানে-গোঁজা আধ-পোড়া সিগারেটটা নামিয়ে মুখে গুঁজে খন্তা দেশলাই জ্বাললে। রামহরির-বউ করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নিবনো চিতাগুলোর দিকে। খাঁ-খাঁ করছে চিতাগুলো। কাঠ নেই, আগুন নেই, নেই আগুনের ওপর হাড় মাংস। ঘুমিয়ে পড়েছে উদ্ধারণপুরের ঘাট। যজ্ঞি-বাড়ির লোকজন খাওয়ানো গেছে চুকে। ভিয়ানকররা বিদেয় নিয়েছে। পড়ে আছে শুধু ভিয়ানের চুলাগুলো। আত্মীয়-কুটুম্বরাও সব চলে গেছে। উৎসবের উৎসাহ উত্তেজনা আর নেই। বাড়ির মানুষ কে কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে। যেদিকে তাকাও—একটা বুক চাপা রিক্ততা। ঠিক সেই অবস্থা উদ্ধারণপুরের ঘাটের! অবস্থা দেখে আমার মনটাও কেমন দ'মে গেল। দমা মনে দম নেবার জন্যে দ্বিতীয় বোতলটাও গলায় ঢেলে দিলাম।

দম ফুরিয়ে গেছে, ঝিমুচ্ছে উদ্ধারণপুরের ঘাট।

আমরা চারজন—আমি, খন্তা, রামহরি আর সীতের মা—আমরা গালে হাত

দিয়ে বসে ভাবছি। উপায় ঠাওরাচ্ছি কি করে বজায় রাখা যায় উদ্ধারণপুরের ঠাট। কিন্তু সীতের কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই। সে তার মায়ের কাঁকালে বসে গালে ঢুকিয়ে দিয়েছে নিজের ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত। মেয়েটা জন্মেছে চোষবার জন্যে। হয় চুষছে মায়ের বুক, নয় চুষছে নিজের হাত। একটা না একটা কিছু চুষবেই।

খন্তা ঘোষও চুষছে। সদা পরিদৃশ্যমান আটখানি দাঁতের ফাঁকে ডান হাতের তিনটে আঙ্গুলের মাথা ঢুকিয়ে চুষছে খন্তা ঘোষ। ঐ আঙ্গুল তিনটির সাহায্যে সে ধরে আছে ক্ষয়ে-যাওয়া সিগারেটের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশটুকু। সব কিছুর ষোল আনা দাম উসুল করা তার স্বভাব।

সেই জন্যেই বলে—'স্বভাব না যায় ম'লে—ইল্লত না যায় ধুলে।'

উদ্ধারণপুরের ঘাটের স্বভাবও পালটাবে না কিছুতে, সাদা হাড আর কালো কয়লার ইল্লতও ঘুচবে না, দুধ দিয়ে ধুলেও ঘুচবে না।

বহুদূরে শোনা গেল—"বল হরি—হরি বোল।"

চমকে উঠল রামহরির বউ। আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল রামহরি। ওদের মেয়ে মুখ থেকে হাত বার করে বড় সড়কের দিকে চেয়ে রইল। কোথা থেকে শুম্ভ-নিশুম্ভ বেরিয়ে এসে প্রাণপণে ছুটে গেল বড় সড়কের দিকে। শকুনগুলো এতক্ষণ ডানা মেলে পড়ে ছিল গঙ্গার ধারে, তারা ডানা গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে দু'টো শেয়াল আকন্দ-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওধারে চলে গেল। শুধু নিশ্চিন্ত খন্তা ঘোষ, পকেটে হাত পুরে আর একটা দোমড়ানো সিগারেট বার করে নির্বিকার-ভাবে অগ্নিসংযোগ করলে।

আবার শোনা গেল—"বল হরি—হরি বোল।" কাছাকাছি এসে গেছে উদ্ধারণপুরের চিতার ভোগ। কোল থেকে মেয়েকে নামিয়ে রামহরির পরিবার হাঁটু গেড়ে একটি প্রণাম সেরে ফেললে। কাকে ঠিক বোঝা গেল না, বোধ করি ওদের ইষ্ট দেবী শ্মশানকালীকেই—যাঁর দয়ায় উদ্ধারণপুরের চিতার আগুন নেবে না কখনও।

কিন্তু চিতার ভোগ পৌঁছবার আগেই একটা বিদঘুটে আওয়াজ শোনা গেল বড় সড়কের ওপর। চমকে উঠলাম সকলে। মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম—মস্ত একখানা চকচকে মোটরগাড়ি এসে থেমেছে নিম গাছটার ওধারে। আর একবার চমকে উঠলাম—প্রথমে যিনি গাড়ি থেকে নামলেন তাঁকে দেখে। মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর নামলেন কাছা গলায় দিয়ে। তাঁর পেছনে পেছনে একে একে নেমে এলেন আরও দু'জন হোমরাচোমরা ভদ্রলোক।

ওঁরা তিনজন নামছেন বড় সড়ক থেকে। নিম গাছতলায় পৌঁছবার আগেই আবার শোনা গেল—বল হরি—হরি বোল। ওঁরা এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। বাঁশে-বাঁধা মাল কাঁধে নিয়ে ছু'জন লোক তরতর করে নেমে এল ওঁদের পাশ দিয়ে। পেছনে আরও কয়েকজন মালপত্র লাঠি লণ্ঠন নিয়ে ছুটে আসছে।

রামহরি উঠে গেল তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। রামহরির বউ গেল। খদ্দের "লক্ষ্মী"। উদ্ধারণপুরের ঘাটের খদ্দের শুধু "লক্ষ্মী" নয়—একেবারে "মহালক্ষ্মী"। এ খদ্দের নেয় না কিছুই, শুধু দিয়ে যায়। মাল দেয়, টাকা দেয়, খাট-বিছানা কাঁথা কম্বল দেয়। দেয় মদ-গাঁজা চাল-ডাল কাপড়-চোপড় সব কিছু। দিয়ে নিজেদের নিঃস্ব করে ঘরে ফেরে। এরকম খদ্দেরকে খাতির করে না কে?

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর তাঁর সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে এসে পৌঁছলেন আমার গদির সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে খন্তা ঘোষ একেবারে গড় হয়ে পড়ল তাঁর একজন সঙ্গীর পায়ের ওপর। প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াতে তিনি চিনতে পারলেন খন্তাকে। হাসিমুখে বললেন—"আরে ঘোষ যে! ভাল ত সব?"

কৃতার্থ হয়ে গেল খন্তা। যে ক'খানা দাঁত তার লুকিয়ে থাকে মুখের মধ্যে সেগুলোও বার করে ঘাড় কাত করে জবাব দিল—"আজ্ঞে হুজুর, আপনার আশীর্বাদে একরকম—"

হুজুর তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চাইলেন ভাল থাকাথাকির প্রসঙ্গটা। বললেন —"ভালই হল যে তোমায় এখানে পাওয়া গেল ঘোষ। আমাদের ন'পাড়া থানার দারোগা নাকি এখানে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কই তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না!"

দাঁত বার করেই খন্তা জবাব দিলে—"এখানেই তাঁকে পাবেন হুজুর। ওই ওপরে ঝুমরী পাড়ায় তাঁকে ভাল করে রেখে দিয়েছি তাঁর মেয়েমানুষের ঘরে। এখনও ভাল করে হুঁশ-জ্ঞান হয় নি কিনা তাঁর।"

হুজুর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"হুঁশ-জ্ঞান নেই তার! তার মানে? হুঁশ-জ্ঞান তাঁর নেই কেন? এখানে তিনি এলেনই বা কি জন্যে?"

তখন খন্তা একে একে জানালে—কি জন্যে দারোগা এসেছেন এখানে। এসে তিনি কিভাবে তদন্ত আরম্ভ করেন, তারপর অর্ধেক রাতে আসামীদের গ্রেপ্তার করতে এসে কি করে ফ্যাসাদে পড়ে গেছেন তিনি।

মড়া পুড়িয়ে তিনজন লোক ফিরছিল শ্মশান থেকে। মাঠের মাঝে কারা তাদের লাঠি মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেয়। থানার মধ্যে ঠ্যাং ভাঙা অবস্থায় পড়েছিল তারা। সেখান থেকে উঠিয়ে তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জ্ঞান হলে তারা নাম করে নিতাই দাসী বোষ্টমীর আর চরণদাস বাবাজীর। সেই বাবাজী বোষ্টমীর খোঁজেই দারোগা সাহেব আসেন উদ্ধারণপুর ঘাটে। ঘাটে এসে বাবাজী আর বোষ্টমীকে হাতেও পান। কিন্তু কি তাঁর খেয়াল হ'ল, খেলিয়ে মাছ ডাঙায় তুলতে চাইলেন। দিনের বেলায় তাদের ছেড়ে দিয়ে নিজে একটু রঙ্ করতে গেলেন ময়নার ঘরে। অর্ধেক রাতে নেমে এলেন শ্মশানে। রাতে শ্মশানে নামা নিষেধ। কিন্তু তিনি কারও মানা মানলেন না। ফলে কি যে দেখলেন তিনি শ্মশানে তা তিনিই জানেন। কিন্তু সেই থেকে অজ্ঞান হয়ে আছেন আর মুখ দিয়ে গাঁজলা ভাঙছে।

চলছে খগার গল্প বলা—একমনে শুনছেন হুজুররা।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কে হুজুরদের পেছন থেকে।

"ঠাকুর হেই বাবা—আমি তোমার অধম সন্তান জয়দেব গো বাবা। এবার আগে থেকেই এসে গেছি বাবা। এবার জ্যান্ত বউটাকে নিয়ে এসেছি তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিতে। দেখি এবার তুমি একে রক্ষে না করে থাকবে কি করে? দেখি এবার আমার বংশরক্ষা আটকায় কোন্ শালার ব্যাটা?"

লাফিয়ে নেমে গেলাম গদি থেকে। হুজুরদের ঠেলে সরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম জয়দেবের সামনে। চিৎকার করে উঠলাম দু'হাতে ওর দু'কাঁধ ধরে—

"জয়দেব, তোমার কবচ কোথায়? তোমায় যে কবচটা দিয়েছি আমি—সেটা কই? এই ত সেদিনও তুমি তোমার বউকে পোড়াতে এসেছিলে সেই কবচটা গলায় দিয়ে।"

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল জয়দেব আমার মুখের দিকে।

এক ঝাঁকুনি দিলাম ওর দু'কাঁধ ধরে—"বল জয়দেব, বল শিগ্গির—কোথায় গেল সেই কবচটা?"

ডুকরে কেঁদে উঠল জয়দেব—"বলছি বাবা, বলছি। অপরাধ নিও না বাবা তোমার অধম সন্তানের। এখান থেকে ফেরবার সময় সেটা হাইরে ফেলেছি বাবা। আগাগোড়াই সেটা ছিল আমার গলায়। নপাড়ায় ঢুকে কি দুর্বুদ্ধি হল। থানায় গিয়ে ঢুকলাম। থানার ছোটবাবু বন্ধু লোক, তাঁর সঙ্গে বসে একটুকু রঙ্ করে বড্ড বেসামাল হয়ে পড়লুম। থানার লোকেই টেনে নিয়ে কখন বাড়িতে ফেলে দিয়ে এসেছে জানতে পারি নি। পরদিন যখন নেশা কাটল তখন

থেকে আর কবচটা খুঁজে পাচ্ছি না। হেই বাবা—অপরাধ নিও না তোমার অধম সন্তানের বাবা—"

জয়দেব আমার পা জড়িয়ে ধরতে এল।

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর এগিয়ে এসে ধরে ফেললেন জয়দেবের একখানা হাত।

"ঘোষাল মশায়—চিনতে পারছেন আমায়?"

কাঠ হয়ে গেল জয়দেব—"আজ্ঞে হুজুর, আজ্ঞে আমি, আজ্ঞে—"

ধীর শান্তকণ্ঠে কুমার বললেন—"পেরেছেন তা'হলে আমায় চিনতে। যাক্, বলুন ত আপনার সেই ন'পাড়া থানার ছোটবাবু বন্ধুটি এখন কোথায়?"

"আজ্ঞে, তা কি করে জানব হুজুর, তা আমি জানব কেমন করে? পরদিন সকালে থানায় গিয়ে তাঁকে ত পাই নি। তিনি নাকি কোথায় খানাতল্লাশ করতে বেইরেছেন।"

"ভাল করে ভেবে দেখুন ত ঘোষাল মশায়, সে রাত্রে কি কি কথা হয়েছিল আপনার বন্ধুটির সঙ্গে। ভাল করে ভেবে জবাব দিন—মনে রাখবেন যে আপনার জবাবের ওপর তার ভাল-মন্দ নির্ভর করছে। সেই ছোটবাবুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আকাশ থেকে পড়ল জয়দেব—"খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! সে কেমন কথা?"

তখনও কুমার বাহাদুর ধরে আছেন জয়দেবের হাতখানা। হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে তিনি বললেন—"মনে করুন ঘোষাল মশায়, ভাল করে মনে করুন। সে রাত্রে এমন কোনও কথা তিনি আপনাকে বলেছিলেন কিনা, যাতে অন্তত আন্দাজ করা যায়, কোথায় তিনি যেতে পারেন। তাঁকে যদি না পাওয়া যায় তা'হলে আপনার বিপদ বাড়বে। এই যে দেখছেন এঁদের দু'জনকে, এঁরা যদিও ভাল মানুষ সেজে এসেছেন কিন্তু এঁরা সহজ লোক নন। ইনি হচ্ছেন পুলিসের বড় সাহেব আর ইনি আমাদের মহকুমা হাকিম। এঁরা বেরিয়েছেন সেই ছোট দারোগার খোঁজ করতে। ভেবে কথার জবাব দিন এবার।"

জয়দেব ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ-চোখ। একটু পরে সে আবার সামলে নিলে নিজেকে। এবং একটু উত্তেজিতও হয়ে উঠল, একটানে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—"বলবই ত। বলবই ত সত্যি কথা। হলেই বা বন্ধুলোক, কিন্তু সে শুয়োর ব্যাটার মুখ দেখতে আছে নাকি। হারামজাদা নচ্ছার জাত-বিচ্ছু! নয়ত অত নীচ নজর হয়? আমাদের

রাঙা দিদিমণির ওপর ওর নজর! কতবার আমায় সেধেছে, টাকাকড়ি পর্যন্ত দিতে চেয়েছে রাঙা দিদিমণিকে ফাঁদে ফেলে ওর হাতে দেবার জন্যে। সে-রাতেও ঐ এক কথা একশবার বলেছে! শেষে আমি ভয় দেখিয়ে বললাম—যাও না, যাও। সাহস থাকে যাও উদ্ধারণপুরের ঘাটে। সেখানে সাঁইবাবা বসে আছেন। রাঙা দিদিমণি তাঁর শ্রীচরণ আঁকড়ে আছে, কেউ তার অনিষ্ট করলে বাবা আর রক্ষে রাখবেন নাকি তার? সেই কথা শুনে ব্যাটা বললে কি না যে সে দেখবে কি ক'রে বাবা বাঁচায় দিদি-ঠাকরুণকে। তারপর আর আমার হুঁশ ছিল না। পরদিন সকালে যখন হুঁশ হল বাড়িতে, তখন কবচটা আর পেলাম না। ছোট-বাবুও সেই থেকে একেবারে উধাও হয়েছেন। তাঁকে ধরতেই পারছি না যে কবচটার কথা একবার শুধোব।"

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর তাঁর আঙুল থেকে খুলে ফেললেন একটি পাথর বসান আংটি। বললেন—"এখন আপনার বউ দেখান ঠাকুর মশাই, তিনি ত আমার গুরুজন। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড। আমি তাঁকে এবার নমস্কার করি।"

আংটিটা জয়দেবের হাতে গুঁজে দিয়ে নেপথ্যস্থিতা জয়দেব-পত্নীকে লক্ষ্য করে বললেন—"আপনাকে নমস্কার করছি গো বৌঠান। পূজোর সময় যাবেন আমাদের বাড়ি ঠাকুরমশায়কে নিয়ে।"

ওঁদের মধ্যে চোখে চোখে কি কথা হয়ে গেল। ওঁরা ফিরে চললেন। যাবার আগে কুমার আমায় বললেন—"দয়া করে একটু স্মরণ করবেন আমায়, যখন দরকার হবে। আপনার কোনও কাজে লাগতে পারলে ধন্য জ্ঞান করব নিজেকে।"

পুলিস সাহেব আর হাকিম সাহেব কিছুই বললেন না। শুধু দু হাতে নমস্কার করে গেলেন। খন্তাও গেল তাঁদের পিছু পিছু—বোধ হয় সাধুরাম সমস্যার একটা সমাধান করবার জন্যে।

তখন মনে পড়ল জয়দেবের এবারের ধর্মপত্নীর কথা। কিন্তু কই সে? কোথায় গেল ন'পাড়ার হেঁপো রুগী হারাধন চক্কোত্তির ডাগর-ডোগর মেয়ে ক্ষিরি?

জয়দেবই জানালে। জানালে যে হারাধন চক্কোত্তি মরেছে। মেয়েকে জয়দেবের মত সুপাত্রের হাতে তুলে দিয়ে সেই রাত্রেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে মরেছে। মেয়েই এসেছে বাপের মুখে আগুন দিতে। কারণ ছেলে ত নেই হারাধনের। ওই ওধারে চিতা সাজানো হচ্ছে। জয়দেবের বউ সেখানেই আছে। বাপের মুখে আগুন দিয়ে আসবে। এসে আমার চরণধুলো নেবে।

একথাও জানালে জয়দেব যে শ্বশুরকে পোড়াবার যাবতীয় খরচটাও সেই

করছে। জানিয়ে ছুটে চলে গেল ওধারে। একটু পরে ফিরে এল দু'টো বোতল হাতে করে। এসে আর একবার নিবেদন করলে তার আরজি। এবার যখন সে জ্যান্ত বউটাকে এনে ফেলেছে আমার শ্রীচরণতলে, তখন এবার আমায় রক্ষে করতে হবে তার বউকে, যাতে তার বংশটা রক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করে দিতেই হবে এবার।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

ঘাটের পূবে বয়ে চলেছে গঙ্গা।

গঙ্গা বয়ে চলেছে উদ্ধারণপুরের কালো মাটি আর কালো কয়লা ধুয়ে নিয়ে।

কিন্তু নিতাই ত কালো নয়!

কোথাও কি কালোর কালিমা লুকিয়ে আছে সেই দুধে-আলতায় গোলা লালিমার মধ্যে?

কালো নয় মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুরও। বড় বেশি রকম মানায় ওঁকে নিতাইয়ের পাশে। আর বাবাজী চরণদাসকে মানায়। কিন্তু সেটা হল বিপরীত মানান মানানো। নিতাইয়ের রঙটা আরও উৎকটভাবে খুলে যায় চরণদাসের পাশে। চট্ ক'রে নজরে ধরে যায় নিতাইয়ের দুধে আলতায় গোলা রঙ্, শুধু চরণদাস পাশটিতে থাকে ব'সে ওর। কুমার বাহাদুরের পাশে নিতাই ও নিতাইয়ের পাশে কুমার বাহাদুর—না—তেমন একটা হাঁ করে চেয়ে থাকবার মত দৃশ্য হবে না সেটা। বরং বলা যায়—এ ওর রূপের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। তখন একে ওকে আলাদা ক'রে চেনাই যাবে না।

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর।

হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে মস্ত উপকার ক'রে গেলেন আমার। একটা জলজ্যান্ত দারোগাকে দাঁতকপাটি লাগিয়েও রেহাই পেয়ে গেলাম ওঁর দয়ায়।

আবার যাবার সময় বলে গেলেন—"আপনার কোনও কাজে লাগতে পারলে ধন্য জ্ঞান করব নিজেকে।"

কেন?

হঠাৎ এতটা সদয় হয়ে উঠলেন উনি কেন আমার ওপর? কে ওঁকে সংবাদ দিয়ে পাঠালে এখানে?

কোথায় গেল বাবাজী চরণদাস নিতাইকে নিয়ে?

মনে হল যেন—যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম কুমার বাহাদুরের চোখে সেই আলো যে আলো ঠিকরে পড়ে নিতাইয়ের কাজল-কালো আঁখি দু'টি থেকে।

কলুষনাশিনী মা গঙ্গা। উদ্ধারণপুর ঘাটের কলুষটুকুর ওপরই তাঁর লোভ। মাদুরে মুড়ে দড়িতে পেঁচিয়ে অতন মোড়ল যা এনে নামালে তাও হরণ করলেন মা গঙ্গা। বৈশ্বানরকে বঞ্চিত করে চুপিচুপি সরিয়ে ফেললেন সেই মাদুর-মোড়া রহস্য। তার ভেতরেও কি লুকিয়ে ছিল কোনও কলুষ? অতন মোড়ল মড়া খেলাতে জানে, কি খেলা খেলেছিল সেই মড়াটাকে নিয়ে তাই বা কে জানে?

আর সেই কচি ছেলের কান্না, যা শুনে নিতাই আর স্থির থাকতে পারলে না। গঙ্গা-গর্ভ থেকেই উঠছিল সেই শিশুর কাতরানি। কচি ছেলেপুলের জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে নিতাই। বাবাজী চরণদাসেরও ঐ এক রোগ। কতদিন ওরা বলেছে, একটা মা-মরা ছেলেমেয়ের জন্যে আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করেছে। কোলের ছেলে ফেলে রেখে কত মা শ্মশানে আসে চিতায় উঠে পোড়বার জন্যে। সেইরকম একটা মা-হারা ছেলে চাই নিতাইয়ের। আমি নাকি একটু খেয়াল করলেই সে রকম একটা ছেলেমেয়ে তাকে যোগাড় করে দিতে পারি।

কিন্তু পারি নি, কিছুই দিতে পারি নি আমি নিতাইকে।

কি দোব? দেবার মত কি আছে আমার? যে মড়ার গদির ওপর শুয়ে থাকে তার কাছে নিতাই কিসের প্রত্যাশা করবে?

কিছু না পাওয়ার অভিমানেই চলে গেল নিতাই।

বোবা গঙ্গা বয়ে চলেছে উদ্ধারণপুরের কালো মাটি ধুয়ে নিয়ে। নিতাই কালো নয়, তবু তাকে নিয়ে গেল।

কে বলে দেবে, নিতাইয়ের দুধে আলতায় গোলা লালচে আভার মধ্যে কোথাও কালোর কলুষ লুকিয়ে আছে কিনা, কে বলে দেবে আমায়?

উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন।

স্বপ্ন হল জাত জালিক। অকূলপাথার সাগরবুকে যেখানে জলপরীরা জল-তরঙ্গ বাজিয়ে গান গায়, সেখানে জাল নিয়ে ছোটে স্বপন-জেলের পাগলা পান্সি। অগাধ জলের তলে যেসব মনগড়া জাল মাছেরা খেলা ক'রে বেড়ায় তাদের ধরবার জন্যে জাল ফেলে সে চুপ ক'রে বসে থাকে তার পান্সির ওপর। খেয়ালও করে না কোথায় চলেছে তার পান্সিখানি উজানভাটির টানে! হঠাৎ ফুঁসিয়ে ওঠে জল, চক্ষের নিমেষে একটা জলস্তম্ভ ওঠে ঘুরতে ঘুরতে, স্বপন-জেলের পান্সিখানাকে মাথায় ক'রে নিয়ে উঠে যায় মেঘের মধ্যে। তখন জলপরীরা পান্সিখানাকে

ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায় মেঘসমুদ্রে আর সেই আসমানে আসমানী মাছ ধরবার জন্য উদ্ধারণপুরের জাত জেলে জাল ফেলে বসে থাকে।

উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন।

স্বপ্ন পাতে জাল। উদ্ধারণপুর ঘাটের পারাপার জুড়ে স্বপন-জেলের বেড়াজাল পাতা। সে জালের আঁটুনি বজ্রের মত শক্ত কিন্তু তার গেরোগুলো সব ফুলের মত ফসকা। সে জালে আটকায় না কিছুই, বাঘা বোয়াল আর চুনো-পুঁটি সবই যায় পালিয়ে। ফাঁদে পড়ে শুধু স্বপন-জেলে নিজে। নিজের জালে জড়িয়ে বেচারা ছট্‌ফট ক'রে মরে।

উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন।

স্বপ্ন টাকু ঘোরায় আর তাল জাল বোনবার সুতোয় পাক পড়ে। পুরুষ মানুষের মাথার খুলির মাঝে ছেঁদা ক'রে তাতে মেয়েমানুষের বুকের একখানি সরু হাড় পরিয়ে বানানো হয় সেই টাকু। যে সুতা পাকানো হয় সে টাকুতে তা বেরিয়ে আসে মানুষের মগজের ভেতর থেকে। কিন্তু বেরিয়ে আসে বিশ্রী জট পাকিয়ে। তাই তার খেই খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। খেই খুঁজে বার করতে স্বপ্ন হিমসিম খেয়ে ওঠে। তখন সেই টাকু দিয়েই নিজের কপালে আঘাত করতে থাকে আর তার ফলে স্বপন-জেলের কপাল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

কিন্তু কিছুতেই কপাল ভাঙে না উদ্ধারণপুরের ঘাটের। মহা-জাগ্রত মহা-শ্মশানের মহা-মাহাত্ম্য আবার সগৌরবে জাঁকিয়ে ওঠে। মাল আসে, ভিয়ান চড়ে, যা পাক হয় তাও কিছু প'ড়ে থাকে না। সব ঠিকঠাক কাটতি হ'য়ে যায়। রামহরির বউকে আর শ্মশান-কালীর পুজো দিতে হয় না, তার অচলা ভক্তিতে গ'লে গিয়ে মা মুখ তুলে চান। চান রামহরির সংসারের দিকে নয়, "কিপাদিষ্টি" নিক্ষেপ করেন উদ্ধারণপুর ঘাটের এলাকা ছাড়িয়ে সারা দেশটার ওপর। ব্যাস—তা'হলেই হল—দেশকে দেশ উজাড় হয়ে সব মাল এসে ওঠে উদ্ধারণপুরের ঘাটে।

এমন কি পাচার-হওয়া আমঅতন আমজীবনের মালও মা গঙ্গা "কিপা" করে ফিরিয়ে দেন। ডোমপাড়ার সিধে ডোম ডিঙে নিয়ে উজানে মাছ মারতে যাচ্ছিল। মাছ মারা আসল কথা নয়, সিধে ডোম ডাঙার কোল ঘেঁষে লগি ঠেলে ডিঙি বায় আর ঝোপঝাড়ের দিকে নজর রাখে। কপালে থাকলে দু'একটা গোসাপ মাঝে মধ্যে মিলেও যায়। গোসাপ মারতে হয় লুকিয়ে-চুরিয়ে, ছালখানার দাম আছে। তবে জানতে পারলে থানায় টেনে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার দেয়। সিধে ডোমের লগিতে লাগল এই মাল। বাজার-খালের ওপরে কেয়া ঝোপের তলায় আটকে

ছিল। সিধে ডোম চিনতে পেরে ঝোপ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

আমাদেরও চিনতে কষ্ট হল না। মোড়লের পাকা হাতের পাকা কাজ, মাদুরে জড়ানো আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ঠিক সেই মালই বটে। দড়ির বাঁধন এতটুকু টসকায় নি কোথাও—ফুলে ফেঁপেও ওঠে নি। এমন কি গন্ধ বাসও বার হচ্ছে না একটুও। আর সব থেকে তাজ্জব কাণ্ড হচ্ছে, খেংরাকাটির মত সিধে ডোম, সিধে হয়ে অনায়াসে সেটাকে কাঁধে করে নামিয়ে নিয়ে এল ডিঙি থেকে। টসটস করে জল পড়ছে তখনও, কিন্তু ভিজে একটুও ভারী হয় নি মড়াটা। বোধ হয় দশ-বারো বছরের ছেলেমেয়ে হবে, এনতার ভুগে একেবারে হাড্ডিসার হয়ে মরেছে। তাই অত ছোট করে বাগিয়ে বাঁধতে পেরেছিল মোড়ল, তাই জলে ভিজেও ভারী হয় নি একটুও।

ডাকা হল সকলকে। রামহরি, পঙ্কা, রামহরির বউ, ডোমপাড়ার সবাই, ময়না, সুবাসীরা সকলে, আর সিধু কবরেজ—সবাই ছুটে এল। এল না শুধু খন্তা, খন্তা গেছে সাধুবামকে স্বস্থানে পৌঁছে দিতে। বলে গেছে, ফিরে এসে সে আমঅতন-দের মাসের একটা কিনারা করবে। সে মালই ফিরে এল অথচ খন্তা নেই। এ সময় থাকলে সব থেকে বেশি খুশি হত সে। সুতরাং তার অনুপস্থিতিটা সকলেই বেশ বোধ করলে।

সিধু ঠাকুর নিবেদন করলেন যে মা গঙ্গা যখন নিয়েও নিলেন না তখন একে সৎকার করতে হবে। হয় জলে নয় আগুনে। জল থেকে যখন উঠে এল ও, তখন এবার চাপাও আগুনে।

চাপাও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু খরচটা? কে দেবে চোদ্দ সিকে? চোদ্দ সিকে হল চুক্তি। চোদ্দ সিকেয় কাঠ পাটকাঠি কলসী ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জাম যোগান দিতে হবে রামহরিকে। একেবারে কাঠ বয়ে এনে চিতে পর্যন্ত সাজিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এখন দেয় কে চোদ্দ সিকে?

অবশেষে সাত সিকে যোগাড় হয়ে গেল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ময়না ওদের নিজেদের ভেতর থেকে সাত সিকে তুলে এনে দিলে। আর সাত সিকে দিলে সীতের মা। সত্যি সত্যিই সাতখানা সিকি এনে দিলে রামহরির হাতে। রামহরি আবার সেটা তার হাতেই গুনে দিলে, যেমন দেয় অন্য খদ্দেরের কাছে আদায় ক'রে। তখন কাঠ বইতে গেল ওরা শালা-ভগ্নীপতি।

এখন প্রশ্ন হল আগুন দেবে কে?

আমঅতন আমজীবন থাকলে তারাই আগুন দিত। কৈঁধোদের হক আছে আগুন দেবার। মড়ার মুখে আগুন দিয়েই তাদের হাতে সঁপে দেওয়া হয়—

তারাই পোড়ায় এখানে এনে। কিন্তু ডোমে পোড়ালে অন্ত কথা দাঁড়াবে যে। আর মড়াটা যে কোন্ জাতের তাই বা কে জানে ?

আচ্ছা—খোলাই হোক না মড়াটা। সিধে ডোমই খুলুক, ওই যখন ব'য়ে এনেছে কাঁধে করে।

সিধে বললে জোড় হাত ক'রে।

"তা'হলে একটু পেসাদ ছ্যান কত্তা। চোখদুটো একটু আঙা করে নিই আগে। কে জানে কার বুক খালি ক'রে এনেছে একে। কেঁধো শালাদের পাঁজরার ভেতর ধুকপুক করে না বুক। ও শালারা যা পারে আমরা তা পারি নে।"

মেয়েরা দিলে একটা বোতল এনে। রামহরির বউও দিতে পারত। কিন্তু এ ক'দিন তার ভাটি ঠাণ্ডা। সাবধান করে গেছে খন্তা—সে ফিরে না এলে যেন ভাটি না চড়ে। হুজুরদের নজর একটু না ঘুরলে ও-সব সাহস করা উচিত নয়। সুতরাং আইনে চুয়ানো বোতল এনে দিলে মেয়েরা।

পেসাদ ক'রে দিলাম। সিধে ডোম একটা ভাঙা ভাঁড়ে নিলে মাত্র দেড় ছটাক। এসব বাজারে-বস্তু তার নাকি চলেই না।

সেটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে সিধে বসল গিঁট খুলতে। নারকেল দড়ির গিঁট, জলে ভিজে আরও চেপে বসেছে। শেষে কাটতে হল কাটারি এনে। দড়িগুলো খুলে ফেলে মাদুরটা ছাড়িয়ে ফেললে সিধে। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে—একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মাদুরের ভেতর কাঁথা-জড়ানো মড়া। কাঁথাখানাও ভিজে সপসপ করছে। কাঁথাখানা ছাড়িয়ে ফেলা হল। তারপর নোংরা কাপড়ে বাঁধা একটা মাঝারি শব। সেটাকে দু'হাতে ধরে টেনে তুলেই ধপাস করে ফেলে দিলে সিধে। সঙ্গে সঙ্গে আঁত্কে উঠল। শুধু আঁত্কেই উঠল না, এক লাফে তিন হাত পিছিয়ে গেল।

কি হল না বুঝেই হুড়মুড় করে মেয়েরা পিছিয়ে গেল দশ হাত। কি হল না বুঝতে পেরে আমিও লাফিয়ে নামলাম গদি থেকে। দু'পা সামনেই সেটা পড়ে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে কাপড়খানা ধরে হেঁচকা টান দিলাম। ফ্যাঁস ক'রে ছিঁড়ে গেল কাপড়খানা। ছিঁড়ে আমার হাতেই চলে এল।

কিন্তু ও কি ? কি ওটা ?

পা দিয়ে ঠেলা দিলাম। সেটা গড়িয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম সেটার দিকে। শ্মশানসুদ্ধ কারও মুখে রা নেই।

হাত ছ'য়েক লম্বা একটা কলা গাছের টুকরো পড়ে আছে সবার চোখের সামনে। মড়া নেই।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

তাল-বেতালের পাট।

সে পাটের পাটোয়ারী চালে হদ্দ হুঁশিয়ারের হিকমত যায় ভেস্তে। জাগরণের জায়গা নেই সেখানে, স্বপ্ন তার জাল বোনবার সুতোর খেই খুঁজে না পেয়ে খাবি খায়। সেখানকার সূচীভেদ্য অন্ধকারে রোমহর্ষক হেঁয়ালির পাল্লায় প'ড়ে সুষুপ্তিরও নাভিশ্বাস ওঠে। বিশ্বাস অবিশ্বাসেরও স্থান নেই সেখানে। অতন মোড়ল তা জানে, জানে ব'লেই সে মানুষের দুধে তামাক ভেজায়। সে তামাক টানলে সকলেরই বিশ্বাস হবে যে মড়াটা বেমালুম উবে গেছে পোঁটলার ভেতর থেকে। গেছে শুধু মোড়লের মড়া-খেলানো মন্ত্রবলে। আর ঐ কলাগাছের টুকরোটাও ঠিক সেই একই কারণে এসে সেঁধিয়েছে ঐ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পোঁটলার মধ্যে।

পঞ্চেশ্বর তামাক টানে না। টানে মড়া পোড়াবার কাঠ। কাঠ টেনে তার কাঁধ দুটো মোষের কাঁধের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে শুধু বেঁকে দাঁড়ালো। উঁহু, অত সহজে পঞ্চেশ্বরকে বোঝানো সম্ভব নয়। যদিও সে মড়া খেলায় না কিন্তু মড়ার পায়ের হাড় দিয়ে তৈরী পাশা চালে। কাঁধ থেকে কাঠের বোঝাটা ফেলে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে সে দাঁড়ালো। দাঁড়ালো ত দাঁড়িয়েই রইল। এধারে মাদুর কাঁথা দড়িদড়া সব আবার গঙ্গায় দিয়ে আসা হল। কলাগাছের টুকরোটারও গঙ্গাপ্রাপ্তি হল। ওনাকে ভাসিয়ে দিয়ে সিধে আর রামহরি ডুব দিয়ে এসে আগুন ছুঁলে। আগুন ছুঁয়ে একটা ক'রে লোহার চাবি দু'জনে কোমরে ঝুলিয়ে রাখলে। রামহরির বউ জানে—নোয়া আর আগুন ছোঁয়া থাকলে ওনারা কেউ 'দিষ্টি' দিতে পারেন না সহজে।

কিন্তু সহজে পঞ্চেশ্বর ঘাড় সোজা করে না। তামাক কলকে চকমকি আর গামছা কাপড় নিয়ে সে তৈরী হয়ে এল। এসে বললে—

"একবার বিদেয় দাও গোসাঁই, গাঁ-দেশ পানে ঘুরে আসি গিয়ে।"

মেয়ে কোলে ক'রে ওর দিদিও এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে। আঁচলে চোখ মুছে বললে—"বল্, বলে যা গোসাঁইয়ের সামনে যে এবার দেখেশুনে বউ নিয়ে ঘরে ফিরবি। নয়ত আমার মরা মুখ দেখ্‌বিক কিন্তু এই ব'লে রাখনু।"

পক্বা ওর ভাগ্নীর মুখখানা ধরে নেড়ে দিয়ে হনহন ক'রে চলে গেল। একবার পেছন ফিরেও চাইলে না। সোজা উঠল গিয়ে বড় সড়কের ওপর।

ওর দিদি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—"হে মা শ্মশানকালী, ওকে কোর মা। গোঁয়ার মনিষ্যি, কোথাও যেন কিছু বাধিয়ে না বসে।"

কোথাও কিছু না বাধলে কিন্তু কৈচরের বামুনদিদি এমুখো হন না কখনও। হাত দেড়েক ঘেরের আড়াই হাত লম্বা একটি মুখ বাঁধা সুপুষ্ট থলেকে বড় সড়ক থেকে মাথা উঁচু করে নেমে আসতে দেখে তৎক্ষণাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। ওটি যাঁর বা কাঁধে চড়ে আসছে তিনি যে আমাদের বামুনদিদি ছাড়া অন্য কেউ নন এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। ওই থলেটি বামুনদিদির স্বহস্তে তৈরী, থলেটি চটের কিন্তু তার ওপর নানা রঙের ছিট দিয়ে অন্তত তিন গণ্ডা তালি লাগাবার দরুন ওটি প্রায় ছিটের থলেতে পরিণত হয়েছে। গঙ্গাস্নানে আসতে যেসব দ্রব্য-সামগ্রী সঙ্গে আনতে হয় সেগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে আনবার জন্যে ঐ থলেটি বামুনদিদি সৃষ্টি করেছেন। কাক পক্ষী মানুষ গরু কেউ ওটির ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। চরাচর অন্তরীক্ষবাসী সবায়ের ছোঁয়া-ন্যাপা এড়িয়ে পাঁচ দিনের পথ বামুনদিদির কাঁধে চ'ড়ে গঙ্গাস্নানে আসে থলেটি। কাজেই পুণ্য কিছু কম সঞ্চয় হয় নি ওর। পুণ্যে বোঝাই থলেটির মর্যাদাও অসামান্য। কাঁধ থেকে নামবার সময় শ্মশান-ভস্মের ওপর গঙ্গা ছিটিয়ে তবে নামানো হবে। তখন ওর পেটের ভেতর থেকে পর পর যা সব বার হবে তাও আমার মুখস্থ হয়ে আছে। প্রথমে বেরোবে গলায় দড়ি বাঁধা একটি পেতলের ঘটি—তারপর বামুনদিদি টেনে তুলবেন দড়ি-বাঁধা একটি ছোট তেলের বোতল। বোতলটিকে নামিয়ে রেখে আবার থলের ভেতর হাত পুরে যে জিনিসটি বামুনদিদি টেনে বার করবেন সেটি একটি ছোট বড় নানা সাইজের পোটলা পুঁটলির মালা। একখানি আস্ত কাপড়ের দশ জায়গায় দশটা পুঁটলি বাঁধা হয়েছে। ওর কোনটিতে কি আছে তাও আমি বলে দিতে পারি। সব থেকে বড়টিতে আছে মুড়ি, তার ছোটটিতে চিঁড়ে, তার পরেরটায় ছাতু। এমনি ভাবে কোনটা থেকে বেরোবে গুড়ের ডেলা, কোনটা থেকে ঝাল লাড়ু। কোনটায় আছে আমচুর, কোনটায় বা খানিক তেঁতুল। সবই গুছিয়ে নিয়ে গঙ্গা-স্নানে আসেন বামুনদিদি। মায় একখানি কুরুনি আর এক মালা নারকেল পর্যন্ত বার হয় তাঁর থলি থেকে। উদ্ধারণপুর ঘাটে বসে আরাম ক'রে নারকেলকোরা-সহযোগে মুড়ি-চর্বণ—এতবড় বাদশাহী বিলাস একমাত্র বামুনদিদির কৃপাতেই সম্ভব হ'ত। কাজেই ওঁর আবির্ভাবে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠতেই হয়।

চাঙ্গা হয়ে ওঠার মত আরও কিছু মাল সঙ্গে আছে বামুনদিদির। কোনও বেটা-বেটীর সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না তিনি। থাকেন না বলেই সারা দেশটার যাবতীয় হাঁড়ির খবর তাঁর বুকের মধ্যে একটি ছোট্ট হাঁড়িতে টগবগিয়ে ফোটে। ফুটলেও কোনও ভাবনা নেই, তেমন বাপের বেটী ন'ন তিনি। তাঁর বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না।

ফোটবার দরকারও করে না তাঁর শ্রীমুখখানি। চক্ষু দু'টি আছে কিসের দরুন তাঁর কপালের নিচে? ওই চক্ষু দু'টির সাহায্যে তিনি যত কথা যত সহজে বলতে পারেন কোনও বেল্লিক-বাচালেও তা বদনের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে না। আমার সামনে পৌঁছেই তিনি তাঁর চোখের তারা দু'টিকে চট করে এমনভাবে ঘুরপাক খাইয়ে দিলেন যে তৎক্ষণাৎ আমার নজর গিয়ে পড়ল সাদা থান-পরা ঘোমটা-টানা আর একটি জীবের ওপর, যিনি ছায়ার মত বামুনদিদির ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ততক্ষণে বামুনদিদির বাঁশীর মত গলাও গিয়ে পৌঁছল শ্মশানের হাড়গুলোর কর্ণবিবরে।

"ওগো ও ভালমানুষের মেয়ে, এই নাও তোমার সাঁইবাবাকে, গড় কর বাপু।" ভালমানুষের মেয়ে বামুনদিদির পাশ দিয়ে এগিয়ে এল। দু'পা এগোতেই একেবারে তিড়বিড়িয়ে উঠলেন বামুনদিদি—"আহা, হা, হা—আবার চললে কোথায় গো আমার মাথা খেতে? উঠবে নাকি গিয়ে একেবারে ঐ মড়ার গদির ওপর? জাত-জন্ম আর থুইও না বাবু। নাও—এখান থেকেই গড় কর, বাবার পাটের সামনে গড় করলেই হবে।"

ঠিক কি যে করতে হবে তা বুঝতে না পেরেই বোধ হয় তিনি অল্প একটু ঘোমটা সরিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন। তিনি চাইলেন আমার মুখের দিকে আর সেই মুহূর্তে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর চক্ষু দু'টির ওপর। শুধু চোখ দু'টিই দেখতে পেলাম আমি এবং তাই যথেষ্ট। যদি চোখের মত চোখ হয় তা'হলে চোখ দু'টিই যথেষ্ট। অন্য কিছু দেখবার প্রয়োজনই করে না।

কিন্তু চোখ নিয়ে আদিখ্যেতা করার সময় নয় সেটা। বামুনদিদি খদ্দের এনেছেন। সুতরাং যেমনই চোখ হোক, চোখের মালিক কিন্তু খদ্দের। এ খদ্দের দাম দেবে, মাল কিনবে। দোকানদার যদি খদ্দেরের চোখ নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ে তা'হলে তার কারবার চলে না।

তাড়াতাড়ি তাঁকে রেহাই দেবার জন্যে বলে উঠলাম—"হয়েছে, হয়েছে, যাও ওধারে বসো গিয়ে। বসে ঠাণ্ডা হওগে যাও।"

ঠাণ্ডা হবার জো কোথায় বামুনদিদি সঙ্গে থাকতে!

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল—"হ্যাঁ, এবার একটু গঙ্গা নিয়ে এস গে তোমার ঘটিতে। এনে বেশ করে ছিটিয়ে দাও ওই ওধারটায়। আমার মাথা খেতে কিছু নামিও না যেন গঙ্গা না ছিটিয়ে। নরক, নরক, ছিষ্টিছাড়া পোড়ারমুখো জায়গায় এমন একটু ঠাঁই নেই যে পা রাখি। হাড়গোড় কাঁথা-কানিতে সব 'থ্যাতোড়' হয়ে রয়েছে, জাত-জন্ম আর রইল না বাপু, কত পাপই যে করে এসেছিলুম মরতে—"

বলতে বলতে বামুনদিদি ডানদিকে খানিক এগিয়ে গিয়ে ডান হাতে কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে সেই থলে কাঁখে নিয়েই ডান ঠ্যাং দিয়ে খানিকটা জায়গা চাঁচতে লাগলেন। তিনিও ততক্ষণে গঙ্গার দিকে পা বাড়ালেন, বোধ হয় গঙ্গা নিয়ে আসতেই গেলেন।

চোখের আড়াল হ'তেই ডিঙি মেরে গলা উঁচিয়ে বামুনদিদি একবার দেখে নিলেন ঠিক নামছে কিনা গঙ্গায়। তারপর ছুটে এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে, দাঁড়িয়ে চোখ দুটিকে অবিশ্রান্ত ঘোরাতে ঘোরাতে ফ্যাস-ফ্যাস করে জানালেন খদ্দেরের পরিচয়।

"পাঁচুন্দির শীলেদের ঘরের ভাগনী। ছুঁড়ীর হাতে ট্যাকা আছে বাপু। একটু খেলিয়ে তুলতে পারলে ভাল হাতে দেবে-থোবে। বড ঘরের বড ব্যাপার,—দেখ —যেন আগে থাকতে ঝুলি ঝেড়ে ভালমানুষ সেজে বোস না। যা দিনকাল পড়েছে।"

ব'লে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার তিন লাফে গিয়ে ঠ্যাং চালাতে লাগলেন।

শ্মশান-ভস্ম উড়তে লাগল বামুনদিদির ঠ্যাং চালাবার চোটে। উড়ে এসে ঢুকতে লাগল আমার চোখে-মুখে। তা থেকে বাঁচবার জন্যে চাদরখানা মুখের ওপর টেনে দিলাম।

মুখ ঢাকা পড়লেও কিন্তু মন ঢাকা পড়ল না। মনের মুখে ছাই লাগে না। মনের চোখে পর্দা নেই। সেই বেপর্দা মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম দুটি চক্ষু। চক্ষু দুটিতে অস্বাভাবিক লম্বা পল্লব। আর সেই পল্লব-ঘেরা চোখের মাঝে যেন ডুব দিয়ে রয়েছে কত কথা—কত কাহিনী। নিমেষের জন্যে সে চোখের সঙ্গে আমার চোখ মিলেছিল। নিমেষের মধ্যে সেই চোখ দু'টি স্পষ্ট বললে যেন—

কি বললে?

আমাকে কি বলতে চায় সেই চক্ষু দু'টি? কি শোনাতে এসেছে আমায়?

যা শোনাতে চায়, তা ত আমার জানা। দাম দেবে তার বদলে এমন কিছু পাবে আমার কাছে, যা দিয়ে মূল্য শোধ করবে নিজের নিয়তির। ক্ষণিকের

দুর্বলতার সুযোগে যে নিয়তি মস্ত বড় পাওনাদার সেজে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার দেনা শোধ করবার জন্যেই ত ওরা আসে আমার কাছে। এ ত অতি সাদাসিধে কারবার। কিন্তু কই? আজ পর্যন্ত বামুনদিদি যত খদ্দের এনেছেন, তাদের কারোও চোখে কখনও দেখি নি ও-জাতের দৃষ্টি। নির্লজ্জ লালসায় লালায়িত কসাইয়ের চোখের নির্বিকার নিষ্ঠুরতা যেন ছোবলাতে এসেছে সে-সব চোখ থেকে। সে-সব চোখ যেন চিৎকার করে বলতে চেয়েছে—দাম দিয়ে মাল কিনতে এসেছি—সুতরাং খাতির কিসের? কিন্তু এ চোখ দু'টি যেন অন্য সুরে কথা বললে। বললে—দিতেই এসেছি, দিতে পেলে বাঁচি। নিতে আসি নি কিছুই। কাজেই ভয় নেই আমার কাছে।

তাঁর কাছে ভয় না থাকলেও বামুনদিদির রসনাকে ভয় করে না এমন কেউ আছে নাকি জগতে! বামুনদিদির আবির্ভাবে শ্মশানের হাড়গোড় শেয়াল-শকুনগুলোও তটস্থ হয়ে ওঠে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ কে জানি গিয়ে পড়ল বামুনদিদির পা দিয়ে ঝাঁটানো পবিত্র এলাকায়। রৈ রৈ করে উঠলেন তিনি।

"দূর, দূর—দূর হয়ে যা চুলো-মুখোরা। মরতে আবার এখানে আসা হচ্ছে কেন? নাথি মেরে মুখ ভেঙে দেবো একেবারে।"

তাড়াতাড়ি মুখের ওপর থেকে চাদর নামিয়ে চেয়ে দেখলাম, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে একটা কুকুর। ওধারে যারা তিনটে চিতার পাশে কাজে ব্যস্ত ছিল তারা খোঁচাখুঁচি থামিয়ে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে বামুনদিদির দিকে। ইতিমধ্যে গঙ্গা এসে পৌঁছে গেলেন। সেই সুরেই বামুনদিদি হুকুমজারি করলেন—"নাও গো নাও। এবার বেশ ক'রে গঙ্গাটুকু ছিটিয়ে দাও এই ঠাঁইটুকুতে। জাত-জন্ম আর রইল না মা—পাঁচ আবাগীর জন্যে। এই জন্যেই বলে—ভাল করতে যেতে নেই মানুষের। পাঁচ আবাগীর পাল্লায় পড়েই এই হাড়ী ডোমের হাল হয় আমার থাকতেও পারি নে মানুষের চোখের জল দেখে, তাই এই নরকে মরতে এসতে হয়।"

বলতে বলতে তাঁর নজর প'ড়ে গেল আমার দিকে। পড়লেন আমায় নিয়ে।

"আর ঐ মুখপোড়া মড়া চড়ে বসে আছে মড়ার কাঁথার পাঁজা সাজিয়ে। মরতে আর ঠাঁই মেলে না ওর। যত বলি, কেন রে বাপু, ভূ-ভারতে কি আর মরবার জায়গা জুটবে না নাকি? এই ত প'ড়ে রয়েছে বাটোয়ার কালীবাড়ী। সেখানে ব'সে থাকলে কি ভাত জুটত না? চলুক ত দেখি আমার সঙ্গে সেখানে। দেশসুদ্ধ সব মড়াকে এনে যদি জমা না করতে পারি ওর পায়ের তলায় ত আমি দেশো ঘোষালের বেটীই নই।"

ব'লে দেশো ঘোষালের বেটী নামালেন তাঁর মোট গঙ্গা-ছিটানো জায়গায়।

নামিয়ে তৎক্ষণাৎ খুলতে বসলেন থলের মুখের বাঁধন। তাঁর নিজের মুখের বাঁধন ত খোলাই রয়েছে, কাজেই তা থেকে অনর্গল ছিটকে বেরোতে লাগল বচনসুধা।

"থ্যাংরা মারি নিজের কপালে মা, থ্যাংরা মারি সেই বিধাতা পুরুষের কপালে, যে আমায় গড়েছিল। রাজার তুল্য বাপ-ভাই সব খেয়ে এই বয়সে এখন লোকের থ্যামজুৎ খেটে মরছি। নয়ত আজ আমার অভাব কিসের? পোড়ারমুখো যমের মুখেও থ্যাংরা মারি, এত লোককে মনে পড়ে আর আমায় ভুলে বসে আছেন চোখ্খেকো যমে।"

বলতে বলতে থলের মুখ খুলে বার ক'রে ফেললেন তাঁর ঘটি আর তেলের শিশি। সে দু'টো দু'হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে পড়ল যে কিছু পবিত্র কাঠ প্রয়োজন। বামুনদিদির চায়ের নেশা আছে। জল গরম করতে গেলে কাঠ চাই। অথচ শ্মশানময় যত কাঠ পড়ে আছে তা তিনি ছোঁবেনও না। এ সমস্ত মড়াপোড়া কাঠ বাঁশে তাঁর জল গরম হতে পারে না। কাজেই চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে হাঁক ছাড়লেন—"ও বাবা হরিপাল, ওরে ও হরিবংশ, বলি গেলি কোন্ চুলোয় রে?"

এক বোঝা কাঠ কাঁধে নিয়ে রামহরি আসছিল। কাঁধে কাঠ নিয়েই জবাব দিলে, "হেই—বামুনদিদি লয় গো। এসো গো দিদি ঠাকরুণ। দাঁড়াও—আসছি কাঠ-বোঝা লামিয়ে।"

ফোকলা মুখে এক গাল হেসে বামুনদিদি বললেন—"এস ভাই, এস। কাঠ নামিয়েই এস। আমি ততক্ষণ একটা ডুব দিয়ে আসি। তা ভাই দু'খানা সরু কাঠের ফালি আর পাকাটিও এনে দিস তোর ঘর থেকে। ক'রে মরেছি মুখপোড়া নেশাটা। ডুব দিয়ে এসে একটু গরম জল মুখে না দিলে আবার মাথা ধরবে।"

সামনে দু'পা এগিয়েই আবার ফিরে দাঁড়ালেন দিদি। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল যে সঙ্গিনী তখনও একভাবে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে তাঁর পিত্তি জ্বলে উঠল।

"বলি, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি গো তুমি? ঢের হয়েছে, আর নজ্জা দেখাতে হবে না এখেনে। এখন কাপড়-চোপড় থুয়ে তেল দাও মাথায়। আর নজর রেখো চারদিকে, শেয়াল-কুকুর না এগোয় এদিকে। ডুবটা দিয়ে আসি আমি, তা'পর তুমি যেও।"

কয়েক পা গিয়ে আবার একবার পেছন ফিরে সাবধান করলেন—

"মুখের কাপড় তুলে একটু চোখ চেয়ে থেকো বাপু। আমি এই গেলুম আর এলুম বোলে—এর মধ্যেই যেন মাথা খেয়ে না যায় আমার কেউ।"

মড়ার কানি পোড়াকয়লা হাড়গোড় এসব বাঁচিয়ে লাফাতে লাফাতে দিদি নেমে গেলেন গঙ্গায় এবং তৎক্ষণাৎ "তিনি" ফিরে দাঁড়ালেন আমার দিকে। দাঁড়িয়ে তাঁর আঁচলের খুঁট মুখে তুলে দাঁত দিয়ে গিঁট খুলতে লাগলেন। সামান্য সময় লাগল গিঁট খুলতে, কি একটা ছোট্ট সাদা-মত বস্তু বার হল। সেটা নিয়ে ত্রস্তপদে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। তখন দেখলাম তাঁর মুখখানি। কাঁচা, একদম কাঁচা এ মুখ। এ মেয়ে মেয়েই আছে এখনও, নারী হয়ে উঠতে পারে নি।

নারীর কণ্ঠ নয়, মেয়ের কণ্ঠই কানে গেল আমার। এতটুকু জড়তা নেই, সঙ্কোচ নেই, নেই ছিটে-ফোঁটা খাদের মিশ্রণ। দুঃখ-লজ্জা হা হুতাশ মেশালে যে খাদের সৃষ্টি হয় তার এতটুকু ছোঁয়াচ নেই সে স্বরে। তার বদলে যেন কানে গেল আমার স্কুল-পালানো দুষ্টু মেয়ের গলার স্বর।

"এই কাগজখানা প'ড়ে দেখুন তাড়াতাড়ি। রাঙা দিদি আমাকে আসতে বলেছেন আপনার কাছে।"

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"রাঙা দিদি! কে তোমার রাঙা দিদি?"

চট ক'রে একবার পেছন দিকে চেয়ে নিয়ে বললে, "বোষ্টমী দিদি। তিনি আমাকে বলেছেন আপনার কাছে আসলেই—" হঠাৎ চুপ করল। মুখখানিও নিচু হয়ে পড়ল। এক ঝলক রক্তও যেন ছুটে এল চোখে-মুখে।

বললাম—"আচ্ছা ভাই, পড়ব তোমার চিঠি। এখন যাও তুমি। খুব সাবধান —বড় ভয়ানক লোক উনি, যাঁর সঙ্গে এসেছ এখানে।"

মুখ তুলে বললে—"যখন যাব আপনার পায়ের ধুলো নোব কিন্তু। একটিবার নেমে দাঁড়াবেন।" বলে আর দাঁড়ালো না, কাক শকুন তাড়াতে ছুটল বামুনদিদির পোঁটলার ওপর থেকে।

চেষ্টা ক'রে কাগজখানির ভাঁজ খুলতে হল। গদির ওপর মেলে হাত দিয়ে চেপে যতটা সম্ভব সোজা করলুম কাগজখানি। পেন্সিলের লেখা, অপটু হাতের মেয়েলি টান। একটু একটু ক'রে পড়তে হল। একবার দু'বার তিনবার পড়লাম আগাগোড়া। তারপর মুখ তুলে দেখলাম। বামুনদিদি তখনও ফেরেন নি, মেয়েটি এধারে পেছন ফিরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

চাপা গলায় ডাক দিলাম—"সুবর্ণ!"

ঘুরে দাঁড়ালো। চেয়ে রইল আমার দিকে।

বললাম—"কিন্তু কে এই লোকটি—ঠিক চিনতে পারছি না ত।"

মুখ নিচু ক'রে সেও চাপা গলায় জবাব দিলে—"ঐ যে আপনার কাছে আসে, দাঁত উঁচু—"

প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলাম—"কার কথা বলছ তুমি? খন্তা! আমাদের খন্তা ঘোষ?"

সঙ্গে সঙ্গে ঝট্ ক'রে মেয়েটি পেছনে ফিরল। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলাম ওর পেছন দিকে। দূরে বামুনদিদির গলা শুনতে পেলাম। মা গঙ্গার বাপের শ্রাদ্ধ করতে করতে উঠে আসছেন।

"গড় করি এমন মা গঙ্গার খুরে। খুরে খুরে গড় করি মা তোমায়। কত পাপ করলে তবে লোকে গঙ্গা নাইতে আসে এখানে। যত বার ডুব দি, ততবার একটা ছাইভস্ম ভেসে উঠবেই মুখের কাছে। খ্যাংরা মারি এমন গঙ্গা নাওয়ার মাথায়।"

তাডাতাড়ি কাগজখানা লুকিয়ে ফেলে একটা বোতল টেনে তুললাম গদির পাশ থেকে। গলায় একটু না ঢাললে মাথাটা ঠিক সাফ হচ্ছে না।

খন্তা ঘোষ!

ময়নাপাডার বড ভাই, দাঁত-উঁচু লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে খন্তা ঘোষ! খন্তা ঘোষ উডনচণ্ডে বেপরোযা বাউণ্ডুলে বাউল। যার মাথায় তেল পডে না কখনও, তেল না পডলেও যে মাথার মধ্যে হাজারো রকম ফন্দি-ফিকির সদাসর্বদা কিলবিল করছে। ঝুঁকি যাতে নেই তেমন কাজে হাতে দিতে যার ঝোঁক চাপে না কিছুতে। সেই খন্তার মাথার মধ্যে এ হেন একটি স্বর্ণ-পোকা ঘুরঘুর করছে—এ কি কস্মিন-কালেও কল্পনা করতে পেরেছি!

কিন্তু এ ত কল্পনা নয়, এ হয়ত সত্যিও নয়। এ শুধু স্বপ্ন। উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন। উদ্ধারণপুরের জাত-জালিকের আসমানী জালে ধরা পড়েছে খন্তা ঘোষের স্বর্ণ-মাছ। মানুষের মাথার খুলিতে ছেঁদা ক'রে তাতে মেয়েমানুষের বুকের একটি নরম হার পরিয়ে যে টাকু তৈরী হয়, সেই টাকুতে সুতো পাকায় উদ্ধারণপুরের স্বপন-জেলে। বিশ্রী জট পাকানো সে সুতোয়, মগজ থেকে সে সুতো বার হয়। খন্তা ঘোষের রুক্ষ মাথার মধ্যে যে মগজ আছে তা থেকে বার হয়েছে যে সুতো, সেই সুতোয় বোনা জালে বাঁধা পড়েছে এই সোনালী মাছটি।

কিন্তু থাকবে না, থাকতে পারে না, স্বপন-জেলের জালে বাঘা বোয়াল থেকে

চুনো পুঁটি কিছুই আটকে থাকে না।

তাই খন্তা ঘোষ ছুটে বেড়ায়। ছুটে যায় আবার ছুটে আসে। থামতে পারে না কোথাও। খন্তা ঘোষের জীবনসঙ্গীতে সমের মাথায় তেহাই পড়ে না কখনও।

কিন্তু করব কি আমি? কি কাজের ভার দিয়েছে আমায় নিতাই? এই বিশ্রী জট আমি খুলব কেমন ক'রে।

কাগজখানা থেকে যেটুকু জানতে পেরেছি তার বেশী আরও একটু কিছু জানবার জন্যে মুখ তুলে হাঁ করলাম। টপ্ ক'রে হাঁ বন্ধ করতে হ'ল। বামুনদিদি সংসার পাতছেন। কানে গেল তাঁর মন্ত্র পাঠ।

"মুড়ো জ্বেলে দি মানুষের নজরে। একেবারে চড়ুই পাখীর নজর গা। বলে—লোকের বেলায় সওয়া হাত গলা, নিজের বাপের ছরাদ্দে একটা পচা কলা। এই তোর হাতে উঠল লা হারামজাদী! যার দৌলতে আজ ডগডগে সিঁদুর কপালে দিয়ে সতী সেজে সোয়ামীর পাশে শুড্ছিস, তাকে পূজো দিতে গিয়ে এই তোর হাতে উঠল লা বোনাই-ভাতারী! মুড়ো জ্বেলে দিতে হয় এমন হাড়-হাবাতে নজরের মুখে। তা আমার আর কি, যা পাঠিয়েছে আমার হাতে তাই ত আমি দিয়ে যাব। আমার আর কি, আমি ত ব'য়ে আনবার বাঁদী। গদির ওপর ব'সে ভালমানুষি ফলিয়ে একেবারে উজোড় করে দিয়ে বসলে এই রকম ত হবেই। গলা দিয়ে একবার উল্‌লে মানুষের আর মনে থাকে নাকি কিছু? ব'লে—নেবার বেলা ছিনে জোঁক, দেবার বেলা পুত্রশোক!"

বলতে বলতে বামুনদিদি উঠে এলেন। কাছাকাছি এসে আমার গদির ওপর ছুঁড়ে মারলেন একটা পুঁটলি। এতটুকু একখানি গামছায় বাঁধা কয়েক মুঠো চাল আর বোধ হয় দু'টো আলু-কচুও আছে ওর মধ্যে। গদির এক হাত সামনে ন্যাকড়া-জড়ানো একটা বোতল টিপ ক'রে নামিয়ে দিয়ে গজরাতেই লাগলেন তিনি।

"এই নাও ভাই, তোমার পূজো নাও। যা তোমার পোড়া কপালে আছে তাই ত পাবে। আমি মাথা খুঁড়ে ম'লে হবে কি, তোমার কপালের দুঃখ খণ্ডাবে কে? ওমা, মানুষ নিয়ে আসি আমি, তা আমার সঙ্গে দু'টো শলাপরামর্শ করার ফুরসৎ হয় না তোমার। উনুন-মুখীদের চোখে জল দেখেই তুমি ম'জে যাও, আর হাত তুলে থপ ক'রে যাকে যা খুশি দিয়ে হাত ধুয়ে ব'সে থাক। এখন এই ধর— দু'বছর হাঁটাহাঁটি ক'রে ঐ আদায় করেছি। পাঁচ সিকে বেঁধে দিয়েছে ঐ টেনাখানার খুঁটে। আর এই তোমার বোতল। সেই বোনাই এখন ভাতার

হয়েছে, কোল জোড়া ছেলে, এখন তুমিই বা কে—আমিই বা কে ?"

ভয়ে ভয়ে একান্ত কুণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করলাম—"এ আবার কে দিদি, মনে পড়ছে না ত !"

দিদি একেবারে ছু'হাত ঘুরিয়ে নৃত্য জুড়ে দিলে—"মনে তোমার পড়বে কেন ভাই ? মনটি কি তোমার আছে এখেনে ? সে পদার্থটুকু ত চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে সেই চলানী। সাত দোর যে বাজিয়ে বেড়ায় তার রাঙা পায়ে মনটি 'সমপ্পণ' ক'রে ত তুমি যতুর হয়ে বসে আছ। যাও না যাও, একবার দেখে এস গিয়ে মালিপাড়ার জমিদার বাড়ীতে। তোমার মন-কেড়ে-নেওয়া সেই সাধের বোষ্টমীর রূপে এখন মালিপাড়া ঝলসে যাচ্ছে যে। মা ম'ল ! মায়ের 'ছরাদ্দ'টা চোকবারও তর সইল না। অমনি সেঁধুলো গিয়ে সেখেনে। আর সেই মুসকো মিন্‌ষে বোষ্টমটা, সেটা প'ড়ে প'ড়ে লাথি খাচ্ছে বাবুদের দরজার বাইরে। তুমিও যাও না কেন, গিয়ে মাথা খুঁড়ে মর গে বাবুদের দারোয়ানের ছিচরণে। শুধু সোনার পিত্তিমে ছাড়া আর কার কথা কবে মনে পড়েছে তোমার ? এই যে আমি মরি তোমার জন্যে, আমার কথাটাই বা কবার মনে পড়ে তোমার ভাই ? সেবার কত বুঝিয়ে পড়িয়ে সেই হারাণীকে আনলুম। বড় বোন মরতে বোনায়ের ঘরে গেল ভাত-জল দিতে। ভাত-জল দিতে দিতে একেবারে তিন মাসের ছেলে পেটে নিয়ে ফিরল। বোনাই নাথি মেরে খেদিয়ে দিলে। তখন এই দেশো ঘোষালের বেটী ছাড়া আর গতি নেই। তা আমি আনলাম এক কথা বোলে, উনি দিলেন উলটো মন্তর। দিলেন এক মাদুলী ছুঁড়ীর হাতে বেঁধে বিনি পয়সায়। সোহাগ দেখিয়ে আশীর্বাদ করা হল আবার—সোয়ামী পুত্তুর নিয়ে সুখী হও গে মা। সুখীই হয়েছে, সুখের পাঁচ-পা দেখেছে একেবারে। সেই বোনাই এসে সিঁদুর পরিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। সেই ব্যাটাই এখন কোল-জোড়া হয়ে বেঁচে রয়েছে। আমে-দুধে মিশে গেছে, আঁটিটা আস্তাকুঁড়ে প'ড়ে বকাচ্ছে।"

হঠাৎ ওধারে নজর গিয়ে পড়ল বামুনদিদির। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে উঠলেন—"হুস, হুস, দুর দুর, ঝেঁটা মার মুখপোড়াদের মুখে।" ছুটে গিয়ে পড়লেন তাঁর পোঁটলার কাছে। ছু'টো কাক চক্রাকারে উড়তে লাগল তাঁর মাথার ওপর।

চুপি চুপি নেমে গেলাম গদির পেছন দিয়ে।

আকন্দ ঝোপের আড়াল দিয়ে ঘুরে গঙ্গায় গিয়ে নামলাম। কৈ ? কোথায় গেল সে ?

একগলা জলে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে ছু'হাত জোড় ক'রে সুবর্ণ প্রণাম করছে।

চোখবোজা মুখখানির দিকে চেয়ে খন্তার মুখখানাও চোখের ওপর ভেসে উঠল। সেই দাঁত বার করা শ্রীহীন মুখে, সেই বেপরোয়া বেহায়া চোখ দু'টোর মধ্যে যে কি রহস্য লুকিয়ে থাকে এতদিন পরে তার হদিস পেলাম। উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন, খন্তার চোখে উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন। এতকাল পরে সেই স্বপ্ন সশরীরে এসে দাঁড়িয়েছে উদ্ধারণপুর ঘাটের একগলা জলে। নিতাই পাঠিয়েছে একে আমার কাছে। এখনও তা'হলে নিতাই বিশ্বাস করে যে আমার মধ্যে মানুষ একটা বেঁচে আছে, যে মানুষ মানুষের সুখে-দুঃখে-বেদনায়-দুর্বলতায় জেগে উঠতে পারে। বড় বেশী বিশ্বাস ক'রে ফেলেছে আমাকে নিতাই, এত ঠকেও তার বিশ্বাস করা রোগটা গেল না।

আরও খানিক জলে গিয়ে সামনে থেকে ডাক দিলাম—"সুবর্ণ ?"

চোখ চেয়ে হকচকিয়ে গেল।

বললাম—"মন দিয়ে শোন। ওষুধ তোমায় খাইয়ে দোব আমি। বিশ্বাস ক'রে চোখ বুজে হাঁ করবে। কিছুই হবে না তোমার। এক মাস অন্তত আমায় সময় দাও। খন্তা যাবে তোমার কাছে। গিয়ে তোমায় নিয়ে আসবে। তোমাদের বিয়েতে আমি মন্ত্র পড়াব। তারপর তোমাদের বাড়ী হ'লে এক কোণায় একখানা ঘর তুলে দিও আমায়। সেই ঘরে গিয়ে আস্তানা গাড়ব। শেষ দিন ক'টা কাটাব তোমাদের কাছে।"

চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল মেয়েটার। ঠোঁট দু'খানি কাঁপতে লাগল থর থর করে। বার বার জোড় হাত কপালে ঠেকাতে লাগল।

বললাম—"উঠে যাও এবার।" ব'লে এক ডুবে অনেকটা পার হয়ে গেলাম। বলা যায় না—বামুনদিদির শ্যেনদৃষ্টি পড়ছে কিনা আমার ওপর কোনও ঝোপের আড়াল থেকে।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

ঘাটের কালো মাটি ধুয়ে নিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। কালো মাটি আর কালো কয়লা, এই দিয়ে উদ্ধারণপুরের শ্মশান তৈরী। কত যুগ ধরে কালো এসে জমা হচ্ছে এখানে। সে কালোয় কিছু ফলে না। যা ফেলা যায়—তাই যায় জ্বলে। বীজ জ্বলে গেলে অঙ্কুরিত হবে কি ?

নিতাই পাঠিয়েছে এ বীজ। স্থির বিশ্বাসে পাঠিয়েছে যে আমি পারব। পারব এ বীজ অঙ্কুরিত করতে। তাই আজ গঙ্গায় নামলাম। কত কাল! কত যুগ-যুগান্ত পরে আজ শীতল হবার জন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি গঙ্গায়।

। কলুষনাশিনী মা গঙ্গা। সকলের সব জ্বালা জুড়িয়ে শীতল ক'রে দেন। আমার জ্বালাও নিশ্চয়ই জুড়িয়ে যাবে। না জুড়োলে যা ছোঁব এ হাত দিয়ে তাই যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। এই জ্বলন্ত স্পর্শ নিয়ে কি ক'রে হাত দোব আমি কোনও কিছুতে? তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছি গঙ্গায়।

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল যে গঙ্গাজলে তর্পণ করলে দেবলোক পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন হয়। আচ্ছা—জ্যান্ত মানুষের হয় না? ইহলোকের কাউকে তুষ্ট করতে হ'লে তিন আঁজলা গঙ্গাজল দিলে হয় না?

হোক না হোক, দিতে দোষ কি? দিয়েই দেখি!

এক গলা জলে দাঁড়িয়ে তিন আঁজলা জল দিলাম। মনে মনে বললাম—"তুমি তৃপ্ত হও। সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাক তোমার। যেখানে থাক শান্তি পাও। যে ভার দিয়েছ তুমি আমায়—তার মর্যাদা আমি রাখবই প্রাণপণে। তুমি তৃপ্ত হও।"

উদ্ধারণপুরের কল্পনা।

শ্রীমতী কল্পনা দেবী উদ্ধারণপুরের শ্মশানের চিতা-লক্ষ্মী। আদর্শ গৃহলক্ষ্মীদের মন শ্মশানলক্ষ্মীও মশগুল হয়ে থাকেন নিজের শ্মশান-সংসার নিয়ে। অভাব অনটন বলতে কোনও কিছু নেই তাঁর গোছানো সংসারে। ভাঙা হাঁড়ি কলসী আর ছেঁড়া চট কাঁথা মাদুরে তাঁর সোনার সংসার বোঝাই। নেই যা তাঁর—তা হচ্ছে একটু শান্তি, এক ছিটে স্বস্তির হাওয়া পেলে তিনি নিশ্বাস নিয়ে বাঁচেন। কিন্তু উপায় নেই, কালশত্রু বাসা বেঁধেছে তাঁর হৃৎপিণ্ডে, রাজযক্ষ্মায় ধরেছে বেচারাকে। শঙ্কা আর সন্দেহ—এই দুই মারাত্মক জীবাণুতে ঝাঁজরা করে দিচ্ছে তাঁর ফুসফুসটা, কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁর কলিজাখানা। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে তাঁর, কালো রক্ত। হিংসার বিষাক্ত পুঁজ মেশানো বলেই অত কালো রক্ত উঠছে তাঁর মুখ দিয়ে।

উদ্ধারণপুরের কল্পনা।

কল্পনা শ্মশান-বধূ—উদ্ধারণপুর থেকে উদ্ধার হবার পথ খোঁজে। পথ খোঁজে আর কাঁদে। কাঁদে আর মাথা খোঁড়ে। বৃথা প্রতীক্ষায় বসে বসে দিন গণে। উদ্ধারণপুর ঘাট থেকে উদ্ধার হবার পথ খুঁজে পায় না।

কিন্তু উদ্ধারণপুর ঘাটের দিন হল ওস্তাদ জাদুকর। তার ওস্তাদি চালের প্যাঁচে কল্পনা-বউ কান্না ভুলে যায়। মনে থাকে না তার বুকের জ্বালা-যন্ত্রণা। চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়ে সাজে-গোজে, পোকায় খাওয়া বুকে জোর ক'রে শ্বাস নিয়ে

আবার ঘর-গৃহস্থালীতে মন দেয়, সাদা হাড় আর পোড়া কয়লার সংসারে নিজেকে রাজরাজেশ্বরী জ্ঞান ক'রে নিজের মনের পর্দায় রঙের পর রঙ চড়ায়।

উদ্ধারণপুরের কল্পনা।

কল্পনা জানে পথ চেয়ে থাকতে। পথ চেয়ে থাকে আর ধুঁকে মরে। ধুঁকতে ধুঁকতে আরও ধোঁকায় পড়ে যায় হতভাগী। পোড়া কাঠ আর পোড়া হাড়ের পোড়া প্রবঞ্চনায় আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। শেষে একদিন খুব ভোরে সব জ্বালা পোড়ার অবসান হয়ে যায়। সন্দেহ আর সংশয়ের দংশন-জ্বালা আর থাকে না, থাকে না নিজেকে ধোঁকা দেবার কুৎসিত হ্যাংলাপনার প্রয়োজন। তার বদলে এ রোগের যা অনিবার্য উৎসর্গ, তাই এসে দেখা দেয়। বিকট হাঁ করে একেবারে গিলে খেতে আসে কল্পনাসুন্দরীকে। রাগ এবং ঘৃণা এই দুটি নতুন উপসর্গ জুটে—কল্পনার ভাঙা শরীর ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে দেয়।

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় উদ্ধারণপুর ঘাটের নির্বিকার নির্মমতা। পোড়া কাঠ আর কালো কয়লা, সাদা হাড় আর ঘোলা গঙ্গার জল, সবাই একদিন খুব ভোরে সচকিত হয়ে ওঠে। দোলা লাগে স্বপন-জেলের বুকে আর কল্পনা-বঁধুর মাথার মধ্যে। কান পেতে স্থির হয়ে শুনতে থাকে সকলে—

"দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গিয়ে আর পেলাম না॥"

'গুব-গুবা-গুব' ক্রমেই এগিয়ে আসে।

কিন্তু খঞ্জনী কই? 'রিন্-টিনি টিন্' উত্তর দিচ্ছে না ত 'গুব্-গুবা-গুব্' এর সঙ্গে। এ কি রকম সঙ্গীত? যেন লবণহীন বিস্বাদ ব্যান্নন, একটু মুখে দিলেই গা বমি বমি করে। উঁকি উঠে উগরে দিতে চায়।

তবু কান পেতে থাকি, তখনও সামান্য এতটুকু ক্ষীণ আশা, নিজেকে নিজে প্রবোধদানের নির্লজ্জ বেহায়াপনা। কানে আসে—

"সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ঘুরিতেছি পাগল হয়ে,
মরমে জ্বলছে আগুন আর নিভে না।
ওগো তারে আমার আমার মনে করি,
সে যে আমার হয়ে আর হোল না॥"

দূর, দূর, দূর হয়ে যা আপদ। লজ্জা করে না আবার এখানে তোর ঐ কালা মুখ দেখাতে? মরমে আগুন জেলে "গুব্-গুবা-গুব্" বাজিয়ে ন্যাকাপনার গান গেয়ে বেড়ানো হচ্ছে। অমন মরমের আগুনের মুখে ছাই তুলে দিতে হয়। কেন

—আগুন নেই নাকি উদ্ধারণপুরের ঘাটের কোনও চুলোয় ? যা না, চ'ড়ে বস্ না, গিয়ে তোর "গুব্-গুবা-গুব্" সুদ্ধ একটা জলন্ত চিতার ওপর। একেবারে খতম হয়ে যাক তোর ঐ পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ানো! অক্ষমের ঠুঁটো হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে যাওয়ার ধাষ্টামো ছাই হয়ে যাক—উদ্ধারণপুরের অনির্বাণ আগুনে।

"দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গিয়ে আর পেলাম না॥"

এসে পড়েছে। নিমগাছটা পেরিয়ে এলেই দেখা যাবে তাকে। শুধু তাকে, সেই কষ্টি পাথরে কোঁদানো মোষের মত নিরেট পিণ্ডটাকে। দরকার নেই দেখবার, এতটুকু প্রয়োজন নেই আমার, তোর ঐ কুৎসিত লেংচানো নাচ-দর্শনের। ইচ্ছে করে, এক হেঁচকায় ঐ 'গুব্-গুবা-গুব্'টা কেড়ে নিয়ে ওর ওই চুড়ো-বাঁধা মাথার ওপরেই আছড়ে ভাঙতে।

এসে পড়ল। চোখ বুজে লেংচাতে লাগল হেলে দুলে ঠিক আমার চোখের সামনে। আর সহ্য হল না, আমিও চোখ বুজে ফেললাম।

কিন্তু কান দুটো ত আর বোজা যায় না। কাজেই বিষ ঢালতে লাগল আমার এক জোড়া খোলা কানে।

"পথিক কয় ভেব না রে ডুবে যাও রূপ-সাগরে
ডুবিলে পাবে তারে আর ভেব না,
ওগো এবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিও না॥"

কি বললে!

বলছে কি ও?

"ওগো এবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিও না॥"

আর রুখতে পারলাম না নিজেকে। চোখ বুজে বসে থাকার সাধ্য হল না আর। অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বার হ'ল একটা প্রকাণ্ড চিৎকার।

"চরণদাস বাবাজী!"

"গুব্-কটাং" ক'রে একটা উদ্ভট রকমের আওয়াজ হল। ছিঁড়ে গেল "গুব্-গুবা-গুব্"-এর তারটা। তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হল চরণদাসের চরণ। বোকার মত চেয়ে রইল সে আমার মুখের দিকে।

আগুনের হল্কার মত এক ঝলক শব্দ বার হ'ল আমার মুখ থেকে।

"কোথায় সে? কোথায় রেখে এলে তাকে?"

খুব হাল্কাভাবে, যেন বেশ একটা মজার খবর শোনাচ্ছে, সেইভাবে অতি প্রশান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে বাবাজী।

"চলে গেছে গোসাঁই।"

কঠিনতর কণ্ঠে প্রায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায়?"

"জানি নে ত গোসাঁই, বাবুর কাছে খোঁজ করবার চেষ্টা করলাম। দারোয়ানেরা গেট পার হতে দিলে না।"

দম বন্ধ হয়ে আসবার যোগাড় আমার তখন। তবু অন্তিম চেষ্টায় মুখ দিয়ে বার করলাম—"কে সে? কোন্ বাবু?"

হেসে ফেললে চরণদাস। পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললে বাবাজী—"ঐ যে সেই বাঘ! সেই যে সেদিন শুনলে না—গেয়েছিলাম—

"ও বাঘের চোখে হলে দেখা
নিশ্চয়ই মরণ লেখা গো—"

প্রচণ্ড ধমক দিলাম একটা—"চুপ থামাও তোমার ন্যাকাপনার গান, আমি শুনতে চাই, কি ক'রে আবার দেখা হল তোমাদের সেই লোকটার সঙ্গে? কোথায় দেখা হল? কবে দেখা হল? সব বলতে হবে তোমায় এখনই।"

উল্‌টো প্রশ্ন ক'রে বসল বাবাজী অতি করুণ কণ্ঠে—"ব'লে আমার কি লাভ হবে গোসাঁই? শুনেই বা তোমার এমন কি লাভ হবে এখন?"

ওর ওই মালা-তিলকের মোলায়েম নির্লিপ্ততা সহ্যের সীমা পার হয়ে গেল। হন্যে কুকুরের মত ছিটকে পড়লাম গদির ওপর থেকে। দু'হাতে চেপে ধরলাম ওর গলা।

প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিতে দিতে দাঁত কড়মড় ক'রে বললাম—"বল্, বল্ শিগ্‌গির, বলতেই হবে তোকে সব কথা—বল্—বল্—"

চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসবার যোগাড় হল বাবাজীর। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত, বাদ্য-যন্ত্রটা আছড়ে পড়ল তার হাত থেকে, দু'হাত দিয়ে ধরলে আমার দুই কব্জি। সঙ্গে সঙ্গে মড়মড় ক'রে উঠল আমার কব্জির হাড়, খ'সে এল আমার হাত দু'খানা ওর গলা থেকে। হয়ত একটা আর্তনাদও ক'রে উঠলাম আমি।

হাঁপাতে হাঁপাতে খুব মিনতি ক'রে বললে চরণদাস—"যাও গোসাঁই, বস গিয়ে তোমার ঐ মড়ার গদির ওপর চেপে। বলছি—বলছি আমি তোমায় সব কথা। আমার গলা টিপে ধরলে কি লাভ হবে বল এখন! এ গলা দিয়ে বহুবার আমি

তোমায় সাবধান করেছিলাম, তখন কেন তোল নি আমার কথা কানে ?"

ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কব্জিখানা ডলতে ডলতে বেদনা-বিকৃত গলায় বললাম—"কি বলেছিলি ? বলেছিলি কি আমায় তখন ?"

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে চরণদাস—"বলি নি তোমায় ? পায়ে ধরে সাধি নি তোমায় আমাদের সঙ্গে যেতে ? ঐ মড়ার গদির মায়া কিছুতে কাটাতে পারলে না গোসাঁই, কিছুতে টললে না তখন। আজ তোমার মাথায় খুন চাপল। কি লাভ হবে এখন আমায় খুন করলে বা নিজে খুন হ'লে ?"

মাথা নিচু ক'রে ফিরে গিয়ে বসলাম আমার গদির ওপর। মড়ার বিছানায় মরা মর্যাদার মাথা হেঁট হয়ে গেল। মুখ তুলে চাইবার উপায় নেই আর। পায়ে ক'রে বাদ্য যন্ত্রটা একধারে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এল চরণদাস। গদি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রায় ফিসফিস ক'রে বলতে লাগল—

"সে গেছে, তার জন্যে আমায় দায়ী করছ কেন গোসাঁই ? আমার সঙ্গে কি এমন সম্বন্ধ ছিল তার যে তাকে বাধা দোব ? কি এমন সম্পদ আছে আমার, যা দিয়ে তাকে বেঁধে রাখব ? সেই রাত্রে, যখন জানতে পারলাম দারোগা ছিনিয়ে নিতে আসছে ওকে, তখন আমিই গঙ্গার ভেতর দাঁড়িয়ে কচি ছেলের কান্না কেঁদে-ছিলাম। আমাদের মধ্যে যড ছিল, ঐ কান্না শুনলে বুঝতে হবে যে বিপদ একটা কিছু ঘটতে চলেছে। তখন পালাতে হবে। পালালাম তাকে নিয়ে। পথে বললে আমায় মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমারবাবুর কথা। তিনিই নাকি একমাত্র বাঁচাতে পারেন তোমায়। নিতাই ধারণা করেছিল যে আমাদের না পেয়ে দারোগা তোমার ওপর অত্যাচার চালাবে। তখন আমারও মাথাটা ঘুলিয়ে উঠল। তোমাকে বাঁচাবার জন্যে ছুটলাম তাকে নিয়ে মুকুন্দপুর মালিপাড়ায়। ভোর নাগাদ গিয়ে পৌছলাম। নিতাই সোজা গিয়ে ঢুকল অন্দরমহলে। সেই যে ঢুকল আর বার হল না। মাথা খুঁড়লাম নায়েব গোমস্তা দারোয়ানের পায়ে, একটিবার তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। অন্তত একটিবার বাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে পায়ে ধরলাম সবলের। ঘা কতক দিয়ে তারা আমায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেল। তখন বসে রইলাম বাবুর বাড়ীর সামনে। দিনের পর দিন কেটে গেল। কত গানই যে গাইলাম, কত ডাকই যে দিলাম, কিন্তু অন্দরমহল বড সাংঘাতিক স্থান গোসাঁই। অনেকগুলো দরজার ওপারে তখন নিতাই, আমার ডাক পৌছবে কি ক'রে সেখানে ?"

বলতে বলতে মাথাটা নুয়ে পড়ল চরণদাসের, ওর ছুঁচলো থুত্‌নি নামতে নামতে প্রায় ঠেকে গেল ওর বুকের সঙ্গে। বাবাজীর সারা শরীরটাই কেমন যেন

শিথিল হয়ে গেল। কাঁধ দুটো অনেকটা ঝুলে পড়ল দু'ধারে। ষণ্ডামার্কা চরণদাস বাবাজী, যার মুঠির সামান্য চাপে আমার কব্জি দু'খানা মড়মড়িয়ে ভেঙে যাবার যোগাড় হয়েছিল, সে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ননীর পুতুলের মত নমনীয় হয়ে উঠল।

হঠাৎ আমার মনে হল—স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম চরণদাস কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওর ভেতরের রুদ্ধ একটা ভয়ঙ্কর কিছু যেন ফেটে বার হবার জন্যে চরম চেষ্টা করছে। চিতার ধোঁয়া লাগা আমার পোড়া চোখেও যেন ধরা প'ড়ে গেল—নিরুদ্ধ বেদনার সাকার রূপটা। ঘৃণা নয়, দ্বেষ নয়, প্রতিশোধ-স্পৃহা নয়, এমন কি নিষ্ফল অভিযোগ বা মাথা-কোটাকুটিও নয়, এ শুধু একটা বোবা যন্ত্রণা-ভোগ। একটা বাসনাহীন নির্জলা হিতকামনা। যাকে ও ভালবাসে তার জন্যে একটা আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। ও জিনিস এতে খেলো জাতের নয় যে ওর অন্য কোনও রকম বহিঃপ্রকাশ সম্ভব। যার ভেতর জন্মায় ও-বস্তু, তাকেই শুধু নিঃশব্দে পুড়িয়ে মারে, অন্য কেউ টেরই পায় না।

আমিও টের পেলাম না, স্পষ্ট ক'রে পারলাম না অনুভব করতে, কিসের জ্বালায় জ্বলে মরছে ও। তবু আমার ভেতরটাও কেমন যেন মুচড়ে উঠল। আরো ভালো ক'রে চিরে চিরে ওকে বিচার করবার ফুরসতও পেলাম না। যেন আমায় ঠেলে নামিয়ে দিলে গদির ওপর থেকে। নেমে দু'হাতে জাপটে ধরলাম ওকে বুকের সঙ্গে। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—"চরণদাস, আমায় ক্ষমা কর ভাই।" আর কিছু বারই হল না আমার গলা দিয়ে। দু'হাতে ওকে বুকের সঙ্গে কষে আঁকড়ে ধরে ওরই কাঁধের ওপর মুখ রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল।

উদ্ধারণপুর ঘাটের অনেকগুলো কাঠ নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

অনেকগুলো হাড়, অনেকটা মাংস মিশে অনেকটা ছাই জমে গেল শ্মশানে। সেই ছাই উড়ে গেল অনেকটা উদ্ধারণপুরের বাতাসের সঙ্গে। উড়ে চলে গেল কোথায়, কতদূরে, তাই বা কে বলতে পারে!

হয়ত সেই ছাই খানিকটা লুকিয়ে ঢুকে পড়ল বাতাসের সঙ্গে মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুরের সুরক্ষিত অন্দরমহলের মধ্যে।

হয়ত সেই ছাই খানিকটা ঢুকল গিয়ে এই মুহূর্তে কুমার বাহাদুরের নাকে-মুখে-চোখে।

হয়ত তাতে ছন্দপতন হল তাঁর প্রেম-গুঞ্জনের।

হয়ত সেই ছাই ঢুকল গিয়ে নিতাইয়ের কানের মধ্যে, তাতে সব চেয়ে মধুর আর সব থেকে প্রিয় ডাকটি আর তার শোনা হল না।

হয়ত উদ্ধারণপুরের ছাই খানিকটা লাগল গিয়ে নিতাইয়ের গালে। আর তাতে মুখ রগড়াতে গিয়ে কুমার বাহাদুর মড়া পোড়ার গন্ধ পেয়ে সজোরে দু'হাতে নিতাইকে দূরে ঠেলে দিলেন।

কতক্ষণ পার হয়ে গেল তার খেয়ালও রইল না।

আমার খোলা বুকটা ভিজে গেল ঈষদুষ্ণ জলে। বাবাজী চরণদাসের বুকের জ্বালা তপ্ত জলের রূপ ধরে উপ্‌চে পড়তে লাগল আমার হিম-শীতল বুকের ওপর। তাতেও কি নরম হল উদ্ধারণপুরের পোড়া মাটির তৈরী পোড় খাওয়া কালো বুকটা আমার? না, বরং আরও রুক্ষ, আরও ঠাণ্ডা, আরও নির্মম হয়ে উঠল আমার বুকের ভেতরটা। অন্য কোনও চিন্তা ভাবনা নেই তখন সেখানে, এমন কি নিতাইকেও বেমালুম ভুলে গেলাম। শুধু একটা তীব্র অপমান-বোধ, একটা নির্জলা প্রতিশোধ-স্পৃহা দুমদুম করে ঘা দিতে লাগল আমার বুকটার মধ্যে।

অবশেষে ওর কাঁধের ওপর থেকে মুখ তুললাম। তারপর ছেড়ে দিলাম ওকে। চরণদাস চোখ-মুখ মুছে সলজ্জ কণ্ঠে বললে—"তামাক আছে গোসাঁই? থাকে ত একটু দাও। আজ কতদিন কলকে ধরি নি হাতে।"

ফিরে গিয়ে উলটে পালটে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম গদির তলায়। নাঃ, কোথাও ছিটে-ফোঁটা তামাক নেই। ও পাট উঠে গেছে একদম, ওরা চলে যাবার পর থেকে। যেটুকু তামাক পড়ে তা লোককে বিলিয়ে বেটে দি। ধারণাও ত ছিল না আমার যে বাবাজী আবার ফিরবে একদিন! ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম, রাগও হল ভয়ানক নিজের ওপর। রাগের ঝোঁকে নিচু হয়ে ঝুঁকে প'ড়ে তছনছ ক'রে ফেললাম গদিটা।

চরণদাসও বেশ লজ্জিত হল তামাক চেয়ে। বললে—"থাক, থাক, আর কষ্ট করতে হবে না তোমায় গোসাঁই। ও জিনিস বোধ হয় আর কপালে জুটবে না আমার। না জোটাই উচিত, বেশ ত আছি, নেশা বলতে আর কিছুই রইল না আমার জীবনে।"

টপ করে ঘুরে দাঁড়ালাম। বললাম—বেশ মিনতি ক'রে বললাম—"গোল্লায় যাক তোমার শুকনো জটা পুড়িয়ে টানা। খাবে বাবাজী? টানবে এক বোতল? দেখবে টেনে—কেমন জ্বলতে জ্বলতে নামে বুকের ভেতর দিয়ে? কি হবে ঐ কলকে টেনে? কি আরাম পাও ও-থেকে? কতটুকু জ্বালা করে ও জিনিস

টানলে? এস, গল গল ক'রে গালায় ঢেলে দাও এক বোতল। দেখ, কি চমৎকার জ্বালা লুকিয়ে আছে এই বোতলের ভেতর! এ বিষ একবার গলা দিয়ে গললে অন্য যে কোনও বিষের জ্বালা জুড়িয়ে শীতল হয়ে যাবে। এস—এই নাও ধর—" গদির পাশ থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

তীরবেগে ছুটে এল একজন। এসে আছড়ে পড়ল আমার পায়ের ওপর। দু'টো পা জড়িয়ে ধরে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

কি বলছে তাও ঠিক বুঝলাম না। লোকটা কে তাও ঠাওর করতে পারলাম না সেই মুহূর্তে। চরণদাস নিচু হয়ে এক হেঁচকায় লোকটাকে তুলে খাড়া ক'রে দিলে। দিয়ে তার হাতে সজোরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলে—"কিরে, হয়েছে কি? অমন ক'রে মরছিস কেন? কি হয়েছে বল্ না ভাল ক'রে?"

পঙ্কেশ্বর ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—"পালাও গোসাঁই, শিগ্‌গির পালাও এখান থেকে। ওরা এসতেছে, এসে পড়েছে ঐ বাজার-তলা পর্যন্ত। তোমায় খুন করবে ওরা, খুন করবে বলে দা-সড়কি নিয়ে ছুটে আসছে ওরা সকলে।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কারা তারা। কারা ছুটে আসছে আমায় খুন করতে রে?"

দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে চরণদাস বললে—"সে যারাই হোক গে যাক্, দরকার নেই সে কথা শুনে। পঙ্কা, একখানা পাকা লাঠি দিতে পারিস আমায়, কিংবা একটা দু'হাত লম্বা রামদা? থাকে ত বার কর্ শিগ্‌গির, হাঁ করে চেয়ে থাকিস পরে।"

প্রায় কেঁদে ফেলে পঙ্কা ডোম—"ঐ যে গা বাবাজী,—ঐ ত রয়েছে আমার বুহুয়ের হাতের ঠ্যাঙাখানা গোসাঁয়ের চালে গোঁজা। কিন্তু একলা তুমি ঠুকতে পারবে কি গো সেই এক গুষ্টি বাগদী লেঠেলদের? ওরা একেবারে ক্ষেপে এসতেছে। হায় হায় রে, আজ আবার আমাদের মানুষ একজনও নেই গো এপারে। সব ওপারে গেছে শুয়োর বিঁধতে।" কপাল চাপড়াতে লাগল পঙ্কা।

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল পঙ্কার কাঁপুনি দেখে। হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। বললাম—"মর্ বেটা, কাঁপছিস কেন অত? মদ ভাঙ্ খেয়েছিস নাকি ঠেলে? কাদের ঘাড়ে ভূত চেপেছে যে এই দিনদুপুরে খুন করতে আসছে আমায়? নেশা ক'রে বেটার মাথা-ফাতা ঘুলিয়ে গেছে—"

"চুপ, মুখ বন্ধ কর গোসাঁই।" একটা প্রচণ্ড ধমক দিলে আমায় চরণদাস।

ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, ইতিমধ্যেই কোমর বাঁধা হয়ে গেছে তার। হাতের বুকের মাংসের গুলিগুলো ঠেলে উঠেছে। ওর সদা-প্রসন্ন চোখ দু'টোয় ফুটে উঠেছে ও কিসের আলো? এবার সত্যিই একটু ঘাবড়ে গেলাম ওর চোখের দিকে চেয়ে।

ঝাঁ ক'রে এক হেঁচকায় আমার হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিলে বাবাজী। নিয়ে গলগল ক'রে ঢালতে লাগল গলায়। অর্ধেকের বেশীটা এক নিঃশ্বাসে সাবাড় করে ফেললে। বাকীটুকু পঙ্কার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে—"নে, লাগা চুমুক। ওস্তাদের নাম নিয়ে দাঁড়া গিয়ে আমার পাঁচ হাত পেছনে একখানা ঠ্যাঙা হাতে ক'রে। ডোমের বাচ্চা ন'স তুই? বাঁশ তোদের দেবতা নয়? বাঁশ হাতে থাকতে ডরাবি তুই? তার চেয়ে ডুবে মর্ গিয়ে ঐ গঙ্গায়।"

পঙ্কাও তখন তৈরী হ'ল। মালটুকু গলায় ঢেলে একখানা বাঁশ তুলে নিলে আমার বেড়া থেকে। বাবাজী দু'হাতের চেটো ঘষে নিলে মাটিতে—। নিয়ে সেই ধুলো-মাখা হাত দিয়ে আমার দু'পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। তারপর তুলে নিলে নিজের পায়ের কাছ থেকে লাঠিখানা। ঝাড়া সাড়ে চার হাত লম্বা চিতার ধোঁয়া খাওয়ানো রামহরে ডোমের হাতের পাকা বংশদণ্ড। কখন যে ওখানা বাবাজী নামিয়ে নিয়েছে আমার চাল থেকে তাও জানতে পাবি নি।

খুব নরম সুরেই আর একবার জিজ্ঞাসা করলাম বাবাজীকে—"কিন্তু এত তোড়জোড় কিসের জন্যে তাও ত জানতে পারলাম না চরণদাস, মানে সবটাই একটা—"

আঙুল তুলে বাবাজী হুকুম দিলে—"চুপ, একটিও কথা নয়,—সোজা উঠে যাও তোমার গদির ওপর, সোজা—"

তার কথা শেষ হবার আগেই রে রে রে রে ধ্বনি উঠল বড় সড়কের ওপর। সে আওয়াজ মেলাবার আগেই দু'তিন হাত আকাশের দিকে ছিটকে উঠল চরণদাস। তারপর যেন হাওয়ায় ভেসেই উঠে চলে গেল নিমগাছটার দিকে। শুধু তার শেষ কথাটা কানে গেল আমার—"চলে আয় পঙ্কা!"

মুহূর্তের মধ্যে ঠক্ ঠকা-ঠক্-ঠক্ আওয়াজ ভেসে এল ওধার থেকে। সে শব্দ ছাপিয়ে হাহাকার ধ্বনি উঠল উদ্ধারণপুরের আকাশ বাতাস তোলপাড় ক'রে। তার সঙ্গে বড় সড়কের ওপর থেকে বহু নারী-কণ্ঠের তুমুল চিৎকার মিলে এমন একটা বীভৎস রসের সৃষ্টি করলে যা শুনে সাদা হাড়গুলোও শিউরে উঠল।

ঝপ্ ক'রে একসঙ্গে সব আওয়াজ গেল থেমে। হঠাৎ যেন মা ধরিত্রী গ্রাস ক'রে ফেললে সকলকে।

আবার শোনা গেল বাবাজীর গলা ঠিক তিন মুহূর্ত পরে।

"কৈ, এগো, এগিয়ে আয় না কে বাপের বেটা আছিস। ধর্ লাঠি হাতে,—তোল্ মাথা, তোল্—"

আবার রৈ রৈ ক'রে উঠল একসঙ্গে বহু নারীকণ্ঠ। তার মধ্যে একটা গলা খুব চেনা মনে হল। হাঁ, ঐ ত রামহরির বউ কথা বলছে, মানে আমাদের সীতের মা। সীতের মা হুকুম দিচ্ছে—"লে, লিয়ে চল্ সব কটা বাগদীকে ঝেঁটিয়ে বাবার সামনে। কডমডিয়ে চিবিয়ে খাক বাবা মাথাগুলো ওদের।"

তার হুকুম দেওয়া শেষ হতে না হতেই হুডমুড করে নামতে লাগল মেয়েরা। ডোমপাড়ার সবাই আর ময়নাপাডার ওরা সকলে। প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু রয়েছে। লাঠি ঝাঁটা বঁটি দা কাটারি যে যা পেয়েছে নিয়ে এসেছে। সব চেয়ে বেশী যা রয়েছে তা হচ্ছে ঝাঁটা। বড সডকের ওপর থেকে ওদের দৌড়ে নামতে দেখলাম। তারপর আর দেখতে পেলাম না। নিমগাছের আডালে আবার আরম্ভ হল নানা রকমের আওয়াজ। সাঁই সাঁই ঝাঁটা চালাবার শব্দের সঙ্গে আবার উঠল বিকট চিৎকার আর তার সঙ্গে অকথ্য গালিগালাজ। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখতে পেলাম সকলকে। মস্ত একটা দল এগিয়ে আসছে এদিকে। মেয়েরাই ঘিরে নিয়ে আসছে ওদের।

এবার শোনা গেল আর একটা গলা। খুবই চেনা-চেনা লাগল গলাটা। নিদারুণ কষ্টে গোঙাচ্ছে যেন কে। কাকুতি-মিনতি করছে—"আমায় তোমরা এবার ক্ষ্যামা দাও গো ভাল মানুষের বেটিরা। বুডো মনিষ্যিটাকে আর মেরে ফেলুনি বাপু।"

অনেকগুলো নারীকণ্ঠ একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—"লাগা খেংরা বুডো মডার মুয়ে।" পডলও বোধ হয় দু'এক ঘা সঙ্গে সঙ্গে, সাঁই সাঁই করে শব্দ উঠল, তার সঙ্গে কুকুরের মত কাঁই কাঁই করে কেঁদে উঠল কে।

সমস্ত দলটা হুডমুড ক'রে এসে পডল আমার গদির সামনে।

একসঙ্গে নারী পুরুষ বহু লোক। একসঙ্গে সবাই কথা বলতে চায়। আমি তখন দু'চোখ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজছি একজনকে। বাবাজী চরণদাস বৈরাগীকে খুঁজছি আমি তখন। কোথায় গেল? গেল কোথায় সে? হঠাৎ যেন বজ্রাঘাত পডল। বাজখাঁই গলায় কে দাবডি দিলে একটা: "কি রে, ব্যাপার কি? এখেনে রথ উঠলো নাকি রে বাবা! এত ভিড কেন?"

থন্তা ঘোষ। সকলের চেয়ে মাথায় উঁচু থন্তা ঘোষের মাথাটা দেখা গেল সবার পেছনে।

সবাই চুপ একেবারে। দলটাকে ডান দিক দিয়ে ঘুরে খন্তা এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। আবার সেই রকম বিকট গর্জন দিলে একটা—"কি গোসাঁই, হয়েছে কি এদের? ক' ব্যাটার মাথায় মুখে রক্ত দেখলুম যেন। হল কি হারামজাদাদের?"

যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হল চরণদাস খন্তা ঘোষের সামনে। তার কপাল থেকেও গড়িয়ে নামছে রক্ত। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বাবাজীর। দাঁত বার করে বললে—"একটু অঙ্গসেবন ক'রে দিলাম দাদা আমার বাগদী ভায়াদের। ওনারা দল বেঁধে লাঠি ঘাড়ে নিয়ে ছুটে এসেছিলেন গোসাঁইকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে।"

দারুণ বিস্ময়ে যেন ফেটে যাচ্ছে খন্তার চোখ। সব ক'খানা দাঁত তার হিংস্র জন্তুর মত বেরিয়ে পড়ল মুখের ভেতর থেকে। সামনের দলটার দিকে তাকিয়ে প্রায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে থেমে থেমে—"ঠাণ্ডা করতে এসেছিল গোসাঁইকে। এঁ্যা—গোসাঁইকে ঠাণ্ডা করবে ওরা? কেন? কি করলে গোসাঁই? কে পাঠিয়েছে ওদের?"

পঞ্চেশ্বর হাউমাউ করে বললে—"খুড়ো, ঐ শালা আম মোড়ল লেলিয়ে দিয়েছে ওদের। ঐ হাড়ে হারামজাদা খুন করাতে চেয়েছিল গোসাঁইকে। ঐ যে ঐ, ওধারে মড়ার মত চিত হয়ে পড়ে রয়েছে ভিটকিলিমি ক'রে।"

দু'তিন জনকে ডিঙিয়ে কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল খন্তা। সেখান থেকে ধপাস করে একটা আওয়াজ হল। কাঁউ কাঁউ ক'রে কেঁদে উঠল মোড়ল। খন্তা খিঁচিয়ে উঠল—"এই চুপ বর্ বলছি বুড়ো ভাম। ন্যাকামি ক'রে কাঁদবি যদি ত ফের এক লাথি লাগাব মুখে। উঠে আয় সামনে। ওঠ্—"

"ওগো—আমি গতর নাড়তে পারবুনি গো বাবা, আর আমায় লেথিও না গো বাবা।" ডুকরে কেঁদে উঠল এবার মোড়ল।

আর সহ্য হল না। বুকে যত জোর ছিল তা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—"থামা, থামা এখন তোর শাসন খন্তা। আর পারি নে সইতে সকলের ধাষ্টামো। এই, এই শুয়োরের বাচ্চারা, ধরে তুলে আন্ না মানুষটাকে। যদি নামতে হয় আমাকে গদি থেকে, তা'হলে জ্যান্ত চিবিয়ে খাব সব কটার মাথা। যা বলছি, উঠিয়ে আন্ মোড়লকে।"

বাগদীরা নড়েচড়ে উঠল। ওদের মধ্যে চারজন গিয়ে বয়ে নিয়ে এল মোড়লকে। এনে শুইয়ে দিলে আমার সামনে।

মোড়ল চক্ষু বুজেই পড়ে রইল। এতটুকু নড়াচড়া পর্যন্ত নেই তার। যেন

সত্যিই লোকটা ম'রে কাঠ হয়ে গেছে।

আমু বাগদী মুরুব্বী মানুষ। ওর ছেলে হলা বাগদী বহুবার এসেছে গেছে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। বাপ-বেটা দু'জনকেই চিনি ভাল ক'রে। আমুর কপালে লেগেছে চোট, রক্ত গড়াচ্ছে। হলার একখানা হাত বোধ হয় ভেঙেছে। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতখানা বুকের কাছে তুলে ধ'রে আছে সে। আমু আর হলা মাথা নিচু করে বসে ছিল অন্য সকলের থেকে একটু তফাতে। আমুকেই ডাক দিলাম।

"মুরুব্বী, উঠে এস না গো। এক টেরে বসে রইলে কেন? এস, একটু পেসাদ নাও মায়ের। তারপর শুনি তোমার কাছ থেকে, কি ক'রে বাধল এত বড় হুজ্জতটা।"

বাগদী আগে তার যৎসামান্য কাপড়ের খুঁটটা তুলে গলায় দিলে। তারপর উঠে এসে গড় হল আমার সামনে।

তখন ডাক দিলাম হলধর মানে হলা বাগদীকে।

"বলি—হ্যাঁরে শালা হলা, ব'সে রইলি কেন তফাতে? শালা যেন আমার ঘরের মাগ, মাথা নুইয়ে আছে। উঠে আয় শালা পেঁচি মাতাল, আগে গেল্ দু'-ঢোক, মুখ খুলুক। দু'ঢোক গলা দিয়ে না গল্‌লে শালার নজ্জা ঘুচবে না।" বলে একটা খুব জবর গোছের রসিকতার হাসি হাসলাম।

অনেকটা হালকা হল থমথমে ভাবটা। মেয়েদের মধ্যে উসখুস্ ক'রে উঠল কয়েকজন। হলধর উঠে এল সামনে, এসে হঠাৎ মাটির ওপর বসে পড়ল হাঁটুতে মুখ গুঁজে। তারপর ভেউ ভেউ ক'রে কান্না।

খন্তা এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করে দেখছিল আর পৌনে আধখানা সিগ্রেটে টান দিচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম—"দাঁড়িয়ে দেখছিস কি খন্তা? আনা, আনা শিগ্গির মাল দু' বোতল। আমু এসেছে—এসেছে ওদের সমাজসুদ্ধ প্রায় সকলেই। আগে সকলের গলা ভিজুক। এত আর ওরা মড়া নিয়ে আসে নি যে ওদের খরচ দিতে হবে। খরচ দিতে হবে এখন আমায়। কারণ আমার দোষ-অপরাধের বিচার করতে এসেছে ওরা। গোসাঁই হই আর যাই হই, দোষ-অপরাধের বিচার হবে না কেন? সমাজ মানবে না কেন? পঞ্চায়েতের পাঁচজনে যা বিচার করে দেবে, কেন তা মাথা পেতে নোব না? নিশ্চয়ই নিতে হবে, দশের কাছে যদি দণ্ড নিতে না পারি ত দশে আমার কথা মানবে কেন? কি বল মুরুব্বী?"

হুম ক'রে আমুকেই রায় দিতে বলে বসলাম।

তখন দাঁড়িয়ে উঠল আমু। গলায় তুলে দিয়েছিল যে খুঁটটা সেটা আবার নামিয়ে কোমরে জড়িয়ে ফেললে। কোমর বেঁধে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে আরম্ভ করলে বক্তৃতা। প্রথমে নাম নিলে গুরুর, তারপর গুরুর গুরুর 'ছিচরণে' গড় করে গঙ্গা আর শ্মশানকালীকে সেবা দিলে। দিয়ে নাক-কান মলে তিন সত্যি ক'রে নিলে। অর্থাৎ সে যা বলবে দশের সামনে, তার একটি কথাও মিথ্যে নয়। মিথ্যে যদি হয় তা'হলে ঐ তার একমাত্র ছেলে বসে রয়েছে, ঐ ছেলেই রইল মা কালীর কাছে জামিন।

তারপর সে গড়গড় ক'রে বলে গেল সুবৃহৎ কাহিনী। আমঅতন মোড়লদের পাশের গ্রামে ওরা থাকে, ওদের কেউ ম'লে ওরা গাঁয়ের ধারেই পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু মোড়ল মাঝে মধ্যে এসে ওদের মড়া ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের খরচায় গঙ্গায় দিয়ে যায়। বিশেষতঃ সোমত্ত বয়সের ঝি-বউ ম'লে মোড়ল বলে যে তাকে গঙ্গায় দেওয়াই বিধি। নয়ত অপদেবতা হয়ে গাঁয়ে-ঘরে অত্যাচার করবে। সোমত্ত বয়সে মরেছে কিনা, সোমত্ত মানুষের নাকি টানটা সহজে যায় না নিজের আত্মীয়স্বজনের ওপর থেকে।

সেবার—মানে এই ক'দিন আগে—নোটন বাগদীর ডবকা মেয়েটা ক'দিন ভুগে ম'ল। মোড়ল একরকম জোর ক'রে তাকে কেড়ে নিয়ে এল গঙ্গায় দিতে। নোটন বেচারা একটা আধলাও দিতে পারলে না। ওর জামাই, যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছিল এই সামনের পোষ মাসে, সে ছোকড়া সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। তাকেও সঙ্গে আসতে দিলে না মোড়ল। ভয় দেখালে, বললে, সঙ্গে গেলে শ্মশান থেকে ছুঁড়ী আবার ফিরে যাবে তার কাঁধে চেপে। পরে যে কাউকে বিয়ে ক'রে ঘরসংসার করবে তারও জো থাকবে না।

নোটনের মেয়েকে গঙ্গায় দিয়ে যাবার ক'দিন পরেই পঙ্কা ডোম গিয়ে হাজির হল ওদের গ্রামে। গিয়ে তার পাশার ছক পেতে একেবারে জাঁকিয়ে বসল সেখানে। বাগদীর ছেলে-ছোকরারা দু'দিনেই পঙ্কার ভক্ত হয়ে উঠল।

হঠাৎ ঘটে গেল একটা দুর্ঘটনা। নেড়া বাগদীর বোনটাকে কিসে কামড়াল 'রেতের বেলায়'। সকালেই বোনটা দুটো খাবি খেয়ে চক্ষু কপালে তুললে। জুটল গিয়ে মোড়ল এবং যথাবিহিত ছোঁ মেরে মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে ভাইপো আমজীবন সহ গঙ্গার দিকে রওয়ানা হল।

এবং তৎক্ষণাৎ পঙ্কেশ্বর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের জুটিয়ে নিয়ে দূর থেকে ছায়ার মত অনুসরণ করল ওদের।

আম্নু হল মুরুব্বী গাঁয়ের। এক রকম ওর পায়ে ধরে পঙ্কা ওকে টেনে নিয়ে এল সঙ্গে।

প্রথম দিন রাতেই ঘটল ঘটনা।

অন্ধকার রাত, নবাবী সড়কের ওপিঠে একটা 'কাঁদোড়ের' ধারে ওরা থামল 'সন্দে-কালে'। পঙ্কা আর হলা লুকিয়ে গিয়ে বসে রইল একটা গাছের ওপর। ঠিক রইল যে তিনবার কাল পেঁচার ডাক ডাকলেই সবাই ছুটে গিয়ে পড়বে সেখেনে।

আগ্‌রাতটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। সবাই প'ড়ে ঘুমুচ্ছে মাঠের মধ্যে। শুধু জেগে আছে মুরুব্বী—আম্নু বাগদী নিজে। হঠাৎ তার চমক ভাঙল, স্পষ্ট শুনতে পেলে তিনবার কাল পেঁচার ডাক। চুপি চুপি ঠেলা দিয়ে তুললে সে সবাইকে। নিঃশব্দে রওয়ানা হল সকলে সেই গাছতলায় যেখানে মোড়লেরা বিশ্রাম নিচ্ছিল।

অন্ধকারে বাগদীদের চোখ জ্বলে, অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা দেখলে—

কি দেখলে তা আর বলতে পারলে না আম্নু। ঝট ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধাঁ ক'রে একটা লাথি মেরে দিলে অতন মোড়লের মাথায়।

আবার রৈ রৈ ক'রে উঠল সকলে। তার মধ্যে মোড়লের ক্ষীণ আর্তনাদ মিলিয়ে গেল। দৌড়ে এসে সপাসপ কয়েক ঘা ঝাঁটার-বাড়ি লাগালে সীতের মা।

ময়নাপাড়ার দু চারজনও ঝাঁটা উঁচিয়ে ছুটে এল।

হুঙ্কার ছাড়লে একটা খন্তা ঘোষ।

"এই চুপ কর্ সবাই, নয়ত ছিঁড়ে দোব সবায়ের মুখ জুতিয়ে।"

সাক্ষাৎ খন্তার হুকুম। সুতরাং আবার সকলে চুপ করলে।

ফাঁক পেয়ে তখন জিজ্ঞাসা করলাম আম্নুকেই—

"কিন্তু মুরুব্বী, আমি এর মধ্যে দোষ করলাম কোথায়? আমাকে শাস্তি দিতে তোমরা তেড়ে এলে কেন? আমার অপরাধটা কোথায় তাই বল? দশের সামনে আমার বিচারটা হয়ে যাক।"

আম্নু কিছু বলবার আগেই দাঁড়িয়ে উঠল হলা। ছুটে এসে আছড়ে পড়ল আমার গদির ওপর। প'ড়ে আমার দু' হাঁটু জড়িয়ে ধ'রে কোলের ওপর মুখ রগড়াতে লাগল।

এমদম স্তব্ধ হয়ে আছে সকলে। আমিও চুপ ক'রে বসে হাত বুলোতে লাগলাম হলধরের মাথায়।

পঞ্চেশ্বর সামনে এসে দাঁড়াল আন্নু বাগদীর। বাগদীর হাতখানা ধরে বললে —"বল মামা বল—কি বলেছিল ঐ বুড়ো মড়াটা, যা শুনে তোমরা ক্ষেপে গেলে। হুঁশ হারিয়ে একেবারে ছুটে এলে গোসাঁইকে খুন করতে।" আন্নু মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। একটু শব্দ বার হল না তার গলা দিয়ে।

আমার কোলের ওপর তখনও হলধরের মাথাটা। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম—"থাক, আর ব'লে কাজ নেই কারও। আমার সেঙাত হলাই শোনাবে সেকথা। সেঙাতের মুখ থেকে শোন সকলে—"

ছিটকে উঠল হলধর। আঙুল বাড়িয়ে মোড়লকে দেখিয়ে বললে—"ঐ শালা, ঐ শয়তানের বাচ্চা, ঘাকতক দিতে ঐ শয়তানের বাচ্চা তোমার নাম করলে গোসাঁই। তুমি নাকি ওকে শিখিয়েছ ওই খেলা। তুমিই নাকি ওর গুরু। ঐ শয়তান আমাদের মাথায় খুন চাপিয়ে দিলে, ঐ শয়তান—" বলতে বলতে ছুটে গিয়ে থুঃ ক'রে এক ধ্যাবড়া থুতু দিলে মোড়লের মুখে। খস্তা ঘোষ আর একবার চিৎকার ক'রে উঠল—

"ব্যাস, ব্যাস, যেতে দাও এবার। এই পঞ্চা, এই লে টাকা, লিয়ে আয় এক টিন মাল। মাথা ঠাণ্ডা কর সবাই। আর নয়. এবার হাস, গাও, নাচ। সবই সেই বোম-ভোলা বাবার খেলা। জয় বাবা শ্মশান-ভৈরব!"

শ্মশান-ভৈরবের নামে সমবেত কণ্ঠে তিনবার জয়ধ্বনি পড়ল।

উদ্ধারণপুরের বাস্তব।

বাস্তব—বেহেড বাতিকগ্রস্তদের বিচক্ষণ বাদশাহ্। বিদ্যা-বুদ্ধি বিচার-বিশ্বাস এই সব বখেড়া তাঁর কাছে বিকল মনের বিচিত্র বিকার ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাদশাহ্ বেতাল বেরসিক, বখারি বটকেরা বজ্জাতি বিন্দুমাত্র বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। তাঁর বজ্রমুষ্টির বর্বর বিমর্দনে বিশ্বপিতার বাহাদুরে বিধানের দম বন্ধ হ'য়ে আসে। তাঁর বিক্রমে বহুমুখী ব্যসনের বেলেল্লা বেসাতী বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ে। বাদশাহের বিলোল কটাক্ষের সামনে বিবসনা বিভীষিকা লজ্জাবতী লতার মত কোথায় মুখ লুকোবে তা ভেবে পায় না।

ন্যাংটা চণ্ডীর দেয়াসি আমমতন ভেবে পায় না কোথায় লুকোবে তার বীভৎস মুখখানা। বাগদীরা যখন ফিরে গেল তখন তাদের সঙ্গেও গেল না মোড়ল।

বললে—"আমায় আর 'দোগ্গো' নি বাবাবা, গতর আমি লাড়তে পারবু নি।" আসল কথা—গ্রামে ফিরে গেলে মোড়লের স্বজাতি থেকে শুরু ক'রে বাগদী বোয়েরা পর্যন্ত কেউ যে তাকে রেহাই দেবে না, একথা মোড়ল জানত। কিন্তু শ্মশানেও তাকে রেহাই দেবে না রামহরের বউ। সবাই চলে গেল, রামহরের বউ গেল না। পা ছড়িয়ে সে বসল মোড়লের মুখের সামনে। ব'সে আরম্ভ করলে তাকে বচন-সুধা পান করাতে। শোধ সে তুলবেই, সুদে-আসলে সাঁতের মা উসুল করে ছাড়বে তার ইজ্জতের দাম। বুক নিঙড়ে অনেক দুধ নিয়েছে মোড়ল তামাক ভেজাতে। দুধও নিয়েছে, আরও অনেক কিছু নিয়েছে তার সঙ্গে লুকিয়ে-চুকিয়ে। শুনুক এখন শুয়ে শুয়ে তার ফিরিস্তি।

শেষ পর্যন্ত রেহাই পেল মোড়ল। রামহরে ডোম মাছ ধরে ফিরে এসে উদ্ধার করলে মোড়লকে উদ্ধারণপুরের ঘাট থেকে। যে নৌকোয় মাছ ধরে ফিরল সেই নৌকোয় তুলে মোড়লকে ও-কূলে পাচার করে দিলে সে। এ-কূল প্রতিকূল হলেও ও-কূল তখনও অনুকূল মোড়লের কপালজোরে। তাই মোড়ল কূল পেয়ে গেল।

কিন্তু যার এ-কূল ও-কূল দু'কূলই প্রতিকূল তার তরী ভিড়বে কোন্ কূলে?

সেই কথাই বলছে চরণদাস।

সব জুড়িয়ে গেলে গঙ্গায় স্নান করে এসে এক মুঠো গাঁদাপাতা কচলে ফাটা কপালের ওপর বেঁধে আবার বাবাজী তার 'গুব্-গুবা-গুব্'টা বাঁধলে। বেঁধে সুর ধরলে—

"ওরে ও প্রাণবন্ধু রে—
তোমার জন্যে জীবন করলাম ক্ষয়।
আর জ্বালা পোড়া প্রাণে কত সয়।
প্রাণবন্ধু রে—তোমার জন্যে জীবন করলাম ক্ষয়॥"

যতক্ষণ দিনের আলো ছিল ততক্ষণ চরণদাস পারেনি আমার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে, আমি পারিনি বাবাজীর মুখের দিকে তাকাতে। কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না যে দু'হাতে আমি ওর গলা টিপে ধরেছিলাম এবং তার প্রতিদানে ও নিমেষের মধ্যে একলা ছুটে গেল এক গুষ্টি বাগদী লেঠেলের সামনে —আমাকে বাঁচাবার জন্যে। সেই সঙ্গে একথাও ভুলতে পারছিলাম না যে বাবাজী আমাকে দায়ী করেছে। আমিই নাকি দায়ী নিতাইয়ের জন্যে। মড়ার গদির মায়া ছেড়ে যদি আমি উঠে যেতাম ওদের সঙ্গে, তা'হলে নাকি এ সর্বনাশটা ঠিক এমন ভাবে ঘটতে পেত না এবং সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে যে আমি ওদের

সঙ্গে গেলে, যেভাবে ঘটতে পারত তখন সর্বনাশটা, তাতে চরণদাসের একটুও আপত্তি ছিল না।

এটি কি?

চরণদাস তখন কেমন ক'রে সহ্য করত আমাকে?

অথবা বাবাজী কি এই মনে করে যে ভাগের কারবারে তার সঙ্গে আমি মনের সুখে ঠাট বজায় রেখে চলতাম।

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল। আজ যখন দু'হাতে ওর গলা টিপে ধরে দম বন্ধ করে মারতে চেয়েছিলাম তখন নিশ্চয়ই চরণদাস বুঝেছে যে আমি উদ্ধারণপুরের বাস্তব বাদশাহের খাস তালুকের প্রজা। রক্ত-মাংস পুড়ে ছাই হয়ে গেলে পরে যে হাড়গুলো পড়ে থাকে সেগুলোর মায়াও আমি ছাড়তে পারি নি। সুতরাং কাঁচা রক্ত-মাংসের ওপর ভাগের কারবার অন্তত আমার সঙ্গে চলে না।

চলে না, এটুকু ভাল করে বুঝতে পারার ফলেই বাবাজী আর আমার চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছে না বোধ হয়।

কিন্তু বাবাজী তাকে ভালবাসে। শুধু ভালবাসার গরজে ভালবাসে তাকে। তাই সে আবার বসেছে তার বাদ্য-যন্ত্রটা বেঁধে নিয়ে।

গাইছে—

"তোমাকে ভালবাসি
এ জগতে হইলাম দোষী
পাড়ার লোকে কত মন্দ কয়।
বন্ধু রে—"

শুনলেও গা জ্বলে ওঠে।

পাড়ার লোকে কে কি বলেছে না বলেছে তাই নিয়েই ওঁর যত মাথাব্যথা। কিন্তু যাকে তুই ভালবাসিস সে যে তোর মুখে লাথি মেরে চলে গেল, তা নিয়ে তোর ছিঁচকাঁদুনি কাঁদতে লজ্জা করে না?

নুড়ো জেলে দিতে হয় অমন প্রেমের মুখে।

আমি হ'লে—

কি করতাম আমি হ'লে? ওর মত যদি ভালবাসার ফাঁদে পড়ে যেতাম তা-হলে? কি করতে পারি এখন আমি তার?

লাথি ত শুধু বাবাজীর মুখেই মারে নি নিতাই, আমার মুখেও ত ঠিক সমান জোরে সমান ওজনের লাথি সে মেরে গেছে একটা।

বরং বলা উচিত যে লাথিটা সে সটান আমার মুখের ওপরেই তাক ক'রে ছুঁড়েছে। বাবাজী জানত, অনেককাল আগেই স্পষ্ট করে জানত যে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই প্রয়োজন ছিল নিতাইয়ের বাবাজীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার। ছাই ফেলা হয়ে গেলে ভাঙা কুলোখানা আবার কেউ যত্ন ক'রে ঘরে তুলে রাখে না। ওটাকে ছায়ের সঙ্গে আঁস্তাকুড়ে বিসর্জন দেয়। দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। আমাকেও কি সেই ভাবে বিসর্জন দিয়ে গেল নিতাই ?

আঁস্তাকুড়ের আবর্জনার সামিল মনে করলে আমাকেও ?

সোনার গয়না আর ঘর-বাড়াই তার কাছে বড় হ'ল ?

একটা সাধারণ লম্পট, যে তাকে দু'দিন পরে কুকুরের মত দূর দূর ক'রে খেদিয়ে দিয়ে আবার আর একটা কারও পেছনে জিব লকলক ক'রে ছুটতে থাকবে তার ওপরে কি ক'রে নির্ভর করতে পারলে নিতাই ?

এ-হেন হীন প্রবৃত্তি কি ক'রে তার হ'ল ?

কি লোভে সে গেল ? কি পাবে সে তার কাছে ? কি দিতে পারে সে নিতাইকে ?

আমি বা কি দিতে পারতাম তাকে ?

মড়ার গদি, কাঁথা, লেপ-তোষকের স্তূপটা কি কাজে লাগত নিতাইয়ের ? কিছু যদি দেবারই থাকত আমার, তা'হলে বার বার তাকে ওভাবে বিদায় দিলাম কেন ? মড়ার গদিতে গদিয়ান হয়ে মড়ার মর্যাদার গরমে বড় ছোট ক'রে দেখে-ছিলাম নিতাইকে। দেবার মতো কিছুই নেই আমার কস্মিনকালে, ছিলও না কিছু। তবু যে কিসের গর্বে অন্ধ হয়ে বার বার অপমান করেছি ওকে।

উদ্ধারণপুরের বাস্তব।

বাদশাহ বাস্তব সামনে এসে দাঁড়ালেন—তাঁর চলন্ত চাবুকখানা হাতে নিয়ে। দাঁড়িয়ে তাঁর খাস বান্দার মুখের ওপর সাঁই সাঁই করে চালিয়ে দিলেন কয়েক ঘা। বললেন—"বেকুব—শুধু সাদা হাড় আর কালো কয়লার জলুস দেখিয়ে চোখ ঝলসে দিতে চেয়েছিলি তার—লজ্জা করে না তোর ?"

লজ্জা নয়, ক'রে উঠল জ্বালা। সারা মুখখানা ফালা ফালা হয়ে চিরে গেল সেই চাবুকের ঘায়ে। এ-মুখ দেখাব আমি কার কাছে ? কেমন ক'রে তুলব এ মুখ আমি দুনিয়ার সামনে ? কোথায় লুকোব আমি আমার এই পোড়ার মুখখানা ত্রিজগতে ?

বাবাজী চরণদাস আছে মহাশান্তিতে। সে যে কিছুই চায় নি তার কাছে। এতটুকু প্রতিদানের আশা না রেখেই সে শুধু দিতে চেয়েছে, একেবারে নিঃশেষে দিয়ে ফেলেছে নিজেকে। তাই তার মনে এতটুকু আক্ষেপ নেই। তাই সে চোখ বুজে প্রাণ দিয়ে গাইতে পারছে—

"নিরালায় বসিয়া গো
আমার প্রাণ কাঁদে তাহারি লাগিয়া।
আমায় ঘুমের ঘোরে দেয় সে দেখা গো
তারে না দেখি জাগিয়া।
আমার প্রাণ কাঁদে তাহারি লাগিয়া॥"

আছে বেশ।

শুধু কেঁদেই ও তৃপ্ত।

আর করবেই বা কি? আছেই বা কি আর করবার?

কেঁদে যদি ওর চাওয়া-পাওয়ার চরম শান্তি হয় ত হোক, কার কি বলবার আছে?

কিন্তু ওটুকু তৃপ্তিলাভও আমার কপালে নেই।

ওতে আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে।

সেদিনও লেগেছিল আঘাত আত্মমর্যাদার গায়ে। সেই জন্যেই আমার করা হয় নি আত্মসমর্পণ। অনবরত নিজেকে নিজে বুঝিয়েছি—ছিঃ, কেন যাচ্ছ ওর কাছে নিচু হ'তে? থাকলেই বা ওর রূপ-যৌবন, তুমি কি কম নাকি কিছু ওর কাছে? তুমি উদ্ধারণপুরের সাঁইবাবা, তুনিয়াসুদ্ধ মানুষ এসে তোমার পায়ে গড়াচ্ছে, তোমার প্রসাদলাভের আশায় কত মানুষে মাথা খুঁড়ে মরছে, মড়ার গদির ওপর চেপে ব'সে যে মোক্ষম ধাপ্পা দিতে পেরেছ তুমি মানুষকে, তার তুলনায় ঐ তুধে-আলতা রঙের রক্ত-মাংসের ডেলাটা হ'তে গেল বড? ছিঃ!

শুধু কি তাই?

শুধু কি নিজেকে অনেক উঁচুতে তুলেছিলাম বলেই পারি নি সেদিন নিতাইয়ের ডাকে সাড়া দিতে?

ওর সঙ্গে আরও কিছু ছিল না?

ছিল এবং সেই কাঁটাটাই সবচেয়ে বড় হয়ে খচখচ করে উঠেছিল তখন। সেই কাঁটা ঐ চরণদাস, ঐ যে বুঁদ হয়ে বসে গাইছে—

"মন রে বুঝাইলাম কত—

হইলাম না তার মনের মত
না পাইলাম সে চিকন কালিয়া।"

কি যেন বললে বাবাজী ?

"মন রে বুঝাইলাম কত
হইলাম না তার মনের মত—"

হ্যাঁ—ঐ আর একটি রোগ। তার মনের মত হ'তে পারব ত ? এই ভয়েই মরেছি তখন কেঁপে। ঐ মারাত্মক রোগেই তখন পেয়ে বসেছিল আমায়।

নিজেকে বড় বলেও ভাবতাম, খাটো করেও ভাবতাম। অনবরত কে যেন ভেতর থেকে অতি চুপি চুপি বলত আমায় তখন—

বলত—"সাবধান—ও আগুন ছুঁতে যেও না। নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, কি আছে তোমার ! কি দেবে ঐ জ্বলন্ত আগুনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মুখে ! কি দিয়ে ঐ লেলিহান অগ্নিশিখার তৃপ্তিসাধন করবে তুমি ?"

মানে—ভয়। একটা নির্জলা বোবা ভয় পেয়ে বসত আমার নিতাইকে সামনে দেখলেই।

তাই অনেকগুলো মহেন্দ্রক্ষণ পিছনে পালিয়ে গেছে।

এখন কপাল কুটে ম'লে কতটুকু ফললাভ হবে ?

কিন্তু চরণদাসের লাভ-ক্ষতির পরোয়া নেই।

তার সকল জ্বালা জুড়োবার পথ খোলা আছে।

সে গাইলে—

"সে যদি না আসে ফিরে—
ঝাঁপিব যমুনার নীরে—
সকল জ্বালা জুড়াইব—
এ ছার পরাণ দিয়া।
আমার প্রাণ কাঁদে তাহারি লাগিয়া ॥"

সহজ পন্থা বটে, সহজ এবং সংক্ষিপ্ত।

কিন্তু ওর যে প্রাণ কাঁদে তার জন্যে। আমার তাও কাঁদে না। উদ্ধারণপুরের বাদশার গোলামের গোলাম আমি। অত সহজে কাঁদে না আমার প্রাণ। সাদা হাড় আর কালো কয়লা দেখতে দেখতে—আর ঝলসানো মাংসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে—কান্না-টান্নার মত তুচ্ছাতিতুচ্ছ রোগগুলো দূর হয়ে গেছে আমার

ত্রিসীমানা ছেড়ে। লোক আর যাই সহ্য করুক, সাঁইবাবার চোখে জল—এই কুৎসিত দৃশ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না কেউ। আর তাতে যে আমি লজ্জাতেই মরে যাব। কোন নদ-নদীর ধারে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার দরকারই যে হবে না আমার তখন।

উদ্ধারণপুরের বাস্তব।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর রূপের বর্ণনা।

"মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং।
বিভ্রতং দন্তখট্টাঙ্গং দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং।
ব্যাঘ্র চর্মাবৃত কটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং।
জটাভারলসচ্চন্দ্র খণ্ডমুগ্রং জলন্নিব॥"

মনে মনে বললাম—হে সর্বদ্রষ্টা, তুমি ত জান যে নিজেকে নিজে ঠকাই নি আমি। তবু আজ জলে মরছি কেন? কেন আমার শ্মশান-শয্যা আজ আমায় শান্তি দিতে পারছে না? কেন আজ বার বার মনে হচ্ছে যে হয়ত সত্যিই আমি দায়ী নিতাইয়ের ওভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলার জন্যে। কি করতে পারতাম আমি? এখনই বা কি করতে পারি আমি তার?

নেপথ্য থেকে হাঁক দিয়ে কে গাইলে—

"মানব-তরী মাল্লা রে ছয়জনা
ছয়জনা ছয়দিকে টানে কোনও কথা মানে না।"

সোজা হয়ে উঠে বসলাম।

খন্তা ঘোষ। খন্তা ঘোষ উদ্ধারণপুরের জ্যান্ত বাস্তব। ফিরে আসছে খন্তা। রাতে সে শ্মশানে নামে না। আজ নেমে আসছে, আসছে শুধু চরণদাসের জন্যে। চরণদাসের জন্যে—কাঁচা গাঁজা নিয়ে আসছে খন্তা। বাবাজীর কষ্ট হবে যে সারারাত।

আরও কাছে এসে গেল। শোনা গেল তার দরাজ গলা—

"মানব-তরী মাল্লা রে ছয়জনা
ছয়জনা ছয়দিকে টানে কোনও কথা মানে না।
এখন গুন ছাড়িয়া সব পলাইল

একা রহিলাম পড়ি।

মন রে আমার—ডুবল মানব-তরী ॥"

বাউণ্ডুলে বাউল খন্তা ঘোষ গাইতে লাগল—

"মন রে আমার

ডুবল মানব-তরী।

ভব সাগর পাকে 'পড়ে

মন রে আমার

ডুবল মানব-তরী ॥

দয়াল গুরু বিনে—

কে আছে রে—

তুলে নেবে হাত ধরি ॥

মন বে আমাব—

ডুবল মানব-তরী ॥"

গুব্-গুবা-গুব্ বগলে চেপে ধরে চরণদাস উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। তারেতে দু'টো ঘা দিতেই খন্তা ঝপ্ করে থামিয়ে ফেললে গান। থামিয়েই হাসি—হি হি হা হা হো হো। হাসতে হাসতে খন্তা এসে থামল বাবাজীর সামনে।

চটে গেল বাবাজী—"এই, হাসছো যে বড ?"

"হাসবো না ? ওরে বাপরে, হাসবো না ? হি হি হি হা হা হা হো হো হো।" আরও বেদম হাসি হাসতে লাগল খন্তা ঘোষ পাগলের মত।

আরও বেদম চটে গেল চরণদাস—"দেখ, থামাও বলছি হাসি, নয়ত দোব ঘাড মটকে গঙ্গায় ফেলে।"

"তা তুমি পার বাবা। একশবার পার সে কাজ। আমি ত তোমার কাছে নস্যি। গণ্ডাকতক বাগদী লেঠেলকে ঠেঙিয়ে লাশ ক'রে ছেড়ে দিলে একলা। সে তুলনায় আমি ত ফড়িং। আমাকে ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলতেও পাব বাবা তুমি। তাতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না। কি সর্বনেশে বাবাজী বে বাবা।"

এবার চরণদাসও হেসে ফেললে। বললে—"ডাঁট বেরসিক হ্যা তুমি! অমন গানটা ঝপ্ ক'রে বন্ধ করতে আছে ?"

"কি করি বল, ঘাস দেখে যে ঘোড়ার মুখ চুলকে উঠল।"

চরণদাস এবার প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল—"আরে দূর দূর, তোমার মত তাল-কানার সঙ্গে বাজায় কে ?"

খন্তা হাত জোড় ক'রে বললে—"ঠিক বলেছ দাদা, একটা লাখ কথার এক

কথা বলেছ। তাল-কানা হয়েছি বলেই এখনও হেসে-খেলে বেঁচে আছি। তোমাদের মত তাল-জ্ঞান থাকলে শুধু তাল ঠুকেই মরতে হ'ত আজ। নাও ধর, তোমার জটা এনেছি, এবার জুত করে ব'সে টান।"

প্রসন্ন হয়ে উঠল বাবাজী। বললে—"মাইরি বলছি তোমায় ঘোষ মশাই, গান যদি শিখতে তুমি তা'হলে বাজিমাত ক'রে ছাড়তে একেবারে।"

খন্তা আর কান দিলে না ওর কথায়। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে—"কোথায় নামাব এগুলো গোসাঁই ?"

তখন নজর করে দেখলাম—একটা বেশ বড় ময়রার দোকানের ঝুড়ি রয়েছে ওর হাতে। একটু যেন সঙ্কোচ ফুটে উঠলো খন্তার স্বরে।

"খাবার নিয়ে এলুম গোসাঁই বাজার থেকে। যে হুল্লোড় চলল আজ সারা দিন এখেনে—খাওয়া-দাওয়ার কথা মাথায় উঠে গেছে সকলের। তাই আনলুম কিছু কিনে। আমাদের বাবাজী ত আবার খিদে সইতে পারেন না।"

তখন আমারও খেয়াল হ'ল। তাই ত। সত্যিই তখনও কিছু মুখে দেয় নি চরণদাস। নিতাই থাকলে অনেকক্ষণ আগেই ওর খাওয়ার যোগাড় করত। একটা লঙ্কা পোড়া আর একটু নুন মেখে একরাশ ভাত গিলে এতক্ষণে টানটান হয়ে শুয়ে নাক ডাকাত বাবাজী। খিদে পেলে ওর জ্ঞান থাকে না। ছোট ছেলের মত আনচান করতে থাকে। সেই চরণদাস আজ সারাটা দিন কিছু মুখে দেয় নি। তার ওপর কপাল ফেটেছে ওর, একরাশ রক্তপাত হয়েছে।

রাগে ক্ষোভে গুম হয়ে বসে রইলাম।

হতভাগী—সোনা ফেলে কাঁচ নিয়ে আঁচলে বাঁধলি। চরণদাস সোনা, সোনার চেয়ে ঢের বড় চরণদাস বাবাজী—সোনা যাতে ঘষে পরীক্ষা করা হয় সেই কষ্টি-পাথর। বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল তোকে। পাছে ওকে ঠকাতে হয় এই ভয়ে আমি কিছুতেই নামিনি আমার মড়ার গদি ছেড়ে তোর ডাকে। সেই চরণ-দাসকে ভাসিয়ে দিয়ে আজ তুই মজা লুটছিস একটা মাকালফল নিয়ে।

খন্তা একটা ধমক লাগালে আমায়।

"এগুলো ধরবে, না টেনে ফেলে দোব গঙ্গায় ?"

চমকে উঠে নেমে গেলাম গদি থেকে। মিনতি ক'রে বললাম—"একটু সবুর কর খন্তা। হাতটা ধুয়ে আসি।"

ব'লে চলে গেলাম গদির পেছনদিকে। সেখানে কলসীতে ছিল খাবার জল। হাত ধুয়ে কলসীটাই উঠিয়ে নিয়ে এলাম। খাবার খেয়ে ওরা জল খাবে।

ততক্ষণে ধুনিটে উসকে দিয়ে কলকেতে আগুন চাপিয়েছে বাবাজী। খন্তার

হাত থেকে ঝুড়িটা নিয়ে ধুনির পাশে নামালাম। দু'খানা শালপাতা খুলে নিয়ে দু'টো ঠোঙা বানিয়ে ভাগ করতে বসলাম খাবার। খন্তা গেল গঙ্গায় মুখ হাত ধুতে। বাবাজী চোখ বুজে বসে কলকেয় দম লাগাতে লাগল।

একটা ঠোঙায় খাবার ভরে চরণদাসকে বললাম—"নাও ধর, এবার মুখে দাও কিছু।"

রক্তবর্ণ চোখ দু'টো মেলে বাবাজী তাকালে আমার দিকে। হাত বাড়ালে না।

আবার বললাম—"ধর এটা, খন্তার খাবারটাও তুলে ফেলি ঠোঙায়।"

চরণদাস মুখ নামিয়ে নিয়ে বললে—"থাক, ওতে আর আমার কাজ নেই।"

একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম—"সে কি! খাবে না তুমি কিছু?"

আরও ঠাণ্ডা আরও মৃদু স্বরে বাবাজী বললে—"ও সমস্ত আর আমার ভাল লাগে না গোসাঁই।"

আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম—"দোকানের খাবার ত তুমি খাও বাবাজী। এখন ভাতের যোগাড় হয় কি করে? নাও ধর, যা জুটেছে তাই খেয়ে রাতটা কাটাই এস।

বাবাজী শুধু মাথা নাড়লে।

তখন একটু চটেই গেলাম—বেশ একটু অভিমানও হ'ল। বললাম—"চরণদাস তা'হলে নেবে না তুমি আমার হাত থেকে খাবার?"

মাথাটা এগিয়ে এনে বাবাজী আমার হাতে-ধরা ঠোঙায় কপাল ঠেকালে। খুব চুপি চুপি বললে—"কারও হাত থেকেই আর কিছু নোব না গোসাঁই। যে হাত থেকে খাবার জিনিস নিতাম আমি, খাওয়ার জন্যে যার ওপর জুলুম চালাতাম, সে আর নেই। সে হাত দু'খানা খুইয়েছি আমি। তাই ও কাজ আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি।"

আতকে উঠলাম—"সে কি! সেই থেকে খাও না তুমি কিছু?

তেমনি ভাবে ফিসফিস ক'রেই বললে বাবাজী—"না গোসাঁই, আমার আর দরকার করে না খাওয়ার। এই ত বেশ আছি। শুধু জল খেয়ে কেমন তাজা রয়েছি। শুধু জল খেয়েই কাটাব যতদিন না সে ফেরে।"

আর সামলাতে পারলাম না নিজেকে। খাবারের ঠোঙাটা নামিয়ে রেখে দু' হাতে ওর হাত দু'টো জড়িয়ে ধরলাম। একটা অবাক্ত যন্ত্রণায় গলাটা বুজে গেছে আমার তখন। শুধু কোনও রকমে বলতে পারলাম—"চরণদাস!"

চরণদাস হাত ছাড়ালে না। ওর কণ্ঠ থেকে মর্মান্তিক অনুনয় বার হ'ল—"একটা কথা তোমায় বলব গোসাঁই। বল রাখবে? বল?"

পাষাণ গলে যায় এমন আকুতি।

বললাম—"বল চরণদাস, বল তোমার কথা। তোমার কথা রাখতে যদি মড়ার গদিও ছাড়তে হয়, তাও আমি ছাড়ব এবার—বল তোমার কথা—"

অনেকটা সময় বাবাজী মুখ নিচু ক'রে রইল, যেন বলতে গিয়ে তার কোথায় আটকাচ্ছে। শেষে মুখ নিচু করেই বললে, বললে যেন একটি একান্ত লজ্জার কথা, একটি অতি গোপনীয় কথা বললে যেন চরণদাস।

বললে—"যদি সে কোনও দিন ফেরে ত তাকে বোল যে আমি শেষ সময় পর্যন্ত এ বিশ্বাস বুকে রাখতে পেরেছি যে সে কোনও ছোট কাজ করতে পারে না।"

ঝট্ করে হাত টেনে নিলাম আমি। গর্জে উঠলাম—"কি? কি বললে তুমি চরণদাস? এর পরও তুমি বলতে চাও যে সে ছোট কাজ করতে পারে না?"

ওর লাল চোখ দু'টোয় অস্বাভাবিক একটা আলো দেখা গেল। অতি মধুর হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে—"হ্যাঁ তাই গোসাঁই, ঠিক তাই, ঠিক তাই, ঠিক তাই। নিতাই দাসী কোনও দিন ছোট কাজ করতে পারে না এই বিশ্বাস নিয়েই যেতে পেরেছে চরণদাস বৈরাগী—এইটুকুই শুধু জানিয়ে দিও তাকে। এই আমার শেষ আব্দার তোমার কাছে।"

কয়েকটা মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। ধুনির আলোয় চরণদাসের কালো মুখখানা আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল—কোথায় যেন একটা কিছু বুঝতে ভুল হচ্ছে আমার। খেই হারিয়ে ফেলেছি যেন আমি সব ব্যাপারটার। চরণদাস আর নিতাই দাসী এই দু'টো জট-পাকানো সুতোর জট খোলার সাধ্য আর যারই থাক, উদ্ধারণপুরের সাঁই-বাবার নেই। বুকের মধ্যে যে জিনিস থাকলে তাই দিয়ে ভিজিয়ে ও জট নরম করা যায় সে জিনিস নেই আমার বুকে। শুকিয়ে গেছে। উদ্ধারণপুরের বাস্তব বাদশার গোলামী করতে করতে এ বান্দার বুকের ভেতরটা শুকনো ছোবড়া হয়ে গেছে। নিতাই দাসী আর চরণদাসের ব্যাপারে নাক গলাতে যাওয়া আমার মত শ্মশান-শকুনের পক্ষে চরম বিড়ম্বনা।

কিন্তু শুধু জল খেয়ে বেঁচে আছে যে ও! শ্মশানে বসেও যে আমরা খাচ্ছি। শেয়াল-শকুন-কুকুর আমি—আমরা যে শ্মশানে বাস করছি, শুধু মজা ক'রে পেট ভরাবার আশায়। সেই পেটের দাবিও যে অগ্রাহ্য ক'রে বসেছে বাবাজী। ও হতভাগা বুঝছে না কেন, যে আগুন পেটের মধ্যে জ্বলছে সে আগুনে কিছু না দিলে তা বাইরে বেরিয়ে এসে ওকেই নিঃশেষে ছাই ক'রে ছাড়বে। তখন কোথায় থাকবে ও নিজে, আর কোথায় থাকবে ওর নিষ্পাপ নিতাই বোষ্টমী। শুধু এই

শ্মশানময় পড়ে থাকবে কিছু সাদা হাড় আর কালো কয়লা। সাদা হাড আর কালো কয়লার বুক ভরা বেদনা বুঝবে কে তখন?

শেষ বারের মত শেষ চেষ্টা করতে গেলাম। আবার ধরলাম ওর হাত দু'খানা জাপটে। ধরে ধরা-গলায় বললাম—"চরণদাস বাবাজী, এই তো একটু আগে বললে—দোষ সব আমার। আমার দোষেই নিতাই গেছে। আমার দোষের জন্তে তুমি কেন প্রায়শ্চিত্ত ক'রে মরবে? করতে হয় সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব। যেভাবে পারি, যেমন ক'রে পারি, আমি ফিরিয়ে এনে দোব তোমার নিতাইকে—"

আমার কথাটা শেষ হ'তে পেল না।

উদ্ধারণপুরের বেহেড বাস্তব হি হি ক'রে হেসে উঠল পেছন থেকে।

"বলি হচ্ছে কি ও? যেন মানভঞ্জন-পালা চলছে! ব্যাপার কি?"

দীনতম দীনের মত হয়ে উঠল বাবাজীর চোখের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি কি বলতে চায় আমায় বুঝলাম। বলতে চায়—"দোহাই তোমার, যা একান্ত ভেতরের ব্যাপার —তাকে বাইরে টেনে এনে বে-ইজ্জৎ কোর না।"

দিলাম বাবাজীর সেই দৃষ্টির মূল্য। ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম—"আয খন্তা, এই তোর কথাই হচ্ছিল। বাবাজীকে তাই বোঝাচ্ছিলাম—না হয় করেই ফেলেছে একটা কাজ, ব্যাটাছেলে মানুষ, ও-রকম হযই একটু-আধটু। তা'বলে সেই মেযেকেই যে এনে গলায ঝুলিয়ে রাখতে হবে এই বা কেমন কথা।"

উবু হযে বসে পডল খন্তা। চোখ দু'টো বড বড ক'রে বললে—"তার মানে?"

খুব ভালমানুষী গলায় বলতে লাগলাম—"মানে সেই মেয়েটার আস্পর্দার বহরটা দেখে একেবারে থ' হয়ে গেছি কিনা। বলে কিনা, আর একটা মাস দেখব তারপর গলায দড়ি দিয়ে ঝুলব।"

"কে আবার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে যাচ্ছে কোথায়? কি ব্যাপার কি গোসাঁই? কে সে? আর ঐ সঙ্গে আমার কথাই বা হচ্ছিল কেন?"

খন্তার ঠোঙায় খাবার তুলতে তুলতে বললাম—"ঐ যে রে, সেই যেন কি নাম ওদের গাঁয়ের? সেই গাঁয়ের শীলের বাড়ীর ভাগনী না কি। কি যেন তার নামটা ছাই, মনেই আসছে না।"

ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরলাম খন্তার দিকে।

হাত দিয়ে ঠেলে দিল খন্তা আমার হাতখানা। দম-আটকানো সুরে বললে "সে মেয়েকে তুমি জানলে কেমন ক'রে গোসাঁই?"

বেশ বিরক্ত হয়ে গেলাম—"আর বলিস কেন সে ঝঞ্ঝাটের কথা? সেই যে তুই গেলি দারোগাকে নিয়ে—আর ত এমুখো হলি না। এধারে কত কাণ্ডই

যে ঘটল। এল কৈচরের বামুনদিদি, সঙ্গে এক খদ্দের। ভাবলুম ছু'টো টাকার মুখ দেখতে পাব। ওমা, তা নয়, যত সব 'অনাছিষ্টি' কাণ্ড। বামুনদিদির চোখ এড়িয়ে খদ্দের এসে চুপি চুপি আমায় বললে যে সে ওষধ-পত্তর নিতে আসে নি! এসেছে তোর খোঁজে। কে নাকি তাকে বলেছে যে আমায় ধরতে পারলেই আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারব, যাতে তুই গিয়ে তার হাতের ভেতর ঢুকিস।"

দাঁত-বার-করা চেহারাটার দিকে একবার আড়চোখে চাইলাম। দাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে খস্তা ধুনির আগুনের দিকে। ও যেন নেই সেই দেহের মধ্যে।

আবার বাড়িয়ে ধরলাম ঠোঙাটা।

"নে, ধর্ খস্তা, এবার মুখে দে কিছু।"

গ্রাহ্যও করলে না খস্তা ঘোষ। সেইভাবে একদৃষ্টে আগুনের মধ্যে কি দেখতে দেখতে বললে—"সেই মেয়েটার থুতনিতে একটা বেশ বড় তিল আছে না গোসাঁই? কথা বলতে বলতে তার নাকের ডগাটা কেমন যেন ঘেমে ওঠে না? আর কেমন যেন ভুরু ছু'টো কুঁচকে কথা বলে না সে?"

বললাম—"হাঁ হাঁ হাঁ, ঠিকই ত, মনে পড়েছে এবার। তিল ত একটা ছিল বটে তার মুখে। আর নামটাও যেন পড়ছে এবার—সোনা—সোনাই বোধ হয় হবে তার নাম—"

"সোনা নয় গোসাঁই, ভুল হচ্ছে তোমার। মেয়েটার নাম সুবর্ণ।" শরীরের অনেক ভেতর থেকে যেন কথা কটা উচ্চারণ করলে খস্তা ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে কিসে যেন একটা সজোরে ধাক্কা দিলে ওর ভেতর থেকে।

সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল খস্তা। দাঁত কটা আবার বেরিয়ে পড়ল তার। চরণদাসের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলে—"বাবাজী, ছোড়দি কোথায়?"

একটিবার মাত্র তাকিয়ে দেখলাম বাবাজীর মুখের দিকে। খস্তার প্রশ্ন শুনে ভয়ে ওর চোখ ছু'টো কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হাঁ ক'রে কি বলতে গেল বাবাজী, গলা দিয়ে আওয়াজ বার হ'ল না।

একটুও দ্বিধা না ক'রে তৎক্ষণাৎ শুরু করে দিলাম—"সেই কথাই ত হচ্ছিল রে এতক্ষণ। চরণদাস জানবে কেমন ক'রে নিতাই আছে কোথায়? সেই সোনা না সুবর্ণ, সে ত এসে বলে গেল আমায় ক'দিন আগে, যে তোর ছোড়দি গিয়ে নাকি তাকে বলেছে আমার কথা। সেইখানেই নাকি আড্ডা গেড়েছে আজকাল তোর ছোড়দি। নিজে তিনি আসতে পারলেন না আমার সামনে, মেয়েটাকে

পাঠালেন বামুনদিদির সঙ্গে। তুই যেন আমার কেনা গোলাম, আমি হুকুম করলেই অমনি ছুটে গিয়ে সেই মেয়ের আঁচল ধরে ঝুলে পড়বি!"

এবার একটু সহজ হ'ল খন্তা ঘোষ, সোজা পথে এল এতক্ষণে। সাদা গলায় বললে—"ও, তাই বল। সে কথা বল নি কেন এতক্ষণ? তাই ত ভাবছি আমার ঠিকানাটা সে যোগাড করলে কোথা থেকে? তা বলে গেল কি সে তোমার কাছে গোসাঁই?"

"কি আবার বলবে? বললে সেই একই কথা, আর সে এক মাস দেখবে। এক মাসের ভেতর যদি তুই তাকে সেখান থেকে উদ্ধার না করিস ত গলায় দড়ি দেবে।"

"কেন, গলায় দড়ি দেবে কেন? কি এমন হ'ল এর মধ্যে যে গলায় দড়ি দিতে হবে তাকে?" বলে খন্তা নিজের গলাটাই একবার হাত দিয়ে ঘষে নিলে।

খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম—"হবে আর কি? যা হয়ে থাকে। বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি? সাঁইথের এক বডলোক মহাজন বহু টাকা দিতে চায় তাকে বিয়ে করার জন্যে' লোকটার বয়েস নাকি ষাট পেরিয়েছে। সুবর্ণর মামারা ঝুঁকে পডেছে টাকার লোভে।"

ঝাঁ ক'রে উঠে দাঁডাল খন্তা—"কি? কি বললে তুমি গোসাঁই? সুবর্ণ যে বিধবা, খুব ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল, বিধবাও হয়েছে ছোটবেলায়। আবার তার বিয়ে হবে কেন?'

"কি ক'রে জানব বল? শীল-ফিলেদের ঘরে হয় বোধ হয় বিধবার বিয়ে। তা ছাডা অত ছোটবেলায় বিধবা হ'লে বিয়ে হওয়াই ত উচিত।"

দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে বললে খন্তা ঘোষ—"তা বলে সেই শুয়োরের বাচ্চা ঘাটের মডা সাঁইথের মোথ্‌রো শীল? শকুন উডছে শালার সাদা মাথার ওপর। দু' হাতে শালার টুঁটিটা টিপে যদি না ধরি এক দিন—"

খন্তা আর শেষ করলে না কথাটা। এক লাফে বাবাজীর সামনে প'ডে দু' হাতে জডিয়ে ধরলে তাকে। ধরে টানাটানি জুডে দিলে—"ওঠ বাবাজী, ওঠ শীগ্‌গীর। আজ রাতারাতি যেভাবে হোক পৌঁছতে হবে পাচুন্দি। বিয়ে দেবার শখ শালাদের ঘুচিয়ে দোব জন্মের শোধ।"

বাবাজীও উঠে দাঁডাল তডাক ক'রে। একেবারে অন্য মানুষ, এতক্ষণ যেন আগুন ছিল না চরণদাসের শরীরে। যে মানুষটা একটু আগে বেদনায় নুয়ে পড়েছিল এ যেন সে মানুষ নয়। ধুনির আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর শরীরের পেশীগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে।

একবার বলতে গেলাম খন্তাকে যে চরণদাস শুধু জল খেয়ে বেঁচে আছে। কথাটা বেরোল না মুখ দিয়ে। শুধু কোনও রকমে বলতে পারলাম—"নিয়ে যাস নি খন্তা, না খাইয়ে নিয়ে যাস নি বাবাজীকে। তুইও দিয়ে যা কিছু মুখে।"

অন্ধকার নিমগাছতলা থেকে ভেসে এল খন্তার জবাব—"দূর ক'রে ফেলে দাও ও-গুলো, শেয়াল-কুকুরের পেট ভরুক।"

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

ঘাটের কিনারায় মাথা কুটছে গঙ্গা।

মাথা কুটছে উদ্ধারণপুরের বাস্তবের পায়ে।

নিরাসক্ত নির্বিকার বাস্তব একটানা পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছেন গঙ্গার কিনারায়। তাঁর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে—ছলাৎ ছলাৎ। এতটুকু ব্যস্ততা নেই, নেই বিন্দুমাত্র উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তাঁর পা ফেলার ছন্দে। সবই যে জানেন তিনি, উদ্ধারণপুরের অন্ধকারের ওপারে কি ঘটবে, কি ঘটেছে, কি ঘটতে পারে, সবই যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তাই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বোত্তম, সর্বেশ্বর, সর্বংসহ। তাই কোনও সর্বনাশই তাঁকে টলাতে পারে না।

কিন্তু মড়ার গদির ওপর বসেও যে আমার বুক কাঁপে।

কম্পিত বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে তাঁর মহামন্ত্র—

"হুঁ ক্ষৌঁ যাং রাং লাং বাং আং ক্রোঁ মহাকাল ভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা।"

আকুল হয়ে বার বার তাঁকে জানাই—"ফিরিয়ে দাও, ওদের দু'জনকে ফিরিয়ে দাও, নিও না গো, কেড়ে নিও না ওদের—"

গঙ্গার এপার-ওপার দু'পার জুড়ে হঠাৎ হাসাহাসি শুরু হয়ে যায়—"হুয়া-হুয়া হুয়া-হুয়া—"

উদ্ধারণপুরের বিস্ময়।

বিস্ময় বর্ণচোরা বহুরূপী।

সাদা হাড় আর কালো কয়লার চোখে তাক লাগাবার জন্তে ভোল ফিরিয়ে আসে সে, এসে হাসে কাঁদে নাচে গায় আর মস্করা করে। এমন মারাত্মক জাতের মস্করা করে যে তা শুনে কালো মুখ সাদা হয়ে যায় আর সাদা মুখ কালো আঁধার

হয়ে ওঠে। যারা মুখ পুড়িয়ে চিতায় চড়ে শুয়ে থাকে তাদের আঁতে এমন আচমকা ঘা দেয় সেই মস্করা যে বেচারারা খলখল ক'রে হেসে উঠতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে।

উদ্ধারণপুরের বিস্ময়।

বিস্ময় বিস্তার করে বাগজাল।

বলে—"বড় আরামে আছ বাবা—এঁ্যা? বেশ মজা ক'রে পুড়ছো বসে বসে। পোড়ো—চিরকাল ধরে পোড়ো। কিছুতেই নিভবে না আগুন, কোনও কালে শেষ হবে না তোমার জ্বলুনির। মরণকে ফাঁকি দেবার জন্যে পালিয়ে এসে লুকিয়ে ব'সে আছ এখেনে, থাক। কে দেবে তোমায় নিষ্কৃতি? চুপি চুপি এসে ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে যে বন্ধু বুকে টেনে নেয় সে যে ভয়ে ঢুকতে পারে না এখেনে। এই হিংস্র হ্যাংলা নির্লজ্জ জীবনের গ্রাস থেকে কে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে রেহাই দেবে?"

উদ্ধারণপুরের বিস্ময়।

বিস্ময় বাধায় বাগড়া।

থতমত খেয়ে যাই। হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। বিলকুল ভোল ফিরিয়ে এসেছে। কোথায় গেল সেই কপাল-জোড়া ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটাটা! কোথায় গেল সেই বীভৎস চুল-দাড়ির জঙ্গল। কোথায় গেল সেই ভাঁটার মত অগ্নিবর্ণ চোখ দুটো। আর কোথায়ই বা লুকোলো সেই বুকের রক্ত-শোষা ভয়াবহ দৃষ্টি! তার বদলে গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দুধের মত সাদা আলখাল্লা পরে যে মানুষটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার মাথায় মুখে কোথাও চুল-দাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। চক্ষু দু'টিতে নেই এতটুকু আকাঙ্ক্ষার আগুন। সব পাওয়ার যা বড় পাওয়া তার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি যেন উপচে পড়ছে চক্ষু দু'টি থেকে। সব জানার যা বড় জানা তা জানা হয়ে গেলে যে জাতের রহস্যময় হাসি হাসতে পারে লোকে, সেই জাতের হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে। এমন কি গলার আওয়াজও গেছে পালটে। যে গলা উদ্ধারণপুর ঘাটের শেয়াল-শকুনের পিলে চমকে দিত, সে গলায় উঁকি দিচ্ছে রসিকতার রহস্য।

বললে—"বলি হ'ল কি হে তোমার? ভিরমি গেছ নাকি? চেনা মানুষেকে চিনতে পার না? শুধু খোলসটা পালটেছি বাবা, ভেতরে যে কালসাপ সেই কালসাপই আছি। এখন শুধু একটু কৃপা, এতটুকু করুণা যদি পাই তা'হলেই

হয়। নয়ত আমার সাধ্য কি ওপর-ভেতর এক ক'রে দোব তাঁকে!"

বলতে বলতে ছ'চোখে জল এসে গেল। বুজে এল চোখের পাতা। ধরা গলায় আরম্ভ করে দিলে—

"যদপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি
ন তব নখাগ্র-মরীচিং।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত
তদপি কৃপাদ্ভুত-বীচিং॥
দেব ভবন্তং বন্দে।
মন্মানস-মধুকরমর্পয় নিজ-
পদ-পঙ্কজ-মরকন্দে॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব
ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক—
দুর্ঘট-ঘটন বিধাত্রী॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন
কলিতাদ্ভুত-রস-ভারং।
নিবসতু নিত্যমিহামৃত-নিন্দিনি
বিন্দন্মধুরিম-সারং॥"

এক বর্ণও মাথায় ঢুকল না। তবু বেশ লাগল শুনতে। আগমবাগীশের গলায় সব রকমের স্তোত্রই খোলে ভাল। সব রকম সাজেই মানায় আগমবাগীশকে। কিন্তু একলা যে। আর একজন কই? বাসি ফুলে ত পুজো হয় না ওঁর! টাটকা ফুল চাই। কিন্তু কই, কেউ ত এসে দাঁড়ালো না এবার ওঁর পেছনে!

না আসুক, কিন্তু উপযুক্ত সমাদর করতে হবে আগমবাগীশকে। তাড়াতাড়ি গদির পাশ থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে লাফিয়ে নামলাম।

"চলুন, আসন করুন, আগে একটু তর্পণ করুন।"

বেশ ধীরেসুস্থে নেড়া মাথাটি ছ'পাশে দোলাতে লাগলেন আগমবাগীশ। বেশ সুর ক'রে বলতে লাগলেন—"না, না না, ও আর মুখে এন না গোসাঁই। ও কথা কানে ঢোকাও পাপ। শুধু একটু চরণামৃত আর একখানি চরণ-তুলসী, সেই সকালে একটিবার মাত্র গ্রহণ করি। ব্যস—ব্যস—আর কিছু না। ত্রিতাপজ্বালা জুড়িয়ে শীতল হয়ে যায়। তারপর নাম, শুধু নামামৃত, আর কিছু না, আর

কিছুরই প্রয়োজন করে না এখন।"

ঘাবড়ে গিয়ে বোতলটা পেছনে লুকিয়ে ফেলি। আগমবাগীশ দু'চোখ বুজে ফেলেছেন। মৃদু মৃদু কাঁপছে তাঁর ঠোঁট দু'খানা। অতি চাপা সুরে আবার আরম্ভ হোল—

"মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লব—
বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।
তিলক-বিড়ম্বিত-মরকত-মণিতল—
বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্॥
যুবতি-মনোহর-বেশম্।
কলয় কলানিধিমিব-ধরণীমনু—
পরিণত-রূপ-বিশেষম্॥"

হঠাৎ দু'চোখ খুলে ফেললেন আগমবাগীশ। আমার মুখের ওপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—"দেখেছ? কখনও দেখেছ এ রূপ? কখনও এ রূপের ছায়া পড়েছে তোমার চোখে? পড়ে নি, পড়লে আর ও চোখের দৃষ্টিতে ভয় লুকিয়ে থাকত না। মরণের ভয়ে লুকিয়ে ব'সে থাকতে না এখানে। তুমিও বলতে পারতে—

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

আচম্বিতে নাকী সুরে খ্যাক খ্যাক ক'রে কে হেসে উঠল আমার গদির পেছন থেকে। দু'জনেই চমকে উঠে ফিরে চাইলাম সেদিকে। চেয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরিষ্কার দিনদুপুরে কে ওখানে ওভাবে প্রেতের হাসি হাসছে?

এক দুই তিন চার—কয়েকটা দমে ভারী মুহূর্ত সরে গেল। তারপর আবার—আবার সেই খিঁ খিঁ খিঁক খিঁক হাসি। হাসির শেষে ভেংচানো নাকী সুরে বার হ'ল—

"মরঁণ রেঁ তুঁহুঁ মঁমঁ শ্যাঁম সঁমান—"

মুখ ফিরিয়ে চাইলাম আগমবাগীশের মুখের দিকে। কালি ঢেলে দিয়েছে মুখে। উদ্ধারণপুরের ভস্মের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আগমবাগীশের মুখখানা। দুই চোখের দৃষ্টিতে—যেখানে এইমাত্র উপচে পড়ছিল পরিতৃপ্তি—সেই দৃষ্টিতে এখন ফুটে উঠেছে আতঙ্ক আর আকুলতা আর আত্মগ্লানি। গদির পেছন দিকে চেয়ে আছেন তিনি একদৃষ্টে—আর পিছুচ্ছেন। একটু একটু ক'রে পিছুতে লাগলেন আগমবাগীশ, আর একটু একটু ক'রে আবির্ভূত হ'ল—আপাদ-মস্তক মিসমিসে

কালো কাপড়ে ঢাকা এক মূর্তি আমার গদির পেছন থেকে। হঠাৎ আগমবাগীশ উদ্ভট একটা চিৎকার ক'রে পেছন ফিরে দিলেন একটা লাফ'গঙ্গার দিকে, হাত চার-পাঁচ দূরে ঢালু পাড়ের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে হড়হড় করে পিছলে নেমে গেলেন গঙ্গার জলে। সেখান থেকে আবার একটা বুকফাটা চিৎকার শোনা গেল। ওধারে দু'টো চিতার পাশে যারা খোঁচাখুঁচি করছিল তারা দৌড়ে এসে পৌঁছে গেল যেখানে আগমবাগীশ জলে পড়েছেন সেখানে। তাবাও লাগল চেঁচাতে, কিছু না বুঝেই চেঁচাতে লাগল তাবা। গঙ্গার ভেতর অনেকটা দূরে আর একবাব দেখা গেল আগমবাগীশের মুখখানা, দেখা গেল শূন্যে দু'টো হাত তুলে কি যেন তিনি ধরবার চেষ্টা করছেন। নিমেষের মধ্যে তলিয়ে গেল মুঠো-বাঁধা হাত দু'খানা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়ালো কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটা—হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল।

সেই বীভৎস হাসি থামবাব আগেই প্রাণপণে চিৎকাব ক'রে উঠলাম—"কে তুই? কি চাস?"

দস্তুরমত ধমক দিযেই বলতে গেলাম কথা ক'টা, শোনাল ঠিক উল্টো। শোনাল যেন প্রাণেব দায়ে পবিত্রাহি ডাক ছাড়ছি আমি। আমার সেই আর্তনাদ শুনেই বোধ হয শ্মশান-সুদ্ধ মানুষ ছুটে এল এধারে। আর একবার চেঁচাতে গেলাম —"কে তুই? খোল মুখ—"

ভালো ক'রে আওয়াজই বেরোল না মুখ দিয়ে, কে যেন সজোরে চেপে ধরেছে আমার গলা, দম বন্ধ হযে আসছে। কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া সেই ভয়ঙ্কর মূর্তিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি।

খুব আস্তে আস্তে নড়ে উঠল মূর্তিটা। প্রথমে কালো কাপড়ের ভেতব থেকে বেরিয়ে এল দু'খানা হাতের কবজি পর্যন্ত। কি কদর্য, কি কদাকার হাত। দু'হাতের দশটা আঙুলই নেই, দগদগে লাল বোঁচা হাত দু'খানা। আস্তে আস্তে হাত দু'খানা উঠল মুখের কাছে। আস্তে আস্তে মুখের ওপরের কাপড় কপাল পর্যন্ত উঠল, আর সেই মুহূর্তে আমি একটা বিকট চিৎকার করে উঠলাম। চিৎকার ক'রেই বুজে ফেললাম দু'চোখ। আর তৎক্ষণাৎ আবার আরম্ভ হয়ে গেল সেই পৈশাচিক হাসি —"হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।"

হঠাৎ ঝপ ক'রে বন্ধ হয়ে গেল হাসিটা। দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল রামহরের বউ—"তবে রে মড়াখাকী, ফের তুই ঢুকেছিস শ্মশানে! দাঁড়া—আজ তোর বিষ ঝাড়ব থেংরে।"

চোখ চেয়ে ফিরে দেখি, ছুটে আসছে রামহরের বউ একখানা আধপোড়া কাঠের চেলা হাতে ক'রে। তার আর এসে পৌঁছতে হ'ল না, মার মার ক'রে উঠল অন্য সকলে। কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটা ছুটল, ছুটে গিয়ে শেয়ালের মত ঢুকে পড়ল আকন্দ গাছের জঙ্গলের মধ্যে। হাতের কাঠখানা প্রাণপণে ছুঁড়লে রামহরের বউ সেদিকে। তার দেখাদেখি আর সবাই যে যা হাতের কাছে পেল ছুঁড়তে লাগল জঙ্গল লক্ষ্য ক'রে। পোড়া বাঁশ, চেলা কাঠ, ভাঙ্গা কলসী—শ্মশানের যাবতীয় জঞ্জাল সব সাফ হয়ে গেল।

তখন আমার সামনে এসে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে রামহরের বউ—"হারামজাদী কি বলছিল তোমায় জামাই ?"

অনেকটা ধাতস্থ হয়ে গেছি আমি তখন। ধীরেসুস্থে গিয়ে চড়ে বসলাম গদির ওপর। বসে রামহরের বউকেই জিজ্ঞাসা করলাম—"ও কে বউ ? কাকে তোরা খেদালি কুকুর-খেদা ক'রে ?"

"ও মা ! তুমিও চিনতে পারনি নাকি গো ওকে ?"

চিনতে যে পারিনি তা বোধ হয় আমার চোখে-মুখেই ফুটে উঠল। রামহরেব বউ তা বুঝলে। বুঝে বললে—"সেই যে গো, সেই ছিনাল মাগী, সোয়ামীর মুখে আগুন দিয়েই গলগল ক'রে মদ গিলতে লাগল। তারপর গিয়ে উঠে বসল সেই পোড়ারমুখো কাপালিকটার কোলে। সেই যে—"

আর বলতে হ'ল না তাকে। ঠিক যেন একটা বিছেয় কামড়ালে আমায়। তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে উঠলাম—"উঃ।" আবার দু'চোখ বুজে ফেললাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর ভেসে উঠল একখানা বিকটাকার মুখ। নাকটা নেই, ঠোট দু'খানাও নেই। বীভৎস লাল একটা গর্ত আর দাঁতগুলো। মরা মা' অনেক রকমের অনেক মড়ার মুখ দেখেছি, খসে গলে যাচ্ছে মাংস তাও হামেশা দেখছি, পোড়া মুখ যে কত দেখছি তার হিসেবও দেওয়া যায় না। কিন্তু একটা জ্যান্ত মানুষের মুখ যে অমন ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে তা কি কস্মিন্‌কালে কল্পনা করতে পেরেছিলাম ? মড়ার বীভৎসতার চেয়ে জ্যান্তর বীভৎসতা কি মারাত্মক রকমের ভয়াবহ !

তবু আর একবার টপ ক'রে আমার বোজা চোখের ওপর ভেসে উঠল এক সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মূর্তি। দুধের মত সাদা রঙ, অতি আশ্চর্য রকমের কালো একজোড়া ভুরুর নিচে অতল রহস্যের আধার দু'টি অতি আশ্চর্য চক্ষু, সেই ছোট্ট কপালখানি জোড়া ডগডগে সিঁদুরের টিপটি আর মুখ-ভর্তি পান। আর একবার আমার কানে এসে বাজল সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর—"আগে আমার ঐ বোনটিকে ওর স্বামীর হাতে পৌঁছে দোব, তারপর চলে যাব কাশীতে।" সেদিন অজ্ঞাতে আমার

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—"আগমবাগীশ। আগমবাগীশ কোথায়?"

আগমবাগীশের কথা মনে পড়তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিউরে উঠলাম। দু'চোখ খুলে চিৎকার ক'রে উঠলাম গঙ্গার দিকে চেয়ে—"আগমবাগীশ—আগমবাগীশ ডুবল যে রে—"

কেউই উত্তর দিলে না। বেশ খানিকক্ষণ পরে রামহরের বউ জবাব দিলে—"ডুবল না হাড জুড়োল মিন্‌সের। ঐ রাক্ষুসী মাগী হাঁ করে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। এতদিনে রেহাই পেলে ওর হাত থেকে।

উদ্ধারণপুরের বিস্ময়।

বিস্ময় বিলীন হ'ল বিস্মৃতির বদন-বিবরে।

তবু কিছু থেকে গেল বাকী। বাকী রইল একটি চিরন্তন জিজ্ঞাসা। গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার পূর্ব-মুহূর্তে আগমবাগীশ করেছিলেন সেই জিজ্ঞাসা। জানতে চেয়েছিলেন তিনি আমার কাছে যে, কখনও আমার চোখে পড়েছে কিনা সেই রূপের ছায়া—

"যুবতি মনোহর-বেশম্।
কলয়কলানিধিমিব-ধরণীমনু—
পরিণত-রূপ-বিশেষম্॥"

জীবন্ত জীবনের রূপ। ও রূপের ছায়া কখনও আমার চোখে পড়লে আমি নাকি মরণের ভয়ে শ্মশানে এসে লুকিয়ে থাকতাম না।

কিন্তু কি হতে কি হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে আগমবাগীশ জীবনের ভয়ে ঝাঁপ দিলেন বিস্মৃতির বদন-বিবরে। কাকে ফাঁকি দিয়ে পালালেন তিনি? জীবনকে না মরণকে? এই চিরন্তন জিজ্ঞাসা শুধু বাকী রইল ডুবতে। ভেসে চলল গঙ্গার ঢেউয়ের সঙ্গে। আর উদ্ধারণপুরের ঘাট একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই দিকে।

আর রামহরের বউ শ্মশানময় নাচতে লাগল গাল পাড়তে পাড়তে। সে যে 'পেত্যখ্য' জানে যে 'ধম্মের কল বাতাসে নড়ে!' ষোল আনা 'পেত্যখ্য' জানতে পেরেছিল সেদিন, যেদিন নাক ঠোঁট হাতের আঙুল খুইয়ে সিঙ্গী গিন্নী এসে সর্বপ্রথম আগমবাগীশের খোঁজ করেন। আমার সামনে তিনি আসেন নি, কারণ আমাকে তাঁর কালামুখ দেখাতে নাকি শরম লাগত। আর ওরা আসতেও দিত না ওঁকে আমার কাছে। দূর থেকেই খেদিয়ে দিত। তবু তিনি আসতেন, প্রায়ই নাকি আসতেন উদ্ধারণপুর ঘাটের ধারেকাছে। এসে খোঁজ করতেন আগমবাগীশের।

ওধারে আগমবাগীশ ভোল ফিরিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন শুধু তাঁর শেষ শক্তিটির ভয়ে।

কিন্তু সিঙ্গী গিন্নী জানতেন। ভয়ানক ভাবে বিশ্বাস করতেন যে একদিন পাবেনই তিনি আগমবাগীশকে উদ্ধারণপুরের ঘাটে। তাই তিনি নজর রেখেছিলেন শ্মশানের ওপর। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর আশা পূর্ণ হ'ল। 'যত মড়া উদ্ধারণপুরের ঘাটে' এই মহাবাক্যটি সার্থক করবার জন্যে আগমবাগীশ ফিরে এলেন শ্মশানে। এবং আর ফিরে গেলেন না।

ফেরে না কেউ।

উদ্ধারণপুরের ঘাট কাউকে ফিরিয়ে দেয় না।

যায় আবার আসে। আসবার জন্যে যায়। অনর্থক ফিরে যায়, শুধু আবার ঘুরে আসবার জন্যে। তারপর একদিন ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে। এবং তারপর আর যায় না। উদ্ধারণপুর ঘাটের কোলে তখন শান্তিতে শুয়ে পড়ে ঘুমোয়।

শুধু আমি যাই না কোথাও। আমি যে পালিয়ে এসে লুকিয়ে বসে আছি শ্মশানে। পালিয়ে এসেছি মরণের ভয়ে। এ কথাটি সব শেষে শুনিয়ে গেলেন আগমবাগীশ।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা তিনিও পালিয়ে এসেছিলেন উদ্ধারণপুরের ঘাটে। মরণের ভয়ে নয়, জীবনের ভয়ে। জীবনকে চাখতেন আগমবাগীশ, হরদম মুখ বদলাতেন জীবনের মুখে চুমো খেয়ে। ওস্তাদ সাপুড়েও কালকেউটের মুখে চুমো খায়। আর কালকেউটে যেদিন চুমো দেয় সাপুড়ের মুখে, সেদিন নীল হয়ে ঢুলে পড়ে সাপুড়ে তার পোষা সাপের কোলে।

ডাক ছেড়ে শোনাতে ইচ্ছে হ'ল আগমবাগীশকে যে সামান্য একটু ভুল বুঝে গেলেন তিনি। মরণের ভয়ে পালিয়ে আসিনি শ্মশানে, এসেছি জীবনের ভয়ে। মরণের ক্ষুধাকে আমার ভয় নয়, আমি ভয় করি জীবনের সুধাকে। মরণের ক্ষুধাকে ফাঁকি দেবার কায়দা জানে উদ্ধারণপুরের ঘাট কিন্তু জীবনের সুধা থেকে যে মারাত্মক নেশা জন্মায়, সে নেশার হাত থেকে কি ক'রে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা যে কেউ জানে না!

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

কান্না হাসির হাট।

দুনিয়ার সর্বত্র দিনের শেষে নামে রাত, রাতের পিছু পিছু আসে দিন। উদ্ধারণ-

পুরের ঘাটেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

দিন আর রাত ঘুরে আসে আর ফিরে যায়—আর আবার ঘুরে আসে। যেন নেশা করেছে। বদ্ধ মাতালের মত অনর্থক ঘুরে মরছে।

কিন্তু ঘুরে আসে না খন্তা ঘোষ, আসে না চরণদাস। আর আসে না একজন। অবশ্য সে আর আসবেও না কোনও দিন। কোন্ মুখে আসবে? আর একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াবার স্পর্ধা কিছুতেই হ'তে পারে না তার। অথবা এও হ'তে পারে যে উদ্ধারণপুরের ঘাটে ফিরে আসবার প্রয়োজন তার চিরকালের মত ফুরিয়েছে। জীবনের সুধা আকণ্ঠ পান ক'রে তীব্র নেশায় বুঁদ হয়ে আছে এখন সে। থাকুক, শান্তিতে থাকুক যেখানে আছে। যত দিন পারে থাকুক, তারপর আসতেই হবে একদিন ফিরে, পরিত্রাণ নেই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ফিরে আসে স্বর্ণ। এসে মাথা খুঁড়তে থাকে উদ্ধারণপুরের ভস্মের ওপর। বলে—"জল দাও, একটু জল দাও ওগো আমায়। তেষ্টায় যে প্রাণ যায়।"

ছুটে আসে পঙ্কা, রামহরে, রামহরের বউ। আসে ময়নাপাড়ার ওরা সকলে। কিন্তু কেউ মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। লজ্জা নেই, শরম নেই, প্রায় উলঙ্গ একটা যুবতী মেয়ে মাথা-কপাল চাপড়াচ্ছে, চুল ছিঁড়ছে, আর শ্মশান-ভস্মের ওপর মুখ রগড়াচ্ছে। জল দিতে গেলে তেড়ে মারতে আসছে। আর সমানে চিৎকার করছে—"জল দাও, ওগো একটু জল দাও, গলা শুকিয়ে গেছে আমার, বুক ফেটে গেল, উঃ, মা গো"—দু'হাতে বুক চেপে ধরে আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, কাছে যাবার জো নেই কারও। এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছে যে কাছে গেলেই বোধ হয় কামড়ে দেবে। অবশেষে একটা মতলব এসে গেল মাথায়। মুখ তুলে আমার দিকে চাইতেই চিৎকার ক'রে উঠলাম—"ডাক্ ত রে কেউ খন্তাকে, ডেকে আন্ খন্তাকে এখনই, ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করুক এটাকে।"

অত্যাশ্চর্য ফল ফলল। স্থির হয়ে বসে মাথা কাত করে যেন শুনতে চেষ্টা করলে আমি কি বললুম। সে সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করলাম আমি। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম—"খন্তা, কোথায় গেলি রে খন্তা, আয় ত একবার এদিকে। ভয়ানক ত্যাঁদড়ামো করছে এ বেটী—"

তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় কাপড় জড়াতে লাগল আর ভীত চকিত আঁখি দু'টি তুলে এধার ওধার দেখতে লাগল। তারপর ঝট ক'রে উঠে পড়ল শ্মশান-ভস্মের ওপর থেকে, ছুটে এসে দাঁড়াল আমার গদি ঘেঁষে। একগলা ঘোমটার ভেতর

থেকে ফিসফিস ক'রে বললে—তা'হলে ছেড়ে দিয়েছে ওকে? পালিয়ে আসতে পেরেছে ও? জল খেয়েছে, খুব জল খেয়ে নিয়েছে ত? আঃ—" বলে দু'হাত দিয়ে নিজের গলাটা রগড়াতে লাগল।

সবাই হাঁ ক'রে চেয়ে আছে ওর দিকে। আমিও একদৃষ্টে চেয়ে আছি ওর মুখের দিকে। একটু পরে আরও খানিক ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস ক'রে বললে—"আমার কথা বলবেন না যেন আর তাকে। কিছুতেই বলবেন না। তা'হলে আবার ও ছুটে যাবে। আর আবার—" বলতে বলতে হঠাৎ থামল। তারপর দু'চোখ বুজে বার বার শিউরে উঠল। তারপর "উঃ মাগো" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে ঢলে পড়ল আমার গদির কিনারায়।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল ময়না। এসে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার ক'রে উঠল—"ওগো, কি হবে গো! দাদাবাবুকে কারা কোথায় আটকে রেখেছে গো! আমাদের দাদাবাবু সেখানে জল জল ক'রে মরছে গো! ওরে বাবা গো, কি হবে গো—"

ময়নার সুর-টানা শেষ হবার আগেই সিধু ঠাকুর ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠাণ্ডা মানুষ সিধু ঠাকুর, নেহাতই ভাল মানুষ। হঠাৎ তাঁর চোখে মুখে সর্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বলে উঠল। মাথার ওপর দু'হাত তুলে হুংকার ছাড়তে ছাড়তে নাচতে লাগলেন তিনি:

"চলে আয়। মানুষ যদি কেউ থাকিস ত আয় আমার সঙ্গে। আমি জানি কোথায় সে গেছে। যাবার সময় ব'লে গেছে আমাকে। খন্তা ঘোষের নুন যদি কেউ খেয়ে থাকিস ত আয় আমার সঙ্গে। আজ সে নুনের দাম দিতে হবে।"

সাড়া দিলে। খন্তা ঘোষের নুনের দাম দিতে তৎক্ষণাৎ দশজন খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। দশখানা লাঠি সড়কি বেরিয়ে গেল ডোমপাড়া থেকে। যাবার সময় শ্মশানে এসে শ্মশানভস্ম ছুঁয়ে শ্মশানকালীর নামে কি যে শপথ ক'রে গেল ওরা তা শ্মশানকালীই জানে।

কিন্তু শ্মশানকালীও জানে না কি হবে এই মেয়েটার। হৈ হৈ করতে করতে যে যার নিজের পথে পা বাড়ালে। ময়না ওকে তুলে আমার গদির এক কোণে ফেলে রেখে গেল। ওর সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার আর এতটুকু গরজ নেই কারও। খন্তা ঘোষ মরছে যে, জল জল ক'রে মরছে কোথাও। খন্তা ঘোষ উদ্ধারণপুর ঘাটের দাদা, সকলেরই দাদা খন্তা ঘোষ। অনেক নুন খেয়েছে অনেকে খন্তা ঘোষের। আজ তার দাম দিতে ছুটল সকলে।

সুতরাং রাজশয্যার এক কিনারায় পড়ে রইল সুবর্ণ। খন্তা ঘোষের অনেক

খুন আমার পেটেও গেছে। সেই খুনের দাম দেবার জন্যে আমি বসে রইলাম কাঠ হয়ে তার দিকে চেয়ে। হতভাগী ঘুমোতে লাগল নিশ্চিন্তে। খন্তা পালিয়ে আসতে পেরেছে, এসে খুব অনেকটা জল খেয়েছে, এ সংবাদ জেনে খন্তার প্রাণ-পাখী মহাশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল মড়ার গদির ওপর। কে জানে কতদিন ও ঘুমোয় নি এভাবে। ঘুমোবে কি করে, খন্তা যে জল জল করে তিলে তিলে শুকিয়ে মরছিল!

ওর দিকে চেয়ে বসে থাকতে থাকতে দাঁত-বার করা খন্তার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলাম যেন। দিবারাত্র অষ্টপ্রহর এই মেয়ে মানসচক্ষে দেখতে পায় খন্তার সেই হতচ্ছাড়া রূপ। দেখতে দেখতে সে রূপের ছায়া পড়েছে ওর চোখে মুখে। হঠাৎ মনে হল, খন্তার চেয়ে সৌভাগ্যবান কে আছে এ দুনিয়ায়? জল জল করে তিলে তিলে যদি মরেও থাকে খন্তা ত তার মরণ সার্থক হয়েছে। মরবার পরেও সে বেঁচে আছে, বেঁচে রয়েছে সুবর্ণর চোখে-মুখে, বুকের মধ্যে, রক্তের সঙ্গে মিশে। সেখান থেকে কোনও যম তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না কোন দিন।

কিন্তু আর একজন?

আর একজনও যে গেছে খন্তার সঙ্গে।

তার কি হ'ল?

কেউ ভাবছে না তার কথা, তার কথা কারও মনেই পড়ল না। জানে না বোধ হয় কেউ যে চরণদাসও মরতে গেছে খন্তার সঙ্গে। তাকেও হয়ত বন্ধ করে রাখা হয়েছে খন্তার সঙ্গে। সে কিন্তু চেঁচাবে না জল জল ক'রে, চেঁচাবে না কারণ চরণদাস ত্যাগ করেছে জলস্পর্শ করা। স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে বাবাজী অন্নজল এবং সেও আর একটি নারীর জন্যে। তফাৎ হচ্ছে খন্তা যার জন্য শুকিয়ে মরছে সে ছুটে এসেছে আগেই উদ্ধারণপুরের ঘাটে আর বাবাজী যার জন্যে স্বেচ্ছায় শুকিয়ে মরছে সে এখন জীবনের সুধাপাত্র দু'হাতে মুখে তুলে আরামে চুমুক মারছে আর একজনের বুকের কাছে শুয়ে।

কে যেন সজোরে মোচড়াতে লাগল আমার হৃৎপিণ্ডটাকে। অসহ্য যন্ত্রণায় দু'হাতে চেপে ধরলাম বুকটা। মনে হ'ল যেন এখনই ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে আসবে নাক-মুখ দিয়ে আমার।

এক ফোঁটা হাওয়া নেই উদ্ধারণপুর ঘাটের আকাশে। চতুর্দিক যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে আসছে। ক্রমে ক্রমে আঁধার হয়ে উঠছে দু'চোখ আমার। দম ফেটে মারা যাব, শুধু এক ফোঁটা হাওয়ার জন্যে দম ফেটে মারা যাব উদ্ধারণপুর ঘাটের রাজশয্যার ওপর বসে।

উদ্ধারণপুরের রাত্রি।

রাত্রি ছায়া দিয়ে গড়া কায়াহীনা নিশীথিনী নয়।

আঁখিতে স্বপন দেখার সুর্মা প'রে যে রজনীরা দুনিয়ার বুকে আসে যায়, সেই ছলনাময়ী অভিসারিণীরা উদ্ধারণপুরের ত্রিসীমানা মাড়ায় না।

উদ্ধারণপুরের রাত্রি উলঙ্গিনী বিভীষণা অতি ক্ষুধার্ত রাক্ষসী। অস্থিচর্মসার পেটে-পিঠে-লাগা ভয়ঙ্করী মূর্তি সে রাক্ষসীর। উদ্ধারণপুর ঘাটের পোড়া কয়লার চেয়ে হাজার গুণ কালো তার রঙ্, কোটরে-বসা দুই ক্ষুধার্ত চোখে অতল অন্ধকার। হাড্ডিসার হাত দু'খানা বিস্তার ক'রে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাক্ষসী শ্মশানময়। খুঁজছে, হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যদি কিছু হাতে ঠেকে ত টপ করে ধরে মুখে পুরে ফেলবে।

উদ্ধারণপুরেব রাত্রি কাঁদছে। ক্ষুধাব জ্বালায় হিসহিস করে কাঁদছে। কাঁদছে আব এগিযে আসছে আমার গদির দিকে। হাতড়াতে হা॰ড়াতে এগোচ্ছে। অন্ধ রাত্রি ভাগ্যে দেখতে পায় না। পেলে অনেক আগেই গিলে ফেলত আমাদের। অবশেষে এসে পৌছে গেল। গদির সামনে দাঁড়িয়ে নিচু হযে দু'হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে লাগল। আরও এগিযে আনলে মুখখানা, খানিক নিচু হ'ল। তপ্ত শ্বাস পড়তে লাগল আমার মুখের ওপব। দম বন্ধ হয়ে গেছে আমাব, নির্নিমেষ চক্ষে চেযে আছি ওব চোখের দিকে। কালো কযলার চেয়ে হাজাব-গুণ কালো উদ্ধারণ-পুরের রাত্রিব দুই কোটরে বসা চক্ষু, চক্ষু দুটিতে ক্ষমাহীন ক্ষুধা ধিকিধিকি জ্বলছে।

জ্বলে উঠল একটা ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা আমাব বুকের মধ্যে। চরণদাস তোমায ক্ষমা করতে পারে, না, বিশ্বাস করতে পারে সে যে কোনও অ ায় তুমি করতে পাব। কিন্তু আমি—আমি বসে থাকি উদ্ধারণপুব ঘাটের মড়াব বিছানার ওপর। এতটুকু রসকস নেই আমার গদিতে, এক ফোঁটা রসও নেই আমার দেহ-মনে কোথাও। চরণদাসকেও তুমি ফাঁকি দিয়েছ, আমায় দিতে পারবে না। আসতেই হবে তোমায এখানে, ফিরে আসতেই হবে। উদ্ধারণপুরের ঘাট ক্ষমা করতে জানে না, চিতাভস্মের সাদর আমন্ত্রণ অলঙ্ঘনীয়, অমোঘ। পালিয়ে থাকবে তুমি কত কাল? অন্নজল ত্যাগ ক'রে মরেছে চবণদাস, কিন্তু আমি মরব না। যুগ যুগ ধরে বসে থাকব আমার এই গদির ওপর, আব ব'যে চলবে ঐ গঙ্গা, আর ব'য়ে চলবে কাল। তন্দ্রাহারা জেগে রব আমরা তিনজন তোমার জন্যে। তার-পর তুমি ফিরে আসবে একদিন, আসবে ঐ সিঙ্গী গিন্নীর মত হয়ে। নাক ঠোঁট হাতের আঙুল কিচ্ছু থাকবে না। রক্ত-মাংসের গরবও থাকবে না তোমার সেদিন।

লোকে তোমায় কুকুরের মত দূর দূর করে খেদাবে। যতক্ষণ না তা দেখছি এই চক্ষে, ততক্ষণ নড়ছি না আমি গদি ছেড়ে।

ব'য়ে চলল গঙ্গা, ব'য়ে চলল কাল, ধিকিধিক জ্বলতে লাগল প্রতিহিংসার আগুন আমার বুকের মধ্যে। আর উদ্ধারণপুরের রাত্রি হিসহিস ক'রে কেঁদে ঘুরে বেড়াতে লাগল শ্মশানময়। অন্ধ রাত্রি হাতড়ে বেড়াতে লাগল যদি কিছু জোটে হাতের কাছে। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে লাগল খন্তা ঘোষের সুবর্ণ আমার গদির এক কোণে শুয়ে, আর রাতজাগা পাখীরা প্রহরে প্রহরে ঘোষণা ক'রে চলল গঙ্গার এপারে ওপারে উঁচু গাছের ডালে বসে। তারপব বড় সড়কের ওপর হুস করে একটা আওয়াজ হ'ল। একটা দমকা হাওয়া যেন ছুটে চলে গেল বড় সড়কের ওপর দিয়ে। একবার একটু চমকে উঠলাম। তারপর আবার চোখ বুজে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। বসে বসে গুনতে লাগলাম মুহূর্তগুলি। খন্তা ঘোষ আব চরণদাসও হয়ত ঠিক এই সময় এইভাবে মুহূর্ত গুনতে গুনতে এগিয়ে আসছে। এক বিন্দু জলের জন্যে তিলে তিলে মরছে ওবা। মরছে অতি তুচ্ছ কারণে। মরছে একটা নারী-দেহের জন্যে, যে নারী-দেহটা প'ড়ে রয়েছে আমাব ডান পাশে ঠিক দু'হাত দূরে।

আচম্বিতে ভযানক রকম চমকে উঠলাম। সত্যিই যেন কার তপ্ত শ্বাস পড়ল আমার মুখের ওপব। আরও জোরে দু'চোখেব পাতা টিপে রইলাম।

কয়েক মুহূর্ত পরেই কানে গেল, স্পষ্ট কানে গেল হিসহিস শব্দ, কে যেন বললে —"গোসাঁই, আমি এসেছি।"

প্রাণপণে বুজে আছি দুই চোখ। কিছুতেই খুলব না। খুললেই ভুল ভেঙ্গে যাবে। দেখতে হবে উদ্ধারণপুরের রাত্রিব কোটর-বসা দুই চক্ষের অতলস্পর্শ অন্ধকার।

তারপর কানে গেল খসখস শব্দ। ভারী গরদের কাপড় প'রে একটু নড়াচড়া করলে যে রকমের শব্দ হয় সেই রকম শব্দ গেল কানে। মনে হ'ল যেন কে বসে পড়ল একেবারে আমার কোল ঘেঁষে। হঠাৎ উগ্র গোলাপ ফুলের গন্ধে ছেয়ে গেল বাতাস। এবার একেবারে কানের কাছে শুনতে পেলাম, কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বলে উঠল—"গোসাঁই, আমি এসেছি। পালিয়ে এসেছি আমি। চোখ খুলবে না গোসাঁই?"

কিছুতেই না, কিছুতেই খুলব না চোখ আমি। শবশয্যায় চড়ে বসে আছি আমি, আমার সঙ্গে কোনও চালাকি চলবে না। কোটরে বসা চক্ষুর অতলস্পর্শী

চাহনিতে যেমন আমি ভয় খাই না, তেমনি ফুলের গন্ধে বা কান-জুড়োনো ডাক দিয়েও আমাকে ভোলানো যাবে না। বছরের পর বছর শবশয্যার ওপর বসে সাধনা করে যে সিদ্ধিলাভ করেছি আমি, অত সহজে সে সিদ্ধিকে টলানো যায় না।

তখন আরম্ভ হ'ল গান। গুনগুন ক'রে গান আরম্ভ হ'ল আমার কানের কাছে।

"বঁধু হে—নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
তোমায় নয়নে লুকায়ে থোব॥
শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে—
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন, জীবন যৌবন,
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি, হয় শত কোটি—
সকলি করিবে ক্ষমা॥"

হঠাৎ আমার দুই গালের ওপর ঠাণ্ডা দু'খানি হাত এসে পড়ল। দু'হাত দিয়ে কে যেন চেপে ধরলে আমার মুখখানা। তখন চাইতেই হ'ল চোখ। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে ধরে ফেললাম তার হাত দুখানা। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়েও দিলাম তটস্থ হয়ে। একি! কার হাত ধরলাম আমি? এত গয়নাগাঁটি সুদ্ধ হাত দু'খানি কার?

অন্ধকারের মধ্যে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। মুখখানা তখন আমার মুখ থেকে মাত্র এক বিঘত তফাতে এসে গেছে। দু'হাতে আমার মুখখানা ধরে সে রুদ্ধনিশ্বাসে চেয়ে আছে আমার চোখের দিকে।

কিন্তু একি! কার মুখ এ! নাকের পাশে জলজল করছে ওটা কি? নিশ্চয়ই ওটা হীরের নাকছাবি। কপালের ওপর ঝুলছে ওটা কি? সিঁথির ওপর দিয়ে নেমে এসেছে একটা চকচক চেন, তার নিচে ঠিক কপালের ওপর একখানি টিকলি ঝুলছে। খুব ছোট ছোট উজ্জ্বল পাথর অনেকগুলো লাগানো রয়েছে টিকলিতে। দুই কানেও দুলছে দুটো গয়না, এত অন্ধকারেও তা থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে, গলাতেও যেন কি একটা দেখা যাচ্ছে। কে এ! কার তপ্ত শ্বাস পড়ছে আমার মুখের ওপর?

ধীরে ধীরে আবার নড়ে উঠল ঠোঁট দু'খানি। আবার কানে গেল—"গোসাঁই আমি এসেছি। পালিয়ে এসেছি গোসাঁই। আর পারি না আমি, আর পারি না। চল গোসাঁই, পালিয়ে চল এখান থেকে। তোমায় নিতে এসেছি। তোমায় নিয়ে পালিয়ে যাব।"

অজ্ঞাতে খুব চুপি চুপি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"কোথায় ?"

আরও কাছে সরে এল মুখখানি, প্রায় ঠেকল এসে আমার মুখের সঙ্গে।

আরও চুপি চুপি বলল সে—"যেখানে দু'চক্ষু যায়। যেখানে মানুষ নেই। যেখানে কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি থাকব সেখানে। সেখানে কেউ কাঁদবে না, কেউ মরবে না, কেউ কাউকে হিংসা করবে না, কারও জন্যে কারও জিভ দিয়ে জলও পড়বে না। সেখানে মড়ার বিছানার ওপর চড়ে বসে থাকতে হবে না তোমায়, গলগল ক'রে গিলতে হবে না ওই বিষগুলো। আমাকে সাত দরজায় লাথি ঝাঁটা খেয়ে ঘুরে মরতে হবে না। সাতজনের মন যোগাতে হবে না। হাজার হাজার হ্যাংলা চোখের চাউনির ছোঁয়াচ লাগবে না আমার গায়ে। চল গোসাঁই চল, আর দেরি করা নয়, ঐ দেখ ফিকে রঙ্ ধরছে গঙ্গার ওপারে।

বলতে বলতে—আমার মুখ ছেড়ে দিয়ে হাত দু'খানা চেপে ধরলে। গঙ্গার ওপারের আকাশে তাকালাম চোখ তুলে। চোখ নামিয়ে ভালো করে চেয়ে দেখলাম সামনে-বসা মূর্তিটির দিকে। তারপর আস্তে আস্তে হাত দু'খানা ছাড়িয়ে নিলাম।

অপরূপ ভঙ্গিমায় হাঁটু গেড়ে বসেছে আমার সামনে। হাঁটু দুটি ঠেকে আছে আমার কোলের সঙ্গে। মুখখানি ঝুঁকে পড়েছে। ছোট্ট কপালখানিতে চন্দন দিয়ে আলপনা আঁকা রয়েছে। মাথার মাঝখানে সিঁথি কেটে বেণী ঝুলিয়ে দিয়েছে পিঠে। সিঁথির ওপর দিয়ে এসেছে টিকলি। বোধ হয় এতক্ষণ ঘোমটা দিয়েছিল, তাই কাপড়ের ঘষায় অনেকগুলি চূর্ণ কুন্তল এসে পড়েছে কপালের ওপর। অসম্ভব কালো চোখের দুই কোণায় খুব সরু করে টেনে দিয়েছে কাজল। প্রায় কাঁধের ওপর ঠেকছে দু'কান থেকে ঝোলানো দুই ঝুমকো। নাকছাবি থেকে যে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে তাইতে মুখের বাঁ দিকটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। হাঁ, মানিয়েছে বটে, সব কিছু এমনভাবে মানিয়েছে যে মনে হ'ল এই সমস্ত বাদ দিয়ে ওকে ভাবাই যায় না। ওর পিছন দিক আরও পরিষ্কার হয়ে উঠল। নজর পড়ল ওর গলায়। পর পর তিনটি সরু দাগ ওর গলায় সৃষ্টিকর্তাই এঁকে দিয়েছেন। তার নিচে থাকে তিন ফের খুব সরু তুলসীর মালা। এখন সেই মালার ওপর চড়েছে সোনার চিক, নানা রঙের পাথর

বসানো। তারপর নেমেছে সাতনরী বুকের ওপর। বুকের অনেকটা অংশ খোলা, বুকটা বেশ ওঠানামা করছে।

ব্যস্ত হয়ে বুকের ওপর কাপড়টা একটু টেনে দিল। খুব মিষ্টি করে হেসে বেশ একটু জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—"অত করে কি দেখছো গো?" এবার আবার আমার দৃষ্টি উঠে এল ওর চোখের ওপর। চোখের দৃষ্টিতে কি রকম একটা মাদকতা।

শুকনো গলায় একটা ঢোঁক গিলে বললাম—"না, এমনিই। বেশ মানিয়েছে কিন্তু সই তোমায়।"

বোধ হয় একটু লজ্জা পেলে। মুখখানি ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর। পরমুহূর্তেই একেবারে ধড়ফড়িয়ে উঠল। ওর দু'হাতের গয়নাগুলো উঠল বেজে। খপ করে আবার ধরে ফেললে আমার হাত দু'খানা। ধরে টানাটানি শুরু করলে—"ওঠ গোসাঁই ওঠ। আর দেরি নয়। এখুনি সবাই জেগে উঠবে। মানুষজন এসে পড়বে এখানে। এইসব নিয়ে আমি লুকোব কোথায়? চল গোসাঁই, আঁধার থাকতে থাকতে পা...ই -"

আর বলতে দিলাম না। খুব আস্তে আস্তে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায়? কোথায় লুকোবে সই মুখ তোমার?"

আকুল কণ্ঠে বলে উঠল—"যেখানে তুমি নিয়ে যাবে গোসাঁই, যেখানে তুমি লুকিয়ে রাখবে আমায়, সেখানেই লুকিয়ে রাখব এ মুখ, শুধু তুমি ছাড়া কখনও আর কেউ দেখতে পাবে না এ মুখ আমার। চল গোসাঁই, ঐ দেখ আলো হয়ে উঠল যে—"

নেমে পড়ল গদি থেকে। নেমে টানতে লাগল আমার দু'হাত ধরে। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলাম না। শুধু একটু শক্ত হয়ে চেপে বসলাম। একটু শক্ত করে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলাম ওর চোখের দিকে চেয়ে—"কিন্তু তিনি তোমায় ঠিক খুঁজে বার করবেন।"

বেশ চমকে উঠল। থামল হাত টানাটানি, কিন্তু হাত ছাড়লে না। থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কে। কে আবার খুঁজতে বেরোবে আমায়?"

চোখ দু'টির দিকে চেয়ে আছি। অকপট উৎকণ্ঠা উপচে পড়ছে সেই আশ্চর্য চোখ দু'টি থেকে। বললাম—"তিনি, যিনি এত সব গয়না কাপড় ঢেলে দিয়েছেন তোমার পায়ে।"

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দু'হাত নাড়তে লাগল আমার চোখের সামনে।

"না, না, না গোসাঁই। এই সব গয়নাগাঁটি এমনি আমি পেয়েছি। তাদের

পরাবার সাধ হয়েছিল তাই আমায় পরিয়ে দিয়েছে। এ সব আর ফেরত নেবে না তারা। তাদের অনেক আছে—”

খুব রসিয়ে রসিয়ে বললাম—“আহা, আমি কি বলছি নাকি যে তাদের আর নেই! আছে বলেই ত তোমায় পরাবার সাধ হয়েছে! তবে সাধ ত আর এক রকমের নয়। আরও নানা রকমের সাধও ত তাদের মনে উথলে উঠতে পারে—”

কিছুতেই বলতে দেবে না আমায়, কানেও তুলবে না আমার কথা। আবার জড়িয়ে ধরলে আমার একখানা হাত। তারপরই পিছন ফিরল। আমার হাতখানা ওর ডান বগলের ভেতর দিয়ে গিয়ে ওর বুকের সঙ্গে রইল চেপে ধরা। টেনে নিয়ে চলল একেবারে।

“কোনও কথা শুনব না আমি আর। চুলোয় যাক লোকের সাধ-আহ্লাদ। আগে পালাই চল এখান থেকে। তারপর দেখা যাবে কে কি করতে পারে আমাদের!”

সত্যিই এবার টানের চোটে নামতে হ'ল গদি থেকে। নেমে দাঁড়িয়ে আর এক হাতে ধরলাম ওর কাঁধ। ধরে থামালাম ওকে। বললাম—“কিন্তু আমায় নিয়ে গিয়ে লাভ হবে কি তোমার সই? এত সব গয়না কাপড় আমি পাব কোথায়? কি দিয়ে মন যোগাব তোমার?”

ঘুরে দাঁড়ালো, মুখখানি তুলে কযেকটি মুহূর্ত চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে। কি অদ্ভুত চাউনি! পাথর গলিয়ে জল ক'রে দিতে পারে ওই চাউনি দিয়েই! সাধে কি আর মানুষ ওকে এত জিনিস দিয়ে সাজায়।

থরথর করে কাঁপতে লাগল ঠোঁট দুখানি। দুই আঁখির লম্বা পল্লবগুলোও যেন একটু কাঁপল। আমার বুকের সঙ্গে এক রকম মিশে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে তুলে আছে মুখখানি ওপর দিকে। কানে গেল—“গয়না কাপড়ের দাবি করব আমি তোমার কাছে? তোমার চেয়ে এগুলোর দাম আমার কাছে বেশী হবে? তোমায় নিতে এসেছি আমি সোনা-দানার লোভে?”

আর বলতে পারলে না। ভেতর থেকে কি যেন একটা ঠেলে উঠে ওর গলার ভেতরে আটকে গেল। শুধু চেয়ে রইল আমার দিকে মুখ তুলে, আর চোখ দুটো ভর্তি হয়ে এল।

ওর মুখের ওপর থেকে নজর সরিয়ে গঙ্গার অপর পারের আকাশের দিকে চাইলাম। অন্ধকার লালচে হয়ে উঠছে।

আর সেই ঈষৎ লালচে আকাশের গায়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম চরণদাসের শুকনো মুখখানা। স্পষ্ট শুনতে পেলাম যেন বাবাজী বলছে—“যদি সে কোনও

দিন ফেরে ত তাকে বোল যে, শেষ সময় পর্যন্ত এ বিশ্বাস আমি বুকে রাখতে পেরেছি যে, সে কোনও ছোট কাজ করতে পারে না।"

লালচে পূব আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হ'ল কে যেন ওখানে লুকিয়ে বসে ভেংচি কাটছে। আস্তে আস্তে লালচে হয়ে উঠল আমার মনের ভেতরটা। আগমবাগীশ ঐ সামনের ওখানটায় ঝাঁপ দিয়ে বেঁচেছে। চরণদাস বলে গেল— এই ত বেশ আছি, শুধু জল খেয়েই কাটাব—যতদিন না সে ফেরে। আর খন্তা ঘোষ জল জল করে শুকিয়ে মরছে হয়ত এতক্ষণে। সিঙ্গী গিন্নীর নাক-ঠোঁট খসা মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সুবর্ণ ঐ গদির ওপর শুয়ে। আর আমার বুক ঘেঁষে মুখের কাছে মুখ তুলে ধরে জবাবের জন্যে একজন চেয়ে রয়েছে, চোখে জল টল টল করছে।

এবং এত কাপড় গয়না সোনাদানা ঢেলে দিয়েও যে ওকে ধরে রাখতে পারল না, সে এতক্ষণে কি করছে তাই বা কে জানে ?

আস্তে আস্তে টেনে নিলাম হাতখানা। আস্তে আস্তে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে গদির কিনার'য় ব'সে পড়লাম। বসে আর একবার আপাদমস্তক দেখলাম ওর। ওর নজর তখনও স্থির হয়ে রয়েছে আমার ওপর। তারপর বললাম।

বললাম—"এত চট করে শখ মিটে গেল ? না, পালিয়ে এলে এই সব সোনাদানা নিয়ে ? এবং সোনাদানার লোভ দেখিয়ে আমাকে গিলতে পার কিনা তাই দেখতে এলে ? সেই কুমার বাহাদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে আসনি ত ? যাক্, সেজেছ ভাল। পছন্দ আছে বলতে হবে কুমার বাহাদুরের। এত কিছু দিয়েছে যখন তখন মন্দ করনি ওর অন্দরমহলে ঢুকে। মরুক গে বেটা চরণদাস শুকিয়ে। আর সে ত কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে বসে আছে যে কুমার বাহাদুরের অন্দরমহলের ভেতর বসে তুমি শুধু নামজপ করে দিন কাটাচ্ছ। হা হা হা হা হা হা—এখন যদি একবার দেখাতে পারতাম তাকে তোমার সোনাদানা গয়নাগাঁটির বহর। হা হা হা হা হা হা—এ সমস্ত শুধু নামজপ করেই পাওয়া যায়—অন্দর-মহলের ভেতর বসে—হা হা হা হা—" দুলে দুলে অট্টহাসি হাসতে লাগলাম।

হাসতে লাগলাম গলা ছেড়ে। তারপর দম ফুরিয়ে গেল। তখন চেয়ে দেখলাম ওর দিকে। জ্বলে উঠেছে ওর দুই চক্ষু। শানদেওয়া ইস্পাতের মত দেখাচ্ছে ওর চেহারাখানা। মানুষটাই যেন আরও খানিক লম্বা হয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে। দু'টো আগুনের শিখা বেরিয়ে আসছে ওর দুই চোখ থেকে। বেশ জ্বালা ক'রে উঠল আমার চোখ মুখ।

তবু ছাড়লাম না। শেষ কথাটুকু ভালো করে শেষ করার জন্তে আবার আরম্ভ করলাম।

"মনে পড়ে তোমার সই—আগে আগে প্রায়ই বলতে—তোমার ঐ রক্তমাংসে গড়া দেহটা পুড়িয়ে আঙার করে নেবার কথা। তখন নাকি তোমার বিষ লাগত কেউ তোমার দিকে চাইলে। হায় রে হায়, সেই রূপকে কি সাজেই সাজিয়েছে কুমার বাহাদুর! এখন একবার পরামর্শ করে এস না গো তোমার বাবুর সঙ্গে, পুড়িয়ে আঙার করে নিলে তাঁর মন উঠবে কি না! এ ত আর হতভাগা চরণদাস নয়, শুধু একটা একতারা সম্বল ক'রে ঘুরে বেড়াত তোমায় আগলে। তাই তোমার পোড়াতে ইচ্ছে করত রূপ। আজ রূপের দাম দেবার লোক জুটেছে। তবু তোমার মন উঠছে না কেন গো সই, তবু তোমার—"

হঠাৎ ঝট করে ছিটকে এসে পড়ল সাতনরী ছড়া আমার গদির ওপর। তারপর টিকলিটা, তারপর কতকগুলো চুড়ি বালা কঙ্কণ তাবিজ বাজু, তারপর গলার চিকটা। অবশেষে চন্দ্রহারটা। পাগলের মত টেনে টেনে খুলতে লাগল সব গা থেকে আর ছুঁড়ে মারতে লাগল আমার গদির ওপর। স্বর্ণব গায়েও পড়ল অনেক কিছু। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেয়েটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ওর দিকে। তত্‌ক্ষণে একটানে একটা কান থেকে ঝুমকো খুলে আনলো। দবদরিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। আর সহ্য হ'ল না, লাফিয়ে নামলাম গদির ওপর থেকে। দেখেই মারলে দৌড়। খপ করে ধরে ফেললাম ওর কচি কলাপাতা-রঙেব বেনারসী জরির কাজ-করা আঁচলটা। সঙ্গে সঙ্গে তিন পাক ঘুবে অনেকটা দূরে চলে গেল। কাপড়খানাবি এক খুঁট রইল আমার হাতেব মুঠোয় আর বাদ-বাকীটা লম্বা হয়ে পড়ে রইল উদ্ধারণপুরের ভস্মের ওপর। আর অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে দুধের মত সাদা থান-পরা এক কালসাপিনী ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে রইল আমার হতভম্ব মুখের দিকে।

চিল-চেঁচিয়ে উঠল স্বর্ণ—"রাঙাদিদি গো, আমায় ফেলে পালিও না গো।" বলেই গদি থেকে লাফিয়ে পড়ে দিল দৌড়। দৌড়ে গিয়ে দু'হাতে জাপটে ধরলে তার রাঙাদিদিকে।

রাঙাদিদিও ওকে দু'হাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল দু'-চোখ দিয়ে আমার ওপর।

এগোলাম সামনের দিকে। দু'পা না ফেলতেই একটা কান-ফাটানো চিৎকার —"খবরদার—আর এক পা এগিও না, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

থামল আমার পা, একেবারে গেড়ে বসে গেল মাটিতে। কানে এল—"এ

এল কি করে গোসাঁই তোমার গদির ওপর ?”

জবাব দিলাম তৎক্ষণাৎ—“সে উত্তর তোমায় দিতে বাধ্য নই আমি।”

“অ—আচ্ছা, চলে আয় স্বর্ণ।” বলে মেয়েটাকে জড়িয়ে নিয়ে সামনে পা বাড়ালে।

ছুটে গিয়ে দু'হাত মেলে দাঁড়ালাম সামনে।

“না পারবে না ওকে নিয়ে যেতে। ছেড়ে দাও ওকে। ও ভাল ঘরের মেয়ে, তোমাকে ছোঁয়াও ওর পাপ।”

চোখ দুটো আরও ছোট ছোট করে চাপা গলায় বললে—“অ—আর তোমার ঐ মড়ার চ্যাকড়ার ওপর শুয়ে রাত কাটানো বুঝি পাপ নয় ? আমিই ওকে পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে। কিন্তু সে অন্য কারণে। তুমি যে ওকে গ্রাস করবে তা বুঝতে পারিনি।”

জোর করে মেয়েটাকে নিজের গা থেকে ছাড়িয়ে ঠেলে দিলে আমার দিকে—“আচ্ছা, এই নাও—”

স্বর্ণ আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকের ওপর।

“রাঙাদিদি গো—”

তখন বার দুয়েক তাকাল তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে আর মেয়েটার মুখের দিকে। তারপর মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে পা বাড়ালে সামনে।

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—“কোথায় চললে ওকে নিয়ে ?”

তৎক্ষণাৎ জবাব পেলাম—“যেখানে খুশি। ও নিজে ইচ্ছা করে চলেছে আমার সঙ্গে। পার ত রোক না,—দাঁড়িয়ে আছ কেন ? সে জোর আর তোমার নেই গোসাঁই, সব এই শ্মশানের চিতায় পুড়িয়ে বসে আছ। ম'ক এত-দিন মনে করতুম মড়ার গদি-বিছানায় বুঝি জ্বালা নেই। মনে করতুম মড়ার গদিতে চেপে যে বসে আছে তার বুকটাও বুঝি ঐ বিছনার মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আজ দেখলাম তা নয়। ওই ছাই-ভস্ম গয়নাগুলোই আগুন জ্বালালে তোমার বুকে। আচ্ছা এইবার বসে বসে পোড়ো নিজের আগুনে—”

আবার পা বাড়ালে সামনে।

এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে ক'রে দাঁড়ালাম না, কে যেন ঠেলে দিলে আমার এক পাশে। ঠিক দু'হাত সামনে দিয়ে চলে গেল। অনেক চেষ্টায় পেছন থেকে বলতে পারলাম : “যেও না নিতাই, ফের।”

আরও অনেকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। পূব আকাশ থেকে চোখ-ধাঁধানো লাল আলো এসে পড়ল ওর মুখ-চোখের ওপর। যেন জ্বলছে ওর রূপ।

ধীর শান্ত কণ্ঠে বললে—"না গোসাঁই, আর নয়। যা পাবার আমি পেয়েছি। আমি যদি অপরের দেওয়া গয়নাগাঁটি পরি বা কারও অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকি তা'হলে যে তোমার বুক পুড়ে যায়—এইটুকু ত জানতে পারলাম। এই আমার সব পাওয়ার বড় পাওয়া হ'ল। আর কখনও জ্বালাতে আসব না তোমায়। প্রেতের দৃষ্টি তোমার চোখে। মরণের ওপার থেকে জীবনকে দেখ তুমি। শুধু সন্দেহ আর অবিশ্বাস আর মনগড়া মিথ্যে অভিমান। আচ্ছা, ওই সব নিয়ে শান্তিতে বসে প্রেতের রাজত্ব চালাও তুমি—"

বলতে বলতে চলে গেল। মিলিয়ে গেল নিমগাছটার আড়ালে ওরা দু'জন। পাথরের মত দাঁড়িয়ে দেখলাম।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

রঙ্‌তামাসার ঠাট।

ঠাট দেখে সাদা হাড় আর কালো কয়লায় গা টেপাটেপি করে হাসে। শেয়ালে শকুনে ভেংচি কাটে। কুকুরগুলো আকাশের দিকে মুখ তুলে বাহবা দেয়। আর উদ্ধারণপুরের আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দিয়ে যারা লুকিয়ে থাকে তারা তাদের অস্থিসার হাতে খট্ খটা খট্ তালি বাজায়।

তালি বাজায় উদ্ধারণপুরের ওস্তাদ বাজিকর। এক দো তিন—আসমান থেকে একে একে আমদানি হয় রসদ। চিতায় চিতায় ভিয়ান চড়ে যায়। রামহরে কাঁধে করে কাঠ বয়, তার বউ টাকা গুনে আঁচলে বাঁধে। ধোঁয়ায় কালো আঁধার হয়ে ওঠে উদ্ধারণপুরের আকাশ। নবরসের রসায়নাগারে পুরোদমে শুরু হয়ে যায় রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হাড় মাস মেদ মজ্জা পুড়িয়ে পুড়িয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়। কোথায় গেল সে? হাসি-কান্না আশা-আকাঙ্ক্ষা দেবত্ব-পিশাচত্ব দিয়ে গড়া যে ছিল ঐ খাঁচার মধ্যে, সে গেল কোথা? খোলস ছেড়ে লুকোলো কোথায় কাল-সাপটা?

খোলস পুড়তে থাকে। উদ্ধারণপুরের চিতার ক্ষুধা কিন্তু মেটে না কিছুতে। আসল মাল চায়। আসল মাল ত আসে না উদ্ধারণপুরের ঘাটে। উদ্ধারণপুরের বাজিকর তুড়ি দিয়ে যা আমদানি করে তার ওপর-ভেতর ফক্কিকার। উদ্ধারণপুর ঘাটের পশ্চিমে বড় সড়ক। বড় সড়ক দিয়ে আসে যায় আসল মালেরা। খোলস ছাড়লে খোলসটা নেমে আসে উদ্ধারণপুরের ঘাটে পুড়তে।

কিন্তু এল। হুস করে একটা আওয়াজ হ'ল বড় সড়কের ওপর। থামল

এসে একখানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী। তারপর তারা নেমে এল; নিমগাছটার এধারে আসতে চিনতে পারলাম। স্বয়ং কুমার বাহাদুর। হাঁ—আসল মালই বটে। কিন্তু ওটি কে? কতগুলি মনের মানুষকে মনের মত করে সাজান কুমার বাহাদুর? নাঃ—শখ আছে বটে, শখ আর সামর্থ্য দুইই আছে! যাকে পাচ্ছে তাকেই সাজাচ্ছে পটের বিবির মত। কিন্তু এখানে আবার কেন? আর ত কেউ নেই এখানে যে ধরে নিয়ে গিয়ে সাজাবেন। যাক্, ভালোই হ'ল। গয়না-গুলো আর কাপড়খানা ফিরিয়ে নিয়ে যাক্। আবার কোনও মনের মানুষ জুটলে তাকে সাজাবে মনের মত ক'রে। বেশ ক'রে সমঝে দিতে হবে ওঁকে যে এবার যেন একটু বুঝেসুঝে মনের মানুষ পাকড়াও করেন। পাখীকে সোনার শেকল পরালেও সে তা কাটবেই।

আরে একি! দামী সাজ-পোশাক সুদ্ধই যে লুটিয়ে পড়ল দু'জন শ্মশানভস্মের ওপর। খামকা এত ভক্তি ঢালছে কেন শুকনো ভস্মে?

প্রণাম সেরে গলায় আঁচলসুদ্ধ জোড়হাতে দাঁড়ালেন কুমারের সঙ্গিনী। খুব মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবা, মাতাজী কোথায়? তাঁকে দেখছি না ত!"

মাতাজী!

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলাম ওঁদের মুখের দিকে। এক পা এগিয়ে এলেন কুমার। বললেন—"খুব ভোরে আমরা তাঁকে নামিয়ে দি এখানে। ঐ বাজারের ওধারে গাড়ী নিয়ে আমরা বসেছিলাম। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন সেই রকম। আপনাকে তিনি শ্মশান থেকে বার করে নিয়ে যাবেন, তারপর আপনাদের দু'জনকে আমরা নিয়ে যাব।"

যতদূর সম্ভব গলা থেকে ঝাঁজটা তাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কোন্ চুলো ?"

থতমত খেয়ে গেলেন কুমার। কিন্তু তাঁর সঙ্গিনী গ্রাহ্য করলেন না কিছু। সেইভাবে জোড়হাতে বলতে লাগলেন—"মাতাজীর কাছে কামনা জানালাম যে অন্তত একটিবার আপনার চরণের ধুলো আমাদের সংসারে পড়া চাই। আপনার দয়াতেই আমাদের ভাঙা সংসার জোড়া লাগল। আপনাকে দেখে, মাতাজীর মুখ থেকে আপনার কথা শুনে আমার স্বামীর চোখ ফুটল। তাই একটিবার আপনাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব আমরা—এই প্রার্থনা জানালাম মাতাজীর কাছে। তাঁর দয়া হ'ল, নিজেই এলেন আপনাকে নিতে। তিনি ছাড়া আর কারই বা সাধ্য হবে আপনাকে আসন থেকে তোলবার? কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেল যে! আর থাকতে না পেরে আমরাই নেমে এলাম। মাতাজী গেলেন কোথায়?" এধার ওধার চেয়ে খুঁজতে লাগলেন দুজনে ওঁদের মাতাজীকে।

গদির ওপর ছড়ানো গয়নাগুলো তখন নজরে পড়ে গেল ওঁদের। ঘরের চালের ওপর ফেলে রেখেছিলাম শাড়ীখানা। সেখানাও এতক্ষণে দেখতে পেলেন ওঁরা। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে চাইলেন। তারপর বোবা হয়ে চেয়ে রইলেন আমার চোখের দিকে।

ওঁদের মুখের অবস্থা দেখে ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল। আর সামলাতে পারলাম না, হা হা করে হেসে উঠলাম।

সেই নৃশংস উল্লাস দেখে দু'জোড়া চোখে ফুটে উঠল আতঙ্ক। একটি বাক্যও বার হ'ল না কারও মুখ থেকে, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন দু'জনে আমার মুখের দিকে।

গয়নাগুলোর দিকে আঙুল উঁচিয়ে হুকুম করলাম—"নিয়ে যাও এগুলো।"

চমকে উঠলেন কুমার—"নিয়ে যাব! কেন?"

বেশ রসিয়ে জবাব দিলাম—"আবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে তখন তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোর।"

কান্না উথলে উঠল কুমারের সঙ্গিনীর গলায়—"তাহ'লে কি মাতাজী আমাদের একেবারে ত্যাগ করে গেলেন? মাত্র কাল আমরা তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছি, আর দু'টো দিনও তাঁকে ধরে রাখতে পারলাম না! কিছুই যে করা হ'ল না তাঁর, কিছুই যে আমরা দিতে পারলাম না তাঁকে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হুজুরের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন কুমার—"কোথায় গেছেন তিনি?"

আরও চড়া গলায় জবাব দিলাম—"বলব কেন তোমাদের?"

সমস্ত রক্ত চলে গেল কুমারের মুখ থেকে। চেষ্টা করে একটা ঢোঁক গিললেন।

এক ঝলক আগুনের হলকা বার হ'ল তখন শ্রীমতীর মুখ থেকে।

"বলবেন না আপনি? কেন, কি অপরাধ করেছি আমরা? আমরা আপনাদের সন্তান, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছি আমরা। আপনি আমাদের গুরুর গুরু। আপনাকে দেখে আমার স্বামী পাগল হয়ে উঠলেন। অমন স্ত্রীকে ত্যাগ করে কিসের টানে মানুষ শ্মশানে বসে থাকে, শ্মশানে বাস করে কি শান্তি পান আপনি, এই সব চিন্তা করে উনি মানুষ হয়ে গেলেন। মাতাজী আমাকে গিয়ে ধরলেন আমার বাপের বাড়ীতে। আমাকে ফিরিয়ে আনলেন। স্বামী শ্মশানবাসী হলেও স্ত্রী তাকে ছায়ার মত আগলে থাকে কেন, তা বুঝতে পারলাম মাতাজীকে দেখে। আমার মনের কালি ঘুচে গেল। জন্মের মত বিদেয় নিয়েছিলাম স্বামীর সংসার থেকে। আবার ফিরে এলাম, এসে দেখলাম স্বামী মানুষ

হয়ে গেছেন। তখন দু'জনে তাঁর পায়ে আশ্রয় চাইলাম। কাল আমাদের দীক্ষা হয়েছে। ঐ কাপড ঐ গয়নাগাঁটি আমি তাঁকে আপন হাতে পরিয়ে দিয়েছি। আমাদের ভিখারিণী মা কিন্তু নিজের সাজ ছাডলেন না। বললেন—দাও পরিয়ে এই সাদা কাপডের ওপরেই। এ আমি ছাডতে পারব না। যদি কোনও দিন তাকে তুলে আনতে পারি শ্মশান থেকে, ছাডাতে পারি তার গা থেকে মডার কাপড, তবেই ছাডব এই ভিখিরীর সাজ। বড আশায় তিনি এসেছিলেন আপনাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে। কোথায় গেলেন তিনি? এভাবে আমাদের তিনি ত্যাগ করে চলে যাবেন এ যে ভাবতেই পারি না। কার কাছে আর দাঁডাব আমরা—"

বল হরি—হরি বোল।

আকাশ-ফাটা চিৎকার উঠল বটে সডকের ওপর। বন্যার জলের মত নেমে আসছে মানুষ। ডোমপাডা ময়নাপাডা আর বাজারের দোকানদাররা সবাই ছুটে আসছে, তাদের মাঝে আসছে মাথা উঁচু করে অনেকগুলো লাঠি। আর আসছে—

বল হরি—হরি বোল।

নিমগাছের এধারে এসে গেছে। কে ও। কাকে আনছে ওরা? রাজার রাজা এলেও ত এত জাঁকজমক হয় না। কার আবির্ভাবে এভাবে খেপে উঠল উদ্ধারণপুরের মানুষ। এ কোন্ মহারাজাধিরাজ?

হু হু করে চলে এল সকলে। সামনের লোক দু পাশে সরে পথ ক'রে দিলে। সেই ফাঁক দিয়ে এগিয়ে এসে দাঁডালো চারজন আমার গদির সামনে। তাদের কাঁধে বাঁশ। বাঁশের মাঝে ঝুলছে—রক্তমাখা কাপড জডানো একটা জাদুর পোঁটলা। টপ টপ করে রক্ত পডল কয়েক ফোঁটা শ্মশান-ভস্মের ওপর। তারপর ভিডের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সিধু ঠাকুর। আছডে পডল আমার গদির সামনে। আকাশটা চিরে গেল সিধু ঠাকুরের বুক-ফাটা চিৎকারে—

"গোসাঁই বাবা গো—খন্তাকে নিয়ে এলাম গো আমরা—"

বাকীটুকু শোনা গেল না। শতকণ্ঠ একসঙ্গে ডুকরে উঠল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাহাকার ক'রে উঠল উদ্ধারণপুরের শেয়ালগুলো, বিকট গর্জন করতে লাগল শ্মশানের কুকুরগুলো, নিষ্ফল আক্রোশে শকুনগুলো ডানা ঝাপটাতে লাগল মাথার ওপর। আর নিচে উদ্ধারণপুরের গঙ্গা মাথা কুটতে লাগল উদ্ধারণপুর ঘাটের পায়ে।

এনেছে ওরা।

লাঠালাঠি করে কেড়ে এনেছে। খন্তার খুনের দাম দিতে গিয়েছিল যারা তারা খুন দিয়ে দাম শোধ করেছে। বিনা জলে শুকিয়ে মারবার মতলবে যে ঘরে খন্তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল সেই ঘরের জানালা ভেঙে খন্তা উঠে পড়ে শীলেদের তেতলার ছাদে। সেখানেও তাকে তাড়া করা হয়। সেই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে খন্তা নিচের শান-বাঁধানো উঠোনে। কার সাধ্য রোখে খন্তাকে? খন্তা পালিয়ে এল ঠিক। তাঁরা মতলব করেছিলেন খন্তার ছাতু-হওয়া খোলসটা পাচার করে ফেলবার। সে সুযোগটুকু আর মিলল না। এরা গিয়ে পড়ল আর লাঠি হাঁকরে ছিনিয়ে নিয়ে এল খন্তা ঘোষকে।

শুনলাম সিধু ঠাকুরের মুখ থেকে খন্তা ঘোষের বিজয়-কাহিনী। তারপর দু'-চোখ বুজে বসে রইলাম। কানে বাজতে লাগল শতকণ্ঠের আকুল আর্তনাদ। দুর্দান্ত খন্তা মরে নি, মরতে পারে না খন্তা। শত শত বুকের ভেতর ভয়ানক রকম বেঁচে রয়েছে। "মোহন প্যারে"কে জাগাবার জন্যে তান তুলত খন্তা ঘোষ। উদ্ধারণপুরের ঘাট তোলপাড় করত দাপাদাপি করে। "মোহন প্যারে" জেগেছে সকলের বুকের মধ্যে। কার সাধ্য মারে খন্তাকে। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে উদ্ধারণপুরের ঘাট থেকে খন্তাকে ছিনিয়ে নেবে।

ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল কান্নার কলরোল। কি হ'ল! দু'চোখ মেলে দেখলাম। দেখলাম আবার ফাঁক হয়ে গেল সামনের মানুষের ভিড়। পথ করে দিল সবাই। আর ওরা দু'জন এগিয়ে এল ধীরে ধীরে। খন্তা ঘোষের ছোড়দি এসে দাঁড়ালো খন্তা ঘোষের জীবনের আলোয় হাত ধরে। একটা ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যায়। দম বন্ধ করে চেয়ে আছে সকলে। তারপর শোনা গেল:

"চোখ খোল্ সুবর্ণ। যা দেখতে চাস, চেয়ে দেখ্। ভাই আমার নেমক-হারাম নয়। ঐ দেখ্ পড়ে আছে তার বিদঘুটে খোলসটা। ওই ছেড়ে ফেলে সে এসে লুকিয়েছে তোর বুকের ভেতর। আর কেউ দেখতে পাবে না তাকে, শুধু তুই দেখবি তোর বুকের ভেতর। সে তোকে দেখবে আর তুই তাকে দেখবি। হয়ে গেল তোদের বিয়ে। এখন আর কে বাধা দেবে! বেঁচে রইল আমার ভাই তোর বুকে। চল্—এবার পালাই এখান থেকে।"

মেয়েটা চোখ খুললে না। টুঁ শব্দ করলে না। মুখটা গুঁজে দিলে রাঙাদিদির বুকে।

আবার ওরা ফিরে চলল ধীরে ধীরে শত শত জোড়া বোবা চোখের সামনে দিয়ে। ছুটে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়ালো কুমারের স্ত্রী।

"মা—'

এগিয়ে গেলেন কুমার। খুব ভারী গলায় বললেন—"আমরা কি করব বলে গেলে না ত ?"

হাসতে জানে নিতাই। খুব মিষ্টি করে হাসতে জানে। মিষ্টি করে হেসে ওদের দিকে চেয়ে বলল—"কেন, তোমার আবার ভাবনা কি ? ঐ ত বসে রইলেন উনি। যাঁর কৃপা তোমরা পেলে, যাঁর মন্ত্র আমি দিয়েছি তোমাদের, যাঁর দিকে চেয়ে তোমরা সংসার করবে, সেই গুরুর গুরু ত ঐ বসে আছেন। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমি ভিখিরী মেয়েমানুষ। পথে পথে ঘুরে বেড়ানো আমার কাজ। আমাকে বাধা দিও না।"

বাধা আর দিল না ওরা। পথ ছেড়ে দিল। এগিয়ে চলল আবার—সুবর্ণকে জড়িয়ে ধরে।

আর থাকতে পারলাম না। ডাক ছেড়ে উঠলাম।

"নিতাই, একেবারে ভুলে গেলে বাবাজীর কথা ?"

থমকে দাড়াল। পিছন ফিরেও তাকালো না, আবার পা বাড়ালে।

আবার চেঁচিয়ে উঠলাম—"বাবাজী অন্নজল ত্যাগ করেছে নিতাই। সেও গিয়েছিল খন্তার সঙ্গে। খন্তাকে ত আনলে এরা, তাকে বোধ হয় শেষ করেই দিলে।"

ফিরে দাঁড়াল এবার। পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেললে আমার চোখের ওপর। জিজ্ঞাসা করলে—"তা আমি কি করব ?"

তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম—"কিন্তু যদি ধর সে ফিরেই আসে ত ? তার মুখে জল তুলে দেবে কে ? তোমার হাতে ছাড়া আর কারও হাতে সে জলও খাবে না।"

আবার বললে সেই একই কথা—"তা আমি কি করব ?"

এবার সত্যিই ব্যাকুল হয়ে উঠলাম—"নিতাই, তুমি যা বলবে তাই করব আমি। উঠে যাব আমি এখান থেকে তোমার সঙ্গে। শুধু তুমি বাবাজীকে বাঁচাও। যদি সে ফেরে তার মুখে জল দিয়ে তাকে বাঁচাও তুমি। আর আমি কিছু চাই না তোমার কাছে—"

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল বোষ্টমী। হাসি যেন উপচে পড়তে লাগল ওর চোখ-মুখ সর্বাঙ্গ থেকে। হাসি সামলাতে সামলাতে বললে—"বাবাজীর জন্যে তুমি আর কি করতে রাজী আছ গোসাঁই ? যাক আর কয়েকটা দিন। ভুল তোমার ভাঙবেই একদিন। সেদিন বুঝতে পারবে একটা একেবারে

মিথ্যে মরীচিকা নিয়ে তুমি মাথা খুঁড়ে মরছ। আচ্ছা যদি তোমার বাবাজীর সঙ্গে আবার দেখা হয় ত তাকে বোল যে মড়া নিয়ে মেতে থাকার ফুরসৎ নেই আমার। জ্যান্তদের যদি একটু শান্তি দিতে পারি তাহ'লেই আমি নিজে মরে শান্তি পাব। মড়ার আবদার তুমিই শোন বসে বসে গোসাঁই। ও বিলাসিতা আমার পোষাবে না।"

বলতে বলতে পেছন ফিরে আবার পা বাড়ালে। তারপর ওরা মিলিয়ে গেল লোকজনদের পেছনে। কুমার আর তাঁর স্ত্রীও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অভ্যাস-দোষে বলে ফেললাম—"খন্তা, একটা বোতল খোল্ ত বাবা, গলাটা ভিজিয়ে নিই।"

বলেই ভয়ানক চমকে উঠলাম। রক্তমাখা কাপড়ের পোঁটলাটা তখনও পড়ে আছে ঠিক সামনে। হাঁ করে চেয়ে রইলাম সেদিকে।

একটা খোলা বোতল কে হাতে ধরিয়ে দিল। অভ্যাস-দোষে সবটুকু গলগল করে ঢেলে দিলাম গলায়। দিয়ে আবার চোখ বুজে রইলাম।

উদ্ধারণপুরের উপসংহার।

নেমে এল উদ্ধারণপুরের মাথার ওপর উদ্দাম উপপ্লবের বেশ ধরে। খুব কাছে সরে এল উদ্ধারণপুরের আকাশ। হাড়ের শিঙা ফোঁকা ভুলে গিয়ে উদ্ধারণপুরের বাতাস মেতে উঠল আকাশের ছুই কালামুখী দেবীকে নিয়ে। বাসনা আর বঞ্চনা. উদ্ধারণপুরের ছুই দেবীর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিতে লাগল উদ্ধারণপুরের উন্মত্ত বাতাস। ছুর্দান্ত খন্তা ঘোষ মাঝে মাঝে খেপে গিয়ে ময়নাপাড়ার ঢেঁটা মেয়ে-গুলোর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাত। বলত, মর্ তোরা, মর্। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে মরার চেয়ে আয় তোদের আমিই মেরে ফেলি। মেরে চুলোয় তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই যেধারে ছু'চক্ষু যায়। মড়াকান্না উঠত ময়না-পাড়ায়। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করা মুলতুবী রেখে ওরা সবাই গলা মিলিয়ে লেগে যেত খন্তার বাপান্ত চোদ্দপুরুষান্ত করতে। হি হি করে হাসতে হাসতে সরে আসত খন্তা। বলত—দে যত পারিস গালাগাল দে আমায় চুলোমুখীরা। কিন্তু খেঁকী কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করে মরিস নে।

হি হি করে হাসছে উদ্ধারণপুরের বাতাস। কাঁই কাঁই করে কাঁদছে উদ্ধারণপুর আকাশের ছুই কালামুখী দেবী বাসনা আর বঞ্চনা। কড়-কড়-কড়াৎ করে ছু'হাতের দশটা আঙুলের দশখানা ধারালো নখ দিয়ে চিরছে উদ্ধারণপুর রঙ্গমঞ্চের পর্দাখানা। উদ্ধারণপুরের উপসংহার। আর কোনও চালাকি চলবে না জাঁহাবাজ

জাদুকরের। যবনিকাখানা ছিঁড়ে খানখান করে দেখাবেই উপসংহার কি লুকোনো আছে ওর আড়ালে। জারিজুরি ভাঙবে আজ জাদুকরের। উদ্ধারণপুর রঙ্গমঞ্চের ওপর ভেলকিবাজির খেল্ দেখানো ভেস্তে যাবে চিরকালের মত। ঠসক দেখিয়ে ঠকানো আর চলবে না।

হু হু করে জ্বলে উঠেছে খন্তা ঘোষের চিতাটা। লাফিয়ে উঠেছে আগুন আকাশ ছোঁবার জন্যে। আগুনে বাতাসে লড়াই চলেছে চিতার ওপর। উদ্ধারণপুরের বাতাস নেভাবেই খন্তা ঘোষের চিতা। নবরসের একটারও ধার ধারত না খন্তা। কোনও লাভ নেই ওকে জ্বালে চড়িয়ে। খন্তা ঘোষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ঐ খোলসের মধ্যে। লোকের বুকের মধ্যে যে চিতা জ্বলছে তাতে চড়ে আরামে পুড়ছে খন্তা ঘোষ। পুড়বেও চিরকাল। কোনও কালে সে পোড়ার শেষ হবে না।

উদ্ধারণপুরের উপসংহার।

উপসংহার উড়িয়ে নিয়ে গেল আমার গদির ওপরের চালখানা। নিয়ে গিয়ে ফেললে গঙ্গার জলে। গঙ্গা ভাসিয়ে নিয়ে চলল সাগরের বুকে বিসর্জন দিতে। সাফ্ হয়ে গেল মাথাটা। ঠিক সেই সময় কড়-কড় কড়াৎ—একটা ঝিলিক দিলে গঙ্গার এপার ওপার জুড়ে। আর সেই আলোয় দেখতে পেলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম কে যেন কি খুঁজছে উদ্ধারণপুরের ঘাটে। অন্ধের মত দু'হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্মশানে। নিমেষের জন্যে দেখতে পেলাম। মিলিয়ে গেল সে কালো যবনিকার অন্তরালে। তারপর শুনতে পেলাম।

অনেক দূর থেকে, খন্তা ঘোষের চিতার ওধার থেকে ভেসে এল আওয়াজটা, উদ্ধারণপুরের উন্মাদ বাতাসের বুক চিরে ভেসে এল।

এগিয়ে আসছে, ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে শোনবার চেষ্টা করছি।

আর একবার, আর একটিবার চিরে ফেলুক কালো যবনিকাখানা উদ্ধারণপুরের উপসংহার। তাহ'লেই হবে সাধ্য থাকবে না—চিতার আঁচে পোড়া আমার চোখ দু'টোকে ফাঁকি দেবার। ঠিক ধরে ফেলব জাদুকরকে। ধরবই দু'হাতে জাপটে। তারপর গলা টিপে তুলে দোব ঐ খন্তা ঘোষের লেলিহান চিতাটার ওপর।

হাত দু'টো গদির ওপর দিয়ে হন্সে কুকুরের মত উবু হয়ে বসলাম। দেখা মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ব তার ঘাড়ে। বেরিয়ে যাবে আমার সঙ্গে চালাকি করা।

এবার আরও স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ধরতে পারলাম কথাগুলো—

"তোমার চরণ পাব বলে
মনে বড় আশা ছিল ;
আমার মনে বড় আশা ছিল।"

লাফিয়ে পড়লাম গদির ওপর থেকে। আন্দাজ করে ছুটলাম যেখান থেকে আওয়াজটা আসছিল সেখানে।

সরে গেল অন্য দিকে। আবার কানে এল—

"আশা-নদীর কূলে বসে গো
আমার আশায় আশায় জনম গেল।"

আর ফাঁকি দেওয়া চলল না। এক লাফে গিয়ে জাপটে ধরলাম তাকে দু'-হাতে বুকের সঙ্গে। টেনে নিয়ে চললাম আলোর দিকে। খস্তা ঘোষের চিতার আলোয় চিনব এবাব ওকে।

চিতার কাছে পৌছে ও আমার বুকের ওপর মাথাটা রেখে এলিয়ে পড়ল। বললে—"আঃ, বাঁচলাম গোসাঁই। বড ভয় ছিল তোমায় বোধ হয় খুঁজে পাব না।"

"কেন মোহন্ত? কেন খুঁজে পাবে না আমায়? শুধু তোমার জন্যেই আমি বসে আছি মোহন্ত। জানতুম আমি যে তুমি আসবে। এবার তোমার সঙ্গে আমি চলে যাব মোহন্ত। এখানের কাজ আমার ফুরিয়েছে।"

সমস্ত দেহটা তখন ছেড়ে দিয়েছে চরণদাস আমার গায়ে। ভয়ানক রোগা হয়ে গেছে, আধখানা হয়ে এসেছে চরণদাস। যাক্, তবু ত এসেছে। এবার পালাই ওকে নিয়ে। রাতটা কোনও রকমে কাটলে হয়।

চরণদাস ছোট ছেলের মত আবদেরে সুরে বললে, "একটু বোস গোসাঁই, আমি শুই তোমার কোলে মাথা রেখে। আর যে পারি না খাড়া থাকতে।" বসে পড়লাম খস্তা ঘোষের চিতার পাশে। চরণদাস শুয়ে পড়ল আমার কোলে মাথা দিয়ে। শুয়ে খুব আস্তে আস্তে আবার গেয়ে উঠল—

"তোমার চরণ পাব বলে গো
মনে বড আশা ছিল।"

হঠাৎ বাবাজীর সমস্ত দেহটা দু'বার শিউরে উঠল। মাথাটা তুলে খক্ খক্ করে কাশতে লাগল। হডাৎ করে এক ঝলক বেরিয়ে এসে পড়ল আমার কোলের ওপর। দেখলাম চিতার আলোয়—খস্তা ঘোষের চিতার আলোয় দেখতে পেলাম—কালোয় কালো হয়ে গেল আমার কোলটা। আর তার ওপরেই আবার মুখ-থুবড়ে পড়ল চরণদাস।

কাঠ হয়ে বসে রইলাম ওর দিকে চেয়ে। অনেকক্ষণ পরে সামলে নিলে বাবাজী। তারপর আবার আরম্ভ করলে—

"আশা-নদীর কূলে বসে গো
আমার আশায় আশায় জনম গেল।"

আবার কেঁপে উঠল ওর দেহটা। তেউড়ে উঠল দেহটা। আবার সেই কাশি। কাশির সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—"তোমায় যে দেখতে পাচ্ছি না গোসাঁই, আর কিছুই যে দেখতে পাই না আমি। আমার চোখের আলো অনেক দিন নিভে গেছে গোসাঁই। তাই বড ভয় ছিল হয়ত তোমায খুঁজে পাব না।"

আবার উঠল একটা কাশির দমক। বেরিয়ে এল আর এক ঝলক কালো রক্ত, পডল আমার কোলের ওপর। তারপর খুব আস্তে আস্তে চরণদাস শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পডল।

উদ্ধারণপ... উপসংহার।

উপসংহার উপহার দিযে গেল আমার কোলে।

খন্তা ঘোষের চিতার আলোয উপহারের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

উদ্ধারণপুরের বাতাস লডতে লাগল চিতার আগুনের সঙ্গে।

ওকে নামিয়ে দিলাম ভস্মের উপর। দিযে উঠে দাঁডালাম।

একটা কলসী চাই। তাডাতাডি চাই। গঙ্গাজল আনতে হবে। স্নান করাতে হবে চরণদাসকে। বড জ্বালায জ্বলছে। তেষ্টায ছাতি ফেটে গেছে ক... জল মুখে দেয় নি। ওকে ঠাণ্ডা করতে হবে। জল মুখে দিতে হবে ওর। ওর সারা অঙ্গ ধুইয়ে দোব গঙ্গাজল দিযে। তারপর তুলে দোব খন্তা ঘোষের চিতার ওপর। শেষ হয়ে যাবে, রাতের অন্ধকারে শেষ করে দোব ওকে। চিহ্নমাত্র রাখব না। কেউ জানবে না কোথায গেল চরণদাস বাবাজী।

পেলাম একটা ভাঙা কলসী।

দৌডে গিয়ে আনলাম জল। তাডাতাডি লেগে গেলাম কাজে। টেনে খুলে ফেললাম ওর কাপডখানা। ছুঁডে ফেলে দিলাম সেখানা আগের চিতার আগুনে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুনটা। উলটে ফেল...ম বাবাজীকে। ছুটে এল আবার বাতাস। আগুনের শিখাটা নুয়ে পডল এদিকে। আর—

আর পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম বাবাজীর দিকে। খন্তা ঘোষের চিতার আলোয় দেখলাম।

দেখলাম—একটা অসমাপ্ত রচনা। সৃষ্টিকর্তার মনের ভুল। মনের ভুল নয় শুধু, একটু গাফিলতি। অতি-বৃদ্ধ ওস্তাদের হাতের কাজে খুঁত থেকে গেছে।

বাবাজী নর নয়, নারী নয়। কিছুই নয়। বিধাতার অমার্জনীয় ভ্রান্তির নিষ্ঠুর সাক্ষ্য।

উদ্ধারণপুরের উপসংহার।

উপসংহার উপহাস করে বিদায় নিলে। বিধাতার সামান্য ভুলের জের টেনে ভুলের দঁকে পড়ে খাবি খেয়ে মরছি আমি!

ওকে তুলে দিলাম। খন্তা ঘোষ আর চরণদাস, সাদা হাড় আর কালো কয়লা জ্বলতে লাগল একসঙ্গে। চরণদাসের লজ্জা লুকিয়ে ফেললাম। সেই চিতা থেকে একখানা কাঠ টেনে নিয়ে গিয়ে গুঁজে দিলাম গদিটায়। বাতাস এসে লাগল তার পেছনেও। উদ্ধারণপুরের গদি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। রাশীকৃত ভুল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে উদ্ধারণপুর ঘাটের অনেকটা আঁধার ফিকে করে আনলে। সেই আগুনে পুরতে লাগল কুমার বাহাদুরের গয়নাগুলো আর কাপড়খানা। পুড়ুক —অনেক আছে তাঁর। কিছু ক্ষতি হবে না।

উঠে এলাম বড় সড়কের ওপর।

অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে পালাতে হবে।

নেমে এল আকাশ। কাঁদতে লাগল বাসনা আর বঞ্চনা। কেঁদে বিদেয় দিচ্ছে উদ্ধারণপুরের দেবীরা।

এগিয়ে চললাম বড় সড়ক ধরে।

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই টের পেলাম! স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কে হাঁটছে আমার পাশে পাশে!

তারপর ধরলে আমার একখানা হাত।

কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে—"চল, পা চালিয়ে চল একটু। আঁধার থাকতে থাকতে পার হয়ে যাই এই পথটুকু।"

নিশ্চিন্ত হয়ে পা চালালাম।

হাত ত ধরেই আছে, আর ভয় কি!

সমাপ্ত

বশীকরণ

উৎসর্গ

অমলের

মা

সুখময়ী দেবীকে

১

নাম তোরাব আলি।

জেলে আমার খাবার জোগাত তোরাব। বিশ্বাসী লোক। জেলের বাবুরা, সাহেবরা, আর বড বড় জমাদার সাহেব—এঁদের সকলেরই আস্থা আছে তোরাবের ওপর। কয়েদী যদি বেগড়ায়—তোরাব তাকে বাগে আনতে পারবে, শুধু তাই নয়, সকলেই জানেন যে, তোরাব একটি অপার্থিব শক্তির অধিকারী। এত বড় জেলে এতগুলো বন্দীর মধ্যে যদি একজনেরও মনের কোণে বিন্দুমাত্র স্বপ্ন জাগে শিকল কাটবার, তা হলে তৎক্ষণাৎ তোরাব তা জানতে পারে। তারপর সে সংবাদ যথাস্থানে পৌছে দিতে তোরাবের আর কতটুকু সময় লাগে?

সকলেই খাতির করে তোরাব মেটকে, আর সাধ্যমত এড়িয়ে চলে তাকে। তার চেয়ে পুরনো পাপী যারা, তারাও সাবধানে থাকে। বলা তো যায় না, কখন ওর দিল্ তডপে উঠবে তা হলেই কেলেঙ্কারি। মুখে যা আসবে তাই বলে বসবে হুজুরদের সামনে। তারপর দিক্‌দারির শুরু। একজন থেকে আর একজন, তারপর আর একজন ধরে টান পডবে। কার বরাতে কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না। মার ডাণ্ডাবেড়ি, মাডভাত, মেট থেকে কালাপাগড়িতে নামানো, কালা-পাগড়ি থেকে সাধারণ কয়েদী। তার ওপর লে আও টিকিট—কাটো পনেরো দিন, কাটো এক মাস। লাঞ্ছনার একশেষ।

সকলের চেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তোরাব মেট। চুল-দাড়ি কামায়, প্রতিদিন সাবান দেওয়া সাজপোশাক পরে। রং তার ফরসা—বেশ ফরসা, ভ্রূ আর মাথাব চুল কটা, চোখের তারা দুটিও কটা। আমার সেলের সামনে কোমরের তোয়ালেখানা পেতে হাঁটু গেডে বসে যখন নামাজ পডত তোরাব, তখন আমি একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম গরাদের ভেতর থেকে। চোখ বুজে ও ঠোঁট নাড়ত।

বেলা দুটো তিনটের সময় রোজই তোরাব এসে সেলের গরাদ ধরে দাঁড়াত। তা এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। সময়টা কাটত হিসেব করতে করতে। হিসেব সোজা নয়। চোদ্দ থেকে আট বাদ গেলে মাত্র ছয় থাকে বাকি, আর ছয় থেকে কত বাদ গেলে কিছুই থাকে না?

হিসেব করত তোরাব—“আজ্ঞে জানমু না ক্যা বাবু মশায়। [illegible]েন ছয় সন—আর এডা অইল গ্যা মহরমের মাস, তা অইল গ্যা ছয় সন আর নয়খান মাস। কাবার কইব্যা ত্থালাম সাত সন। কি কন?”

তাড়াতাড়ি উত্তর দিই আমি, “বটেই তো। সাত বছরের আর বাকি কোথায় তোমার?”

উত্তর শোনার অপেক্ষা রাখে না তোরাব, হিসেব চালিয়ে যায় আপন মনে—“তার সাথে ধইব্যা রাখেন আরও ছয়খান মাস, ওই হাতখানা মাসই গোনতি পারেন। ছার পাইমু না?”—ব'লে এমনভাবে চেয়ে থাকে আমার দিকে যেন বছরে এক মাস হিসেব ছাড় পাওয়া না পাওয়াটা আমার মতামতের ওপরেই নির্ভর করছে।

বিস্ময় প্রকাশ করি, “পাবে না মানে? না পাবার কি হয়েছে?”

চকচকে দাঁতগুলি বার ক'রে তোরাব বলে—“হক কথা কইছেন কর্তা।” তারপর হঠাৎ যেন তার মনে প'ড়ে যায়। আবার শুরু করে—“আরও ধরেন তিনডা মাস। হেবার মাইরডাঙ্গায় বব সাহেব মাফ ত্থালেন তিনডা মাস, এক্কারে পাকা কইব্যা লেইখ্যা থুইযা গ্যাছেন মোর টিকিডখানার 'পর। অ্যাহন-জোবেন হেসাবখান। ত্থাহেন আটডা সন কাবার কইব্যা ত্থালাম কিনা কন?”

তু' হাত মেলে আঙ্গুল গুনতে থাকে। চৌদ্দ থেকে আট বাদ গেলে থাকে মাত্র ছয়। মাত্র ছটি বছরই বাকি আছে তাব খালাস পেতে। এব মধ্যে যদি আর তু-একবার দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগে জেলে, তবে খোদার দোয়ায় কি আরও অন্তত ছটা মাস মাফ করিয়ে নিতে পারবে না সে? খুব পারবে।

সেবারের সেই হাঙ্গামার কাহিনী কমপক্ষে একশোবার আমার শোনা হয়ে গেছে তোবাবের মুখ থেকে। শুনতে শুনতে এমনই দাঁড়িযেছিল যেন সেই মাবাত্মক পালাটি আগাগোড়া ঘাটে গেছে আমাব চোখের ওপর, চোখ বুজে হুবহু আমি দেখতে পেতাম সে-দিনের সেই কাণ্ডকারখানা।

বেলা তখন এগারোটা। হঠাৎ হৈ হৈ উঠল চারদিক থেকে। এক সঙ্গে ফুঁসিয়ে উঠল সাড়ে সাতশো লোক। খোন্তা কোদাল যে যা পেলে হাতের কাছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াল। তিনশো যাট দিন শুধু পুঁইশাকসেদ্ধ খেতে আর কেউ রাজী নয়।

বড় সাহেব, জেলার সাহেব, ছোট হুজুরেরা সকলেই অফিসের মধ্যে। সকলেরই মুখ চুন। পেট-মোটা জমাদার সাহেবরা ছুটে গিয়ে জড়ো হয়েছেন গেটের ওধারে অফিসের সামনে। ওয়ার্ডাররা কে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে তার

পাত্তা নেই। পাগলা-ঘন্টি বাজছে তো বেজেই চলেছে। সাড়ে সাতশো লোক মরীয়া হয়ে একটু একটু করে এগুচ্ছে গেটের দিকে।

তোরাবের তখন মাত্র তিন বছর। কয়েদীর ভেতরের সব খবরাখবর যথাস্থানে সরবরাহ করে সে তখন নূতন কালাপাগড়ি পেয়েছে। দিনে অফিসের মধ্যে কাজ-কর্ম করে, ঝাড়ে পোঁছে, ফাইফরমাস খাটে। রাতে নিজের ওয়ার্ডে তালা-চাবির মধ্যে বন্ধ থাকে। প্রকাণ্ড হলটার দু'ধারে সারবন্দি ঘুমোচ্ছে কম্বল বিছিয়ে যে কয়জন লোক, তাদের মাঝখান দিয়ে হলটার এ-ধার থেকে ও ধার হাঁটা আর বিচিত্র সুরে গান গেয়ে গোনা 'এক দো তিন চার—সাতচল্লিশ উনপঁচাশ পঁচাশ—ঠিক হায় চার নম্বর।' মনে মনে হয়তো আলাদা করে গুণতে থাকত তখন চোদ্দ থেকে তিন বাদ গেলে হাতে থাকে এগারো আর এগারো থেকে কত বাদ গেলে হাতে কিছুই থাকে না আর।

নসিবের জোরে সেদিন তখন কালাপাগড়ি তোরাবালি অফিসের মধ্যেই আটক পড়েছিল হুজুরদের সঙ্গে।

প্রতি মুহূর্তে অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে উঠছে। সরকারী ভাষায় যাকে বলে আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া, অবস্থাটা প্রায় সেই রকমেরই হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সাহেবরা পরামর্শ করছেন—গুলি চালাবার হুকুম এই মুহূর্তেই দেবেন, না আরও কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করে দেখবেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে লোক ছুটেছে।

তোরাব গিয়ে দাঁড়াল সেলাম ঠুকে সুপার সাহেবের সামনে, তখন তার কপালের ওপর খাড়া হয়ে নীল শিরগুলো।

তার চোখের দিকে চেয়ে সাহেব তাঁর পিস্তলটা হাতে তুলে নিলেন।

কেয়া মাংতা?

বক্ষে তার আগুন ধরে গেছে তখন। সাহেব শুনলেন তার আরজি, পিস্তল-সুদ্ধ হাত নামালেন না বা তোরাবের ওপর থেকে নজর সরালেন না। কয়েকটা কথা-কাটাকাটি করলেন জেলার সাহেবের সঙ্গে। তোরাবের আরজি মঞ্জুর হল, হাত-পাঁচেক লম্বা একখানা পাকা লাঠি দেওয়া হল তাকে। পিস্তল বাগিয়ে ধরে স্বয়ং বড় সাহেব চললেন তার পিছু পিছু ফটকের ছাদের ওপর। ভেতরের গেট তখন খুলবে কে? গেট খুললেই যদি লাফিয়ে পড়ে সাড়ে সাতশো লোক গেটের ওপর।

তারপর—

র‍্যা র‍্যা কইরা একডা চিক্কুর ছাইড়া দ্যালাম লাফ আর নামলাম গ্যা একারে

হালাগোর মন্তি। তহন বুইঝা লন ব্যাপারখান। মুই তোরাবালি, মোর ওস্তাদের নাম আসমতালি ছায়েব। গরের মন্তি হুইয়া হাশের মানুষ কাঁপে মোর ওস্তাদের নামে। চক্ষু পালডাতি না পালডাতি হালাম এক কুড়ি খতম কইর‍্যা। ব্যাস, হালার গুষ্টি কাইত্। ফটক খুইল্যা ছুইটা আইয়া পডল প্যাট-মোটা জমাদার ছায়েবরা। হালাগো সামাল ছাওয়া গ্যাল, তালা পডল, লোক গোনতি হল। বর ছায়েব আপন হাতে আধস্যার লাল পানি ঢাইলা হ্যালেন মোর মগে। আর তিনখান মাস র‍্যাহাই প্যালাম।

বলতে বলতে তোবাবেব চোখ-মুখেব চেহাবা যেত বদলে। আমার বুকেব ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠত ওর মুখেব দিকে চেয়ে। তবু বক্ষে যে দু'ইঞ্চি মোটা লোহার গবাদগুলোর এক ধাবে সে, আব অন্য ধারে আমি। বাইবে থেকে হাত বাডিযে গলা টিপে ধরবে, সে উপায নেই।

জেলের মধ্যে জেল, তাব মধ্যে সেল। বিচারকর্তা বাইরে থেকে লিখে দিলেন, আমি বি ক্লাস। সি ক্লাস হলে সকলের সঙ্গে থাকতে পেতাম। বি ক্লাসেব জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। আলাদা কবে বাখতে হবে তো! কাজেই ফাঁসির আসামীব সেল একটি ছেডে দেওযা হল আমায। দশ হাত লম্বা আব পাঁচ হাত চওডা একটি ঘব, যার একমাত্র প্রবেশ ও নির্গমন-পথে দু'ইঞ্চি মোটা লোহার গবাদেব গায়ে শক্ত লোহাব জাল। হাওযা আলো বৃষ্টির ছাট এ সকলের জন্য অবাবিত দ্বার। সেই ঘরেব মধ্যে সি ক্লাসের মত কম্বল একখানি আব থালা মগ নিযে থাকতে পাবলেও স্বস্তি পেতাম। তা তো নয। একবাশ অস্থাবব সম্পত্তি বি ক্লাসেব। চাব হাত লম্বা, দু'হাত চওডা লোহাব খাট। তাব ওপর ছোবডাব গদি, ছোবডার বালিশ। নাবকেলের থেকে ছোবডা ছাডিযে নিযে সদ্য সদ্য একটা চটের থলেয় পুরে দেওয়া হযেছে। ছোবডাগুলোকে পেটানো বা পেঁজা হযনি। তারপর মশারি, যার চার দিকের ঝুল চার রকমের। এক দিকেব এক হাত, এক দিকের দু'হাত, এক দিকের তিন হাত আর এক দিকের চার হাত। একখানি টেবিল ও একটি চেযার। কি মহাপরাধেব দরুন ওরা দু'জন আমাব সঙ্গে সেলে বন্দী হয়ে বইল ন নটা মাস, তা বলতে পারব না। ওদের অবস্থা দেখে আমি ঘরের এক কোণে অতি সাবধানে একজনকে আর একজনের ওপব চাপিযে রেখে দিলাম। একেবারে বিকলাঙ্গ পঙ্গু কিনা বেচারারা।

আর একটি জিনিসও ছিল আমার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে। তান্ত্রিক সাধকরা পূজায় বসতে হলে আসনের পিছনে হাত ধুয়ে জল-টল ফেলবার জন্যে একটি পাত্র রাখেন। ওটির নাম ক্ষেপণী-পাত্র। আমার সেই দশ হাত পাঁচ হাত ঘরের মধ্যে

চব্বিশ ঘণ্টার জন্তে দেওয়া হত একটি ক্ষেপণী-পাত্র। চার সের আন্দাজ জল ধরে এই রকমের গোল একটি আলকাতরা মাখানো ঢাকনাওয়ালা জিনিস। বেহিসেবী হলে রক্ষে নেই। ঘর ভাসতে থাকবে নিজের অন্তরের অন্তরতম মালমসলায়। তারই মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে পরদিন সকালে অকথ্য গালাগালি উপরি পাওনা।

প্রথম দিন জিনিসপত্র সমস্ত সমঝে দিয়ে ছোট জেলারবাবু তোরাব আলির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—"বড় বিশ্বাসী লোক এ, আর এ জানে কি করে সম্মানী লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।" তারপর থেকে ন' মাস আমি রইলাম তোরাব আলির হেপাজতে।

ঠিক সকাল সাতটায় সেলের সামনে এসে দাড়াত তোরাব। বলত, "সালাম কর্তা।" জমাদার এসে সেলের তালা খুলে দিয়ে যেত।

সেলের মাপের সমান এক টুকরো উঠান সেলের সামনে। তিন-মানুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঠান থেকে বাইরে বেরুবার দরজাটি সেলের দরজার কজু-কজু। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলে পাওয়া যাবে তিন হাত চওড়া গলি। গলিটা সব কটা সেলের সামনে দিয়ে চলে গেছে। তারপরই হচ্ছে লাল ইটের ছ-মানুষ উঁচু পাঁচিল। সেই গলি দিয়ে দিবারাত্র ওয়ার্ডাররা রুল হাতে এ ধার থেকে ও-ধার আর ও ধার থেকে এ-ধার খট খট মস মস করে টহল দেয়। উঠানের দরজা দিয়ে নজর রাখে, সেলের মধ্যের জীবটি কিছু করছে কিনা। করবার অবশ্য কিছুই ছিল না, ওঁদের শ্রীবপু কতবার উঠানের দরজা দিয়ে দেখা যায় তা গণনা করা ছাড়া।

সেল থেকে বেরিয়ে এসে তোরাবের সঙ্গে উঠানের দরজা পার হতাম। সেই তিন হাত চওড়া গলিটার এক প্রান্তে পৌছে কলের নীচে মাথা পেতে বসে থাকতাম। সকালের ছুটির পুরো আধ-ঘণ্টাই বসে থাকতাম কলের নীচে। বি ক্লাসের ওইটুকুই বিশেষ সুবিধা। নয়তো সারারাত ক্ষেপণী-পাত্রের সঙ্গে কাটিয়ে কার সাধ্য সকালে এক ঢোঁক জল গেলে!

আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়ে তোরাব নিয়ে আসত চা আর চায়ের সরঞ্জাম। সাড়ে-পনেরো আনা কলাই-ওঠা একখানি থালায় করে আনত সে সমস্ত অপূর্ব খাদ্যসামগ্রী। সি ক্লাস তো নই, কাজেই বিলকুল অসাধারণ হওয়া চাই। থালার ওপর থাকত, বড় বড় আরশোলা সেঁকে দিলে যেমন দেখতে হয় ঠিক সেই রকম দেখতে, দশ-বারো টুকরো পোড়া পাঁউরুটি। তার পাশে এক ধ্যাবড়া সাদা থকথকে পদার্থ। ওই পদার্থ দিয়ে আরশোলা-সেঁকা খেতে হবে। খেলে বি ক্লাসের ব্রেকফাস্ট করার ফল মিলবে। আর থাকত খানিকটা মাখা তামাক। সেজে খাবার জন্তে নয়। চেটে খাবার জন্তে। জেলের আইনে বি ক্লাসকে গুড়

দেবার নিয়ম লেখা আছে কিনা। সামান্য একটু চিনিও থাকত তার পাশে।

একটা কলাই-করা মগের তলদেশে খানিকটা সাদা তরল পদার্থ আর একটা পাঁচ-সের ওজনের লোহার কেটলিতে গুচ্ছের-খানিক চা-পাতা-ভিজানো এক কেটলি গরম জল। প্রথমেই মগের মধ্যে খানিকটা চায়ের জল ঢেলে আমি তোরাবের হাতে তুলে দিতাম। রুটি-মাখন গুড় সমস্ত তোরাবের সেবায় লাগত। তোরাব প্রবল আপত্তি তুলেছিল। তাকে বোঝালাম, আমি জন্ম পেটরোগা, এ সমস্ত ভালমন্দ জিনিস একদম পেটে সয় না। আমার নিজের এলুমিনিয়ামের গেলাসটির মধ্যে চায়ের জল ঢালতাম আর চিনি মিশিয়ে খেতাম।

চা-পর্বের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রাত্যহিক আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যেত। বিষয়বস্তু সেই একই, তবু আলাপটি তোলবার কায়দার দরুন কোনও দিন একঘেয়ে মনে হত না। প্রতিদিনই বেশ চমক লাগত তোরাবের ক্ষমতা দেখে। চায়ের মগে চুমুক দিয়ে হঠাৎ তোরাব জিজ্ঞাসা করে বসল তার নিজস্ব ভাষায়, "কর্তা, আপনার পোলাপান কটি?"

হেসে ফেলতাম—"নাও মিঞা সাহেব, যেমন তোমার কথা। আরে, বিয়ে করবারই তো ফুরসত মিলল না এখনও। পোলাপান কি ছপ্পর ফুটো হয়ে পড়বে নাকি?"

ভ্রূক্ষেপ নেই আমার রসিকতায়। ততক্ষণে তোরাব তার মগের মধ্যে একদৃষ্টে কি দেখছে। একটু পরে যেন বহু দূর থেকে সে বলতে থাকত, "সব কটা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরেছে এতদিনে। আমার সাকিনার বয়স হল এই বারো, নুরুর এই দশ, আর ছোটটার—তা আট তো বটেই। কি খাবে? ওদের মা নিজের পেট চালিয়ে আরও তিনটে পেট কি করে চালাবে? মেয়েটাকে হয়তো কারও ঘরে কাজে দিয়েছে। ওরা দু' ভাইও হয়তো কারও গরু-বাছুর রাখে। নাঃ, না খেয়ে শুকিয়ে মরবে না—কি বলেন কর্তা?" আমার মুখের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাইত তোরাব। বলতাম—"দূর, না খেয়ে মরে নাকি কেউ কোথাও? তোমারও যেমন মাথা খারাপ। দেশে কি মানুষ নেই নাকি, কেউ না কেউ ওদের দেখাশুনো করছেই।"

সামান্য একটু সময় কি ভাবত তোরাব। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেই আরশোলা-সেঁকা রুটি একটুকরো মুখে ফেলে চিবুতে থাকত। আবার বলে উঠত হঠাৎ—"আচ্ছা কর্তা, আপনাদের ঘরে এ রকম হলে কি করত?"

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম—"কি আবার করত, কোন আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে আশ্রয় নিত।"

তোরাব একেবারে ফেটে পড়ত—"আর ওরা যদি কারও কাছে আশ্রয় পেয়েও থাকে, তার বদলে কি দিতে হয়েছে জানেন? দিতে হয়েছে ইজ্জৎ। কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই মিলবে না, যদি সে কারও সঙ্গে নিকেয় না বসে থাকে। নিজের বলতে যা কিছু তার সবটুকু ধুয়ে মুছে না ফেললে কারও দরজায় আশ্রয় নেই। আমার সাকিনা, আমার মুক, আমার বাচ্চারা যতক্ষণ না আর একজনকে বাপজান বলে ডাকবে, যতক্ষণ না তাদের মা আর একজনের সন্তানকে পেটে ধরতে রাজী হবে, ততক্ষণ তাদের মুখে দানাপানি পড়বার কোনও আশা নেই।"

আর কথা জোগাত না তোরাবের। তার সেই কটা-চোখের চাহনি তখন বাকিটুকু বলে দিত। কোনও পশুকে বেঁধে খাঁড়ার তলায় গলাটা টেনে ধরলে যে ভাষা তার চোখে ফুটে ওঠে, সেই মর্মান্তিক অসহায় ভাষা মুখর হয়ে উঠত তোরাব আলির দুই চোখে।

আমার সাকিনা, আমার মুক—হায় আল্লা, কে জানে আজ তারা কোথায়! আর কি কখনও আমি তাদের ফিরে পাব?

সকালের আলাপটা যেন বন্ধ হয়ে হঠাৎ। আমার মুখেও আর কিছু জোগাত না।

চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে যাবার সময় পিছন দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেলে একটু দোক্তাপাতা আমার হাতে গুঁজে দিত তোরাব। দেওয়ালের গা থেকে আঙুলের নখ দিয়ে চুন কুরে নিয়ে ওটুকুর সঙ্গে হাতের তেলোয় পিষে দাঁতের গোড়ায় টিপে রাখতে হবে। দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। প্রথম প্রথম বেয়াড়া রকমের মাথা ধরত। সদাসর্বদা এক চিন্তা, কি করে কষে টান দেওয়া যায় একটা বিড়ি বা সিগারেটে। লক্ষ্য করল তোরাব। শেখালে দাঁতের গোড়ায় দোক্তা-পাতা টিপে রাখা। স্বস্তি পেলাম। কতবার প্রশ্ন করেছি, কি করে আসে এসব জিনিস জেলের মধ্যে? তোরাব শুধু দাঁত বের করে হেসেছে। সকালে দুপুরে আর সন্ধ্যায় তিনবার সে ওই জিনিস পরিমাণমত দিয়ে গেছে আমার হাতে। এত-টুকু বেশি কাছে রাখার উপায় নেই। কখন যে ঝাড়া নেবে কে জানে। যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে তবে নাজেহাল করে ছাড়বে।

জমাদার সাহেব এসে দরজায় তালা লাগাত। গরাদের পাশে বসে চেয়ে থাকতাম উঠানের পাঁচিলের ও-পারে বড় পাঁচিলটার মাথার ওপর এক ফালি আকাশের দিকে। বসে বসে গুনতাম কতবার পাক খেল দুটো শকুন আমার সেই ছোট্ট আকাশখানির গায়ে। তারা চলে গেলে আসত একটু টুকরো সাদা

মেঘ। এসে চুপ করে চেয়ে থাকত গরাদের ভেতর দিয়ে আমার দিকে। আস্তে আস্তে তার রূপ পালটাতো। একটু একটু করে চারটে ঠ্যাং গজাল গজাল শুঁড়। দেখতে দেখতে বেশ স্পষ্ট একটা হাতি হয়ে উঠল। তারপর, ধীরে ধীরে বড় পাঁচিলের ও-ধারে কোথায় চলে গেল।

বেলা দশটা নাগাদ পাঁচিলের ওপর এসে বসত এক শালিক দম্পতি। কলহ-কচকচির সীমা নেই ওদের। আর কি ব্যস্ত। একটা কিছু ফয়সালা না করেই আবার দু'জনেই ফুড়ুৎ।

বিরক্ত হয়ে নিজের ছোট্ট কুলায় নজর ফিরিয়ে আনতাম। রিক্ততা—চরম নিঃস্বতা যেন দু'হাত মেলে আঁকড়ে ধরতে আসত। কিছু নেই, দেওয়াল ছাদ সমস্ত নিখুঁত সাদা—সাদা ধপধপ করছে। চোখ ঝলসে যেত। চোখ বুজতাম। চিত হয়ে শুয়ে পড়তাম আমার সেই রাজ-শয্যায়। কিছুক্ষণ পরে সব পালটে যেত।

বন্ধ চোখের ওপর ভেসে উঠত আঁকাবাঁকা একটি সরু খাল। দু' পাশের হোগলা আর নলবন নুয়ে পড়েছে খালের ওপর। খাল দিয়ে চলেছে একখানি শালতি, মাঝখানে বসে আছি আমি। একটি লোক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে লগি মেরে শালতিখানাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে মাথা নুইয়ে নিতে হচ্ছে, নয়তো নলপাতায় মুখ মাথা কেটে ফালা ফালা হবে। চলেছি তো চলেছিই। অনেক দূর যেতে হবে যে আমাকে। যাচ্ছি সেই নলবুনিয়া। উমেদালি মোল্লার ব্যাটা তোরাব আলির ঘর নলবুনিয়ায়।

শালতি গিয়ে লাগবে তোরাবের বাড়ির ঘাটে। সেই ঘাটে উঠে আমি পাব সাকিনাকে, নুরুকে আর তোরাবের ছোট ব্যাটাকে—যাকে সে মাত্র এক বছরেরটি ফেলে এসেছে, আর ওদের মাকে। তাদের সকলকে বুঝিয়ে বলে আসতে হবে আমায় যে, চোদ্দ থেকে আট বাদ দিলে থাকে মাত্র ছয়। আর ছয় তো কিছুই নয়। দেখতে দেখতে এই ছয়ও পার হয়ে যাবে। তখন আর কিছুই থাকবে না। তোরাব ফিরে আসবে। আর কিসের ভাবনা।

বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বলে আসতে হবে যে, তোরাবের হিসেবে বিন্দুমাত্র ভুল হয় নি। তারাও যেন হিসেবে ভুল না করে। যেন ভুলে না যায় যে, উমেদালি মোল্লার ছেলে তোরাব আলির রক্ত মাংস হাড় দিয়ে তারা তৈরী। কোনও ভেজাল যেন না মেশে সেই রক্তে, কারণ তাদের খুন হচ্ছে একদম আলাদা জাতের খুন। তাদের বাপজান তাদের ভোলেনি। নিমকহারাম নয় সে, তারাও যেন তাদের বাপজানের কথা না ভোলে।

সাকিনার মাকে আমি বুঝিয়ে আসতে চলেছি। আমাকে একটু নরম হয়ে মিনতি করে বলে আসতে হবে সাকিনার মাকে—তুমি তো জান, তোরাব তোমায় ভুলতে পারে না। আটটা বছর নিমিষের তরেও তোমার কথা আর তোমার ছেলেমেয়ের কথা সে ভুলতে পারে নি। তুমি কি করে ভুলতে পারো তোরাবকে? কি সে না করেছে তোমার জন্যে। কোন্ আবদারটি সে রাখেনি তোমার? যখন যা চেয়েছ তাই—রূপোর মল, বাউটি, কোমরের বিছা, গলার চিক, ধানগাছ রঙের রেশমী ডুরে। কোনও দিন তোমায় ছোট কাজ করতে দেয় নি তোরাব—মাঠে যাওয়া, ধান ভাঙা, বা মাছ ধরা! তোমার ইজ্জত আবরু নিখুঁত বজায় রেখে গেছে সে—সে-সব কথা কি তুমি ভুলতে পারো? নিজে কামাত তোরাব। যে করে কামিয়ে আমুক সে, এনে তোমার দু' হাত ভরে দিত। আর মাত্র ছ-টা বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। যখন ফিরে এসে তোরাব তোমাদের—

তোরাব ফিরে এসে সন্তর্পণে ডাক দিত, "কর্তা, ঘুমিয়েছেন নাকি?" উঠে পড়তাম। হাসিমুখে তোরাব জানাত, "ভাত খাবার বেলা হল যে। এবার গিয়ে ভাত নিয়ে আসব।—বলে নিজের জামার তলা থেকে আধখানা কাগজি নেবু বার করে দিত। ব্যবস্থা করে হাসপাতাল থেকে আনিয়েছে আমার জন্যে।

বলতুম, "আবার ওসবের ঝুঁকি কেন নিতে যাও তুমি? একটা ফ্যাসাদ বাধতে কতক্ষণ!"

গ্রাহ্য করত না তোরাব, মুখ টিপে হাসত। বলত, "একবার হুকুম করুন না হুজুর, সব হাজির করে দিচ্ছি। বোতল থেকে কালাচাঁদ পর্যন্ত। এখানকার সব মামুকেই চিনি। কে কি করে না-করে চোখ বুজে টের পাই আমি। হয় মামদোবাজি ছাড়, নয়তো আমার মুখ বন্ধ কর—ব্যাস্।"

ঝন ঝন ঘটাং ঘট শব্দ করে সেলের দরজাগুলো খুলতে খুলতে জমাদার সাহেব এগিয়ে আসত। তোরাব চলে যেত। মিনিট দশেক পরে সঙ্গে নিয়ে আসত আর একটি লোককে। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ উলঙ্গ, টস টস করে ঘাম ঝরছে। সেই লোকটির হাতে প্রকাণ্ড একখানা বারকোশের ওপর ভাতের থালা, ডালের মগ আর দুটো এলুমিনিয়ামের বাটি।

বারকোশ নামিয়ে দিয়ে লোকটি চলে গেলে তোরাব নামিয়ে দিত ছখানি গরম আটার রুটি তার তোয়ালের ভেতর থেকে। দিয়ে এমন মুখ করে আমার দিকে চাইত যেন সে হচ্ছে এ বাড়ি কর্তা আর আমি তা. অতিথি। মরমে সে মরে যাচ্ছে আমার সামনে শুধু রুটি নামিয়ে দিতে।

তাড়াতাড়ি সেই গরম রুটি কখানি লবণ সহযোগে গোগ্রাসে গলাধঃকরণ

করতাম। এ ভিন্ন অন্য উপায়ও ছিল না। বি ক্লাসের জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত সেই ভাত-তবকারি-ব্যঞ্জন কোনও দিন স্পর্শও করিনি। করবার সাহসও ছিল না আমার। দর্শনেই পেটের ক্ষুধা মাথায় উঠে যেত। তোবাবের লুকিয়ে আনা ওই রুটি কখানিই ছিল অগতির গতি। জেলের কয়েদীরা জাঁতায় গম ভাঙে। সেই আটায় বানানো হয় রুটি। জেলে ওই একটি জিনিস পাওয়া যেত যার মধ্যে অন্য কিছু মেশানো নেই। ওই-জিনিসটি না থাকলে একটি লোকও বাঁচত না জেলে গিয়ে।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে আবার দরজায় তালা পড়ত। তোবাব যেত খেয়ে আসতে তখন। বেলা দুটো নাগাদ আবার এসে দাঁড়াত গরাদ ধরে। তখন একটানা দু' ঘণ্টা গল্প চলত আমাদের। কে আসছে দেখতে?

সেই সময় তাব মেজাজটা থাকত নরম গরম কিছুই না হয়ে। সেই সময় আমি তাব সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-কাহিনী শুনতাম। আজ প্রথম দিকের একটু শুনলাম, তারপর শেষের দিকের খানিকটা হয়তো শোনালে সে দশদিন পরে। মাঝখানের সবটুকু অনেক দিন ধরে আরও নানা কথার সঙ্গে মিলেমিশে বেরুল তাব মুখ দিয়ে। এইভাবে শুনেছিলাম তাব জীবন-কাহিনী, আগাগোড়া সবটা সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে তোরাবালিব জীবনী হচ্ছে এই—

নলবুনিয়ার উমেদালি মোল্লার ছেলে সে। উমেদালিব একমাত্র ছেলে। ঘরে ধান-পান ছিল উমেদালিব। হঠাৎ মাথায় কি খেয়াল চাপল। খয়রাত শুরু করে দিল। হাল-বলদ লাঙ্গল-জমি বিলকুল খয়রাত হয়ে গেল। শেষে নিজে চলে গেল হজ করতে। যাবার সময় ছেলের হাত ধরে বলে গেল, দেখিস বাপজান, বংশের মুখে যেন কালি না পড়ে।

তোবাবের মা অনেক আগেই বেহেস্তে গিয়েছিলেন। হজ থেকে তার বাপজানও আর ফিরে এলেন না। ঘরে রইল শুধু তোরাব, ষোল বছরের মরিয়ম আর ছোট সাকিনা। অনেক খুঁজে পেতে উমেদালি ছেলের বিয়ে দিয়ে তেরো বছরের মরিয়মকে ঘরে এনেছিল। নাতনি সাকিনার মুখ দেখে সে হজের পথে পা বাড়াল।

ধর্মপ্রাণ লোক ছিল উমেদালি মোল্লা সায়েব। ও-তল্লাটে সকলেই এক ডাকে চিনবে তাকে। নলবুনিয়ার উমেদালি মোল্লার ঘর বললে, যে-কোনও নৌকো নিয়ে যাবে পিরোজপুর থেকে। কোনও কষ্ট হবে না।

বাপ চলে গেলে তোরাব নামল সংসার করতে বউ-বেটী নিয়ে। কিন্তু করবে কি? যতদিন বাপ ছিল, একমাত্র ছেলেকে সে কুটোটি ভাঙতে দেয়নি। সর্বস্ব

খয়রাত করে বাপ নিজের পথ দেখলে, তোরাবকেও আপন পথ খুঁজতে হল। অবশেষে পথের সন্ধান পেল সে। ওস্তাদ আসমতালি সায়েব তাকে নিজের সাকরেদ করে নিলেন। এক ধারে বিষখালি, অপর ধারে বালেশ্বর। সমগ্র এলাকাটি জুড়ে ছিল ওস্তাদ আসমতালি সায়েবের কর্মক্ষেত্র। নিজের দল নিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারতেন তিনি। তারপর সকলকে ভাগ-বখরা দিয়ে যা থাকত তাই নিজের বলে নিতেন। ওস্তাদের মেহেরবানিতে অল্পদিনেই তোরাব নায়েক হয়ে উঠল। দু-একটা জেদের কাজে সবার আগে ওস্তাদের হুকুম পালন করে প্রমাণ করে দিলে যে, কিছুতেই তার প্রাণ কাঁপে না।

একবার এক জায়গায় হানা দিয়ে তারা বাড়ির কর্তাকে বেঁধে ফেললে, লোকটা কিছুতেই বলবে না, কোথায় টাকাকড়ি লুকিয়ে রেখেছে। বার বার জ্বলন্ত মশাল চেপে ধরা হল তার শরীরে, তবু তার মুখ ফুটল না। একটা মাস ছয়েকের ফুটফুটে বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে ধরে সেই লোকটার নাতবউ থরথর করে কাঁপছিল। ওস্তাদ হুকুম দিলেন, ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে পা ধরে আছাড় মারতে। কেউই এগোয় না। হুকুম শুনে সব সাকরেদের মাথা হেঁট। তোরাব এগিয়ে গেল। এক হেঁচকায় ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে তার পা দুটো ধরে ঘুরিয়ে মারলে এক আছাড়। ফটাস করে মাথাটা ফেটে এক ঝলক রক্ত ছিটকে গিয়ে লাগল সেই লোকটার মুখে। তখন সে বাগে এল। টাকাকড়ি যেখানে পুঁতে রেখেছিল সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিলে।

ওস্তাদ আসমতালি খুশি হলেন। বড় বড় কাজের ভার দিতে লাগলেন তোরাবকে। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না। ভুল করে আবার রাতে নদীর বুকে পুলিশ সাহেবের নৌকোয় চড়াও হয়ে গুলির মুখে জান দিলেন ও · পাঁচজন সাকরেদসহ। জলের তলেই তাঁর সমাধি হল। দল ভেঙে গেল।

তোরাব ইচ্ছে করলে দল বাঁধতে পারত। কিন্তু ও-কাজে বেজায় ঝুঁকি। বড় বড় কাজে হাত দিতে হবে। দল বাঁধতে গেলে, সকলের চলা চাই, এমন সব কাজে হাত দিতে হবে। কিন্তু একজন ধরা পড়ে যদি বেইমানি করে বসে তা হলেই সর্বনাশ। দল নিয়ে মাসের পর মাস বউ-বেটা ঘরে ফেলে ঘুরে বেড়ানো চাই।

দল বাঁধবার আশা ছেড়ে দিলে তোরাব। ছোটখাট ঠিকের কাজ চালাতে লাগল, যা একলা সামাল দেওয়া যায়। ফুরনের কাজ। মজুরি আগে দিয়ে দিতে হবে। সব কাজের মজুরিও সমান নয়। যেমন ঝুঁকি তেমনি মজুরি। রাতের আঁধারে বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে রাম-দার এক কোপে কর্ম শেষ করে আসবার যা

মজুরি তাতে নদীর বুকে নৌকোর উপর হামলা করে জলে ডুবিয়ে রেখে আসা হয় না। যেমন কাজ তার উপযুক্ত দক্ষিণা। সম্পূর্ণ টাকা হাতে পেয়ে যজমানকে কথা দেওয়া হত, এক মাস বা দু'মাসের মধ্যে তার পূজো বলিদান সব সুসম্পন্ন হয়ে যাবে।

বেশ চলছিল তোরাবেব সংসার। মাসে দু' তিন রাত ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যাওয়া আবার শেষ রাতে ঘরে ফিরে শাস্তিতে বউ-ছেলে নিয়ে ঘুমনো। সুরু তখন ঘরে এসেছে। মাসে দু-একটা ছাড়া কাজে হাতই দিত না তোরাব। প্রাণে কি চায় চাঁদপানা ছেলে-মেয়ে ঘরে ফেলে আঁধার রাতে শিকারে বেরুতে! কিন্তু পোড়া পেট যে মানে না। তার ওপর নিত্য নূতন বায়না সাকিনার মায়ের। সে বেচারা তো জানত না, তোরাবের রুজি-রোজগারের উপায়টি কি। সে জানত, তোরাব নৌকা বায়। গঞ্জে গিয়ে বেচাকেনা করে মাল।

হায়রে পোড়া নসিব, শুধু একগাছি রশি, হাতে পাকানো একগাছি সামান্য শণের দড়ি। তোরাবের এতবড় ভাগ্যবিপর্যয়ের হেতু হল শেষ পর্যন্ত ওই একগাছি সামান্য দড়ি।

জগতের অনেক নাম-করা কেতাবে বজ্জুতে সর্পভ্রমের কথা লেখা আছে। তোরাবের জীবন-নাটকের সবচেয়ে জমজমাট দৃশ্যে একগাছি রজ্জু কালসর্প হয়ে তার শিরে দংশন করলে।

নলবুনিয়ার পাশের গ্রামের দুন্নু মিঞা। দুন্নু মিঞার পাঁচখানা হাল, তিনটে মরাই, চার-চারজন বিবি, একপাল নোকর-বাঁদী। যাকে বলে খানদানী ঘর। এমন যে দুন্নু মিঞা তিনি একদিন স্বয়ং তোরাবের ঘরে এসে তার হাতে পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়ে গেলেন। সামান্য কাজ। বলে গেলেন, কাজ খতম হলে আরও পাঁচ কুড়ি। তোরাব বলেছিল মিঞা সাহেবকে যে, টাকা আর সে নেবে না। তার পোলাপান দুধ পায় না। মিঞা সাহেবের অনেক গরু-বাছুর। যদি তার কাজে মালিক খুশি হন, তা হলে যেন একটা দুধালো গাই আর বাছুর দেন। তার পোলাপান দুধ খেয়ে বাঁচবে। রাজী হয়ে মিঞা সাহেব ফিরে গেলেন।

খোঁজখবর নিতে লাগল তোরাব। নিয়ে দেখলে, ব্যাপারটা একটা মেয়েছেলে নিয়ে রেষারেষি। দুন্নু মিঞা ঠিক করেছেন, তাঁর মত সম্মানী লোকের অন্তত পাঁচটি বিবি থাকার একান্ত প্রয়োজন। পাঁচটা কেন, পঁচিশটারও অভাব হত না তাঁর বিবির। কিন্তু কি যে মরজি হোল তাঁর, গোঁ ধরে বসলেন যে ওকেই চাই— আমিনুদ্দি শেখের চৌদ্দ বছরের বউটিকে চাই তাঁর। আমিনুদ্দিকে সরাতে হবে। তাই একশো টাকা দাদন দিয়ে গেলেন দুন্নু মিঞা তোরাবকে।

কিন্তু জুতমত পাওয়াই মুশকিল ছোকরাকে। ভয়ানক হুঁশিয়ার। বউকে সরিয়ে ফেলেছে দূর গ্রামে এক আত্মীয়বাড়ি। তাতেই আরও ক্ষেপে উঠেছেন তুনু মিঞা। কিন্তু করতে পারছেন না কিছুই। আমিনুদ্দির বিধবা মা একমাত্র ছেলেকে বুক দিয়ে আগলে আছে। সন্ধ্যার আগেই আমিনুদ্দিকে ঘরে ফিরে মার পাশে পাশে থাকতে হয়। কার সাধ্য তখন এগোয় মায়ের বুক থেকে ছেলেকে টেনে আনতে।

হঠাৎ একদিন আমিনুদ্দি এসে উপস্থিত তার মাকে নিয়ে তোরাবের কাছে। লজ্জা শরম ত্যাগ করে আকুল জননী তোরাবের দু'হাত চেপে ধরলে। তার একমাত্র ছেলের প্রাণভিক্ষা চায়

কি করে কোথা থেকে যে হদিস পেল এরা! তোরাব তো প্রথমে খুবই রেগে উঠল, এ-সব কথা তাকে বলবার মানে কি? ওই সমস্ত কাজ সে করে নাকি? কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মায়ের প্রাণ খোদার দোয়ায় সব জানতে পেরেছে। তোরাবকে কথা দিতে হল, তুনু মিঞার টাকা সে খাবে না।

মা-বেটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

কিন্তু কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলে না তোরাব। তারপর মাস দুই আর কোথাও থেকে ডাক এল না। একটা পয়সা বায়না দিয়ে গেল না কেউ। শ্রাবণ মাস, ঘরে ক্ষুদটুকুও বাড়ন্ত হল। তখন নুরুর পরে আর একটি এক বছরের বাচ্চা মরিয়মের কোলে। বাচ্চা মায়ের বুক চুষছে। চুষবে কি, বুকেও দুধ নেই, পেটে যে দানা পড়ে না মায়ের।

দিন আর কাটে না। একদিন আঁচলে চোখের পানি মুছতে মুছতে মরিয়ম এসে দাঁড়াল তার সামনে। এভাবে আর চলতে পারে না। ছেলেমেয়ের হাত ধরে সে উঠবে গিয়ে ওই রয়জুদ্দির ঘরে।

খুন চেপে গেল তোরাবের মাথায়। তার কলিজার মধ্যে আগুন ধরে গেল বেইমান রয়জুদ্দির নাম শুনে। হারামীর বাচ্চা চাটগাঁ থেকে জাহাজে করে সফর কেমিয়ে আসে। ন-মাসে ছ-মাসে ঘরে ফিরে দু দশ দিন থাকে। তখন তার বাহার কত। গোলাপী রঙের রেশমী রুমাল গলায় জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় শিস দিয়ে। পরনে পাজামা, ফুলতোলা আদ্দির পাঞ্জাবি, চোখে চশমা। যেন কত বড় এক নবাবজাদা! গাঁয়ের সোমত্ত বউ-ঝিদের এটা-ওটা উপহার দেয়। দু-একবার তোরাবের দাওয়াতেও উঠে বসেছিল রয়জুদ্দি। বাঁকা বাঁকা বোলচাল ঝাড়ত তোরাবের বিবিকে শুনিয়ে। অসহ্য লাগল তোরাবের, একদিন রাম-দা দেখিয়ে দিলে। সেই থেকে তোরাবের ঘর এড়িয়ে চলত রয়জুদ্দি।

রয়জুদ্দির নাম শুনে তোরাবের সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ল। চুপি চুপি আরও পঞ্চাশটা টাকা আর আধ মণ ধান নিয়ে এল তুনু মিঞার কাছ থেকে সে।

তুনু মিঞার চাপ যে বেড়েই চলল। আগে টাকা খেয়েছ, এখন না করলে চলবে কেন? এক নিষুতি রাতে বেরুতে হ'ল তোরাবকে ঠিকের কাজ সারতে।

ঠিকঠাক হয়ে গেল সব। বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে কান পেতে শুনলে সে ঘুমন্ত লোকের নিঃশ্বাসের শব্দ। অন্ধকারের মধ্যে চোখে ভেসে উঠল মাচার ওপর পাশ ফিরে শোওয়া যুবক আমিনুদ্দির তাজা দেহটা। ওস্তাদের নাম নিয়ে ঠিক ঠাহর করে ঝাড়লে এক কোপ রাম দা তুলে। সামান্য একবার একটু আওয়াজ বেরুল —বাপ! তারপর একেবারে নিস্তব্ধ। তখন যদি আর একটা কোপ দিয়ে আসতে পারত সে!

পাশের ঘরের লোক জেগে উঠেছে তখন। আর ফুরসৎ পেলে না তোরাব। কাম যে ফতে—এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই সে ঘরে ফিরল। ফিরে তার সাকিনা আর নুরুকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমাল।

কিন্তু সবই হচ্ছে খোদার মরজি। সবই তার পোড়া নসিবের ফল। এক-গাছা দড়ি টাঙানো ছিল সেই মাচার ওপর। তোরাবের কোপ সেই দড়ি কেটে তবে নামল লোকটার ওপর। ফলে শুধু কাটা গেল তার একখানা হাত। হাত কেটে পাঁজরায় যেটুকু চোট লাগল, তাতে তার কিছুই হ'ল না। তাকে নৌকায় তুলে মহকুমায় নিয়ে গেল গ্রামের লোকেরা। সেখানে হাকিমের কাছে তোরাবের নাম করে দিলে আমিনুদ্দি।

গেল সব ভেসে। ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে বউ সব বইল পড়ে। তোরাবকে চোদ্দ বছরের জন্যে ছেড়ে আসতে হ'ল তার সাকিনাকে, তার নুরুকে আর সেই এক বছরের দুধের বাচ্চাটাকে। তাদের দুধ খাওয়াবার জন্যে একটা গাই আর বাছুর জোটাতে গিয়েই এই ফ্যাসাদ বাধল।

"হা খোদা, এই কি তোমার বিচার! কি অপরাধ করেছিল সেই দুধের বাচ্চারা তোমার দরবারে! কোন দোষে তাদের বাপজানকে হারাল তারা? কি পাপে আজ তারা পথের কুকুরের মত পরের দরজায় পড়ে আছে?"

বলতে বলতে আর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুত না তোরাবের।

যে হাত দিয়ে সে লোহার গরাদটা ধরে থাকত, সেই হাতখানা কাঁপত থরথর করে। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বহুদূরে আকাশের গায়ে কি পড়ল তোরাব—তা আমি বলতে পারব না।

আমার নয় থেকে খরচা হয়ে গেল আট। আর তোরাবের চোদ্দ থেকে নয় বাদ গিয়ে রইল পাঁচ।

শেষের কটি দিন।

সকালে বিকেলে দুপুরে ত্রিশবার করে গুনতে লাগলাম, কোথা দিয়ে কেমন করে কত কম খরচে নলবুনিয়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারব আমি। একবার যে যেতেই হবে আমায় সেখানে। তাদের যদি ভুল হয়ে গিয়ে থাকে তাদের মনে করিয়ে দিয়ে আসতে হবে যে, আর বাকি আছে মাত্র পাঁচ। এই পাঁচ থেকেও আর এক বছর ঠিক ছাড় পাওয়া যাবে। তার মানে মাত্র আর চারটে বছর। এ আর কতটুকু সময়। খুব সাবধানে থাকে যেন তারা। খুব সাবধানে, কোনও ছোঁয়াচ যেন না লাগে উমেদালি মোল্লার ছেলে তোরাবালির বংশে।

কিছুতেই তোরাবকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না যে, যাবই আমি তার বাড়িতে। যত খরচই লাগুক আর যতদিনই লাগুক। তোরাবের চুরি-করে আনা রুটি দোক্তা লেবু—এক কথায় তার অতিথি হয়েই কাটালাম আমি ন'মাস। এ ঋন আমি শোধ করব।

কিন্তু ওখান থেকে তাদের দেখে এসে তোরাবকে সংবাদটা দেওয়া যাবে কি করে?

তারও কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু একবার সাকিনা, নুর আর নুরুর ভাইকে মনে করিয়ে দিয়ে আসতে হবে যে, তাদের বাপজান এল বলে। এসে সে তাদের ভার কাঁধে তুলে নেবে, তখন আর চিন্তা কি।

আমার ছাড়া পাবার আগের দিন তোরাব আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। হু-হু করে কেঁদে ফেললে সে। বললে, "কত বাবুকেই ঠিক এই ভাবে সেবাযত্ন করলাম হুজুর। সকলেই কথা দিয়ে গেলেন। কে জানে, তাঁরা যেতে পেরেছেন কিনা! যদি তাঁরা একবার যেতেনই সেখানে, তাহলে এই আট বছরের মধ্যে অন্তত একবারও কি সাকিনার মা ছেলে-মেয়ে নিয়ে দেখা করতে আসত না এখানে?"

গরাদের ফাঁক দিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখি। কি জবাব দেওয়া যায়।

হঠাৎ দপ ক'রে জ্বলে উঠল তোরাব। একটা কাল-কেউটে যেন ফোঁস ফোঁস করে উঠল।—"সেই হারামজাদা রয়জুদ্দি। সে ঠিক দখল করেছে সব। তার গ্রাসে নিশ্চয়ই গেছে আমার সমস্ত। হেই খোদা, যেন পাঁচটা বছর আর পার করতে পারি আমি। যদি তাই হয়, যদি তাই হয়ে থাকে—"

দাঁতগুলো সব কড়মড় করে উঠল তোরাবের।

পরদিন সকাল সাতটায় আমায় জেল-আপিসে পৌঁছে দিয়ে তোরাব মুখ বুজে ফিরে গেল। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ওর কাঁধের ওপর ডান হাত দিয়ে একটা চাপ দিতে পেরেছিলাম আমি।

জেলগেট পার হতেই মহা সমাদরে আমায় গ্রহণ করলেন বাইরের কর্তারা। এবং মহাযত্নে সোজা স্টীমারে নিয়ে তুললেন।

তারপর নলবুনিয়ার বদলে বীরভূমের নলহাটি পৌঁছে মাঠের মাঝে একখানা খড়ের ঘরে তিন বছরের জন্যে আশ্রয় পেলাম। নলবুনিয়া অনেক পিছনে পড়ে রইল।

আরও সাত বছর পরে। অন্য এক জেল। এবার আমার ভাগ্যে সাগর ডিঙোনোর ডাক এসেছে। জাহাজের আর কয়েকটা দিন দেরি। এক বোঝা অলঙ্কার পরিয়ে রাখা হয়েছে আমায়। তা প্রায় সবসুদ্ধ সের পাঁচেক ওজন। দু' পায়ের গোছে দুটো লোহার বেড়ি। এক-একটা দু'হাত লম্বা লোহার ডাণ্ডা আটকানো সেই বেড়ির সঙ্গে। ডাণ্ডা দুটোর অন্য প্রান্ত দুটো আবার আর একটা লোহার বালায় লাগানো। একেবারে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত। একটা হাত দিয়ে সেই লোহার বালাটা কোমরের কাছে ধরে তবে চলাফেরা করতে হয়। ঝড়াং ঝড়াং বাজনা বাজে পা ফেললেই।

চালান হয়ে এলাম গয়নাগাঁটিসুদ্ধ কলকাতায়। তোলা হ'ল এক সেলে। দিন চারেক পরে তোলা হবে জাহাজের খোলে।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। পাশের সেল থেকে কে গোঙাচ্ছে। বরি-শালিয়া ভাষায় কে বলছে—"সাকিনা রে, নুর রে, তোদের জন্যে কিছুই করে যেতে পারলাম না রে, কিছুই করে যেতে পারলাম না।"

কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম—"কোথায় তোরা পড়ে রইলি রে, তাও জেনে যেতে পারলাম না।" কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর হঠাৎ উৎকট শব্দে হা-হা করে হাসি।—"শেষ করে এসেছি হারামীর বাচ্চাদের। দুটোকেই জাহান্নামে পাঠিয়ে তবে এসেছি নিজে। সেখানেও কি তোরা শান্তি পাবি মনে করেছিস? দাঁড়া, আসি আমি। তারপর দেখাব তোদের।" আবার সেই প্রেতের হাসি রাতের আঁধারকে খান খান করে ফেললে।

হঠাৎ আমিও চিৎকার করে উঠলাম, "তোরাব, তোরাবালি মেট!"

হাসি থামল। ভাঙা গলায় সাড়া দিলে, "কে?"

দু' হাতে সেলের গরাদ দুটো আঁকড়ে ধ'রে গরাদের ফাঁকে মুখটা চেপে চেঁচাতে

থাকলাম, "আমি—আমি তোরাব। সেই যে বরিশাল জেলে আমি সেলে ছিলাম আর তুমি আমায় রুটি খাইয়ে বাঁচিয়েছিলে ন' মাস। সেই যে—"

নিস্পৃহ-কণ্ঠে জবাব এল, "তা কি বলছেন বলুন?"

আকুল হয়ে উঠলাম, "এবার আমায় চিনতে পেরেছ তোরাব? সেই যে তুমি আমায় নলবুনিয়া যেতে বলছিলে।"

সে জিজ্ঞাসা করলে, "তা কর্তা, আবার এলেন কেন?"

কি উত্তর দেব? বললুম, "নসিব ভাই, সবই নসিব। এবার কালাপানি পেয়েছি। আর পাঁচ দিন পরেই জাহাজ ছাড়বে।"

একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু তোমার তো এতদিনে খালাস পাবার কথা। সে সময়ে আমরা যেন হিসেব করেছিলাম যে, আর মাত্র পাঁচ বছর বাকি ছিল তখন তোমার।"

আবার সেই প্রেতের হাসি শোনা গেল পাশের সেল থেকে। হাসি থামলে শুনতে পেলাম, "এবার একেবারে খালাস পাব কর্তা। সেবার হিসেবের ভুল হয় নি। চার বছর পরেই বাইরে বেরিয়েছিলাম সেবার। তারপর তাদের খুঁজে বার করতে লেগে গেল পুরো এক বছর। এই শহরেরই এক বস্তি। ওয়াটগঞ্জ না মুন্সিগঞ্জ কি নাম তার। সেইখানে তাদের পাকড়াও করলাম। বয়জুদ্দি সাহেব আর তার বেগম মরিয়ম বিবিকে। কত তার পর্দা, কত আবরু, কত ইজ্জৎ! দরজায় চিক টাঙানো। পায়ে বাহারে চটি, গালে ঠোঁটে হাতে রঙ, চোখে সুরমা। আসমানী রঙের ফুল-তোলা ফুরফুরে শাড়ি। তা ওই সমস্ত বাহার সুদ্ধই সে গেছে। একই সঙ্গে দু'জনকে ঠিক জায়গায় আশনাই করতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আমি এখানে এসেছি। আমাকেও তাড়াতাড়ি যেতে হবে কিনা ওদের পিছু পিছু।"

আবার সেই উৎকট হাসি।

ওয়াডার তেড়ে এসে আমার সেলের দরজায় রুলের ঘা মারতে লাগল, "এই, হল্লা বন্ধ করো।"

ওকে গ্রাহ্যই করলাম না। চিৎকার করে বললাম, "তোরাব ভাই, তোমাকে কথা দিয়ে রাখতে পারি নি আমি। তোমার ছেলেকে দেখতে যাওয়া হয় নি আমার। জেলগেটেই আবার গ্রেপ্তার হয়ে—"

এবার আমার সেই আগেকার তোরাবের গলা শুনতে পেলাম। সেই একান্ত আত্মীয়ের গলা।—"সে খবর আমিও পেয়েছিলাম কর্তা। আপনি আর মনে দুঃখ রাখবেন না। গেলেও আপনি তাদের দেখা পেতেন না। আমিও ফিরে

গিয়ে তাদের পাই নি। তাদের মা তাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার পর তাদের কি দশা হয়েছিল কেউ তার খোঁজ দিতে পারল না। ছেলেমেয়ে বউ ওসব শাঁখের করাত—কর্তা, একেবারে শাঁখের করাত। আসতে কাটে, যেতেও কাটে।"

ওয়ার্ডার তোরাবের দরজায় গিয়ে রুল ঠুকতে লাগল। তার পরদিন সকালে অন্য প্রান্তের সেলে আমাকে সরানো হ'ল। আর জাহাজও ছাড়ল ঠিক পাঁচ দিন পরে।

আমি রওনা হলাম। আমার যাত্রার আজও শেষ হয় নি। কিন্তু আমার বন্ধু তোরাব বোধ হয় ঠিক জায়গায় পৌঁছে এতদিনে শান্তি পেয়েছে।

২

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মত। হয় লুকিয়ে থাকা, নয় পালিয়ে বেড়ানো, এই করে জীবন কাটছে তখন। যেখানে বহু লোকের ভিড় জমে, সেখানেই লুকিয়ে থাকার সব চেয়ে বড় সুযোগ। তাতেও যখন পোষায় না তখন পালিয়ে বেড়াই। কোনও কারণ না থাকলেও পালাতাম, পাছে কেউ কিছু আমার সম্বন্ধে চিন্তা করে এই ভয়ে লুকাতাম। কয়েক বছর জেল খেটে বার হয়ে মনে করলাম যে, আমি এমনই একটা ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে পড়েছি যার জন্যে দেশসুদ্ধ সবাই আমার সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে বাধ্য। দেশের জন্যে যখন জেল খাটলাম তখন দেশের লোকে হন্যে হয়ে খুঁজবে না কেন আমাকে? বিশেষতঃ ওঁরা, যাদের খাতায় জ্বলজ্বল করছে আমার নাম, নামের পাশে লেখা আছে—অতি বিপজ্জনক জীব—তাঁরা যে আমায় গরু-খোঁজা করে খুঁজছেন সে সম্বন্ধে কি আর কোনও সন্দেহ আছে? হায়, তখন কে জানত যে, ওঁরাও এই দেশের লোক সুতরাং সমান সমান অকৃতজ্ঞ। আমার মত দেশসেবকের কথা স্রেফ ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছেন! শুধু লিখে রেখেছেন নিজের খাতায়—খামখেয়ালী লোক, কোনও ভয় নেই এর সম্বন্ধে।

কিন্তু ভুলতে দেব কেন আমি সকলকে আমার কথা? নিজেকে নিজে জড়িয়ে রাখব এমন রহস্যের মাঝে, করে বসব এমন সব তাজ্জব কাণ্ড-কারখানা যার কোনও অর্থ খুঁজে না পেয়ে সবাই অস্থির হয়ে উঠবে। তবেই না মজা।

এই মজায় তখন পেয়ে বসেছে আমাকে।

জুটেছিলাম গিয়ে গঙ্গাসাগর মেলায়। কাজও জুটেছিল একটি। তেলেভাজার দোকানে বেগুনী-ফুলুরি-পাঁপর ভাজার কাজ। মনের আনন্দে দিন কাটছে ভাজা ভেজে। একটা উনুনে আমি বসেছি আর একটায় দোকানদার নিজে বসেছে।

সে ভাজছে কচুরি-শিঙাড়া-জিলিপি। দোকানদারের ছেলে বেচছে আমাদের দু'জনের ভাজা, পয়সা গুণে নিয়ে ফেলছে মস্ত একটা পেতলের ডাবরে। ভেজে কুলিয়ে ওঠা যায় না, এত খদ্দের। পুণ্যস্নান করতে গিয়ে তেলে-ভাজা খাওয়ার ঝোঁকটাই যেন বেশি তীর্থযাত্রীদের। এতগুলো দোকানে যত তেলে ভাজা ভাজা হচ্ছে তা চক্ষের নিমেষে যাচ্ছে উধাও হয়ে। পৌষ মাসের শীতেও দরদর করে ঘাম ঝরছে আমাদের কপাল থেকে, ধোঁয়ায় আধ পোড়া তেলের গন্ধে দম আটকে আসছে। প্রচণ্ড ভিড়ে আর উড়ন্ত ধুলোয় কোনও দিকেই কারও নজর যাচ্ছে না।

তখনও সন্ধ্যা হতে বেশ দেরি আছে। হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল মানুষ। হুড়মুড় করে মস্ত একটা পাহাড় যেন ভেঙ্গে পড়ল আমাদের ওপর। উনুন কড়া-তেল বেগুন-পাঁপর সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল এক নিমেষে। গোলমাল উঠতেই দোকানদার চিৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠল কড়া ছেড়ে—'হুঁশিয়ার ভেইয়া, আপনা জান বাঁচাকে।' বলে টাকা পয়সার ডাবর তুলে নিয়ে চম্পট হোল। আমিও খুন্তি-ঝাঁজরা ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। পাল্লা বাটখারা নিয়ে দোকানদারের ছেলে আগেই দৌড় দিলে উত্তর দিকে। সমুদ্রের স্রোতের মত মানুষের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল হোগলা পাতার ছাউনি উনুন কড়াই পরাত গামলা-ভাজা আভাজা সমস্ত মালপত্র। দু'শো দোকান বসেছিল যেখানে সেখানে আর কোনও কিছুর চিহ্নমাত্র রইল না।

এই ছিল তখনকার সরকারী রীতি। গোটাকতক হাতি দিয়ে বহুদূর থেকে লোক তাড়া করা হোত। উদ্দেশ্য অতি মহৎ, খাবারের দোকান থেকে কলেরা ছড়ায়, সেই দোকানগুলো উঠিয়ে দিতে হবে। জমিদারকে উপযুক্ত সেলামি দিয়ে যারা দোকান দিয়ে বসেছে তাদের উঠতে বললে সহজে উঠবে কেন? আর কে-ই বা যায় অত ঝঞ্ঝাটে? তার চেয়ে ঢের সোজা পন্থা হচ্ছে গোড়া থেকে কলকাঠি নেড়ে সব তছনছ করে দেওয়া। কার হাতি, কেন খামকা ক্ষেপে উঠল হাতিরা, কেনই বা লোক তাড়া করতে গেল, এসব প্রশ্ন কাকেই বা করা হবে আর কেনই বা জবাব দেবে? কখন কোথায় হাতি ক্ষেপবে তার জন্যে সরকারী হুজুররা দায়ী হতে পারেন না। হয়ত কিছু লোকের সর্বাঙ্গ পুড়ে গেল গরম তেলে আর জলন্ত উনুনে, কয়েকজন মেয়ে পুরুষ হয়ত সশরীরে স্বর্গলাভ করল মানুষের পায়ের তলায় পড়ে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? পরিকল্পনা-মত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ল তো।

দোকানদারের যা লোকসান হত তা তারা গ্রাহ্যও করত না। এই রকমের

হাঙ্গাম-হুজ্জতের জন্যে তারা তৈরী হয়েই দোকান সাজাত, মজুদ মাল কিছুই রাখত না, হাঙ্গামা ঠাণ্ডা হলে আবার দোকান খুলে বসত মেলার অন্যদিকে।

লক্ষ লোকের সঙ্গে দিশাহারা হয়ে ছুটতে লাগলাম। কি একটা ছিটকে এসে পড়ল পায়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তার ওপর পেছনের মানুষের ধাক্কায়। হাজার হাজার লাথি পড়তে লাগল পিঠে। পায়ের দুই হাঁটু আর দুই হাতে ভর রেখে মাথা গুঁজে দাঁতে দাঁত দিয়ে রইলাম। কিন্তু সে মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। শহরের রাস্তা নয় যে দু'পাশে লোক সরতে পারবে না। আর মানুষ কখনও ইচ্ছে করে মানুষের ওপর দিয়ে চলে না। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ, কাজেই মানুষের পায়ের চাপে আর চিঁড়ে-চেপ্টা হতে হল না। দু'পাশ দিয়ে লোকজন ছুটে বেরিয়ে গেল। আবার কয়েকজন দাঁড়িয়েও পড়ল আমার চারপাশে। টেনে তুলল আমাকে তারা। তুলে দেখে বুকের নিচে একটা চার-পাঁচ বছরের ছেলে। ছেলেটা অক্ষত রয়েছে কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ গেছে থেঁতলে আর নাক-মুখ দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছে।

বোধ হয় সামান্যক্ষণ হুঁশ ছিল না আমার। হুঁশ হতে দেখি হুড় হুড় করে মাথায় মুখে জল ঢালা হচ্ছে। চোখ চাইতে জল ঢালা বন্ধ হ'ল আর তখন প্রথম খেয়াল হ'ল যে ছেলেটা নিজের ছোট্ট দুখানি হাত দিয়ে আমার একটা হাত আঁকড়ে ধরে আছে।

চারিদিক হতে হাজার রকমের প্রশ্ন বর্ষণ হচ্ছে আমাদের ওপর। আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি, সঙ্গে আর কেউ এসেছে কিনা, কোথায় পৌঁছে দিতে হবে? কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। উত্তর দেবার মত অবস্থাও নয় তখন। ঠোঁট মুখ ফুলে উঠছে, বাক্‌রোধ হবার মত অবস্থা।

ছেলেটি কিন্তু সমানে উত্তর দিচ্ছে সব প্রশ্নের। আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, আমি তার ছোট মামা, ঠাকুমা-বাবা সবাই এসেছে মেলায়, বাবার নাম শ্রীহিমাদ্রিশেখর ঘোষ, বাড়ি ভবানীপুরে। অতটুকু ছেলে, কিন্তু বেশ চালাক-চতুর। আমি ওর ছোট মামা হতে গেলাম কি করে! ওর কথা শুনছি আর মনে মনে ভাবছি এবার আমার কর্তব্য কি। কর্তব্য ছেলেটিকে ওর আত্মীয়দের হাতে দিয়ে আমার সেই ভেলে-ভাজা মনিবের সন্ধান করা। উঠে দাঁড়াতে গেলাম, পারলাম না, হাঁটু দুটো যেন কে মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।

"এই যে এখানে, এই যে অরুণ," বলে চেঁচিয়ে উঠল কে।

"ওরে আমার গোপাল রে, ওরে মানিক আমার," হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ভিড় ঠেলে সামনে এসে দু'হাতে ছেলেটিকে বুকে জাপটে ধরলেন এক বুড়ি।

"কই কোথায়, কোথায় অরুণ," কোমরে-চাদর জড়ানো এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে দু'জন পুলিশ আর একজন বোধহয় ছোট দারোগা। ছেলের মা-বোনও এসে পৌছল ছেলের কাছে। ছেলে ফিরে পেয়ে ওঁদের আনন্দ উত্তেজনা চরমে গিয়ে পৌছল। ছেলে বুড়ির বুকের ভেতর থেকে জোর করে বেরিয়ে এসে আমাকে জাপটে ধরলে। তখন তাঁদেরও নজর পড়ল আমাকে দিকে। শুনলেন সকলের মুখ থেকে যে, আমি বুকের নিচে রেখে পায়ের তলায় পিষে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছি ছেলেকে। বুড়ি তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ে দিলেন।

আমার আর সহ্য হ'ল না গোলমাল। আবার বেহুঁশ হয়ে পড়লাম।

যখন ভাল করে বোঝাবার মত অবস্থা নিয়ে ঘুম ভাঙল তখন চোখ চেয়েই দেখতে পেলাম একটি ছোট্ট মুখ। এক মাথা কোঁকড়া চুল সুদ্ধ ছোট্ট একটি মুখ—আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে।

আমাকে চোখ চাইতে দেখে চিৎকার করে উঠল সে, "ও মা, ও দিদি, শিগগিরি এস, ছোট মামা চোখ চেয়েছে।" বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ভাল করে চেয়ে দেখলাম চারপাশ। খাটের ওপর ভাল বিছানায় শুয়ে আছি, খাটের পাশে দুটো জানালা দিয়ে অগাধ রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। আলমারি টেবিল চেয়ার দিয়ে ঘরখান সাজানো। বুঝতে পারলাম নেহাৎ গরীব লোকের ঘর নয়।

সব মনে পড়ে গেল। গঙ্গাসাগর মেলা, তেলে-ভাজার দোকান, প্রাণ নিয়ে পালানো, লোকের পায়ের তলায় পড়া, একে একে সব ফুটে উঠল আমার স্মৃতির পর্দায়। ছেলেটির সুন্দর মুখখানিও মনে পড়ে গেল।

কিন্তু এখন আমি এ কোথায় কার ঘরে শুয়ে আছি!

অরুণের সঙ্গে অনেকে ঘরে ঢুকলেন। অরুণ এক লাফে উঠে এল খাটের ওপর। আমার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে চেঁচাতে লাগল, "ও মামা, চোখ খোলো না! এই তো খুলেছিলে চোখ একটু আগে—ও মামা।"

কে ধমক দিলেন, "ছিঃ অরুণ, চেঁচিও না অত, তোমার মামার কষ্ট হবে যে।"

এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল অরুণের গলা, "আঃ চেঁচাচ্ছি নাকি আমি! এই তো মামা চোখ খুলে দেখলে আমাকে একটু আগে।"

সুতরাং আবার চোখ খুলতে হ'ল, হেসে ফেললাম অরুণের মুখের দিকে চেয়ে।

অরুণ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "ও মা—এই দেখ মামা হাসছে।"

অরুণের মা খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আমার কপালে হাত রাখলেন, "নাঃ, আজ আর জ্বর আসবে না বোধহয়।"

পেছন থেকে কে বললে, "আবার আসতে কতক্ষণ, বিকেলের দিকে আবার আসবে হয়ত।"

"ছিঃ, অমন অলুক্ষণে কথা আর মুখে আনিস নি শিউলি। আবার জ্বর আসবে কি করতে? বাছা এবার সেরে উঠবে ঠিক।"—এগিয়ে এলেন অরুণের ঠাকুমা। এসে আমার কপালে বুকে হাত বুলিয়ে দেখলেন।

শিউলি জিজ্ঞাসা করলে তার মাকে, "এবার কমলার রস করে আনব মা?"

তার মা নিচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমায়, "কি খেতে ইচ্ছে করছে ভাই?"

বললাম, "শুধু একটু গরম চা।"

"চা—এবার চা খাবে মামা," অরুণ হাততালি দিয়ে উঠল।

পেছন থেকে শোনা গেল বেশ ভারী গলার আওয়াজ, "কই দেখি, একটু সর তো তোমরা. এই যে ভায়া, কেমন মনে হচ্ছে এখন?"

আমাকে কোনও উত্তর দিতে হ'ল না। অরুণ বললে, "মামা একদম সেরে গেছে। এইবার চা খেতে চাচ্ছে বাবা—শুধু চা।"

হিমাদ্রিবাবু বললেন, "চা নয়, ভাল কফি তৈরী করে নিয়ে আয় শিউলি। আঃ বাঁচা গেল, ক'দিন যেভাবে কেটেছে আমাদের। আপনার এ পাজী ভাগনেটার জন্যে এক মিনিট কেউ মুখ বন্ধ করে থাকতে পাই নি। কখন আপনি চোখ চাইবেন আর কথা বলবেন এই এক কথার উত্তর দিতে দিতে আমরা প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম। এবার যত পারেন বকুন ঐ পাজীটার সঙ্গে। যাই ডাক্তারকে খবরটা দিয়ে আসি। মা—এবার তুমি ভাত-টাত খাবে তো, আজ পাঁচদিন তো শুধু জল খেয়ে কাটালে।"

মা ধমক দিলেন ছেলেকে, "তুই থাম্ তো হিমু, আমার ভাত খাওয়া পালাচ্ছে না। আগে বাবার মুখে দুটি অন্ন-পথ্য দিই, মা কালীর পূজো পাঠাই, তা না, আগেই আমার ভাত খাওয়া। ওরে ও শিউলি—গেলি তুই কফি করতে?" বলতে বলতে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অরুণের মা বললেন, "এখন আর বকিও না তোমার মামাকে অরুণ। চল এখন, স্নান করে ভাত খেয়ে আবার এসে বসবে মামার কাছে।"

একান্ত অনিচ্ছায় অরুণ উঠে গেল মায়ের সঙ্গে। হিমাদ্রিবাবু এসে বসলেন খাটের পাশে।

বললেন, "আপনার বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে হবে।"

চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিলাম। হিমাদ্রিবাবু বললেন, "কি হ'ল, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?"

চোখ চাইলাম। হিমাদ্রিবাবু আবার বুঝিয়ে বললেন, "আপনার বাড়িতে একটা সংবাদ দিই এবার। যদি দূরে হয় আপনার বাড়ি, তাহলে তার করব তাঁদের আসার জন্যে। আর কাছাকাছি কোথাও হলে নিজে যাচ্ছি এখনই। কি ঠিকানা আপনার, কার কাছে খবর দিতে হবে ?"

মাথার চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বললেন আপনি ?"

হিমাদ্রিবাবু ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বললেন আর একবার। আমি চোখে-মুখে অনাবিল বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বললাম, "কই—মনে তো পড়ছে না কিছু।"

অরুণের বাবা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর দুই চোখে ফুটে উঠল অকৃত্রিম বেদনা। মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠলেন "ও আচ্ছা আচ্ছা, শুয়ে থাকুন আপনি শান্ত হয়ে, যাচ্ছি আমি ডাক্তারের কাছে।"—চলে গেলেন হন্তদন্ত হয়ে

বাইরে [illegible] গেল [illegible] বলছেন, "খুব সাবধান, একজন [illegible] একজন নজর রাখবে [illegible] দিকে [illegible] মাথায় চোট লেগে সব গোলমাল হয়ে গেছে, নিজের ঠি[illegible] মনে [illegible] পারছে না [illegible] আপনার লোকের কথা মনে পড়[illegible] [illegible] দেখো, যেন [illegible] বেরিয়ে পড়েন ভদ্রলোক, আমি এখনই ডাক্তার নিয়ে আসছি।"

বাঁধা পড়লাম আত্মী[illegible] ডোরে [illegible] রোগ সেরে গেল, হাত পায়ের চোট গেল শুকিয়ে, বিছানা ছেড়ে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম স্বাভাবিকভাবে। সবই ঠিক আছে, শুধু বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলেই [illegible] [illegible] করে চেয়ে থাকি, দু'হাতে নিজের মাথার চুল ধরে [illegible] বা ঘাড় হেঁট করে বসে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মনের ডাক্তার আর মাথার ডাক্তার ডেকে আনলেন হিমাদ্রিশেখর। তাঁরা বলে গেলেন, "মাথায় চোট লাগলে এ রকম হয়, একদিন সব সেরে যাবে, বাড়ির কথা মনে পড়বে। এ রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। রুগীর মন যাতে প্রফুল্ল থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে।"

এতটুকু ত্রুটি হ'ল না সে চেষ্টার। হিমাদ্রিশেখরের ছিল বই কেনার শখ আর মেয়ে শেফালীকে শিখিয়েছিলেন গান। বিয়ে দেবার জন্যে হারমোনিয়াম টিপে হাঁপাতে শেখান নি, সত্যিকারের গানই শিখিয়েছিলেন। গানে আর বই-এ ডুবে রইলাম। কিন্তু এভাবে এঁদের ঠকিয়ে কতদিন আর কাটানো যায়। স্নেহ-ভালবাসা অকপট আত্মীয়তার বদলে নির্জল কপটতা চালাতে আর মন চাচ্ছিল

না। কিন্তু উপায় কি? চোখের আড়াল হবার যো নেই, কেউ না কেউ ঠিক পাহারা দিচ্ছেই।

সবচেয়ে বেশি পাহারা দিচ্ছে অরুণ আর তার দিদি শেফালী। শেফালীকে পড়াচ্ছি। আমার গরজেই সে পড়ছে। প্রথম শ্রেণীতে উঠে তার অসুখ হওয়ার ফলে পড়া বন্ধ হয়। সে আজ তিন বছর আগেকার কথা। আমি বললাম, "দিয়ে দাও এবার ম্যাট্রিকটা। সামান্য খাটলেই হয়ে যাবে। খামকা ম্যাট্রিকটা না দিয়ে বসে আছ কেন যখন প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত ঠেঙিয়েছ।"

শেফালীর বাবা-মা-ঠাকুমা বলেন, "ও যদি ম্যাট্রিক পাশ করে তো করবে অরুণের মামার জন্যে। ও-রকম যত্ন করে গাধা পিটে ঘোড়া তৈরী করবে কে ওকে?" শুনে আমি নিজের মনকে বোঝাই যে, আমার জন্যে এদের যে খরচটা হচ্ছে তার বদলে তবু কিছু পরিশ্রম করছি শেফালীকে পড়িয়ে। পড়াবার মত বিদ্যে আমার পেটে আছে জেনে ওঁরাও নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে আমার আত্মীয়স্বজনের, একটি লেখাপড়া জানা ভদ্র-সন্তান, যার জন্যে ওঁদের একমাত্র ছেলের জীবন বেঁচেছে, তাকে এভাবে আটকে রাখতে বিবেকে বাধছে ওঁদের। আমার আত্মীস্বজনকে একটা সংবাদ দিতে না পেরে হিমাদ্রিবাবু ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

আরও একটা ঝঞ্ঝাট বাড়ছিল দিন দিন। এঁদের পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন হিমাদ্রিবাবুর অফিসের বন্ধুবান্ধব দল বেঁধে দেখতে আসা শুরু করলেন আমাকে। তা ছাড়া যাঁদের কস্মিনকালে কোনও আপনার লোক হারিয়েছে তাঁরা বারবার এসে পরীক্ষা করে গেলেন—আমি তাঁদের সেই হারানো আপনার জন কিনা। শেষে একটা উপায় ঠাওরালাম। কেউ দেখতে এলেই খাওয়া আর কথা বলা বন্ধ করে দিতাম। আবার এঁরা ছুটলেন মনের ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন—"কেউ যেন বিরক্ত না করে রুগীকে। ভিড়ের মাঝে পড়ে মাথায় গোলমাল হয়েছে, সেইজন্যে ভিড় দেখলেই ও রকম হয়ে যায়।" আমাকে দেখতে আসা বন্ধ হ'ল তারপর।

নিশ্চিন্ত হয়েই আছি এক রকম। ওঁরাও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন। কি দরকার অত খোঁজাখুঁজি করে, যেদিন মাথার ঠিক হবে সেদিন যাবে বাড়ি চলে। ছেলেমেয়ের একজন ভাল শিক্ষক পাওয়া গেছে। হিমাদ্রিবাবুর স্ত্রী নিজের ভাই বলেই মনে করেন, ছেলে অরুণও অষ্টপ্রহর আমাকে ছাড়া থাকে না। খাওয়া-শোওয়া সব আমার সঙ্গে। হিমাদ্রিবাবুর মা ভাবেন, আমি তাঁর আর একটি ছেলে। শুধু শেফালী মাঝে মাঝে উলটে-পালটে এক-একটা প্রশ্ন করে

বসে। কোন দিনও সে আমায় মামা বলে ডাকে না। কিছু বলেই ডাকে না। তার ডাকবারই দরকার করে না। যা বলবার সামনে এসে বলে।

এক-একদিন বলে বড় গোলমেলে সব কথা। একদিন পড়তে পড়তে হঠাৎ চাপা গলায় বললে, "আপনার নাম আমি জানি।"

হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাই নাকি। আচ্ছা, বল তো আমার নাম কি?"

সোজা আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বললে শেফালী, "আপনার নাম নিরঞ্জন।"

"কি করে জানলে?"

"অসুখের সময় বেহুঁশ অবস্থায় অনেকবার নিজে উচ্চারণ করেছেন ঐ নাম।"

চুপ করে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। খুবই সম্ভব বেহুঁশ অবস্থায় ও নামটি উচ্চারণ করেছি। নিরঞ্জন আর আমি অনেক দিন এক সেলে ছিলাম। তার ফাঁসি হয়ে গেছে, আন্দামানে একটা ওয়ার্ডারকে খুন করেছিল বলে। ফাঁসি আমারও হোত, নিরঞ্জন সব দোষ নিজের মাথায় নিয়ে আমায় বাঁচিয়ে দেয়।

সে কথা তো শেফালীকে খুলে বলা চলে না। কাজেই চুপ করে চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। ও রাগ করে উঠে চলে যায়।

বেশিক্ষণ ওর রাগ থাকে না আমার ওপর। চা কফি দুধ যাহোক একটা কিছু নিয়ে ফিরে আসে। বলে, "রাগ করলেন তো? আচ্ছা, কি করব বলুন তো আমি? আমারও আর কিছু ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে—"

হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করি, "কি করে, কি ইচ্ছে করে তোমার শেফালী?"

"জানি না যান্।" বলে শেফালী মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পড়াশোনা ভালোই চলছে। ওর মাথা ভালো, একবারের বেশি দু'বার কোনও কিছু বোঝাতে হয় না। তবু এক-একদিন যেন কিছুই বুঝতে চায় না শেফালী। আমি চটে উঠি, "যাও তুমি উঠে। কিছু হবে না তোমার। মন দিয়ে না শুনলে কাকে বোঝাব?"

"এবার কেমন লাগছে মশাই? যে বুঝতে চায় না, তার কাছে শুধু শুধু মাথা খুঁড়তে হলে কেমন লাগে?" শেফালীর চোখে কৌতুকের হাসি।

আশ্চর্য হয়ে বলি, "তার মানে?"

"মানে, আমারও ঠিক ঐ রকম লাগে, বুঝলেন?"

আবার এক-একদিন প্রায় কেঁদে ফেলে, "আর এভাবে চলবে না বুঝলেন, আর আমি পারি না। কিছুতেই আপনি কাকেও বিশ্বাস করতে পারেন না। কেন, কেন আমায় বিশ্বাস করেন না আপনি?" কান্নায় ভেঙে পড়ে ওর গলা।

না-বোঝার ভান করা বৃথা, প্রায় উনিশ বছর বয়স হয়েছে ওর। তবু চাপা দেবার চেষ্টা করি।

"বই-খাতা তুলে রাখ শেফালী, নামাও তানপুরা তোমার। এবার শোনাও গান একখানা।"

নিজেকে সামলে নেয় শেফালী। গানই আরম্ভ হয় তখন, নিস্তব্ধ দুপুরে সেই সুর শুনে সত্যিই ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কি রকম একটা করুণ অসহায়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় মন। ইচ্ছে হয় অনর্থক এই ছল চাতুরী বন্ধ করে নিজেকে কারও হাতে সঁপে দিতে। শেফালীর দিকে চেয়ে দেখি ও তখন চোখ বুজে তানপুরাটা বাঁ গালে চেপে ধরে গমক না গিটকিরির প্যাচ কষছে গলায়। যদি ও ঠিক সেই মুহূর্তে ওর বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকত তাহলে হয়ত ঠিকই কিছু একটা করে ফেলতাম।

কিন্তু না—আর দেরি করা উচিত নয়। এঁদের নুনের দাম দিতেই হবে। অর্থাৎ আর একটুও অপেক্ষা না করে পলায়ন।

হঠাৎ শেফালী গান বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করে, "পালাবার কথা ভাবছেন তো?" অবাক হয়ে যাই। মনের কথাও জানতে পারে নাকি ও। আমার ভ্যাবাচাকা-লাগা মুখের দিকে চেয়ে ও হেসে ফেলে, "তা হবে না মশাই, যতই সাধুপুরুষ হোন আপনি, আমি না ছেড়ে দিলে যাবেন কোথায়?"

নিস্পৃহ কণ্ঠে বলি—"তাই ভাবছিলাম শেফালী, তোমার পরীক্ষাটা চুকে গেলে—"

"আমার পরীক্ষা চুকবে না কখনও, আর আপনার যাওয়াও হবে না কোথাও।"

বলে উঠে পড়ে শেফালী।—"যাই এবার চা করে আনি, তিনটে বাজল, চা না দিলে মা উঠে বকাবকি করবে।" একটু বেশ রহস্যময় হাসি হেসে ও চলে যায়

বসে বসে ভাবতে থাকি, বড্ড জড়িয়ে পড়ছি। এবার সরতে হচ্ছে, আরও দেরি করার মানে হচ্ছে—

মানে যে কি, তা আর কয়েকদিন পরেই বেশ ভাল করে বুঝতে পারলাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় শেফালী এক মনে মুখ নিচু করে অঙ্ক কসছে, আমি পড়ছি সদ্য প্রকাশিত একখানি উপন্যাস। নায়ক তখন বিদায় নিচ্ছেন নায়িকার কাছে। একটি বেশ প্রাণ-মোচড়ানো বক্তৃতা দিচ্ছেন নায়ক। এমন সময় শেফালী খাতা-খানা আমার দিকে ঠেলে দিলে। আমি এমন মশগুল হয়ে আছি নায়কের বিদায়-কালীন বক্তৃতায় যে, সেদিকে খেয়ালই করলাম না।

"আঃ, চট করে পড়ে ফেলুন না।"—চাপা গলায় বললে শেফালী। চমকে উঠে খাতাখানা টেনে নিয়ে দেখি—এ কি। এ যে—

"আপনি পালান, এখনই চলে যান এখান থেকে, আপনার পরিচয় সকলে জেনে ফেলেছে। আমি লুকিয়ে শুনেছি কাল রাত্রে বাবা যা বলছিলেন মাকে। পুলিশ আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছে। কাল সকালে ফটো তোলা হবে আপনার, সেই ফটোর এক কপি দিতে হবে পুলিশকে। আমি জানি আপনার মাথা খারাপ হয় নি। কিচ্ছু হয় নি আপনার। এবার দয়া করে পালান আপনি।"

মুখ তুলে চাইলাম ওর দিকে। কি আছে ঐ চোখে। অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই তো এই চিঠি লেখার? পালাবার চেষ্টা করলে তো নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে ফেলব। হয়তো এই চিঠি পড়ে আমি কি করি তা দেখবার জন্যে আড়ালে সকলে সজাগ হয়ে আছে। আর তা যদি না হয়, যদি কাল সকালে ফটো তোলা হয় আর সেই ফটো যায় পুলিশের হাতে, তাহলে—

তারপর ঝিম ঝিম করতে লাগল। ওর চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

খাতাখানা টেনে নিয়ে পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে আবার কি লিখলে খসখস করে। লিখে ঠেলে দিলে খাতাখানা। পড়লাম—
"আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি যখন বর্ধমান জেলে ছিলেন তখন আপনার যে ফটো তোলা হয় সেখানা বাবাকে দিয়েছে। আমি চুরি করেছি সে ফটো। এ চেহারার সঙ্গে সে চেহারার মিল নেই, শুধু আপনার চোখ দেখে আমি চিনেছি। আর বেশিক্ষণ সময় নেই আর। আপনার দুখানা কাপড় আর দুটো জামা আমি বেঁধে রেখেছি। চলে যান পাশের দরজা দিয়ে। বাইরে হয়ত পুলিশে পাহারা দিচ্ছে। এখনও বাড়ি ফেরেন নি বাবা, যান—"

খবরের কাগজে জড়ানো ছোট্ট একটি প্যাকেট টেবিলের নিচে থেকে বার করলে।

ওর দুই চোখ তখন জ্বলছে। প্রায় টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। শেফালী উঠে গিয়ে ভেতর দিকের দরজায় মুখ বাড়িয়ে দেখে এল, কেউ এধারে আসছে কিনা। তারপর নিঃশব্দে বাইরের রোয়াকের দরজা বন্ধ কি না দেখে এসে দাঁড়াল আমার বুক ঘেঁষে। ডান হাতে আমার ডান হাতখানা ধরে, বাঁ হাতে নিজের জামার বোতামগুলো এক টানে পট পট করে খুলে ফেললে। বার করলে জামার ভেতর থেকে একখানা ফটো। একবার দেখেই চিনতে পারলাম। জেলের

পোশাক পরে যে দাঁড়িয়ে আছে সে ব্যক্তি যে আমি, তাতে কোনও ভুল নেই। শেফালীর উদলা বুকের ওপর নজর পড়ল। উত্তেজনায় ওঠানামা করছে উনিশ বছরের মেয়ের বুক। ওর কোন লজ্জাশরম নেই সে সময়। আমার হাতখানা তুলে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বললে, "বল, কথা দাও আর একবার অন্তত: আমায় দেখা দেবে।"

আমার মুখ দিয়ে বার হল, "দেব।"

শেফালী ফটোখানা বুকে রেখে জামার বোতাম এঁটে দিল। প্যাকেটটা আমার বগলে গুঁজে দিয়ে হাত ধরে নিয়ে গেল দরজার কাছে। দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে কি দেখলে। দেখে এসে এক রকম ঠেলে বার করে দিলে আমাকে ঘর থেকে। সেই মুহূর্তে তার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর আমার কানে এল, "মনে থাকে যেন, আমার বুকে হাত দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা করে গেলে তুমি।'

বন্ধ হয়ে গেল কপাট। অন্ধকার রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে আমি কাঁপছি। ভয়ে আনন্দে না উত্তেজনায়—তা আজ ঠিক বলতে পারব না।

দরজাটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। নিজের ডান হাতখানা কপালে মুখে বুলিয়ে নিলাম। তারপর জামার দু' পকেটে দু'হাত পুরে মাথা নিচু করে পথে নেমে পড়লাম। হাতে কি ঠেকল পকেটের ভেতর। টিপে দেখলাম এক তাড়া কাগজ। এ কাগজগুলো আবার এল কি করে পকেটে—বার বার মুখের কাছে ধরে অন্ধকারেই চিনতে পারলাম এক তাড়া নোট।

শরীরের রক্তে আবার আগুন ধরে গেল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের রক্তে এই আগুনই জ্বলত।

আচ্ছা, দেখাচ্ছি এবার মজা—আমায় ধরতে কত কলসী জল খেতে হয়, বাছাধনদের তা দেখাচ্ছি। চিরপলাতকের চোখ-কান-নাক আবার সজাগ হয়ে উঠল। বড় রাস্তায় পড়ে মিশে গেলাম জনতার সঙ্গে। আর আমায় পায় কে?

আবার পথ।

পথ তো নয়, একখানা ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। দিনগুলি সেই উপন্যাসের এক-একখানি পাতা, বছরগুলি এক-একটি পরিচ্ছেদ। পাতার পর পাতা উলটে যাচ্ছি, শেষ হয়ে যাচ্ছে পরিচ্ছেদ। রহস্য, রোমাঞ্চ, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা, হাসি-কান্নায় ভরা উপন্যাস হচ্ছে পথ। এ উপন্যাসখানি হাত থেকে নামিয়ে রাখলে জীবন হয়ে যায় একঘেয়ে, বিস্বাদ, বিড়ম্বনাময়। সেই বিরতিটুকু ভরে ওঠে বাজে আবর্জনায়, জঘন্যভাবে জট পাকিয়ে যায় নিজের ভাগ্যের সঙ্গে উপন্যাসের নায়ক-

নায়িকার হাসি-কান্না মান-অভিমান। আর তখন জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে বসে একটা অসহ্য অবসাদ। নেশার মত আস্তে আস্তে জড়িয়ে ধরে সেই অবসাদ, অজগর সাপের মত একটু একটু করে গ্রাস করতে থাকে।

তবু একটা অদ্ভুত মোহ আছে এই বিরতিটুকুর। বিগত পরিচ্ছেদগুলিতে যা পড়া হয়ে গেছে, সেগুলো মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ভাল করে চেখে চেখে রসাস্বাদন করা যায় সেই সময়। আর নিজের মনকে তৈরী করে নেওয়া যায় নতুন পরিচ্ছেদ শুরু করবার উপযুক্ত করে।

কিন্তু সেবার যখন আবার ডুব দিলাম আমার পথ নামক উপন্যাসে, তখন কোথায় যেন কি গোলমাল হয়ে গেছে। অনবরত একটা কাঁটা যেন খচ খচ করছে কোথায়। ডান হাতখানা নিয়েই হয়েছে মুশকিল। বড় বেশি সচেতন হয়ে পড়েছি ডান দিকের কাঁধে ঝোলানো পুরানো হাতখানা সম্বন্ধে।

মাঝে মাঝে হাতখানা মুখের সামনে তুলে ধরে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। হিজিবিজি দাগ অনেকগুলো, কে জানে ঐ দাগগুলির গূঢ় অর্থ কি। অনেকবার নিজের কপালের ওপর, মুখে, বুকে চেপে ধরি হাতখানা। কৈ সে রকম ওঠানামা করছে না তো। সেই ঈষৎ উষ্ণতা কোথায়? অবহেলায় উপন্যাসের পাতার পর পাতা উল্টে চলে যাই। পাত্রপাত্রীদের সুখ দুঃখ হাসি কান্না আমায় স্পর্শ করে না। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, সব পাত্রপাত্রীই যেন এক কথা বলে—'মনে থাকে যেন, আমার বুকে হাত দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা করে গেলে তুমি।'

জুতো-জামা-কাপড়-অলংকারের মত মন নামক পদার্থটিকেও যদি খুলে ফেলে দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া যেত, তাহলে কত সহজ হত আমার মজা করে উপন্যাস পড়া। কিন্তু তা হবার নয় সহজে, বড় বিশ্রী পোশাক হচ্ছে এই মন। এ খোলস সহজে খুলে ফেলা যায় না।...অনেকগুলো পাতা, আস্ত গোটাকতক পরিচ্ছেদ পড়া শেষ হয়ে গেল আমার পথ উপন্যাসের। তখন একদিন সবিস্ময়ে দেখলাম, কবে পুরনো হয়ে পচে গলে খসে পড়ে গেছে আমার সেই রঙ-মাখা পোশাকটি তা আমি টেরও পাই নি। আর ডান কাঁধে হাতখানি যথা নিয়মে একান্ত অবহেলায় ঝুলছে আগের মতই, ঝুলন্ত হাতখানা দোলাতে দোলাতে অনেক দূরে আমি পৌঁছে গেছি উপন্যাসে ডুবে।

ভোল ফিরিয়ে ফেলছি একেবারে। কাঁচা-পাকা চুল-দাড়ি, রক্ত বস্ত্র, রুদ্রাক্ষ মালা, কপালে ইয়া-বড় সিঁদুরের গুল আঁকা, তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মহাপাত্র আর মহা-কলকে। এতগুলি উপচারে সুসজ্জিত হয়ে নিজেকে নিজে কল্কি অবতারের সাক্ষাৎ বংশধর বলে জ্ঞান করছি তখন। চা-বাগানের কাঁচা পয়সা আর কাঁচি মদে

মশগুল্ হয়ে দীর্ঘ বিরতি উপভোগ করছি মেটেলি কালীবাড়িতে বসে। কাঁচা সাহেব থেকে শুরু করে পাকা বাবুরা পর্যন্ত সব আমার ভক্ত। চায়ের টেবিলের প্রেমের গল্প লিখতে লিখতে যাঁদের অরুচি ধরে গেছে, তাঁরা হয়ত জানেন না, ঐ প্রেম সোজা চা-বাগান থেকে চা-পাতার সঙ্গে মিশে শহরে এসে পৌঁছয়। কাঁচা চা-পাতা যারা তোলে আর যারা তোলায়, তাদের মনের বিষাক্ত জীবাণু সেই কাঁচা পাতার সঙ্গে মিশে যায়। সেই জন্যেই অত বিকার উৎপন্ন হয় চায়ের টেবিল ঘিরে। কিন্তু তখন চা-পাতা থাকে কাঁচা, কাজেই সেই প্রেমও থাকে কাঁচা। সেই কাঁচা বিকারের চিকিৎসা করছি সর্বজনীন বাবার ভূমিকা নিয়ে।

হাতিফাঁদা বাগানের বড় সাহেব বড় ভাল লোক। দুর্গাপূজার সময় বিস্তর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেন। কলকাতা থেকে গাইয়ে-বাজিয়ে নাচিয়ের আমদানি করান। সেবার এল এক মেয়ে-পুরুষের থিয়েটার পার্টি। আর তার সঙ্গে একজন নাম করা কীর্তন-গায়িকা। ঐ কীর্তন-গায়িকা একাই মাত করে দিলেন সব বাগান। দুর্গাপূজা মিটে গেল, যাত্রা থিয়েটার ম্যাজিক-পার্টি বিদেয় নিলে। কিন্তু কীর্তন-গায়িকা রয়ে গেলেন তাঁর দলবলসহ। আজ এ-বাগান কাল ও বাগান, তার পর-দিন আর এক বাগানে গান হচ্ছে। গান নাকি এমনই গাইছেন তিনি যে, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে উঠছে। কালী-বাড়িতে বসেই শুনতে পাচ্ছি—তাঁর গানের সুখ্যাতি। আরও একটি কথাও কানে আসছে যে, কীর্তন গায়িকা হলেও তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অর্থাৎ 'বাজারে' নন।

দামডাচেরা বাগানের বড়বাবু আমার বড় ভক্ত। আমার দেওয়া এক মাদুলির দৌলতে তাঁর বেশি বয়সে বংশ-রক্ষা হয়েছে তৃতীয়বার বিবাহ করে। অবশ্য বজ্জাত লোকে বলে, গ্রামোফোন রেকর্ডের ক্যানভাসার গানবাবুকে ধর্মের ভাই সম্বন্ধ পাতিয়ে বাসায় স্থান না দিলে নাকি আমার কবচও কিছু করতে পারত না। গান-বাবু ছোকরাটিকে আমি চিনি, সেও আমার বিশেষ ভক্ত। কাজেই সৎ চরিত্র। আমি আমার কবচকেই বিশ্বাস করি।

বংশ-রক্ষার হেতু সেই ছেলেটির অন্নপ্রাশন। বড়বাবু দশটা খাসি কিনে ফেললেন। দশখানা বাগানের বাবুদের সপরিবারে নিমন্ত্রণ করলেন। কলকাতার কীর্তন-গায়িকাকে বায়না দিলেন তিন দিনের জন্য। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে বাগানের লরি পাঠালেন।

লরি থেকে নামতে বড়বাবুর তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী নিজে হাত-পা ধুইয়ে আঁচল দিয়ে পা মুছে দিলেন। তাঁর ধর্মের ভাই সদা-সর্বদা একখানা পাখা হাতে খাড়া

আমার পেছনে। যার অন্নপ্রাশন তাকে আমার কোলে বসিয়ে ফটো তোলা হ'ল। খাসি খেতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও আমার ভক্ত। কাজেই ধোয়া আর আঁচল-দিয়ে-মোছা পায়ের ধুলো নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাইকে মাথায় হাত দিয়ে চোখ বুজে আশীর্বাদ করলাম। জ্বরে আর পেটের অসুখে অনবরত ভোগবার দরুন হাড়-জিরজিরে ছেলেমেয়েগুলিকে 'দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে থাক' বলতে হ'ল। যদিও জানি এদের অনেকগুলিই আমার আশীর্বাদ নিষ্ফল প্রমাণ করবার জন্যে ডুয়াসের ব্ল্যাক ওয়াটারের ঠেলায় কিছু দিনের মধ্যেই স্বস্থানে প্রস্থান করবে।

এমন সময়ে একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের মেয়ে এসে প্রণাম করলে আমায়। এর সাজপোশাক অন্য রকম, চোখেমুখে চা-বাগানের ছাপ পড়েনি। ছোট শরীরটি স্বাস্থ্য আর লাবণ্যে টলমল করছে।

ঘাড়-পর্যন্ত-ছাটা এক মাথা নরম চুলে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"নাম কি তোমার মা-লক্ষ্মী, কোথা থেকে এসেছ তুমি?"

মিষ্টি হাসি হেসে ঘাড় হেঁট করে বললে সে—"কি করে জানলেন আপনি আমার নাম?"

হো হো করে হেসে বললাম—"এই দেখ, তোমার নাম যে লক্ষ্মী তা তো দেখেই বোঝা যায়। তা কোথা থেকে এসেছ তোমরা?"

"কলকাতা থেকে। আমার কিন্তু আর একটা নাম আছে, শুধু মা আমায় লক্ষ্মী বলে ডাকেন।"

"ও তোমার মাও এসেছেন বুঝি—"

"আমারই মেয়ে ও!" লালপাড় দুধে-গরদ-পরা এক ভদ্রমহিলা গলায় আঁচল দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আমায় প্রণাম করলেন।

প্রণাম সেরে উঠে, হাঁটু গেড়ে, কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে, জোড় হাতে বসে রইলেন আমার সামনে। তার মুখ ঠিক আমার মুখের সামনে, ব্যবধান মাত্র দু' হাত, চতুর্দিকে অনেক জোড়া চোখ চেয়ে আছে আমার দিকে। আমার মাথাটা যেন কি-রকম ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুজে গেল আমার চোখ। তলিয়ে গেলাম নিজের মনের মধ্যে। হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম মনের অন্ধিসন্ধি। ঘুলিয়ে যাচ্ছে অনবরত সব ছবি। এতবড় উপন্যাসখানার সব ক-টা চরিত্র যেন মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আঁকুপাঁকু করছে বুকের ভেতরটা। একান্ত দামী জিনিস হঠাৎ হারিয়ে ফেললে যেমন অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি অবস্থা তখন আমার।

"আপনার সঙ্গে নির্জনে একটু দেখা হতে পারে কি?"

চোখ চেয়ে দেখলাম, তিনি তখনও হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। পেছন থেকে বড়বাবু তাঁর খ্যানখেনে গলায় বলে উঠলেন—"ইনিই এসেছেন, বাবা, কলকাতা থেকে, কীর্তন গেয়ে আমাদের মত পাপীদের উদ্ধার করতে। আপনিও পায়ের ধুলো দিলেন দয়া করে অধমের বাসায়। তিন দিন এঁর গানের ব্যবস্থা করেছি—শুধু আপনাকে শোনাব বলে। হেঁ হেঁ—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ—হেঁ হেঁ।"

নিজের কৃতিত্বে নিজেই দু' হাত কচলে হাসতে লাগলেন—হেঁ হেঁ, হেঁ হে।

তখনও চেয়ে আছি সেই চোখ দুটির দিকে, দেখছি ঐ চোখে কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা ওঁর পরিচয়। ওই মুখ, ওই চিবুক, কপালের ওই রেখা ক'টি, বাঁ কানের ঠিক পাশে গালের ওপর ছোট্ট ঐ আঁচিলটি, অত লম্বা কালো চোখের পল্লব, এমন কি নাকের ওপর ঐ ঘামের বিন্দুগুলি পর্যন্ত কোথায় যেন লুকিয়ে আছে আমার মনের মধ্যে। কিন্তু চিনতে পারছি না ঐ চোখের দৃষ্টি, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা আর আত্ম-পীড়ন লুকিয়ে আছে ঐ দৃষ্টিতে, কার তপস্যা করেন ইনি!

আবার কানে গেল সেই গলার স্বর—"আমি আপনাকে কয়েকটি কথা নির্জনে নিবেদন করতে চাই।" চমকে উঠলাম, কি জানি কেন বহুদিন পরে আবার সচেতন হয়ে উঠলাম নিজের ডান হাতখানা সম্বন্ধে। হাতখানা নিজের মুখের সামনে মেলে ধরে অন্যমনস্কভাবে হুকুম করলাম বড়বাবুকে—"যোগীন, সকলকে এক বার বাইরে যেতে বলো তো, আগে শুনি এঁর কি বলবার আছে।"

"হেঁ হেঁ—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, চলো চলো সব বাইরে যাও তোমরা। বাবা এখন কৃপা করবেন আমাদের মা-ঠাকরুণকে, হেঁ হেঁ।"

মেয়েটির মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন—"লক্ষ্মী, তুমিও মা একটু বাইরে যাও তো, আমি এঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে আসছি।'

দরজা বন্ধ হ'ল বাইরে থেকে।

মাথা হেঁট করে উনি বসে আছেন আমার সামনে, কোলের ওপর দুটি হাত রেখে। হঠাৎ নজর পড়ল ওঁর একখানি হাতে। বাঁ হাতে তর্জনীর মাথাটা নেই।

অনেকদিন আগে আচমকা একদিন একখানা জ্বলন্ত কয়লার ওপর পা পড়ে যায়। সেদিন যে-রকম একটা ধাক্কা লেগেছিল ভেতরে, ঠিক সেই রকম একটা ধাক্কা লাগল বুকে। পেন্সিল কাটতে গিয়ে একটি মেয়ে একদিন উড়িয়ে দিয়েছিল তর্জনীর মাথাটা, কিন্তু একবার উহু-আহাও করে নি মুখে। বরং সে কি হাসি, যেন অমন মজা সহজে হয় না। যত আমি লাফালাফি করছি রক্ত বন্ধ করার জন্যে, মেয়ের তত স্ফূর্তি। ডান হাতে বাঁ হাতের আঙুলটা টিপে ধরে হেসে গড়াগড়ি

যাচ্ছে। শেষে ডাক্তার এসে রক্ত বন্ধ করে।

হাঁ করলাম, গলা পর্যন্ত ঠেলে এল নামটি। সেই মুহূর্তে উনি মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঐ মেয়ের বাবা এখন কোথায় তাই জানতে চাই আমি।"

প্রাণপণ চেষ্টায় একটা ঢোঁক গিলে ফেললাম। তারপর বার করলাম বাবা-জনোচিত উচ্চাঙ্গের হাসি, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের ভেতর থেকে। যতটা সম্ভব পরিহাসের স্বর আমদানি করলাম গলায়। বললাম—"আমি তা জানব কেমন করে?"

অতি সংযত কণ্ঠে তিনি বললেন—"আপনি জানেন না বটে, কিন্তু ইচ্ছে করলে বলতে পারেন। চা-বাগানের সাহেব থেকে কুলিরা পর্যন্ত সবাই এক বাক্যে আমায় বলেছে আপনার শক্তির কথা। কিছু না জেনেই কি এসেছি আপনার কাছে। কিন্তু আমার মত হতভাগিনীর ওপর কি আপনার দয়া হবে।"

তিনি মাথা নিচু করলেন আবার। আমার মাথার ভেতর, শুধু মাথার ভেতর কেন, সারা শরীরের রক্তের সঙ্গে ছুটোছুটি করছে কয়েকটি কথা—'মনে থাকে যেন, আমার বুকে হাত দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা করে গেলে তুমি।'

চেয়ে আছি ওঁর বুকের দিকে, সেদিনের সেই বুকের চেয়ে অনেক উঁচু, অনেক সুস্পষ্ট ঐ মেয়ের মায়ের বুক, দুধ গরদের জামার নিচে আজও যেন ঈষৎ ওঠা-নামা করছে। কিন্তু যদিই বা ফিরে যেতাম একদিন, তাতেই বা কি হোত। অন্য এক ভদ্রলোকের সাধ্বী স্ত্রী খুব ভক্তিভরে একটি প্রণাম করতেন ঠিক এই আজকের মত। কিন্তু প্রণামে আমার আর লোভ নেই, ওতে অরুচি ধরে গেছে। আমার নিজের ডান হাতখানার দিকে চাইলাম। বড় বিতৃষ্ণা লাগল হাতখানার ওপর। মিছামিছি যত্ন করে এতদিন বয়ে বেড়াচ্ছি এখানা।

"আমাকে কি দয়া করবেন না আপনি?"

আবার সেই কণ্ঠস্বর। কিন্তু এ হচ্ছে ভিখারিণীর গলার আওয়াজ, বহুকাল আগে শোনা সেই জীবন্ত মেয়েটির গলার আওয়াজ এ নয়।

সামলে নিলাম নিজেকে। বললাম—"কি নাম তাঁর?"

এবার অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে বললেন, "তাও জানি না।" স্পষ্ট শুনতে পেলাম ওঁর বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

এবার জ্বালা আরম্ভ হ'ল পায়ের তলার সেই জায়গাটায়, অনেকদিন আগে জ্বলন্ত কয়লাটা চেপে ধরেছিলাম যে জায়গাটা দিয়ে।

অর্থাৎ? 'তাও জানি না'—এই ছোট্ট কথাটির অর্থ কি?

অতি সোজা অর্থ—পণ্যাঙ্গনা জানবে কি করে কে ওই মেয়ের জন্মদাতা!

অথচ ন্যাকাপনা করতে এসেছে—এখন সে কোথায় তাই আমায় গুণে বলে দিতে হবে। যেন তাঁর নাম-ঠিকানা পেলে উনি ঘরে গিয়ে উঠবেন ঐ মেয়ে নিয়ে। নচ্ছার মেয়েমানুষ, গরদের লালপাড় শাড়ি শাঁখা সিঁদুর পরে, গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝিয়ের সঙ্গে মিশে, মা-ঠাকরুণ হয়ে কীর্তন শুনিয়ে পাপীদের উদ্ধার করছেন। আজই ব্যবস্থা করছি যাতে ওঁকে কালই ঝাড়ু মেরে তাড়ায় সকলে চা-বাগান থেকে।

"আপনি তো সবই জানতে পাবেন ইচ্ছে করলে, আপনি অন্তর্যামী"—দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে ওঁর।

নিজেকে শক্ত করে সামলে নিলাম, দেখি না কতদূর ছলনা জানে ও। বললাম—"জানতে তো অনেক কিছু পারছি, তারপর যে অনেকটা অন্ধকার দেখছি, কেন যে এ-রকম হচ্ছে। মানে আপনার উনিশ-কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ধরুন আপনার ঐ আঙুলটির মাথা করে কাটা যায় তাও দেখছি, তখন আপনি একটুও কাঁদেন নি। আচ্ছা আপনার নাম আগে শেফালী ছিল না?"

উনি নির্বাক, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন আমার মুখের দিকে, শুধু ঘাড় নাড়লেন। চোখ বুজে বেশ বসিয়ে গেলাম সেই পর্যন্ত। উনি ওঁর নিজের উদলা বুকের ওপর অন্য একজনের হাত চেপে ধরে বলছেন—'মনে থাকে যেন, আমার বুকে হাত দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা করে গেলে, তুমি।'

চেয়ে দেখি ওঁর দুই চোখ বোজা, আর দুই চোখ থেকে নেমেছে দুটি জলধারা, বুকের ওপরে দুধে-গরদ ভিজছে।

কিন্তু অশ্রু ভেজাতে পারবে না আমাকে। নির্জলা ভক্তি আর প্রণাম পেতে পেতে ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে অনেক দিন। এখন আমি ষোল-আনা একজন মার্কা-মারা বাবা।

বললাম—"তারপরই যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, যেন খেই হারিয়ে ফেলছি। আপনি যদি তারপর কিছু কিছু বলে যান তবে হয়ত শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখতে পারি ঐ মেয়ের বাবা এখন কোথায়।"

তিনি চোখ খুললেন। যেন একটি অতি গোপনীয় কথা বলছেন এইভাবে বললেন—"আচ্ছা, যদি তাঁর ফটো দেখাই তাহলে আপনি বলতে পারবেন কোথায় আছেন তিনি এখন?"

আবার ফটোও সঙ্গে রেখেছে, কিন্তু সে লোকটাই বা কেমন নির্বোধ, এই রূপাজীবার কাছে নিজের ফটো রেখে যায়। আছে, আছে বটে অনেক বড় ঘরের

পাঠা, যারা বিশেষ ভঙ্গিমায় এই জাতের মেয়েদের সঙ্গে নিজের ফটো তোলার বাহাদুরি করে—নিজের কু-চরিত্রের চিরস্থায়ী দলিল রাখবার জন্যে।

দেখাই যাক না সে মহাপুরুষের মূর্তিখানি কেমন। বললাম—"সঙ্গে আছে নাকি আপনার সেই ফটো? থাকে তো দেখান—দেখি যদি কিছু করতে পারি।"

আরে, এ-ও যে পটপট করে জামার বোতাম খুলছে!—বার করলেন লাল ভেলভেট মোড়া কি একটা। অতি যত্নে ভেলভেট মোড়া খুলে ফটোখানি নিজের মাথায় ছুঁইয়ে আমার হাতে দিলেন।

বোধহয় একটা অদ্ভুত আওয়াজও বেরিয়েছিল আমার গলা থেকে সেই মুহূর্তে। ফটোখানা আমার হাত থেকে পড়ে গেল।

পড়ে গেল চিৎ হয়ে ফটোখানা, আমি বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলাম। তারপর চোখ তুলে চাইলাম সামনে বসা সেই রূপাজীবার দিকে। সেও অবাক হয়ে দেখছে আমাকে।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। ঘরের ভেতর কারও নিশ্বাস পড়বার শব্দও হচ্ছে না তখন। তিনিই প্রথম কথা বললেন—"কি হ'ল আপনার, এঁকে আপনি চেনেন নাকি।"

জড়িয়ে জড়িয়ে আমার গলা দিয়ে বার হ'ল—"কৈ না, চিনি না তো। তবে ঠিক এই রকমের একটি চেহারাই ভেসে উঠেছিল কিনা আমার মানসচক্ষে। কিন্তু ঐ জেলের পোশাকে নয়। আর বয়সও অত কম নয়।"

তিনি বললেন—"তাই তো হবে। যখন তিনি আমায় ছেড়ে চলে যান প্রথম বার, তখন তো তিনি জেলের পোশাকে ছিলেন না, আর তখন তাঁর বয়সও আরও বেশি হয়েছে। আমি শুধু ঐ চোখ দুটি দেখে ওঁকে চিনেছিলাম তখন।"

বহুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলাম। নিশ্চয়ই সামনে বসে ভাবতে লাগলেন, আমি অন্তর্যামীগিরি ফলাবার চেষ্টায় চোখ বুজে বসে আছি। ভাবুক ওরা যা খুশি, আমি শুধু আশ্চর্য হয়ে ভাবছি তখন—কি হ'ল আমার সেই চোখের। আজ তুমি চিনতে পারছ না কেন আমার চোখ দেখে? দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল গজিয়ে কি আমি আমার চোখ দুটিকেও খুইয়েছি! সেদিন তো চিনেছিলে তুমি, আজ কেন পারছ না? কেন পারছ না? কেন?

শেষ কেনটা মুখ ফুটে বেরিয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কেন কি! কি কেন জিজ্ঞাসা করছেন?"

চোখ চাইলাম আবার। বললাম—"কেন যে তার পরের ব্যাপারগুলো জোড়া

দিতে পারছি না তাই ভাবছিলাম। আচ্ছা, এবার দয়া করে বলুন তো, আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হল এঁর।"

তখন শুনলাম সেই দীর্ঘ কাহিনী। আমি চলে আসবার পর ওর বাবার সরকারী চাকরিটি গেল বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে। ওকে নিতে হ'ল লোকের বাড়ি গিয়ে মেয়েদের গান শেখাবার কাজ। তাতেও কিছু হ'ল না, হিমাদ্রিবাবু কোথাও আর চাকরি পেলেন না, শেষে একরকম না খেতে পেয়ে অরুণ মারা গেল। হিমাদ্রিবাবু স্কুল-মাস্টারি নিয়ে চলে গেলেন রাজসাহী।

সেই রাজসাহীতে আর একবার দেখা হয় ফটোব ঐ লোকটির সঙ্গে শেফালীর। বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে সে এসে আশ্রয় নেয় শেফালীর এক বন্ধুর বাড়িতে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দিন বাত তাব সেবা করে শেফালী। প্রায় এক মাস ছিল, তারপর সুস্থ হয়ে সে পালায়। শেফালীকে ধবে সরকার বাজবন্দিনী করে রাখে। সেই সময় ঐ মেয়ে জন্মায় দিনাজপুব জেলে। তিন বছবের মেয়ে নিয়ে শেফালী যখন ছাড়া পায, তখন বাপ-মাযের আব পাত্তাই পেলো না কোথাও। তখন পেটের দায়ে আর মেয়েকে বাঁচাবার দাযে নিজেব গলাব ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হ'ল।

"আমার আর কোনও বাসনা-কামনা নেই, শুধু তার মেযেকে তার হাতে সঁপে দিয়ে মরতে চাই। আমি যে ওই মেয়েকেও জবাব দিতে পাবছি না ওব বাবা কে?"

এবার আর আমার ছলনা বলে মনে হ'ল না ওব ঐ অশ্রুর প্লাবনকে। ডুবে মরার আগের মুহূর্তটিতে একগাছা খডকুটো ভেসে যেতে দেখলেও আঁকুপাঁকু করে ধরতে যায় মানুষ। ঠিক তাই করতে গেলাম, অন্তিম চেষ্টায় আঁকড়ে ধরতে গেলাম এক গাছা খড—"আচ্ছা—এমন কি হতে পাবে না যে, আপনি লোক ভুল করেছিলেন—"

কথাটা ভাল করে শেষ করতে দিলে না আমাকে। আর্তনাদ করে উঠল—"কি, কি বললেন? লোক চিনতে ভুল হয়েছে আমার? তার মানে এক মাস ধরে সেবা করে যাকে আমি যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম, তাকে চিনতে পারি নি আমি!"

ওর দুই চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল।

সেই চোখের দিকে চেয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম। থাক, শান্তিতে থাক ও—ওর বিশ্বাস বুকে নিয়ে চিরকাল। আমি তাতে বাগড়া দেবার কে?

আরও অনেকটা সময় কেটে গেল। চোখ বুজে বসে রইলাম, অন্তর্যামী যে

আমি, আমি যে একজন মার্কা-মারা বাবা।

বললাম শেষে—"তিনি হয়ত এখন সন্ন্যাসী হয়ে ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছেন।"

ধবক্ করে জ্বলে উঠল শেফালীর চোখ—"কখ্খনো নয়, কিছুতেই তা হতে পারে না। এত হীন, এত নীচ তিনি হতেই পারেন না। দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে তাঁর বুকের ভেতর আগুন জ্বলছে। কোনও ভগবান সে আগুন নেবাতে পারবে না যতদিন না দেশ স্বাধীন হবে। বরং আমি বিশ্বাস করব, তিনি মরে গেছেন পুলিশের গুলিতে, তবু সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন বিশ্বাস করতে পারব না।"

ছোঁ দিয়ে তুলে নিলে ফটোখানা। নিয়ে সযত্নে ভেলভেটে জড়িয়ে বুকে রেখে জামার বোতাম আঁটতে লাগল।

একান্ত নিস্পৃহকণ্ঠে বললাম, "হরশৃঙ্গার মানে জানেন?"

অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। অল্প হেসে বললাম—"হিন্দি ভাষায় শিউলি ফুলের নাম হরশৃঙ্গার। তা আপনি তো শেফালী, আপনার গর্ভে ঐ যে জন্মেছে--মনে করুন ওর বাবা স্বয়ং বিশ্বনাথ। মনে শান্তি পাবেন, আপনার হরশৃঙ্গার নামটিও সার্থক হবে।"

ও আবার চোখ বুজে ফেলেছে। যেন ধ্যানমগ্না। কিছুক্ষণ পরে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলে—"আমি মরবার আগেও কি একবার দেখা পাব না, সে যে প্রতিজ্ঞা করে গেছে? একবার প্রতিজ্ঞা রেখেছে আর একবার কি রাখবে না?"

পেছনের দরজা খুলে ওর মেয়ে ঘরে ঢুকল।

"মা, সভায় সকলে বসে আছেন, আজ গাইবে না?"

আঁচলে চোখ মুছে আমায় প্রণাম ক'রে মেয়ের হাত ধরে শেফালী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ যোগীনকে ডেকে বললাম—"লরি ঠিক করে দাও যোগীন। মা-বেটি আমায় স্মরণ করেছে, আসন ছেড়ে থাকতে পারব না আজ রাত্রে।"

তটস্থ হয়ে ওরা লরি ঠিক করে দিলে। সোজা স্টেশন। তারপর আবার পথ—

উপন্যাসের না-পড়া পাতা ক'খানা যে শেষ করতেই হবে আমাকে।

৩

দোসরা তারিখে হাতে পেতাম গুণে গুণে দশটি টাকা। ওরই মধ্যে সমস্ত। মা কালীর ভোগ-নৈবেদ্য ফুল-বেলপাতা-সন্ধ্যারতির ঘি থেকে আরম্ভ করে নিজের আহার-বিহার পর্যন্ত পুরোপুরি ত্রিশটি দিন চলা চাই। তার ওপর বিনা ভাড়ায় একখানি থাকবার ঘর। সিঁড়ির নিচের ঘর। মাথায় ঠেকে এই মাপের একটি দরজা। এক বিন্দু আলো যাবার অন্য কোনও পথ নেই ঘরে। আগে বোধ হয় সেই ঘরে কেরোসিন তেল আর তেলেব আলো রাখা হত। বড় বড় বাড়িতে কেরোসিনের বাতিগুলো সাজাবার জন্যে ঐ রকমের আলাদা একটি ঘর থাকে। আমার ঘরখানাও বোধ হয় সেই কাজেই ব্যবহৃত হত। যতদিন সে ঘরে আমি ছিলাম সদাসর্বদা কেরোসিনের গন্ধ পেয়েছি। যেন কেরোসিনের মধ্যে ডুবে আছি। একটা মাটির কলসিতে খাবার জল রাখতাম। সেই জল থেকেও কেরোসিনের গন্ধ বেরোত। চাকরি পাবার পর সেই ঘরখানিতেই আমাকে থাকতে দেওয়া হল। কারণ অত বড় বাড়ির ভেতর এই ঘরখানিতেই কোনও ভাড়াটে জুটত না।

চাকরি পেয়ে বর্তে গেলাম। মা কালীর নিত্য সেবা-পূজার কাজ। এটি হচ্ছে একটি মঠ। মহাতান্ত্রিক পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী তারানন্দ পরমহংস আগমবাগীশ মঠ আর কালী প্রতিষ্ঠা করেন। বিপুল ধন-সম্পত্তি আর বিরাট বাড়িখানি রেখে তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। তাঁর দৌহিত্র শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ শর্মা, এম-এ ডি-ফিল, এখন এই মঠ আর কালীর মালিক। ভদ্রলোক মনুষ্যত্বের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে ডি-ফিল পেয়েছেন। সমস্ত বাড়িটার একতলা দোতলা তিনতলার চব্বিশখানা ঘরে চব্বিশটি ভাড়াটে। ভাড়া আদায় হত মাসে একশ কুড়ি টাকা। শুধু মা কালীর ঘরখানি, তার সামনের দালানটি আর সিঁড়ির নিচের ঘরখানি ভাড়া দেওয়া হয় নি। এমন কি কালী-ঘরের সামনের উঠানেও ভাড়াটে ছিল। এক কবিরাজ সেই উঠানে মস্ত মস্ত উনুন গেঁথে তার ওপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়াই বসিয়ে তেল জ্বাল দিত।

শঙ্করীপ্রসাদ থাকতেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলোতে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বিলেত-ফেরত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা মাহিনায় চাকরি করতেন তিনি। দোসরা তারিখে যেতে হোত তাঁর বাংলোয় দশটি টাকা আর একটি শিশিতে এক ছটাক দেশী মদ আনবার জন্যে। এক ফোঁটা মদ জলে ফেলে সেই জলে মা কালীর

ঘর ধোয়া থেকে ভোগ পূজা সমস্ত সম্পন্ন করা চাই। কারণবারি ছাড়া মায়ের সেবা নিষিদ্ধ। এই কালীর পূজায় একমাত্র অভিষিক্ত কৌলের অধিকার। চাকরি পাবার জন্যে আমাকেও অভিষিক্ত হতে হয়।

যিনি আমাকে কাজটি জুটিয়ে দেন, তিনিই সংক্ষিপ্ত পূজা-পদ্ধতি শিখিয়ে, অভিষেক করে, কৌলের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়ে দিয়ে তবে শঙ্করীপ্রসাদের সামনে নিয়ে দাঁড় করান আমাকে। তখন ঐ-জাতের একটা কাজকর্ম না জুটলে আমার বাঁচবার কোনও উপায় ছিল না।

বাঙলাদেশে মাথা বাঁচাবার স্থান নেই। ধরা পড়লে হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর নয়ত বা একেবারে ঝুলিয়েই ছাড়বে। জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের চা-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম রক্ত-বস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে সিন্দুরের ফোঁটা পরে। জ্বর আর রক্ত-আমাশয় ধরল বাগে পেয়ে। ওখানে এক কুলীন জাতের জ্বর আছে। নামটিও ভাল। ব্লাক ওয়াটার ফিভার। একবার ধরলে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যায় যাকে ধরে তাকে। সেই জ্বরের ভয়ে ওখান থেকেও সরতে হল। তাড়া খেতে খেতে একদিন, মাত্র ঐ জ্বর আর রক্ত-আমাশা সম্বল করে, কাশী গিয়ে পৌছলাম। বাঙ্গালীটোলার এক বাড়ির সামনের রোয়াকের ওপর থেকে এক ব্রাহ্মণ আমাকে তুলে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। জ্বর গেলে তাঁকেই ধরে বসলাম কোথাও যে কোন রকমের একটি কাজ জুটিয়ে দেবার জন্যে। যেখানে অন্ততঃ বছর দুই মাথা গুঁজে পড়ে থেকে সংস্কৃত ভাষাটা রপ্ত করতে পারি। আমার আশ্রয়দাতার তিনটি গুণ ছিল একসঙ্গে। কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তিনি, সর্বজনপূজ্য সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন—আর একবিন্দুও বিদ্যার অহঙ্কার ছিল না তাঁর। কেউ পড়াশুনা করতে চাইছে অথচ সুযোগ পাচ্ছে না, এ শুনলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। যে করে হোক একটা সুযোগ করে দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তাঁর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিলাম আমি। ফলে আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। যাকে বলে একেবারে রাজযোটক ঘটে গেল। চুল দাড়ি অনেকদিন থেকে স্বাধীনতা পেয়ে বেড়েই ছিল। রক্তবস্ত্র, রুদ্রাক্ষমালা তো ছিলই। এবার কালী-বাড়ির চাকরি পেয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে খটখট করে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মহা-তান্ত্রিক সাধক মানুষ হয়ে গেলাম দু'দিনেই।

তবু প্রথম প্রথম সেই অন্ধকার গুহা থেকে বেরুতে সাহস হত না। ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে এসে একটা ছোট পিতলের হাঁড়িতে চাল, ডাল, আলু, কচু যা যখন জুটত, একসঙ্গে চড়িয়ে দিতাম। সেটা সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিয়ে মা কালীর ঘরে গিয়ে ঢুকতাম। এক পয়সার ফুল-বেলপাতা ফুলওয়ালা শালপাতায় জড়িয়ে

জানালা গলিয়ে ঠাকুরঘরে কখন ফেলে রেখে যেত। বেলা দশটা এগারটা পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে মা কালীর সেবা-পূজা চলত। শেষে ঘণ্টা কাঁসরে ঘা-কতক বাড়ি দিযে, পূজা সমাপ্ত হল ঘোষণা করে পেতলের হাঁড়িটা হাতে করে নিজের ঘরে ঢুকতাম। তারপর সেই পিণ্ডি-প্রসাদ গিলে, সারাদিন দরজা বন্ধ করে সেই অন্ধকার ঘবে পড়ে থাকতাম। সন্ধ্যার পর একবার ঠাকুরঘরে গিয়ে ঘণ্টা নেড়ে আবতি করে আসা। তাহলেই চাকবিব লেঠা চুকে যেত। কেউই আমার নিরবচ্ছিন্ন সাধন-ভজনের ব্যাঘাত করতে সাহস কবত না।

কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না। লোকে সমীহ করে কথাবার্তা বলতে শুরু করলে আমার সম্বন্ধে। কারও সঙ্গে মেশে না, কথা কয না, সাবা দিন-রাত দরজা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে কি করে? সহজ লোক নয মানুষটি। অসীম ক্ষমতা-সম্পন্ন লোক যে আমি, আব সহজে কাউকে ধবা-ছোঁযা দেব না কিছুতেই—এ কথা চুপি চুপি এ মুখ থেকে ও কানে আব ও-কান থেকে সে-মুখে বটতে লাগলো।

ফলও ফলল। স্বয়ং ডি-ফিল সাহেব একদিন সস্ত্রীক উপস্থিত হলেন তাঁর কালীবাড়িতে। উদ্দেশ্য—তাঁব দশ-টাকা-মাইনের পূজারী বামুনকে একটু বাজিয়ে দেখা। অনেকের মুখ থেকে অনেক রকমেব কথা শুনে তাঁব খেযাল হযেছে লোকটি আসল না মেকী একটু যাচাই কববার।

একথা অবশ্য মানতেই হবে যে, তান্ত্রিক সাধকের মধ্যে কে কেমন দরের 'চিজ', তা এক আঁচড়ে বোঝবার শক্তি তাঁর মত লোকেব থাকা উচিত। তাবানন্দ পরমহংসের সাক্ষাৎ মেযেব ছেলে তিনি। কাশীর বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা তারানন্দকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন বা জানতেন, তাঁরা এখনও স্বামীজীর নাম করলে কেঁপে ওঠেন। শুধু তাঁরা কেন—এত সব অদ্ভুত কাহিনী চালু আছে তারানন্দ আর তাঁর এই মঠবাড়ি সম্বন্ধে—যে এখনও লোকে এই কালী আব কালীবাড়ির নামে কপালে জোড়হাত ঠেকায়। সাক্ষাৎ ভৈরব ছিলেন তারানন্দ। দুধকে মদ আর মদকে দুধ বানানো কর্মটি ছিল তাঁর কাছে ছেলে-খেলা। গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে কতদিনের মড়া কে জানে, গা থেকে মাংস খসে গলে পড়ছে। তাই তুলে নিয়ে এসে মা কালীর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছেন। একপক্ষ কাল পরে দরজা খুলে তার হাত ধরে হাসতে হাসতে বেরিযে এসেছেন। এই ধরনের নাকি সমস্ত অমানুষিক শক্তি ছিল তাঁর। কালে-ভদ্রে যখন তিনি বার হতেন তখন মঠ থেকে দামামা বেজে উঠত। তা শুনে রাস্তার দু-পাশের বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ হয়ে যেত। লোকে বিশ্বাস করত, তাঁর চোখের সঙ্গে চোখ মিললে আর রক্ষে নেই। ঘরের বউ-ঝি, যাকে তাঁর ইচ্ছে হবে, তাকেই টেনে নিয়ে যাবেন মঠের মধ্যে।

বহু নরবলি নাকি হয়ে গেছে তাঁর সময়ে কালীর সামনে।

বড় বড় রাজা-মহারাজা ছিল তাঁর শিষ্য-ভক্ত। আর ছিল তাঁর তিনটি শক্তি। প্রথমা তাঁর বিবাহিতা পত্নী; দ্বিতীয়া এক অন্ধ্রদেশীয়া কন্যা—তাঁকে তিনি গ্রহণ করেন, যখন পরিব্রাজক অবস্থায় দক্ষিণ ভারতে তীর্থ দর্শন করে বেড়াচ্ছিলেন; শেষ বয়সে তৃতীয় শক্তি পান গুরু-দক্ষিণা হিসেবে তাঁরই এক শিষ্যের মেয়েকে।

ঐ তেলেঙ্গী শক্তির গর্ভে জন্মায় এক মেয়ে। মেয়ে তো নয় যেন অগ্নিশিখা! আট বছর বয়সেই সে মেয়ের দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যেত। সেই জন্যেই বোধ হয় মেয়ের নাম রেখেছিলেন স্বামীজী—স্বাহা। বয়স যখন তার ঠিক নবছর, তখন কোথা থেকে এক অতি সুদর্শন ষোল বছরের ব্রাহ্মণ সন্তানকে জোগাড় করে আনলেন স্বামীজী। এনে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। শৈব বিবাহ হল শাস্ত্রমতে। গৌরীদানের ফল লাভ করলেন তারানন্দ। বিয়ের পর মেয়ে-জামাইকে কাছে রেখে দিলেন। জামাইকে দীক্ষা দিলেন, শাক্তাভিষেক থেকে পূর্ণাভিষেক পর্যন্ত করলেন। মেয়ে জামাইকে মঠ আর কালীর ভবিষ্যৎ সেবায়েত করে রেখে যাবেন এই ছিল তাঁর বাসনা। সেজন্য উপযুক্ত বিদ্যেও তিনি দিচ্ছিলেন জামাইকে। কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। তারানন্দ হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন। শোনা যায় তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।

তার অল্প কিছুদিন পরে তাঁর জামাইও রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হলেন। বোধ হয় উচ্চতর সাধনমার্গে প্রবেশ করবার জন্যে চলে গেলেন হিমালয়ে। মেয়ের বয়স তখন মাত্র উনিশ-কুড়ি। অতুলনীয়া রূপ-লাবণ্যবতী সেই মেয়ে সেই বয়সেই যথোচিত আড়ম্বরের সঙ্গে ভৈরবী-পদে অভিষিক্তা হলেন। হয়ে কায়মনোবাক্যে সাধন-ভজনের স্রোতে গা ভাসালেন। পা পর্যন্ত এলোচুলে আর রক্তবর্ণ মহামূল্য বেনারসীতে তাঁকে এমন মানান মানালো যে, সাক্ষাৎ শিবও দেখলে হয়ত তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তেন।

স্বাহা ভৈরবীর হাতে এল প্রচুর সোনাদানা হীরে-জহরত। মঠের এক গুপ্ত ঘরে ছিল কয়েক ঘড়া গিনি আর মোহর। দেহত্যাগের আগে মেয়েকেই সে সন্ধান দিয়ে যান তারানন্দ। সুতরাং স্বাহা ভৈরবীর আমলেই হচ্ছে মঠের সব-চেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। ধন-দৌলতের সঙ্গে একপাল শিষ্য-সেবক সাধক-সাধিকা এসে জুটল ফাউ হিসেবে স্বাহা ভৈরবীর পায়ের তলায়। আরম্ভ হল স্বর্ণযুগ। তান্ত্রিক সাধন অনুষ্ঠানাদির বিপুল সমারোহ আরম্ভ হল। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ইত্যাদির ঢেউ বয়ে যেতে লাগল মঠে। দিবারাত্র অষ্টপ্রহর শোনা যেতে লাগল কেউ বলছে 'জুহোমি'—তৎক্ষণাৎ কেউ উত্তর দিচ্ছে 'জুষস্ব পরমানন্দে'। এক-

সঙ্গে বহু-বিচিত্রকণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল যখন তখন—

"ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা ॥"

তখন এই বাড়ির বন্ধ ঘরের দরজার গায়ে কান পাতলে শোনা যেত আরও কত বিচিত্র রহস্যময় শব্দ। কত হাসি আর সঙ্গে মর্মন্তুদ চাপা আর্তনাদ। আরও কত বিচিত্র সব মন্ত্র। যেমন—

"ওঁ ধর্মাধর্মহবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তির্জুহোম্যহং ॥"

ভৈরবী স্বাহা দেবীর আমলে এই মঠ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার-তুল্য এক দল সাধক-সাধিকা বার হল—যারা প্রকাশ্যে তন্ত্রের মহিমা চারিদিকে প্রচার করে বেড়াতে লাগল। কিছুদিন পরেই শঙ্করীপ্রসাদের জন্ম হয়। অতি অল্প দিনই মায়ের বুকের দুধ পায় সে। ছেলে জন্মাবার পর আরও প্রচণ্ডভাবে স্বাহা ভৈরবী সাধন-মার্গে প্রবেশ করলেন। একটি উল্লেখযোগ্য ভাল কাজও তিনি করে-ছিলেন সে সময়। প্রচুর টাকা আর তাঁর শিশু সন্তানটি তিনি দিয়ে এসেছিলেন খৃষ্টান মিশনারীদের কাছে। দিয়ে এসে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে ডুবে গেলেন আধ্যাত্মিক জগতে।

মাত্র বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত দেহ রাখতে পেরেছিলেন তিনি। বড় বড় কয়েকটা মামলা মকদ্দমা করতে হয় তাঁকে তারানন্দের অন্য আর একদল শিষ্যের সঙ্গে। শেষে যখন সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন তিনি জীবনের মাত্র বত্রিশটি বছর পার হয়ে—তখন সোনা-রুপো-হীরে-জহরতের এতটুকুও আর পাওয়া গেল না মঠে। রইল শুধু তাঁকে আর মঠকে ঘিরে সব ভয়াবহ বদনাম। এতবড় তিন-মহল বাড়িখানার ঘরে ঘরে তালা ঝুলতে লাগল। কালীর সেবা বন্ধ হল। তখন প্রাণহীন বাড়িখানার পাশ দিয়ে যেতে আসতে লোকের বুক কেঁপে উঠত। রাশি রাশি আজগুবি গল্প চালু হয়ে গেল মঠ আর কালী সম্বন্ধে। বন্ধ বাড়িখানার ভেতর থেকে নাকি দিনের বেলাতেও অদ্ভুত সব আওয়াজ পাওয়া যেত। কখনও পাওয়া যেত হোমের গন্ধ, কখনও শোনা যেত বিচিত্র সুরে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ। কখনও বা বুকফাটা হাহাকার আর আকুল কান্না। যেন অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে কোন এক হতভাগিনী মাথা খুঁড়ছে মঠবাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে। লোকে বলে, কুলবধূদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ধরে এনে মঠে ঢোকানো হয়েছে কিন্তু তারা আর কখনও এখান থেকে বার হতে পারেনি। আরও কত কি লোকে বলে। এমন কথাও অনেকে বলে যে, যাকেই এ কালীর সেবায় লাগানো হয়, তারই নাকি

মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। একবার বলতে আরম্ভ করলে লোকে কীই বা না বলতে পারে?

স্বাহা ভৈরবীর মহাপ্রয়াণের ঠিক সতেরো বছর পরে বিলেত থেকে ফিরে এলেন শঙ্করীপ্রসাদ। এসে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ে মঠ আর কালী অধিকার করলেন। ঘরে ঘরে ভাড়াটে বসালেন। পুনরায় সেবা-পূজার ব্যবস্থা করলেন মা কালীর। বরাদ্দ করলেন মাসে দশটি টাকা আর এক ছটাক মদ। কিন্তু মুখ দিয়ে রক্ত ওঠার ভয়ে সহজে কোনও ব্রাহ্মণ মেলে না কালীর নিত্যপূজার জন্যে। এমনও হতে পারে যে, মাত্র দশটাকার মধ্যে ত্রিশ দিন পূজার খরচা আর পারিশ্রমিক পোষায় না বলেই সহজে কেউ রাজী হয় না এ-কাজ নিতে। এটা আমারই বরাত জোর বলতে হবে। তার ওপর তিন মাস কালীর পূজা চালাবার পরেও যখন মুখ দিয়ে রক্ত উঠল না—তখন সহজ লোক যে আমি নই, সেটাও তো প্রমাণ হয়ে গেল। তাই স্বয়ং মালিক আর মালিক-পত্নী এসে উপস্থিত হলেন।

জুতা পায়ে খট খট মস মস আওয়াজ তুলে তাঁরা একতলা-দোতলা-তেতলা ঘুরে সব দেখে-শুনে এলেন। ভাড়াটেদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করে সিঁড়ির তলায় আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বন্ধ দরজার ভেতর থেকে ওঁদের আলাপ আলোচনা শুনতে পেলাম। ভাড়াটেদের মধ্যে মিনুর মা কইয়ে-বলিয়ে মানুষ। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কানপুরে তাঁর ভাই-ভাইপোরা ভাল চাকরি করেন। অতি বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কাশীবাস করছেন মিনুর মা। মাকে নিয়ে কেদার-বদরী পর্যন্ত করে এসেছেন। শক্ত পাকানো শরীর। বার-ব্রত-উপবাস আর নিত্য ছ'ঘণ্টা জপ—তার ওপর চলতে-ফিরতে অশক্ত জননীকে শিশুর মত করে নাওয়ানো খাওয়ানো, এই সমস্ত করতে করতে তাঁর চক্ষু দুটিতে স্নিগ্ধ প্রশান্ত জ্যোতি ফুটে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, পরে লক্ষ্য করেছিলাম—তাঁর সুন্দর ইংরেজী হাতের লেখা। ইংরেজীতে নাম সই করে তিনি মনি-অর্ডার নিতেন।

তিনি সঙ্গে ছিলেন বাড়িওয়ালাদের। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ওঁরা চাপা গলায় আলাপ করতে লাগলেন।

"কি করেন সারাদিন ঘরের মধ্যে?"

"ধ্যান-জপ করেন নিশ্চয়।"

"কখনও কথাবার্তা বলেন না আপনাদের সঙ্গে?"

"আমাদের দিকে কোনও দিন একবার চেয়েও দেখেননি!"

"কেউ কখনও দেখা করতে আসে না ওঁর সঙ্গে ?"

"কাকেও দেখিনি ত কোনও দিন আসতে।"

"চিঠিপত্র কিংবা টাকা-কড়ি কখনও আসে না ওঁর নামে ?"

"আজ পর্যন্ত একখানি চিঠিও আসে নি।"

"কোনও অলৌকিক কিছু কখনও টেব পেয়েছেন আপনারা ?"

"উনি যখন মায়ের ঘরে থাকেন তখন কার সঙ্গে যেন কথাবার্তা বলেন। দরজা তো বন্ধ থাকে, কাজেই ঘরের ভিতব কি যে করেন তা দেখতে পাই না তো। শুধু বাইরে থেকে কথাবার্তার আওয়াজ পাওযা যায।"

মেযেলি গলায় ইংরেজীতে কে বললেন, "দবকার নেই আর ওঁকে ডেকে। হয়ত বিরক্ত হবেন। চল আমবা পালাই এখন।"

"একবার ডেকে দেখলে হয না ?"

মিনুর মা বললেন—"কি দরকার এখন বিবক্ত করে ? মাসকাবারে যেদিন টাকা আনতে যাবেন সেইদিনই আলাপ করবেন।"

"সেই ভাল। চল আমরা আজ পালাই এখন।"

ওঁরা চলে গেলেন।

পরদিন পূজা সেরে ঠাকুরঘর থেকে বেরুচ্ছি, একটা ঘটি হাতে করে সামনে এসে দাঁড়ালেন মিনুর মা।

"বাড়িওযালারা কাল এসেছিলেন। আজ থেকে মায়ের ভোগে একসের করে দুধেব ব্যবস্থা কবে গেছেন। আপনি যখন মায়ের ঘবে ছিলেন গয়লা তখন দুধ দিযে গেছে।"

চাকরি আরও বাড়ল। দুধ জ্বাল দাও, তারপব আবার বাসনটা মাজো ধোও। দশটাকায় আব কত হতে পারে! ভুরু কুঁচকে ঘটিটার দিকে চেযে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিনুর মা মুশকিল আসান করলেন।

"যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে দুধ জ্বাল দিয়ে পাথরের বাটিতে করে মায়ের ঘরে রেখে দোব। সন্ধ্যায় মায়ের ভোগ দেবেন।"

বেঁচে গেলাম। "তাই করবেন" বলে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম।

সন্ধ্যার পর দুধের বাটি হাতে নিয়ে মিনুর মার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

"প্রসাদ নিন।"

"না-না-না। আমরা প্রসাদ নোব কেন ? রাতে ওটুকু আপনি সেবা করবেন বাবা,"—ব্যাকুল মিনতি তাঁর গলায়।

"তবে এক কাজ করুন। যে অন্ধ বুড়িটা বাইরের দালানে পড়ে থাকে তাকে দিয়ে দিন।" বাটিটা ওঁদের দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম।

মাসকাবারে টাকা আনতে গেছি। টাকা কটা আর মদটুকু চাকরের হাতেই প্রতিবার বাড়ির থেকে আসে। এবার শঙ্করীপ্রসাদ সাহেব নিজে বেরিয়ে এলেন। সম্বর্ধনা করে নিয়ে গিয়ে বসালেন ড্রয়িংরুমের গদিমোড়া চেয়ারে। স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। আরম্ভ হল আলাপ-পরিচয়।

"আপনার কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো?"

"কষ্ট আর কি, বেশ আরামেই তো আছি।" উত্তর না দিয়ে উপায় নেই।

"দোতলার দুটো ঘর খালি আছে। ও ঘর-দুটো আর ভাড়া দোব না আমি।" বলে অপেক্ষা করতে লাগলেন কিছু শোনবার জন্যে আমার মুখ থেকে। কিন্তু আমি কি বলব—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

"ওপরের ঘরে থাকতে আপনার অসুবিধে হবে?" জিজ্ঞাসা করলেন স্বামী, স্ত্রী তার সঙ্গে যোগ করে দিলেন: "বাসন মাজা, উনুন ধরানো, ঘর-দরজা ধোয়া-মোছার জন্যে একজন লোক দেখতে আমি ভাড়াটেদের বলে এসেছি।"

"ওপরের ঘর দু'খানার চুনকাম হয়ে গেলে আপনি ওপরেই থাকবেন।"

স্ত্রী আরও একটু যুক্ত করলেন—"এ মাস থেকে আমরা দুজনে পুজো দিচ্ছি।" বলে দশটাকার দু'খানা নোট রাখলেন আমার সামনে।

তথাস্তু, আমার আপত্তি করবার কি আছে? নোট দু'খানা তুলে নিয়ে চলে এলাম। মায়ের পূজার দেরি হয়ে যাচ্ছে। এলাম ওঁদেরই গাড়িতে চেপে। মনিব-ঠাকরুণ একঝুড়ি ফল দিয়ে দিলেন সঙ্গে। রাতারাতি কপাল ফিরে গেল। একেই বলে মায়া দয়া!

ঝঞ্ঝাট বেড়েই চলল দিন দিন।

মায়ের মন্দিরের ভেতর ইলেকট্রিক আলো হল। প্রতি অমাবস্যার রাতে বিশেষ পূজা-ভোগ-হোম। শঙ্করীপ্রসাদ আর তাঁর স্ত্রীর বন্ধু-বান্ধবরা প্রসাদ পেতে লাগলেন। বাড়ির ভাড়াটেরা সবাই বিধবা কাশীবাসিনী। সকলেই ভদ্র-সংসার থেকে এসেছেন। এঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের কাজ-কর্ম সমস্ত বাঁধা-ধরা। ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে জপে বসেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে বেলা দশটা এগারটা পর্যন্ত জপ চলে। জপ থেকে উঠে কেদারঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে কেদারনাথের পূজা সেরে বাড়ি ফিরতে সেই একটা-দেড়টা। তখন উনুনে আগুন দিয়ে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ায় ঘণ্টা তিনেক সময় ব্যয় হয়। এই সময়ই সমস্ত বাড়িটা জেগে উঠে। বেলা চারটের মধ্যে ঘর দরজা ধুয়ে মুছে, বাসন কোসন

মেজে পরের দিনের জন্যে উমুন সাজিয়ে রেখে কোথাও পাঠ বা কীর্তন শুনতে যান। সন্ধ্যার সময় ফিরে আসেন দু'চার পয়সার বাজার হাট করে নিয়ে। সেই সময় আর একবার বাড়িতে সকলের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। তারপরই আস্তে আস্তে সমস্ত বাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। ওঁরা নিজের নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে আবার জপে বসেন।

এতদিন শান্তিতেই সমস্ত চলছিল—ঘড়ি-ধরা সময়ে মায়ের সেবা-পূজার ধুমধাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁদেরও কাজকর্ম বেড়ে গেল। সকলকেই এটা ওটা করে দিতে হয় প্রতিদিন। মা কালীকে নিয়ে মেতে উঠলেন সকলে। প্রাণহীন বাড়িটায় আবার প্রাণ ফিরে এল। কাঁসর ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে আবার গুরু গুরু শব্দে বেজে উঠল ঠাকুরদালানের কোণে বসানো প্রকাণ্ড তামার খোলের উপর নতুন চামড়া লাগানো মঠের বহু পুরাতন দামামাটা। গঙ্গাস্নান করে যাবার সময় শত শত স্ত্রী-পুরুষ মায়ের পায়ে ফুল-জল দিতে লাগলেন রোজ সকালে।

তবু লোকের মন থেকে ভয় ঘুচল না। সে ভয়টা আরো কালো হয়ে উঠল আমাকে ঘিরেই। কই—রক্ত তো উঠল না এর মুখ দিয়ে। সুতরাং এ লোক সহজ লোক নয়। মা কালীর ভক্ত যত না বাড়ুক, আমার ভক্ত বেড়ে চলল দিন দিন। রোজই নতুন নতুন মুখ। সকলেরই গুহ্য কথা আছে। সময় করে দেওয়া হল—বিকেল চারটে থেকে ছ'টা। তখন সকলে সাক্ষাৎ পাবে আমার। সবার মুশকিল শুনব তখন।

দু'ঘণ্টা ধৈর্য ধরে বসে শুনতে হত সকলের গুহ্য কথা। বলতে হত মাত্র একটি উত্তর। "ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।' মা যা করেন।" তাতেই কাজ হত। মায়ের ইচ্ছেটা যাতে তাঁদের অনুকূলে মোড় ফেরে তার দরুন বেশ মোটা হাতে প্রণামী দিয়ে বিদেয় নিতেন সকলে।

শঙ্করীপ্রসাদরা মহা সন্তুষ্ট। তাঁদের কালীবাড়ির উন্নতি হচ্ছে। এমন কী বাড়িভাড়া আদায় করাও ওঁরা ছেড়ে দিলেন। সে কাজটিও আমার ঘাড়ে পড়ল। ওটা আদায় হলে ব্যয় করাও আমার দায়। ওঁরা শুধু অমাবস্যা পূজার একথালা প্রসাদ পেয়েই খুশী। মাঝে মাঝে ইঙ্গিত করতেন যে, মায়ের পূজায় মদের বরাদ্দটা না বেড়ে যায়। ঐতেই একবার ঘুচে গিয়েছিল কিনা সেবা-পূজা সমস্ত। সে ভয়টা আমারও ছিল। কাজেই তর্পণ করতে বা করাতে যাঁরা এলেন তাঁরা মনঃপীড়া পেয়ে ফিরলেন।

এই রকমে যখন সব দিক দিয়ে জমজমে অবস্থা কালীবাড়ির—তখন একদিন

বিকেলবেলা মোটা একগাছি জুঁই ফুলের গোড়ে হাতে নিয়ে আমাকে দর্শন করতে এল একটি ছোকরা। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে উঠে সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। মালাটি আমার গলায় পরিয়ে দেবে।

"আরে, এ আবার কি আপদ! ফুলের মালা আমাকে কেন?"

কোনও ওজর আপত্তি শুনলে না সে। আমাকে পরাবে বলে কিনে এনেছে মালা, সুতরাং পরাবেই আমার গলায়। সামনে যে কজন বসে ছিলেন তাঁরাও ওর হয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। হৈ-চৈ গোলমাল আরম্ভ হল। বিরক্ত হয়ে বললাম, "দাও পরিয়ে।" গলা বাড়িয়ে দিলাম। মালা পরিয়ে দিয়ে আবার প্রণাম করে যখন সে উঠে বসল সামনে, তখন ভাল করে চেয়ে দেখলাম ছোকরার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

এমন অপরূপ রূপ সত্যই কোনও দিন চোখে পড়েনি। ছিপছিপে গড়নের কালোবরণ একখানি দেহ। এমনই মানানসই তার প্রত্যেকটি খুটিনাটি যে মনে হয়, কোনও ওস্তাদ কারিগর মাপজোপ করে হাতে গড়েছে। মাথার মাঝখানে সিঁথি, লম্বা চুল দু'ভাগ হয়ে গলার দু'ধার দিয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে। চুলের শেষটুকু আবার বেশ কোঁকড়ানো। কপালের সঙ্গে সমান টিকোলো নাক। মুখের দু'ধারে প্রায় কানের কাছে গিছে পৌঁচেছে টানা টানা দুই চক্ষু। কেমন যেন ভাববিহ্বল সেই চোখের চাহনি। আরও আছে অনেক কিছু সেই মুখে। ছোট্ট কপালখানিতে আর নাকের ওপর যত্ন করে তিলক আঁকা। কালো রঙ-এর ওপর সাদা তিলক। এমন খুলেছে যেন তিলক না থাকাটাই অস্বাভাবিক হত। দুই কানের পাতায় সাদা পাথর বসানো দুটি সোনার ফুল—সে দু'টি দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে। লম্বা গলায় জড়ানো তিন ফের তুলসীর মালা। একখানি সিল্কের চাদরে বিশেষ ছাঁদে জড়ানো তার দেহখানি। চাদরের নিচে আরও কিছু আছে কিনা দেখতে পেলাম না। সবকিছুর ওপর প্রথমেই নজরে পড়ে তার ঠোঁটের একফালি অদ্ভুত ধরনের হাসি। যাদের জীবনে জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু নেই—ঐ জাতের হাসি তাদের ঠোটেই লেগে থাকে।

"আপনার কাছে এলাম, মাকে একখানা পালা গান শোনাব বলে।" এমন-ভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে যেন সেই অপূর্ব চক্ষু দু'টির চাউনি আমার দেহের মধ্যে সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

তখন পরিচয় পেলাম তার। সকলেই চেনে তাকে। প্রায় একমাস এসেছে কাশীতে দলবল নিয়ে। নাম মনোহর দাস। লীলা-কীর্তন গায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে, কুচবিহারের কালীবাড়িতে, ছাতুবাবু-লাটুবাবুর ঠাকুর-বাড়িতে কয়েকখানা

পালা গান ইতিমধ্যেই গাওয়া হয়ে গেছে। তার গান শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেছে চারিদিকে। এমন গানই সে গায়, যা নাকি কাকপক্ষী 'থির' হয়ে শোনে। নিজে সেধে আমাদের কালীবাড়িতে গান শোনাতে এসেছে মনোহর দাস—এটা একেবারে আশাতীত কাণ্ড। সে সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের আয় ভাড়াটেদের মুখ থেকে মনোহর সম্বন্ধে যা শুনতে পেলাম, যে রকমের খাতির সম্মান সকলে করলে তাকে, তাতে বুঝতে বাকি রইল না যে, মনোহর অতটুকু মানুষ হলে হবে কি—তার খ্যাতি অনেক বড়।

বললাম, "আমি টাকা পয়সা দিতে পারব না বাবাজী, সে সামর্থ্য নেই আমার।" মনোহর আরও বিনীতভাবে উত্তর দিলে, "সে জন্যে অন্য স্থান আছে। আপনার কাছে আমিই তো সেধে এসেছি।"

সুতরাং আমার আর আপত্তি করবার কি আছে?

কবিরাজ মশাই স্বেচ্ছায় উনুন ভেঙে তেলের কড়াই সরিয়ে মায়ের সামনের উঠান সাফ করে দিলেন পরদিন সকাল বেলাতেই। বিকেলে মনোহরের গানের আসর। লোকজন জমতে লাগল বেলা একটা থেকে। ছোট্ট উঠানে শ'তিন-চার লোক ধরে বড় জোর। লোক এল তার চেয়ে ঢের বেশি। মেয়েদের ভিড়ই অত্যধিক।

আসরের মাঝখানে বসল পাঁচজন—একটি হারমোনিয়াম, দু'খানি খোল, একটি বেহালা আর একজোড়া করতাল নিয়ে। তাদের মাঝখানে সামান্য একটু জায়গায় দাঁড়াল মনোহর। গলায় প্রকাণ্ড জুঁই ফুলের মালা। গায়ে চাঁপা রঙ-এর সিল্কের নামাবলী। একহাতে দুলছে রুপো-বাঁধানো মস্ত বড় সাদা চামর। মনোহরের দিক থেকে তখন চোখ ফেরায় কার সাধ্য!

পালার নাম কলঙ্কভঞ্জন।

শতছিদ্র একটি কলসী। যমুনা থেকে জল আনতে হবে ঐ কলসীতে করে। মনে প্রাণে যে সতী—সে-ই পারবে এই অসাধ্য সাধন করতে।

বুকে তুলে নিলেন সেই কলসী রাধারাণী। তাঁর ভেতর-বার শ্যামকলঙ্কে কালো হয়ে গেছে। সেই কলঙ্কে কলসীর শতছিদ্র লেপে যাক। শ্যামকলঙ্ক কি কিছুতেই ভঞ্জন হবে রাই কলঙ্কিনীর? বললেন তিনি অন্তর দিয়ে অন্তরের অন্তরতমকে, "আমি শ্যামকলঙ্কে গরবিনী, দেখি কেমন করে এই ছেঁদা কলসী আমার সে গরব ভাঙে? তা যদি হয় তবে তোমার কালা মুখ তুমি দেখাবে কেমন করে ত্রিজগতে? তোমার চেয়ে আরও বড় কিছু আছে নাকি, আরও বড় লজ্জা, আরও নিবিড় কোন কালো! ঐ কালো রূপ দেখতে দেখতে আমার চোখের তারা দু'টি কালো

হয়ে গেছে। ঐ কালো রূপের আগুনে পুড়ে আমি যে আঙার হয়ে গেছি। আঙারের কালিমা কোনও কিছুতে ঘোচে নাকি কখনও? শতবার ধুলেও কয়লা কয়লাই থেকে যায়। কি করবে এই শতছিদ্র কলসী আমার?" বলে তিনি জল আনতে চলে গেলেন। যমুনার কালো জল, জল তো নয়। এও যে সেই শ্যামরূপ। শ্যামরূপে ছেঁদা কলসীর ছেঁদা গেল লেপে। জল তো নয়, এক কলসী শ্যামরূপ ভরে নিয়ে এলেন রাই। তাঁর শ্যামকলঙ্কের ভঞ্জন হল না।

মনোহর গাইছে। গাইছে নাম-মাত্রই। করছে যা তার নাম ব্যাখ্যান। হাত নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে চোখের তারা দু'টিতে কখনো আলো কখনো আঁধার ফুটিয়ে তুলে নিজের মনের মত করে বোঝাচ্ছে ভাব শ্রোতাদের। তার কণ্ঠ দিয়ে যেন মধু ঝরে পড়ছে। কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে, কখনও বা অভিমানে ফুলে ফুলে উঠছে। সহস্র-জোড়া চক্ষু তার ওপর স্থির হয়ে আছে, একটি চোখের পাতাও পড়ছে না। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সবাই। আমিও।

মনোহরের কথা বিন্দুবিসর্গও কানে যাচ্ছে না। শুধু চেয়ে আছি তার চক্ষু দু'টির দিকে। সর্বনেশে চোখ দু'টিই এতগুলো মেয়ে-পুরুষের বাহ্যজ্ঞান লোপ করে ফেলেছে।

সন্ধ্যার পর শেষ হল সেদিনের পালা। চাল-ডাল, ঘি-মসলা, আনাজ-তরকারি দিয়ে সাজানো বড় বড় কয়েকটা সিধা পড়ল। টাকা পয়সাও মন্দ পড়ল না।

বিদায়ের সময় তাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। মনোহর জানিয়ে গেল কালকের পালা রাইরাজা।

আরও একদিন আরও এক পালা—এই করে করে পর পর সাতদিন গান হয়ে গেল। নেশা ধরে গেছে সকলেরই। বেলা একটা না বাজতেই লোক জমতে শুরু করে। আগে এসে সামনের জায়গা দখল করবার জন্যে সকলেই সচেষ্ট। বড়লোকের বাড়ির ঝি এসে মনিব ঠাকরুনের জন্যে কার্পেটের আসন পেতে পাহারা দেয়। গান আরম্ভ হবার একটু আগে আসেন স্বয়ং গিন্নী ঠাকরুন। পিছনে চাকরের মাথায় মস্ত এক ডালা। তাতে চাল ডাল আনাজ ঘি মসলা ক্ষীর সন্দেশ ফুলের মালা। রুপার পানের কৌটা আর সিধের ডালা সামনে নিয়ে গিয়ে গিন্নী-মা তিন জনের জায়গা জুড়ে কার্পেটের আসনে বসেন। গানের শেষে নিজে সিধা তুলে দিয়ে যাবেন মনোহরের হাতে। তারপর আরও আছে, পরদিন দুপুরে তাঁর কাছে সেবা করে আসবার সনির্বন্ধ অনুরোধ। কিন্তু মনোহর একজন মাত্র—আর তার পেটও একটাই। রোজ দশজনের কাছে সেবা গ্রহণ করেই বা কি করে সে? সুতরাং তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়ানো নিয়ে রেষারেষির অন্ত ছিল না।

মা কালীর সামনে প্রণামী পড়ার বহরও বেড়ে গেল। বেশ চলছিল কদিন। সকালের দিকটা একটু চুপচাপ, তারপর দুপুর থেকেই উৎসব আরম্ভ। লোক সমাগম, হৈ চৈ কলহ কোলাহল। বিকেলে গান আরম্ভ হলে আর এক রূপ। খোল কত্তাল হারমোনিয়াম বেহালা বেজে উঠলে চারিদিক একেবারে নিস্পন্দ নিস্তব্ধ। তখন মনোহরের মধুকণ্ঠ থেকে অপরূপ রূপে জন্মগ্রহণ করে খণ্ডিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বিপ্রলব্ধার দল। মান-অভিমান হাসি-অশ্রু বিরহ-মিলনের এক মায়া-জগৎ সৃষ্টি করে মনোহরের কণ্ঠ, যারা শোনে তারা নিজেদের হারিয়ে ফেলে সেই কল্পনার সুরলোকের মাঝে।

সেদিন পালা হচ্ছে কলহান্তরিতা।

নতমুখে দাঁড়িয়ে শ্যামসুন্দর। চন্দ্রাবলীর কাছে রাত কাটিয়ে এসেছেন। তার চিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে। গালে সিন্দুরের দাগ, অঙ্গে নখের আঁচড়, মোহন চূড়াটি খসে পড়েছে বুকের উপর। আরও কত কি!

ছি ছি ছি, লজ্জা করে না তোমার সারা রাত কাটিয়ে এসে মুখ দেখাতে? কি দশা হয়েছে তোমার রূপের! কে করেছে অমন দশা তোমার? আমরা হলে লজ্জায় মরে যেতাম। না, তুমি ফিরে যাও। তোমার ও-মুখ আমি আর দেখতে চাই না।

গঞ্জনা দিচ্ছেন রাধারাণী। তখন করুণ-ভাবে মিনতি করলেন, ক্ষমা চাইলেন শ্যামরায়। মান ভাঙ্গাবার শতচেষ্টা করে নতমুখে ফিরেই গেলেন শ্রীমতীর হৃদয়-বল্লভ। সঙ্গে সঙ্গে রাগ পড়ে গেল। দুর্জয় মান কোথায় গেল কে জানে, তার বদলে যা আরম্ভ হল তার নামই কলহান্তরিতা।

কেন ফিরিয়ে দিলাম তাকে—হায়, কোন্ প্রাণে ফিরিয়ে দিলাম। আরম্ভ হল অন্তর্দাহ। সেই অন্তর্দাহের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছে মনোহর নিজেই। তার দুই চোখ দিয়ে, গলা দিয়ে, সর্বাঙ্গ দিয়ে বিচ্ছেদের জ্বালা বেদনার মধুরস হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। এত জোড়া চোখের মধ্যে এক জোড়া চোখও শুষ্ক রইল না। আসরের চতুর্দিক থেকে আরম্ভ হল ফোঁস ফোঁস শব্দ আর নাকঝাড়ার আওয়াজ।

মা কালীর দরজায় বসে গান শুনছি। মিনুর মা এসে ডাকলেন।

"একবার উঠে ভেতরে আসুন বাবা। একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

মিনুর মা ভয়ানক হিসেবী মানুষ। গুরুতর কিছু না হলে আমায় উঠে আসতে বলবেন না। কি হতে পারে? কে আবার এল এ-সময় দেখা করতে?

উঠে গেলাম বাড়ির মধ্যে।

"কই, কে ডাকছে আমায়?"

মিনুর মা দেখিয়ে দিলেন, "এই এরা।"

এরা বলতে অন্ততঃ দু'জনকে বোঝায় কিন্তু দেখতে পেলাম মাত্র একজন। এক ছোট্ট বউ। মুখের অর্ধেক ঘোমটা ঢাকা। গলায় আঁচল দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বউটি প্রণাম করলে। এতটুকু বউ মানুষ—কি চায় আমার কাছে? নিজে থেকে কিছু বলবে, এই আশায় চেয়ে রইলাম। হঠাৎ কানে এল—কান্না চাপবার শব্দ। ঘোমটার মধ্যে বউটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বেশ ঘাবড়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কোনও কথা আসছে না আমার। মিনুর মার দিকে চাইলাম। তিনিই পরিচয় দিলেন—"মনোহর দাস বাবাজীর বউ। আপনি না বাঁচালে মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

আকাশ থেকে পড়লাম। মনোহরের আবার বউ আছে একটি। তার মানে এর মধ্যেই মনোহর বিয়ে-থা করে ফেলেছে। মনোহর পুরোপুরি সংসারী মানুষ এ কথা যে কল্পনা করাও সহজ নয়। মান-অভিমান বিরহ-মিলন ইত্যাদি কাণ্ড-কারখানাগুলোর জন্যে যে আলাদা এক জগৎ আছে, মনোহর হচ্ছে সেখানকার মানুষ। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, স্ত্রী-পুত্র, ক্ষুধা, অভাব-অনটন কামড়াকামড়ি এ সমস্ত হচ্ছে এই মাটির জগতের ব্যাপার। মনোহর এই মাটির জগতের মানুষ নয়—তবু সাত-তাড়াতাড়ি একটি বিয়েও করে ফেলেছে। কিন্তু যতই আশ্চর্য মনে হোক, এই বউটি তো আর মিথ্যে হতে পারে না। মনোহরের বিয়ে-করা বউ চাক্ষুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছে। কোন জাতের রস যে এর কান্না থেকে ঝরে পড়ছে, তার সঠিক ব্যাখ্যা মনোহরই করতে পারে সব চেয়ে ভাল করে!

আপাততঃ তা না জানলেও আমার চলবে। এখন কি থেকে বাঁচাতে পারলে মেয়েটির সর্বনাশ হবে না, এইটুকু জানতে পারলেই যথেষ্ট!

মিনুর মা বউটিকে সাহস দিলেন, "বলো না মা—সব কথা খুলে বলো বাবার কাছে। কোনও ভয় নেই তোমার। ওঁর দয়া হলে এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

অতএব শুনতে হল মনোহরের বউ-এর মুখ থেকে তার দুঃখের কাহিনী। আস্তে আস্তে তার কান্না কমে এল, একটু একটু করে ঘোমটাও উঠল কপাল পর্যন্ত। বসে বসে হাঁ করে শুনলাম মনোহরের ব্যক্তিগত জীবনের পদাবলী কীর্তন। সেও বড় সহজ ব্যাপার নয়, আগাগোড়া সহজিয়া-পরকীয়ার ছড়াছড়ি তাতে। ওস্তাদ

পদকর্তার হাতে পড়লে সমস্ত মাল মসলা নিয়েই এমন মুখরোচক জিনিস তৈরী হত, যা শুনে পাষাণও গলে জল হয়ে যেত।

সবকিছু বলা হয়ে গেলে পর মনোহরের বউ এই বলে শেষ করলে যে, সে এবার গলায় দড়ি দেবে। কারণ গলায় দড়ি দেওয়া ভিন্ন তার আর কোনও উপায় নেই।

হয়ত তা নেইও। নিজের স্বামী, আর মনোহরের মত অমন স্বামী যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য গলায় দড়ি দেওয়া কিনা, তা আমি জানব কেমন করে! এসব ব্যাপারের যথাবিহিত আইন-কানুন আমার জানা নেই। জানবার কথাও নয়। কিন্তু আমাকে এখন করতে হবে কি?

কথাটি অবশেষে খুলে বললেন মিনুর মা। বশীকরণ করে দিতে হবে। মনোহর যাতে বউটির হাতের মুঠোয় ঢুকে পড়ে, সেই রকমের শক্ত জাতের বশীকরণ করে দেওয়া চাই। এমন একটি তান্ত্রিক ক্রিয়া করতে হবে, যাব ফলে মনোহর বাবাজী এই বউ ভিন্ন আর কোনও দিকে কস্মিনকালে চোখ তুলেও চাইবে না। ব্যাস্, তাহলেই নিশ্চিন্ত।

একদম হতভম্ব! বশীকরণ করা কাকে বলে, তার হাডহদ্দ কিছু ধাবণা নেই। কিন্তু সে কথা শোনে কে? এই কালী পূজা ক'বেও যার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে না, সে কি সোজা মানুষ নাকি? মিনুব মার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। ইচ্ছে করলে সব পারি। সুতবাং এই একটিবার দয়া করতেই হবে নয়ত বউটিব গতি হবে কি?

মিনুর মা কোনও কথা শুনবেন না। বউটিও তাই পা জডিযে ধবতে এল। ওধারে গান শেষ হয়ে আসছে। মায়ের আবতির সময় হ'ল। এখন এদের হাত ছাড়াতে পারলে বাঁচি।

বললাম, "মা যা করেন। সবই ইচ্ছাময়ীব ইচ্ছা। আজ তুমি যাও মা। দেখি কতদূর কি করতে পারি।"

এতেই মিনুর মা একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, "এই তো কথা পেয়ে গেলে। এইবার তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও মা। আমার বাবা তেমন বাবা নয়। কথা যখন পেয়েছো আর ভাবনা কি তোমার। তোমার দুঃখের দিন এবার ঘুচল বলে।"

দিন চার-পাঁচ কাটল। ভাবছি মনোহর বাবাজীকে একদিন বেশ করে বুঝিয়ে বলে দেব—নিজের ধর্মপত্নীকে অবহেলা করাটা কতবড অন্যায়। রস নিয়ে তার কারবার। নব রসের নিগূঢ় অর্থ আর তার অলিগলি সব সে নিজে অত ভাল

করে বোঝে কিন্তু তার নিজের ঘরে কোন্ রসের ভিয়ান চড়ছে, সে কি তার কোনও খবরই রাখে না! শেষে যে রস জ্বাল হতে হতে বিপদ ঘটে যাবে। বউটি গলায় দড়ি-ফড়ি যদি দেয়, তখন কতদূর কেলেঙ্কারি হবে, সে যেন একটু ভেবে দেখে।

মনোহরের গান তখনও চলছে। হয়ত আরও কিছুদিন চলতও। হঠাৎ একদিন এক অভাবনায় কাণ্ড ঘটে গেল। সেদিন কি পালা হচ্ছিল মনে নেই। মনোহর রূপ বর্ণনা করছে একেবারে জীবন্ত ভাষায়। কুচ-যুগল হচ্ছে এই রকমের, নিতম্ব হচ্ছে ঐ রকমের আরঅমুকটা হচ্ছে ঠিক অমুক জিনিসের মত দেখতে। যাঁরা শুনছেন তাঁদেরও কান-মন গরম হয়ে উঠেছে। এমন সময় দারুণ হৈ চৈ লেগে গেল। কোথা থেকে একপাটি চটি এসে পড়ল মনোহরের গায়ে। গান ভেঙে গেল। কাকেও ধরা গেল না।

এতবড় দুঃসাহস কার হ'ল, কালীবাড়ির মধ্যে জুতো ছোঁড়বার? ধরতে পারলে তৎক্ষণাৎ তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত মনোহরের ভক্তরা। ধরা গেল না লোকটাকে—এজন্যে আপসোসের অন্ত রইল না কারও। চোখা চোখা গালাগাল ঘোররবে বর্ষণ হতে লাগল সেই অদৃশ্য শত্রুকে তাক করে। তবু কি সহজে কারও গায়ের ঝাল কমে! কিন্তু একেবারে কাটা গেল আমার মাথাটা। কারণ, আমাদের কালীবাড়িতে গান গাইতে এসেই সকলের প্রাণতুল্য মনোহর বাবাজীর এ হেন লাঞ্ছনা। এ নিশ্চয়ই সেই পুরনো পচা তান্ত্রিক বৈষ্ণবের ঝগড়া। তন্ত্রের জীবন্ত পীঠস্থান, যেখানে নরবলি পর্যন্ত হয়ে গেছে একদিন, সেখানে দিনের পর দিন এই হা-হুতাশ অভিসার অভিমান আর সহ্য করতে না পেরে মঠেরই ভক্ত কোন ব্যাটা তান্ত্রিক এই দুষ্কর্ম করে গা ঢাকা দিয়েছে। নয়ত আর কি কারণ থাকতে পারে মনোহরের মত সকলের নয়ন-দুলালের এ হেন অপমান করবার। সুতরাং সেই অদৃশ্য তান্ত্রিক ব্যাটার অপকর্মের জন্য মাথা হেঁট করে করজোড়ে সবার কাছে ক্ষমা চাইলাম আমি।

আর পরদিন সকালে মনিব-বাড়ি থেকে একখানি পত্র এল। শঙ্করীপ্রসাদরা তাঁদের ঠাকুরবাড়িতে কোনও রকমের ইতরামো বরদাস্ত করতে রাজী নন। চিঠির শেষে আমাকে এই বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, আমি সাধক মানুষ, কি এমন দরকার আমার কালীবাড়িতে গান-বাজনা করবার। এ-ও লেখা আছে শেষে যে, আমার মত লোকের পক্ষে ঐ সমস্ত ফচ্‌কে কীর্তনীয়াদের কীর্তিকলাপ বোঝার সাধ্য নেই।

চিঠিখানা পড়ে বেশ গরম হওয়াই হয়ত উচিত ছিল আমার, কিন্তু তা আর

হয়ে উঠল না। শরীরের হাড় মজ্জা তখন চাকরির রসে বেশ জারিয়ে উঠেছে। বরং বেঁচে গেলাম রোজ রোজ হৈ-হট্টগোল থামল বলে। সকলকে মালিকের চিঠিখানা দেখিয়ে কীর্তন বন্ধ করে দিলাম।

কীর্তন বন্ধ হ'ল বটে কিন্তু অত সহজে তার জের মিটল না। ছাই-চাপা আগুনের মত ধিকি ধিকি জলতেই লাগল। বরং বলা উচিত কীর্তনের আদি রস তখনই গাঢ় হয়ে জমে উঠল।

মনোহর কোথাও গান-গাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে। যেখান থেকেই ডাক আসুক, যত টাকার বায়নাই হোক না কেন, সে আর কাশীতে গান গাইবে না। একান্ত মনমরা হয়ে আমার কাছে বা মা কালীর দরজায় মা'র দিকে চেয়ে বসে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে লাগল। দলের লোকদের টাকাকড়ি গাড়িভাড়া সব চুকিয়ে বিদেয় করে দিলে। খোল কত্তাল হারমোনিয়াম বেহালা সব চলে গেল। কাজেই গান আর হয়ই বা কি করে।

ছোকরার অবস্থা দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে গেল। ওর চক্ষু দুটির আলো যেন নিভে গেছে। মুখ একেবারে অন্ধকার। কি বললে যে ওর মুখে একটু হাসি ফোটে, সেই চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

মায়ের পূজা দিতে এল একদিন মনোহরের ছোট্ট বউটি। মা কালীকে সোনার নথ দেবে সে। মা তার কামনা পূর্ণ করেছেন ষোল আনা। স্বামী একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। আমার দয়াতেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। যাকে বলে হাতে হাতে ফল। মিনুর মা চুপি চুপি সকলকে বললেন যে, মানুষ চেনবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। তিনিই টের পেয়েছিলেন যে, কতবড় তন্ত্রমন্ত্র জানা সাধক পুরুষ আমি। সবাই এবার চোখ মেলে চেয়ে দেখুন, কি ভাবে বশীভূত করে দিয়েছি আমি মনোহরকে তার বউ-এর কাছে। ইচ্ছে করলে চোখের পলকে দিনকে রাত আর রাতকে দিনে পরিণত করা যে আমার পক্ষে কিছুই নয়—এ-কথা যত্র-তত্র বলে বেড়াতে লাগলেন মিনুর মা আর কালীবাড়ির অন্য সব ভাড়াটেরা। এর ফলও হাতে হাতে পেলাম।

আমার মনিব-ঠাকরুন একদিন বিকেল বেলা তাঁর এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন কালী দর্শন করতে। বান্ধবীটির বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। আঁট-সাট দোহারা গড়ন। মাজা-ঘষা রঙ, একরকম ফর্সাই বলা চলে। গোলগাল মুখ, মুখে পান-জর্দা। মাথার চুল যত্ন ক'রে সাজানো। বুকের দিকটায় অনেক নিচু পর্যন্ত কাটা পাতলা সাদা কাপড়ের জামা আর খুব ভালো কালোপাড় একখানি তাঁদের ধুতি তাঁর পরনে। গলায় আধ ইঞ্চি চওড়া সোনার বিছা হার, দু'হাতের

আঙ্গুলে গোটা তিনেক মূল্যবান পাথর বসানো আংটি। সিঁথিতে সিন্দুর নেই। দেখে চিনতে কষ্ট হয় না ইনি কোন বড ঘরের বিধবা কাশীবাসনী।

কালী দর্শনাদি সমাপন করে ওঁরা এসে আসন গ্রহণ করলেন আমার সামনে। শঙ্করীপ্রসাদের গৃহিণী সম্ভ্রমের সঙ্গে নিচু গলায় পরিচয় দিলেন তাঁর সঙ্গিনীর। নাম করা ঘরের বউই বটে। কাশীতে খান চারেক আর কলকাতায় খান-পাঁচ-ছয় বাড়ি আছে এঁর। কলকাতার পাশে কোথায় একটা বিরাট বাগান-বাড়িও আছে। প্রায় দশ বছর বিধবা হয়েছেন। সদ্গুরু খুঁজছেন। শাস্ত্রপাঠ আর কীর্তনাদি শুনে, সাধু-বৈষ্ণবের সেবা করে কাশীতে দিন কাটান। এঁর সংকল্প একদিন আমায় হাত দেখাবেন।

এই সেরেছে। হাত-দেখা মানে কবিরাজের নাড়ী টেপা নয়। এ হাত-দেখার অর্থ হচ্ছে হাতের চেটোর ওপর নজর রেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বাতলানো। হে মা কালী! রক্ষা করো মা এবার আমাকে। আমার চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ এ বিদ্যা জানতেন কিনা তার আমি জানি না। আমি নিজে যে একজন কতবড় হাত দেখিয়ে সেটুকু অন্ততঃ আমি ভাল করে জানি। রাত পোহালে কাল আমার ভাগ্যে কি ঘটবে, মাত্র এইটুকু জানবার বাসনায় বহুবার নিজের দু'হাতের চেটো দুই চোখের সামনে মেলে ধরেছি। ফল সেই একই—বড় বড় কড়াগুলো গড়গড় ক'রে মনে করিয়ে দিয়েছে বিগত জীবনের দুঃখময় কাহিনীগুলি। আর তা দেখে অনাগত ভবিষ্যৎটুকু সম্বন্ধে আশা করবার মত কোনও কিছুই খুঁজে পাইনি। কিন্তু এখন উপায় কি? এঁর হাত নাকের ডগায় মেলে না ধরেও স্পষ্ট এইটুকু মাত্র বুঝতে পারছি যে, ঐ নরম হাত দু'খানি দিয়ে এঁকে জীবনে কুটোটি ভেঙে দুটো করতে হয়নি। এর অতিরিক্ত যে একবর্ণও বলার সাধ্য নেই আমার।

কিন্তু অত সহজে ভোলবার পাত্রী ওঁরা নন। বেশী কাতর্তি করতে ভয়ও হ'ল। মনিব-পত্নীকে চটানো কাজের কথা নয়। মুখ বুজে রইলাম। পরদিন সকাল সাতটায় পূজোয় বসবার আগে আসবেন হাত দেখাতে, এই বলে মোটা হাতে প্রণামী দিয়ে ওঁরা বিদায় হলেন। তখনকার মত বাঁচলাম।

সন্ধ্যার পর আরতি সেরে মন্দিরের দরজা বন্ধ করছি, মনোহর একান্ত করুণ মুখে নিবেদন করলে যে তার বক্তব্যটুকু দয়া করে শুনতেই হবে আমাকে। আর যা সে বলতে চায়, তা শোনাবার জন্যে আমাকে সে একটু একলা পেতে চায়।

তাই হ'ল, মন্দির বন্ধ ক'রে দোতলায় আমার ঘরে এনে তাকে বসালাম। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে হ'ল। কেউ কোথাও থেকে কান পেতে শুনছে না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে মনোহর তখন উন্মোচন করলে তার হৃদয়-দুয়ার। আর

আমি নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললাম সেখানকার আলো-আঁধারের মাঝে। রহস্য-রোমাঞ্চ-উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা-হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ—এই সব নিয়ে মনোহরের সে গুহ্য জগৎ। শুনতে শুনতে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম।

ভাগ্য পরীক্ষা করতে দলবল নিয়ে কাশীতে এসে ওরা প্রথমে ওঠে বাঙ্গালী-টোলার এক তিনতলা বাড়ির একতলার দু'খানা ঘুপসি ঘরে। সাত টাকা ভাড়ায় ঘর দু'খানা মিলে যায়। ঘরের মেঝেয় শতরঞ্চি বিছানা পাতলে ভিজে উঠত। ওরই একখানায় থাকত দলের পাঁচজন আর একখানায় মনোহর আর তার বউ। এতদিন সেখানে বাস করতে হলে নির্ঘাত সবাই মরতে বসত। মনোহরের বউ তো কিছুতেই বাঁচত না। দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই গলা ফুলে তার জ্বর এসেছিল।

থাকবার জায়গার তো ঐ অবস্থা। এধারে হাতের সামান্য পুঁজি ফুরিয়ে আসছে। দলের পাঁচজন লোকের খাই-খরচা চালাতে হচ্ছে। অনেক জায়গায় ঢুঁ দিলে মনোহর। একটা দশ টাকার বায়নাও কোথাও জুটল না। শেষে মরিয়া হয়ে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ভিখারীর মত দশাশ্বমেধ ঘাটে বসতে হ'ল একদিন। নিজেদের বিছানায় জড়ানো শতরঞ্চি খুলে নিয়ে গিয়ে তাই পেতে গানের আসর বসাল ঘাটের সিঁড়ির ওপর বিনা নিমন্ত্রণে বিনা বায়নায়। দেখতে দেখতে লোক জমতে লাগল। লোকে লোকারণ্য। সন্ধ্যার পর পালা শেষ হলে শতরঞ্চির ওপর পাতা চাদরখানা ঝেড়ে-ঝুড়ে যা পাওয়া গেল তা বাড়িতে নিয়ে এসে গুণে দেখে সবাইয়ের চক্ষু স্থির। নগদ তেইশ টাকা দশ আনা, দুটো সোনার আংটি, আর একটা সোনার কানের দুল। পরদিন থেকে সিধে পড়া শুরু হ'ল। চাল ডাল, আনাজ-তরকারি, ফল-মিষ্টি, ঘি-মসলায় ঘর বোঝাই। কত রাঁধবে বউ—কত খাবে সকলে! দশাশ্বমেধ ঘাটে দিন-পাঁচেক গান হয়। তখন পাওয়া যায় প্রথম বায়না—প্রতি পালা ত্রিশ টাকা।

মাসখানেকের মধ্যে বউ-এর হাতের আট গাছা নিরেট চুড়ি গড়াতে দিলে মনোহর। দলের সকলে বাড়িতে এক মাসের মাহিনা মনি-অর্ডার করলে। প্রত্যেকের দু' জোড়া করে ধুতি আর জামা-জুতো কেনা হয়ে গেল। রান্নাবান্না বাসন-কোসন মাজা-ধোয়ার জন্যে দু'জন লোক রাখতে হ'ল। এধারে বউ বিছানা নিলে। তখন আরম্ভ হ'ল একটা ভাল বাসা খোঁজা।

বাড়ি পাওয়া গেল। প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ি। কাশীর ঘিঞ্জি বসতি এড়িয়ে সেই দুর্গা বাড়ির ওধারে। কিন্তু বিনা ভাড়ায়। সে বাড়ি ভাড়া দেবার বাড়ি নয়। আর তার ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য মনোহরের ছিলও না। তার গান শুনে

মুগ্ধ হয়ে সেই রাজপ্রাসাদে তাদের থাকতে দেওয়া হ'ল যতদিন খুশি ততদিনের জন্যে। এই রকমের বাড়ি মিলবে—এ আশা করা একেবারে আকাশ-কুসুম। সে বাড়ির সাজসজ্জা আসবাব-পত্র জন্মেও তারা চোখে দেখেনি। চাকর বামুন দারোয়ান মালী সব মিলে চৌদ্দজন লেগে গেল তাদের সেবা-যত্ন করতে। একেবারে যাকে বলে রাজসুখ।

যে ভদ্রলোক সেধে আলাপ করে তাদের নিয়ে গিয়ে তুললেন সেই বাড়িতে—তিনি মালদহ জেলার কোন্ এক জমিদারের পদস্থ কর্মচারী। তাঁর মুখ থেকে মনোহর শুনলে যে, বাড়ির মালিক স্বকর্ণে তার গান শুনেছেন কুচবিহারের কালীবাড়িতে। শুনে এতদূর সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, হয়ত মনোহরকে দলবল সমেত তাঁর নিজের দেশ সেই মালদহে নিয়ে যাবেন। সেখানে তাঁর বিরাট ঠাকুরবাড়ি। শ্যামরায়ের সেবা। বার মাসে তের পার্বণ। সেই ঠাকুরবাড়িতে থাকবার স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। নিত্য শ্যামরায়কে গান শোনাতে হবে।

বাগান-বাড়িতে গিয়ে মনোহরের বউ সেরে উঠল। তখন শহরময় সর্বত্র ডাক মনোহরের। একদিনও কামাই নেই গানের। টাকা পয়সা জিনিসপত্র যা আমদানী হচ্ছে তা গোনেই বা কে, দেখেই বা কে! কিন্তু এত সুখ কপালে সইবে কেন। অন্যদিকে অবস্থা জটিল হয়ে উঠল দিন দিন।

ডাক এল বাগানবাড়ির মালিকের কাছ থেকে ওদের স্বামী-স্ত্রীর! এক-গা গয়না পরে ফিরল মনোহরের বউ। মনোহরকেও অন্দর মহল পর্যন্ত যেতে হ'ল। পর্দার আড়ালে বসে মনোহরের খাওয়ার তত্ত্বাবধান করলেন মালিক নিজে। সেই-দিনই মনোহর প্রথম জানতে পারল যে, মালিক পুরুষ নন। তিনি বিধবা এবং নিঃসন্তান। তারপর যেদিন চাক্ষুষ পরিচয় হবার সৌভাগ্য হ'ল ওঁর সঙ্গে, সেদিন মনোহর দেখলে যে বয়সও তাঁর বেশী নয়—চল্লিশের মধ্যেই। শেষে রোজ মনোহরকে দুপুরবেলা যেতে হ'ত সেই রানীর কাছে। ওখানকার কর্মচারী চাকর বামুন সবাই তাঁকে রানী-মা বলে ডাকে। সেখানে আহারাদি করে বেলা তিনটে-চারটে পর্যন্ত রানীকে নিরালায় কৃষ্ণতত্ত্ব শোনানো ছিল তার কাজ। কিন্তু এতটা সহ্য হ'ল না মনোহরের বউ-এর এক গা সোনার গয়না পরেও। গোলমাল শুরু করে দিলে।

এ সব তো গেল ঘরোয়া ব্যাপার। বাইরেও ঝড় বইতে লাগল। কাশীতে ঐ একজন ভক্তিমতী রানী আর বাকি সবাই পাপীয়সী মেথরানী এই বা কেমন কথা! গানের শেষে কোথাও না কোথাও তাকে একটু জলযোগ করে আসতেই হ'ত। সেখানে খেতে বসে সন্দেশ ভাঙলে বেরুত সোনার আংটি, ক্ষীরের বাটির

মধ্যে সোনার হার। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যেত মনোহরের। জল খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে বাইরে আরম্ভ হ'ল নিদারুণ অশান্তি। কানা-ঘুষোয় আকাশ-বাতাস ভরে গেল। কবে কোথায় কোন্ বাড়ি থেকে অনেক রাতে তাকে বেরুতে দেখা গেছে, কে কোথায় কোন্ বাড়িতে তাকে অসময়ে ঢুকতে দেখেছে, এইসব আলোচনা আর গা টেপাটেপি একরকম প্রকাশ্যেই চলতে লাগল তার গানের আসরের মধ্যে—সামনের সারিতে। আসতে লাগল বেনামী চিঠি। ঐ বিশেষ বাড়িটিতে জলযোগ করা যদি না সে ত্যাগ করে, তাহলে তার প্রাণ যাবে—এই ধরনের মধুর সম্ভাষণ থাকত সেইসব চিঠিতে।

এধারে মাথা খুঁড়ে, গলায় দড়ি দিতে গিয়ে মহা অনর্থ বাধালে বউ। শেষ পর্যন্ত বাগানবাড়ি ছাড়তে হ'ল। একটা বাসা ভাড়া করে উঠে গেল সেখানে সবাই। কিন্তু রানী একেবারে বেঁকে বসলেন। মনোহর আর তাঁর সঙ্গে দেখাই ক'রতে পারলে না।

বাইরে জলযোগ করা ছেড়ে দিলে মনোহর। কিন্তু তাতে কি রেহাই আছে? যাঁরা জলযোগ না করিয়ে ছাড়বেন না, তাঁরা তার বাসায় হানা দিতে শুরু করলেন। গানের আসরের মধ্যে বচসা কেলেঙ্কারি শুরু হ'ল তাঁদের মধ্যে। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে আমার শরণাপন্ন হ'ল মনোহর। তার ধারণা ছিল, কালীবাড়িকে লোকে যে রকম ভয়-ভক্তি করে তাতে এখানে সব গোলমাল হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অদৃষ্ট এমনি খারাপ যে, চরম কাণ্ডটা এখানেই ঘটে গেল।

এই পর্যন্ত বলতে বলতে দুঃখে ক্ষোভে মনোহরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। মাথা হেঁট করে বসে রইল সে। আর এতক্ষণে একটু একটু আলোর রশ্মি দেখতে পেলাম আমি। তাহলে চটি জুতোখানা কোনও উৎকট তান্ত্রিকের পায়ের নয়। ওখানাকে দক্ষিণা হিসাবেও ধরা যায়—বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মনোহরকে নিরিবিলি জল খাওয়ানোরই জের ওখানা। অথচ খামকা আমি জোড় হাতে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে ম'লাম। একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে চাইলে মনোহর। অনেকদিন পরে আবার তার চোখে আলো দেখতে পেলাম। প্রথম দিন আমার গলায় মালা পরাতে এসে যে জাতের চাউনি চেয়েছিল সে আমার দিকে, এ হচ্ছে সেই জাতের চাউনি। বড় বিষম জিনিস। শরীর-মনের ভিতরে কেমন যেন সুড়সুড়ি দিতে থাকে। এটি হচ্ছে তার মোক্ষম অস্ত্র। সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করে মনোহর তখন আসল কথাটা পাড়লে।

আমাকে একটি বশীকরণ করে দিতে হবে!

মনোহরের উপর বেঁকে-বসা সেই মালদহের রানীর মনটা যাতে একটু ফেরে

ওর দিকে—তাই করে দিতে হবে আমাকে। তা'হলেই ওরা কাশী ছেড়ে মালদহ চলে যেতে পারে। সেখানে শ্যামরায়কে নিত্য গান শোনাবার চাকরিটি পেলে বেঁচে যায়। নয়ত এখানে না খেয়ে মরতে হবে যে!

সে-ই এক কথা। আর একটি বশীকরণ। সোজা বশীকরণ নয়—এবার রাজরানী বশীকরণ। কিন্তু যাকে কোনও দিন চোখে দেখিনি, এমন কি যার নাম পর্যন্ত জানি না—তাকে দূর থেকে বশীকরণ করব কেমন করে?

কি একটু চিন্তা করে শেষে মনোহর নামটি বলে গেল।

নামটি হচ্ছে কল্যাণী রায়।

রাতে স্বপ্ন দেখলাম সেই রানীকে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গল মনোহরের রানীর স্বপ্ন দেখতে দেখতে। ছটার সময় উপস্থিত হলেন আমার মনিব ঠাকরুনের সেই বান্ধবীটি। স্নান সেরে এসেছেন। গরদের ধুতি আর গরদের জামা পরা। এক হাতে ছোট একটি রূপার কমণ্ডলু। এক রাশ ভিজে চুল বাঁ-কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এনে বুকের ওপর ফেলা রয়েছে। চুলের রাশি নিচের দিকে পৌঁছেছে কোমর পর্যন্ত। চুলের ডগায় একটি গিট বাঁধা। একটিমাত্র মাথায় এত চুল থাকতে পারে, এ না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

বুক ঢিপঢিপ শুরু হ'ল আমার। এ কি বিষম পরীক্ষায় ফেলে দিলি মা শেষকালে। চাকরিটুকু যাবেই দেখছি। দাঁতে দাঁত চেপে বসলাম তাঁর সামনে পরীক্ষা দিতে। কি একটা বেশ মিষ্টি গন্ধ ঢুকতে লাগল আমার নাকে। বোধ হয় ও গন্ধ তার ভিজে চুল থেকেই আসছিল। তিনি বাঁ হাতখানি মেলে ধরলেন আমার সামনে। হাতখানি আর ছুঁলাম না। মিনিট তিন-চার একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম হাতের দিকে। তারপর মুখ তুলে বললাম—"এখন হাত আপনি তুলে নিতে পারেন। বলুন তো এবার কি জানতে চান। মনে রাখবেন, একদিনে মাত্র তিনটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারি আমি।······সবই মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।"

বলে চোখ বুজে বসে রইলাম তাঁর প্রশ্ন করার অপেক্ষায়, বেশ কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। বোধ হয় একটু বিপাকেই পড়ে গেলেন তিনি। মাত্র তিনটি প্রশ্ন—তার মধ্যেই তাঁর যা জানার সব জেনে নিতে হবে। এই রকমের বাঁধাবাধির মধ্যে পড়বেন এ নিশ্চয়ই তিনি ভেবে-চিন্তে আসেননি। কিন্তু সবই যখন মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা তখন আর উপায় কি? অবশেষে তাঁর প্রথম প্রশ্ন কানে এল।

"আমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে কিনা?"

সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরের সঙ্গে উত্তর দিলাম—"না।"

আবার নিঃশব্দে কাটল কিছুক্ষণ। চোখ বুজেই বসে আছি তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নটি শোনার জন্যে। অতি নিচু স্বরে বেশ কম্পিত-কণ্ঠে শোনা গেল আবার "কেন ?"

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, "বাধা আছে।"

নিঃশ্বাস বন্ধ করে কথা বললে যেমন শোনায়, তেমনিভাবে তাঁর তৃতীয়-প্রশ্ন শুনতে পেলাম।

"কি সেই বাধা।"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই উত্তর দিলাম, "শত্রু।" উত্তর দিয়ে চোখ মেললাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। মুখখানি একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ তিনি নতমুখে বসে রইলেন। আর তো প্রশ্ন করার উপায় নেই। তিনটি প্রশ্নই খতম। শেষে একটি নিঃশ্বাস চেপে বললেন, "আরও কত কথাই জানবার ছিল। কিন্তু আর তো কোনও উত্তর আজ পাওয়া যাবে না।"

বললাম, "আপনার আরও প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলে যেতে পারেন। রাত্রে আসনে বসে মার কাছ থেকে জেনে নেবার চেষ্টা করব। দেখি যদি বেটির দয়া হয়।"

তবুও সেইভাবে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "সে শত্রু যে কে, তাও আমি জানি। কিন্তু কি করে তাকে ভুলে গিয়ে"—বলতে বলতে হঠাৎ থামলেন। কে যেন তাঁর গলা চেপে ধরল। চকিতে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন তিনি। একটি ঢোক গিলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন—"মানে কি করে সেই শত্রুকে জব্দ করা যায় ?"

বললাম, "যদি সে শত্রুর নাম আপনার জানা থাকে, তবে তা বলে যান আমার কাছে দেখি কি করতে পারি।"

বেশ কিছুক্ষণ আবার কি চিন্তা করলেন তিনি। শেষে একান্ত মিনতির সুরে বললেন—"আমার বিশ্বাস আপনার কাছ থেকে আর কেউ এ নাম জানতে পারবে না। নাম—নামটি হচ্ছে কল্যাণী রায়।"

সাপের গায়ে পা পড়লে মানুষ যেভাবে চমকে ওঠে, সেইভাবে চমকে উঠলাম আমি। কিন্তু তা ভেতরে ভেতরে। রাতে আসনে বসে যা জানতে পারব তা তিনি কাল সকালে এলে শুনতে পাবেন, এই কথা বলে তাঁকে বিদায় দিলাম।

সকালের পূজা শেষ হল। কাঁসর-ঘণ্টা থামতে না থামতেই পিছন থেকে কানে এল, "মা—মা গো, মুখ তুলে চাও মা। হতচ্ছাড়ী আবাগীরা যেন দু'টি

চক্ষের মাথা খায়। যেন ভাতে হাত দিতে গুয়ে হাত দেয়। তাদের ভরা কোল খালি করে দাও মা—নির্মূল করে খালি করে দাও। যে মুখ নেড়ে আমার গায়ে নোংরা ছিটোচ্ছে, সে মুখ দিয়ে যেন রক্ত ওঠে। তুমি যদি সত্যি মা হও—তাহলে যেন তেরাত্তির না পেরোয় মা, তেরাত্তির যেন না কাটে! যেন সব উঁচু বুক ভেঙে নেপটে যায়।" টিপটিপ করে শব্দ হতে লাগল দরজার চৌকাঠের ওপর।

এ আবার কোন্ মেয়েমানুষ-দুর্বাসা রে বাবা! সভয়ে পেছন ফিরে দেখলাম এক দশাসই বুড়ি হাঁটু গেড়ে বসে হেঁট হয়ে মাথা খুঁড়ছে।

আরতি শেষের প্রণামটা করতেও ভুলে গেলাম। তিনি তাঁর বপুখানি খাড়া করে উঠে বসলেন। তারপর তাঁর ভাঁটার মত দুই ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি আমার ওপর ফেলে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটি বাড়িয়ে বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যা গা, তুমিই আমাদের শঙ্করীর পুরুত—নয় বাছা? তোমার সঙ্গেই দুটো কাজের কথা আছে।" বলে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত মুখব্যাদান করলেন। অর্থাৎ ওঁদের শঙ্করীর পুরুতকে একটু আপ্যায়িত করবার জন্যে হাসলেন।

ভয়ে দুর্ভাবনায় একেবারে কুঁকড়ি-মুকড়ি মেরে গেলাম। কিন্তু পালাবারও তো পথ নেই। দরজা জুড়ে তিনি অধিষ্ঠান করছেন। কোনক্রমে শুধু গলা দিয়ে বেরুল, "বলুন।"

"এখানে কি বলা যায় বাছা সে-সব কথা। কোন্ হারামজাদী কোথা থেকে শুনে ফেলবে। পরের হাঁড়ির খবর গিলবে বলে সব হাঁ করে রয়েছে যে আবাগীরা। তোমাব কাজ হয়ে থাকে তো চলো না তোমার ঘরে। সেখানেই সব কথা বলব।"

অগত্যা তাই করতে হ'ল। হুকুম তামিল না করে উপায় নেই। এ লোক সব করতে পারে। তাঁর কথা শোনাবার জন্যে আমার টুঁটিটা টিপে ধরে বিড়াল বাচ্চার মত ঝুলিয়ে নিয়ে কোনও নির্জন স্থানে যদি রওয়ানা হন, তাহলেই বা কি করতে পারি আমি? তার চেয়ে ভালয় ভালয় ওঁর বক্তব্যটুকু শোনা ঢের নিরাপদ।

বললাম, "চলুন।"

চললেন তিনি আগে আগে। বোঝা গেল এ বাড়ির অন্ধি-সন্ধি সবই তাঁর জানা। কোন্ তলায় থাকি আমি, এইটুকু মাত্র জেনে নিয়ে এগিয়ে চললেন সিঁড়ির দিকে।

পেছন থেকে ইশারা করলেন মিনুর মা থামাবার জন্যে। ওঁর অলক্ষ্যে কাছে এসে বললেন, "ওমা, এ যে গাঙ্গুলী গিন্নী গো—এ মাগী আবার জুটল কোথা

থেকে ? কোথায় যাচ্ছেন ওর সঙ্গে ?" আঙুল দিয়ে ওপরটা দেখিয়ে তার পেছনে পেছনে উঠে এলাম দোতলায়।

আমার ঘরের দরজা খুলে দিতে তিনিই আগে প্রবেশ করলেন। ঢুকেই ধপ করে মেঝের ওপর বসে পড়লেন। আবার হুকুম হ'ল, "দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস বাছা।"

তাই করে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। তিনি বসবার হুকুম দিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁর হুকুম মানলাম না। উল্টে তাঁকেই হুকুম করলাম দৃঢ়কণ্ঠে— "বলুন, আপনার কি বলবার আছে ? মনে থাকে যেন—পাঁচ মিনিটের বেশী আমি কারও সঙ্গে আলাপ করি না। আপনাকেও পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।"

বলেই চোখ বুজে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর সামনে।

আমার কথা শুনে তাঁর মুখের অবস্থা কি দাঁড়ালো দেখতে পেলাম না। তবে তাঁর গলার আওয়াজ বদলালো। এতক্ষণ চলছিল হুকুম করার গলা, এবার তা থেকে নরম স্বর বার হ'ল। শুধু তাই নয়, বেশ বুঝলাম হঠাৎ মুখের ওপর চড় খেতে তিনি অভ্যস্ত নন। চিরকাল লোকের ওপর আধিপত্য করা যাঁর স্বভাব, তাঁর সেই হামবড়া ভাবটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলে পায়ের নিচে মাটি থাকে না আর। তখন তিনি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। আসল দুর্বল মানুষটি তখন বেরিয়ে পড়ে খোলস ছেড়ে।

তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে আরম্ভ করলেন, "আমি—মানে আমার পরিচয়টা আগে দিই। আমি হলুম এই—" তখনই থামালাম তাঁকে, "আপনি গাঙ্গুলী গিন্নী। কথা বাড়াবেন না। দরকারী কথাটুকু বলুন আগে।" চোখ বুজেই আছি আমি। যেন চোখ বুজে সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখছি। এবার আরও নরম হলেন তিনি, "তাই তো বলছি বাবা। তুমি তো সাক্ষাৎ অন্তর্যামী, সবই তো বুঝতে পারছ তুমি। সবই আমার অদৃষ্ট, সবই আমার এই পোড়া—"

আবার থামালাম তাঁকে, "থাক্, কপালের দোষ দেবেন না আমার সামনে। সবই সেই মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। এখন বলুন কি চান আপনি ?"

ফাঁপরে পড়ে গেলেন। একটিও বাজে কথা বলা চলবে না, এ অবস্থায় পড়তে হবে বুঝলে হয়ত তিনি আসতেনই না আমার কাছে। একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি।

"মেয়েটার মাথাটা যাতে ভাল হয়, তাই করে দাও বাবা। তাই তোমার কাছে এসে পড়েছি।"

"সে মেয়ে আপনার কে ?"

"ভাইঝি। আমার একমাত্র ভায়ের ঐ একটি মাত্র মেয়ে। অগাধ ঐশ্বর্য আমার ভায়ের। ঐ মেয়েই এখন মালিক। হতভাগীর ভাল ঘরে বিয়েও দিয়েছিলাম বাবা, কিন্তু কপাল পুড়ল এক বছর না পেরোতেই। সেখান থেকেও অগাধ সম্পত্তি তার হাতে এল। এখন এখানেই আমার কাছে আছে।"

"মাথা খারাপ হয়েছে জানলেন কি করে?"

"মাথা খারাপ নয় তো কি বাবা! লজ্জা-শরমের মাথা একেবারে খেয়েছে। যা খুশি তাই করছে। লোকে কি বলছে না বলছে সেদিকে মোটে খেয়াল নেই। কোথাকার কে এক হাডহাবাতে কেত্তনওলাকে নিয়ে মেতে উঠেছে। তাকেই নাওয়ানো, তাকেই খাওয়ানো, তাকেই ঘুম পাড়ানো। আবার বলে কিনা—এই আমার সেই শ্যাম, সেই কালোরূপ, সেই চোখ, সেই সব। অত আদিখ্যেতা আর বেলেল্লাপনা লোকের গায়ে সইবে কেন বাবা। পাঁচজনে পাঁচ-কথা বলাবলি করবে না তো কি? এই তো আমি—এই যে বিধবা হয়ে আজ পঞ্চাশ বছর কাশীবাস করছি—কই বলুক তো দেখি কোন ব্যাটাখাগীর বেটি কি বলতে পারে আমার নামে, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব না তার? কিন্তু ঐ মেয়ের দরুন আমার মাথা কাটা গেল বাবা, লোকে আমার মুখে এবার ময়লা তুলে দিচ্ছে।"

এতখানি একসঙ্গে বলে তিনি হাপাতে লাগলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলাম, "আপনার সেই ভাইঝি কি মালদার কোনও জমিদার-বাড়ির বউ যাঁকে তাঁর কর্মচারীরা রানীমা বলে ডাকে?"

জ্বলে উঠলেন গাঙ্গুলী গিন্নী দপ্‌ করে—"ঝাড়ু মারি সেই রানীর মুখে! সেই ঢলানীর জন্যেই তো আমার অমন সোনার 'পিতিমের' এমন মতিচ্ছন্ন আজ। সেই ছোঁড়া কেত্তুনে প্রথমে সেই রানী-মাগীর কাছেই তো গিয়ে জুটেছিল। সে হচ্ছে আমার মেয়ের ননদ। তার সেখান থেকেই তো ঐ ভূত ভর করছে আমার মেয়ের ঘাড়ে। একটা কিছু তোমায় করে দিতে হবেই বাবা—যাতে মেয়েটা আমার কথা শোনে। আমি যে আর মুখ দেখাতে পারি না লোকসমাজে, আমার যে আর—"

আবার থামাতে হ'ল তাঁকে। আর এবার দুই চোখ খুলে সোজা তাঁর চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার ভাইঝির নাম হচ্ছে কল্যাণী রায়। কেমন —সত্যি কিনা?"

ভদ্রমহিলার নীচেকার পুরু ঠোঁট একেবারে ঝুলে পড়ল। এতবড় অন্তর্যামী সত্যই তিনি জন্মে কখনও চোখে দেখেননি। তাঁকেও বিদায় করলাম। কথা দিতে হল যে, এমন ভাবেই বশীকরণ করে দেব যে ভাইঝি একেবারে তাঁর কথায়

'উঠবে আর বসবে!

খেতে বসলাম। খেতে খেতে ভাবছি, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করব।

"কি, খাচ্ছেন নাকি? এত বেলায় খাওয়া-দাওয়া করলে শরীর টিঁকবে কেন?"

ঘরে ঢুকলেন আমার মনিব খোদ ডক্টর শঙ্করীপ্রসাদ শর্মা। এমন সময় তিনি উপস্থিত হবেন, একথা ভাবাও যায় না। খান-তিনেক মোটা মোটা বই তাঁর বগলে। বই ক'খানা আমার বিছানার ওপর ফেলে কোট-প্যাণ্টসুদ্ধ মেঝের ওপর বসে পড়লেন তিনি।

"আহা-হা, হাত তুলবেন না, হাত তুলবেন না। আপনার খাওয়াটা নষ্ট হলে সত্যি আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। কোথাও শান্তি-ফান্তি নেই মশায়। ভাল লাগে না আর। ক্লাস না করেই চলে এলাম। অনর্থক ভূতের ব্যাগার খাটা। আপনারাই শান্তিতে আছেন। মাকে নিয়ে আছেন। মা আনন্দময়ী —আনন্দে আছেন আপনারা মার দয়ায়। ভাবছি এবার সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এই পথই ধরব।"

তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। টাঙ্গায় করে এসেছেন এই দুপুর রোদে। নিজের গাড়িও আনেননি। কে একজন এসে দরজার বাইরে থেকে জানালে যে, টাঙ্গাওয়ালা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে। শঙ্করীপ্রসাদ কোট প্যাণ্টের সব কটা পকেট হাতড়াতে লাগলেন। মুখ আরও লাল হয়ে উঠল তাঁর। কাছে টাকা-পয়সা কিছু নেই। থাকার কথাও নয়। তাঁর বাঙলো থেকে কলেজে যেতে গাড়ি লাগে না। হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে ক্লাসে পড়াতে পড়াতে পড়ানো বন্ধ করে টাঙ্গায় চড়ে এখানে চলে এসেছেন। কাছে যে কিছু নেই, এটুকুও খেয়াল হয়নি।

খাওয়া আমার শেষ হয়েছিল। উঠে পড়ে একটা টাকা পাঠালাম নিচে ভাড়া দিতে। মিনুর মাকে এক গেলাস লেবু-চিনির সরবৎ করতে বলে এসে বসলাম তাঁর কাছে।

"দেখুন দেখি, একটা পয়সাও সঙ্গে নেই। এমন নিঃসম্বল হয়ে কাকেও ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন কখনও? একেই বলে ষোল আনা সন্ন্যাসী, কি বলেন?" বলে হা-হা করে হাসতে লাগলেন ডক্টর সাহেব।

বললাম, "তাহলে আরও একটু সন্ন্যাসী হোন! এই দুপুর রোদে আর ও-গুলো

পরে থাকবেন না। ছেড়ে ফেলুন আমার এই কাপড়খানা পরে। দেখবেন, শান্তি পাবেন।"

কাপড়খানা নিয়ে তিনি বললেন, "শেষ পর্যন্ত রক্তবস্ত্রই তো পরতে হবে একদিন। দিন, আজ থেকেই অভ্যাসটা হোক। সত্যই এগুলো অসহ্য লাগছে।"

পাশের ঘরে কাপড় পালটাতে গেলেন তিনি। তারপর নিচে গিয়ে মুখে মাথায় জল দিয়ে আবার যখন এসে বসলেন তখন তাঁকে দেখে একেবারে থ হয়ে গেলাম। ধপধপে ফর্সা রঙ মোটা-সোটা মানুষটি, গলায় এক গোছা শুভ্র পৈতা, তার ওপর লাল টকটকে রক্তবস্ত্র। মানুষটি যেন একদম বদলে গেছেন।

"কি দেখছেন অমন করে? একেবারে কাপালিক হয়ে গেছি তো! আরে মশাই—শরীরে রয়েছে যে কাপালিকের রক্ত। এ ভিন্ন আমায় মানবে কেন বলুন?"

বললাম, "বাস্তবিকই মানিয়েছে আপনাকে। শ্রীমতী শর্মা একবার দেখলে—"

যেন জ্বলে উঠলেন তিনি, "কি করতেন? কি করতেন আপনার মনে হয়? জানেন না ঐ সমস্ত আলোক-প্রাপ্তাদের! শখ করেও একদিন এই বেশ পরেছি দেখলে তিনি শক্‌ড হবেন। মানে আঁতকে উঠে ভিরমি যাবেন। যেতে দিন, যেতে দিন ওঁদের কথা।"

সরবৎ এল। এক নিঃশ্বাসে গেলাসটা শেষ করে মেঝের ওপরেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি কড়িকাঠের দিকে চেয়ে।

বললাম, "এখন চোখ বুজে ঘুমোন একটু—এই নিন বালিশটা।"

তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে বসলেন তিনি।

"আরে, ঘুমোব কি মশায়? ঘুমোতে এলাম নাকি এখানে! আপনার সঙ্গে অনেক কিছু আলোচনা করবার আছে যে। কোথায় গেল বইগুলো?"

বইগুলো নামিয়ে এনে খুলে বসলেন।

তখন আরম্ভ হ'ল আসন আর মুদ্রা। তা থেকে তত্ত্ব আর আচার। আত্ম-তত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব শেষ করে যখন বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার পযন্ত আসা গেল তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম বিলেত-ফেরত ডক্টর সাহেবের পড়াশুনার বহর দেখে। সমস্ত পড়েছেন—সবই জানেন। কেবল মাত্র তর্ক করবার জন্যে বা একটিকে উঁচু অন্যটিকে নিচু প্রতিপন্ন করার বাসনা নিয়ে শাস্ত্রগুলো পড়েননি। তত্ত্ব আর আচার কোন্‌টি কোন্ অবস্থায় কোন্ কাজে লাগে, তা তলিয়ে বোঝবার তাগিদে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব পড়েছেন। কিন্তু আর তো পারা যায় না। অন্ততঃ এবার একটু চা হলে হ'ত। বললাম—"এবার চা

করি—এ তো আর সহজে শেষ হচ্ছে না। এখনও দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাচার, বামাচার রয়েছে। তারপরও থাকবে অঘোরাচার, যোগাচার, কৌলাচার। সেই কৌলাচারে না পৌঁছে তো আর থামছেন না আজ। এধারে চায়ের সময় যে বয়ে যায়। চায়ের সময় চা না খেলে সেটা কোন্ আচারেব মধ্যে পডে তা জানেন আপনি ?”

বই বন্ধ করে আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। দুই চোখের ওপর একখানা হাত চাপা দিযে বললেন, “স্রেফ ভ্রষ্টাচার—চা-ই হোক—আর যা—” বলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

চা দিলাম। ফলও দিলাম। আগে চায়ের বাটিটা টেনে নিয়ে চুমুক দিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। তারপর বেশ নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা, ঐ সমস্ত বিশ্বাস করেন আপনি ?”

“কি সমস্ত ?”

“ঐ যে আপনাদের মারন উচাটন বিদ্বেষণ স্তম্ভন এই সব বিদ্‌ঘুটে ব্যাপারগুলো ?”

“আমার বিশ্বাসে কি যায় আসে ? লোকে তো করে !”

“লোকে বোঝে ছাই ! এই কাশীতেই কত ব্যাটা ঐসব ধাপ্পা দিয়ে করে খাচ্ছে।…কিন্তু আপনার কথা আলাদা। লোকে আপনাকে ভয়ানক ভয় করে। আপনি নাকি হাতে হাতে মোক্ষম বশীকরণ করে দিতে পারেন। অরুণার বিশ্বাস, আপনি মরা বাঁচাতে পারেন, তাই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—এসব কি সত্যি ?”

বললাম, “লোকে তো আরও কত কথাই বলে। মিনুর মা আর আপনার অন্য সব ভাডাটেরাও এমনি কথাও তো বলে বেডাচ্ছেন যে, আসনে বসে ধ্যান করতে করতে আমি এক-দেড হাত শূন্যে উঠে যাই। একথা কি আপনি বিশ্বাস করবেন ?”

শঙ্করীপ্রসাদ ঠক্ করে বাটিটা নামিয়ে রেখে হাল ছেড়ে দিলেন।

“নাঃ, একটা লোককেও আপনার করে পেলাম না এ জীবনে। জন্মের পরই মা দিলেন দূর করে। মানুষ হলাম পরের কাছে। দুনিয়া পর রয়ে গেল চিরদিন। কারও কাছে যে মনটা একটু হাল্কা করব—এমন কাকেও আজ পর্যন্ত পেলাম না। ভেবে এলাম, আপনি সংসার-ত্যাগী সাধক মানুষ, আপনি বুঝবেন আমার দুঃখ। তা আপনি শুদ্ধ ভ্যাঙচাতে লাগলেন।”

বেশ কয়েক মিনিট কাটল নিঃশব্দে। নিঃশব্দেই তিনি কমলার কোয়া চিবুতে লাগলেন। তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একখানা পর্দা উঠে গেল আমার

চোখের সামনে থেকে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, বাড়ি-গাড়ি, উচ্চ বিলাতী ডিগ্রী, প্রচুর বেতন, সুসজ্জিত বাঙলো, বিদুষী ভার্যা এ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও এই লোকটির কিছু নেই, কেউ নেই। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল সঙ্গ-বিবর্জিত একক একটি বয়োবৃদ্ধ শিশু ইনি—সব কিছু পেয়েও একটি অভাব আজও পূরণ হয়নি এঁর। জীবনে কোনও দিন জননীর বুকের তলার তপ্ত স্থানটুকু পাননি বলেই একখানি বুকের কাছে একান্ত নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে এর প্রাণ আঁকু-পাঁকু করছে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অপরের হাতে সঁপে দিয়ে, সেই পরকে আপন করে পাবার তৃষ্ণায়, এঁর ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

বললাম, "ভ্যাঙ্‌চাতে যাব কেন আপনাকে? নিজের দিকটাই শুধু দেখছেন। আমার কথাটা একবার ভাবুন তো। কে আছে আমার ত্রিজগতে? আপনার দুঃখ-সুখের ভাগ নেবার জন্যে তবুও তো রয়েছেন একজন। তিনি হয়ত—"

দাবড়ি দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিলেন সাহেব।

"থামুন থামুন! ঢের হয়েছে! কি জানেন আপনি? কতটুকু জানেন তাঁর সম্বন্ধে? খাট, আলমারি, টেবিল, চেয়ার এই সব চারপেয়ে আসবাব কতকগুলোয় তো ঘর ভর্তি রয়েছে আমার। উনিও তেমনি একটি দু'পেয়ে আসবাব ভিন্ন আর কিছু নন।"

অতএব থামলাম। বলবারই বা আমার আছে কি? নিজের কথাই বলতে এসেছেন উনি। শুনতে আসেননি কিছু। কাজেই চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমার মনিব আবার মুখ খুললেন। তখন বেরুলো তাঁর মুখ দিয়ে তাঁরই ঘরের আর মনের কথা। সেদিনই প্রথম জানতে পারলাম যে শ্রীমতী শর্মা বলে যাকে জানি, তিনি আমারই মত সাহেবের কাছ থেকে মাইনে নেন মাসে মাসে। তবে তাঁর পদটি বড, পদবীটিও বড, মাইনেও অনেক বেশী পান আমার চেয়ে। তা ভিন্ন তাঁর চাকরিও অনেক দিনের। দশ বছরেরও বেশী তিনি চাকরি করছেন। সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে তাঁর সঙ্গে বার-দুই সারা দুনিয়া ঘুরে এসেছেন। মাসে মাসে টাকা জমছে তাঁর। জমে জমে সেই টাকার অঙ্ক বোধ হয় দশ বারো হাজারেরও ওপর উঠেছে। যেদিন খুশি যেদিকে খুশি তিনি চলে যেতে পারেন—তাঁর জমানো টাকা নিয়ে। গিয়ে বিয়ে-থা করে সংসারী হবেন। কোনও অজুহাতেই তখন তাঁকে বাধা দেবার উপায় নেই।

মনিব সায়েব দু'হাত নেড়ে বললেন—"তা ভিন্ন ওঁর যে কি জাত আর ওঁর বাপ-মায়ের পরিচয়ই বা কি—তা তিনি নিজেই জানেন না। আমার মত খৃষ্টান

মিশনারিদের কাছে তিনি মানুষ হয়েছেন। আমার মা-বাপের পরিচয়টুকু ছিল—ওঁর তাও নেই। ফাদার উইলসন যখন ওঁকে আমার কাছে দেন, তখন বলেছিলেন—'শর্মা, এই মেয়েটির মা হ'ল ধরিত্রী আর বাপ স্বয়ং পরমপিতা ঈশ্বর। এর বেশী কোনও পরিচয় আমার জানা নেই। মনে রেখো, এমনভাবে একে আমি গড়ে তুলেছি যে, এ মেয়ে ধরিত্রীর মত সবই সহ্য করবে—শুধু এর আত্মার অপমান ছাড়া। তোমার কাছে একে দিচ্ছি, কারণ তোমাকে আমি মানুষ করেছি। এ বিশ্বাস আমার আছে যে, তুমি এর আত্মার অবমাননা করবে না।' সেই থেকে এই এতগুলো বছর উনি কাটালেন আমার সঙ্গে। সর্বদাই আমি তটস্থ, পাছে ওঁর আত্মার গায়ে চোট লাগে। এই সব আত্মা-টাত্মা মশাই আমি বুঝিও না, আর ও আপদ বোধ হয় আমার নেইও। থাকলেও কবে শুকিয়ে একেবারে রসকষ-শূন্য ছিবড়ে হয়ে গেছে।"

শঙ্করীপ্রসাদ বলতে লাগলেন, "অমন একগুঁয়ে জেদী লোক দুনিয়ায় দু'টি আছে কিনা সন্দেহ। একবার টায়ফয়েড হয় আমার। এক মাস পরে পথ্য করে, চাকর-বাকরদের কাছে জানতে পারলাম যে, মেমসাহেব এক মাস সকালে বিকালে দু' কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খাননি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টাও আমার মাথার কাছ থেকে ওঠেননি। তার ফলও ভোগ করতে হ'ল তাঁকে। আমি সেরে উঠলাম, তিনি বিছানা নিলেন। তার জের চলল সমানে ছ'মাস। কোথায় মুসৌরী, কোথায় ওয়ালটেয়ার করে করে তবে খাড়া করি তাঁকে।"

এতক্ষণ পরে সাহেব বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বলেও ফেললেন বেশ গর্বের সঙ্গে—"টাকা দিলেই কি ভাল লোক পাওয়া যায় মশায়? ভাল লোক পাওয়া ভাগ্যের কথা। টাকা দিচ্ছি বা খাওয়াচ্ছি-পরাচ্ছি, সেটা কিছু বড় কথা নয়। স্ত্রী থাকলে তাঁর নামেও টাকা জমত। আজ এঁর হাতে মাস গেলে একখানা চেক দিচ্ছি, বিয়ে করলে বউকে তো আমার লাইফ ইনসিওরগুলোর নমিনি করতাম। ও একই কথা। এখন এঁর নামে টাকা জমছে তখন তাঁর নামে জমত। কিন্তু এত বিশ্বাসী লোক কোন-কিছুর বদলেই মিলবে না। আমার ভাল-মন্দ সুনাম-দুর্নাম সব কিছু ঢেকেঢুকে সামলে-সুমলে চলেছেন উনি এই দশ বছর। কারও স্ত্রী বোধ হয় এতটা করেন না।"

ডক্টর সাহেব দু-একটা ছোট-খাটো কাহিনী বলে বোঝালেন আমায় যে, খাস-বিলেতেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সেখানে খুব বিশ্বাসী সেক্রেটারী কেউ কেউ নিজের জান-প্রাণ বিপন্ন করেও মনিবের জান-প্রাণ রক্ষা করে।

তবুও—তবুও একটা জায়গায় থেকে যাচ্ছে একটা মস্ত বড় হাঁ—মানে ছিদ্র।

সেই ছিদ্র দিয়ে তাঁর বুকের মধ্যে ঢুকছে তীব্র হিমেল হাওয়া। ঢুকে ছুঁচ ফোটাচ্ছে তাঁর হাড়ে-পাঁজরায়। মিশনারি হোমের মেয়ের আর যে ক্ষমতাই থাক, সেই ফাঁকটুকু জুড়ে দেবার সামর্থ্য নেই। সে না-হয় বড় জোর তাঁর জন্যে জীবনটাই দিতে পারে।

শঙ্করীপ্রসাদ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তাই তো ছুটে এলাম আপনার কাছে। সব কথা তো আর সবাইকে বলা যায় না।"

"কিন্তু বলছেন কই আপনার নিজের কথা? এতক্ষণ তো বাজে কথাতেই কাটল।"

আরও একটু কাছে সরে এলেন তিনি। সামনের দিকে ঝুঁকে একরকম ফিস্‌ফিসিয়ে আরম্ভ করলেন—"তাই তো বলছি—ঐসব বশীকরণ সম্মোহন ব্যাপার-গুলো সম্বন্ধেই তো জানতে চাচ্ছি। এসব কি সত্যিই সম্ভব?"

সাবধান হলাম। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে এবার সাপ বেরুচ্ছে। বললাম, "সম্ভব কিনা পরীক্ষা করেই দেখুন। হাতে হাতে ফল পেলেই বুঝবেন। এখনই গিয়ে শ্রীমতী অরুণাকে ধরে নিয়ে এসে আপনার সামনে বসিয়ে এমন বশীকরণ করে দেব যে তখন—"

সাহেব মারমুখো হয়ে উঠলেন, "আবার আরম্ভ হ'ল তো ভ্যাঙচানো?"

চমকে উঠলাম। সত্যিই আমার গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে। সেক্রেটারী অরুণার কথা বলতে আসেননি উনি এত কষ্ট করে দুপুর রোদে। এটুকু আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এ হচ্ছে আর একজনের কথা। আঠারো বছর বয়সে দেরাদুন থেকে কাশীতে ফিরে এসে যাঁর কাছে শঙ্করীপ্রসাদ আশ্রয় পান, যিনি তাঁকে নিজের ছেলের মত দেখতেন, যিনি তাঁকে বিলেত পাঠান উপযুক্ত হয়ে আসবার জন্যে, যিনি আশা করেছিলেন যে, বিলেত থেকে ফিরে এসে শঙ্করীপ্রসাদ তাঁর ছেলের স্থানটুকু পূরণ করবেন, এ হচ্ছে সেই এলাহাবাদের বিখ্যাত আইনজীবী মিস্টার চৌধুরীর কথা। না, শুধু তাঁর কথা নয়—সঙ্গে তাঁর একমাত্র কন্যার কথাও জড়ানো রয়েছে।

মিস্টার চৌধুরী ছিলেন, শঙ্করীপ্রসাদের দাদামশায়ের শিষ্য। আপনার বলতে এ জগতে ডক্টর শর্মার কেউ ছিল না যখন, তখন চৌধুরী সাহেব তাঁকে বুক দিয়ে আগলে রাখেন। তিনিই আশা দেন যে, মামলা করে মঠ আর কালী উদ্ধার করা যাবে। শৈব-বিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ, শৈব-বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানই যে সম্পত্তির আইন-সম্মত মালিক, এ-কথা তিনিই প্রথম বলেন।

বছর দুই এলাহাবাদে তাঁর কাছে ছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। তারপর চলে গেলেন বিলেতে। তাঁর মায়ের দেওয়া প্রচুর টাকা ছিল তাঁর নামে। মিস্টার চৌধুরী বিশ বছরের শঙ্করীপ্রসাদকে বিলেতে পাঠালেন উপযুক্ত হয়ে ফিরে আসবার জন্যে। তাঁর একমাত্র কন্যার উপযুক্ত স্বামী হয়ে আসতে হবে বিলেত থেকে।

বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়ছে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশ বছরের ছেলে। ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে বাপ আর পাশে তাঁর মেয়ে। ছেলেটি ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, শক্ত করে চেপে ধরেছে দু'হাতে জাহাজের রেলিং, দু'চোখের সবটুকু শক্তি দিয়ে চেয়ে আছে বাপ আর মেয়ের দিকে। চোখের পলক পড়ছে না, বোধ হয় নিঃশ্বাসও পড়ছে না। জাহাজ পিছু হটে সরে যাচ্ছে।

ছাপ পড়ে গেল। বুকের মধ্যে একটি ছবি ফুটে উঠল ছেলেটির। একটি মেয়ের ছবি, মেয়েটি এক হাতে তার দামী শাড়ির আঁচল মোচড়াচ্ছে, আর এক হাতে বাপের একখানা হাত আঁকড়ে ধরে আছে, নাকের ডগা লাল হয়ে উঠেছে তার, চোখের পলক পড়ছে না, দম বন্ধ করে চেয়ে আছে মেয়েটি জাহাজের ওপর দাঁড়ানো ছেলেটির দিকে। শঙ্করীপ্রসাদের বুকের নিভৃততম প্রকোষ্ঠে সেই ছবি আজও অম্লান, আজও সজীব, আজও জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

সাগর-পারের দেশে চার-চারটে বছরের সব কটা দিন আর রাতগুলো শঙ্করী-প্রসাদ কাটিয়েছেন নিজেকে সর্বরকমের আমোদ-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত রেখে। রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছেন পুঁথি পড়ে, দিনের পর দিন লাইব্রেরীগুলোর মধ্যে বইয়ের পোকার মত ঘুরে ঘুরে। তাঁকে যে উপযুক্ত হতেই হবে, দেশে ফিরে একজনের বরমাল্য পাবার জন্যে।

সবই হ'ল। ঠিক সময় দেশে ফিরলেন শঙ্করীপ্রসাদ। কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। মিস্টার চৌধুরী মারা গেছেন। তাঁর এক দজ্জাল বোন ছিল কাশীতে। তিনি মেয়েকে নিয়ে এসে এক জমিদারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। পিসীর সঙ্গে দেখা হতে তিনি দশ কথা মুখের ওপর শুনিয়ে দিলেন। শঙ্করী-প্রসাদের জাত-জন্মেরই ঠিক-ঠিকানা নেই, কোন্ সাহসে সে আসে তার ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করতে?

এই পর্যন্ত বলে একটু চুপ করে, শেষে এই ক'টি কথা উচ্চারণ করলেন আমার মনিব, "সেই থেকে আজ পর্যন্ত একবার তাকে চোখের দেখাও দেখতে পাইনি।" কথা ক'টি যেন তাঁর বুক খালি করে বেরিয়ে এল।

ইতিমধ্যে আমি চোখ বুজে ফেলেছি। সেই অবস্থাতেই বললাম, "এখন বলুন তো সেই মেয়ের নাম কল্যাণী কিনা?"

খপ করে আমার দু'হাত চেপে ধরলেন ডক্টর। থরথর করে তাঁর হাত কাঁপছে। মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরুলো না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে।

আবার যখন কথা ফুটল তাঁর মুখে, তখন বললেন বাকিটুকু নিজেই। কল্যাণী এখন কাশীতেই রয়েছে। বিধবা হয়েছে বিয়ের এক বছরের মধ্যেই। তাঁর সেক্রেটারী অরুণাকে তিনি লাগিয়েছিলেন, কোনও ফল হয়নি। কে এক মালদহের রানী হচ্ছে কল্যাণীর ননদ। তিনিও বিধবা! তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে অরুণার! সেই রানীর কাছ থেকে শুনে এসেছে অরুণা যে, কল্যাণীর ঘাড়ে মীরাবাঈয়ের ভূত ভর করেছে। এখন সে 'হা মেরে নন্দদুলাল' করছে। দিনরাত ঠাকুর নিয়েই আছে। সেই কালো পাথরের পুতুলকে নাওয়ানো-খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, আর গান শোনানো এই নিয়েই আছে সব সময়। দুনিয়ার কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত করে না।

"আরে আসুন আসুন। আপনার কথাই হচ্ছিল। বাঁচবেন বহুদিন আপনি।"

ঘরের মধ্যে এক পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সাহেবের সেক্রেটারী তাঁর মনিবের দিকে চেয়ে।

বললাম, "কি দেখছেন অমন করে?"

"বাঃ, একেবারে চেনাই যায় না! বেশ মানিয়েছে কিন্তু।"

"কৈ, আপনি তো শক্ড্ হয়ে ভিরমি গেলেন না?"

"ভিরমি যাব কোন্ দুঃখে? বরং ইচ্ছে করছে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করি ওঁর দু'পায়ে।"

হেঁকে উঠলেন সাহেব, "তাহলে আমিই ভিরমি যাব যে। সবাই মিলে ও-রকম করে আমায় ক্ষেপালে—"

"ক্ষেপাতে আর বাকি আছে কতটুকু? আমাকে একটা খবর না দিয়েই পালিয়ে এলে যে বড?"

ভাবলাম, এবার উঠল বুঝি ঝড। না, ঠিক তার উল্টোটি হ'ল। সাহেব তাড়াতাড়ি ছুটলেন পাশের ঘরে রক্তবস্ত্র পাল্টে আসতে। বলতে বলতে গেলেন —"আরে না না, পালিয়ে আসব কেন? এমনই মনটা ভাল লাগল না, তাই— বুঝলে কিনা, তুমি হয়ত তখন ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই তোমাকে বিরক্ত না করেই—"

বললাম, "বসুন।"

অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। আধ মিনিট মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি আন্দাজ করলেন। বোধ হয় সারা দুপুর তাঁর মনিবের সঙ্গে কি আলাপ হয়েছে তার কিছুটা ঠাওরালেন মনে মনে। শেষে এক ফালি ম্লান হাসি হেসে বললেন, "দেখলেন তো ব্যাপারটা! কলেজ থেকে লোক এলো ডাকতে। আকাশ থেকে পড়লাম। সে কি! কলেজে নেই? তবে গেলেন কোথায়? কি দুর্ভাবনায় যে পড়ে গেলাম। তারপর ছুটে এলাম আপনার কাছে।"

"কি করে সন্দেহ করলেন যে এখানেই এসেছেন?"

দু'মিনিট চুপচাপ। মাটির দিকে চেয়ে আবার কি চিন্তা করলেন তিনি। তারপর একান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, "আমি তো আপনার অনেক ছোট, আমাকে দয়া করে তুমি বলতে পারেন না?"

বললাম, "বয়সে ছোট হলে কি হবে? মাইনে বেশী পান, চাকরিও আপনার আমার চেয়ে অনেক দিনের পুরনো, তা ছাড়া আমার চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বাসী আপনি মনিবের।"

মাটির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি মিশে গেল। শুধু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো দু'টি কথা—"তাই বটে।"

বললাম, "দুঃখ করছেন নাকি? আমাদের আলাদা সুখ-দুঃখ থাকতে নেই যে, মনিবের মান-অপমান সুখ-দুঃখই আমাদের সব।"

আবার দু'চোখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। চক্ষু দু'টি জলে টলমল করছে।

বললাম, "ওটাও সামলে রাখুন। পরে অনেক কাজে লাগতে পারে। কিন্তু আমাদের আজকের এই আলাপের বিন্দু-বিসর্গও যেন সাহেব জানতে না পারেন।" তিনি মাথা নাড়লেন। ডক্টর ঘরে ঢুকলেন নেকটাই বাঁধতে বাঁধতে, "তাহলে এবার চলি। আজ আপনার দুপুরের বিশ্রামটাই মাটি হয়ে গেল। জানলে অরুণা, একরাশ শাস্ত্রচর্চা করা গেল সারা দুপুর। বই-টই পড়ে ছাই বুঝি আমরা, ওঁদের মত নাড়াচাড়া না করলে ও-সব তন্ত্র-মন্ত্রের কোনও মানেই বোঝা যায় না। বাপ্‌স্ লোকটি সাক্ষাৎ অন্তর্যামী। এখানে বসেই সব দেখতে শুনতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, আসি তাহলে আজ, নমস্কার।"

সাহেবের সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারীও বেরিয়ে গেলেন। আর যাবার আগে, আজ পর্যন্ত যা কোনও দিন করেননি, তাই করে গেলেন, হঠাৎ ঢিপ করে আমার পায়ের ওপর মাথা ঠুকে এক প্রণাম।

সন্ধ্যারতির পর মনোহরকে দেখতে পেলাম না সেদিন। নিত্য হাজির থাকে, আরতির পর পঞ্চপ্রদীপের শিখায় দু'হাত তাতিয়ে মুখে মাথায় বুলোয়। আজ সে নেই। ভাবলাম, যাক বাঁচা গেল। রাশি রাশি মিথ্যে কথা আজ আর শুনতে হবে না। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম।

ভোররাতেই ঘুম ভেঙে গেল। বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে! সারা বাড়িটায় যে যেখানে ছিল সবাই চেঁচাচ্ছে। তখনও অন্ধকার, কালীমায়ের মঙ্গল-আরতির ঘণ্টাটা তখনও বেজে চলেছে ঢং ঢং করে থেমে থেমে। পথ দিয়ে স্নানার্থীরা চলেছে সুর করে স্তব পাঠ করতে করতে। গোলমালটা এগিয়ে এসে আমার ঘরের দরজার সামনে উপস্থিত হ'ল। তারপর দরজায় ধাক্কা।

এত ভোরে আবার হ'ল কি। চুরি-ফুরি হ'ল নাকি বাড়িতে!

দরজা খুলে দেখি বাড়িসুদ্ধ সবাই উপস্থিত।

একসঙ্গে সকলে কথা বলছেন। কিছুই মাথায় ঢুকল না। মিনুর মা একটি বউকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

"দেখুন বাবা, দেখুন—সর্বনেশেটা কি করে গেছে, দেখুন একবার!"

দেখলাম। সামনে দাঁড়িয়ে মনোহরের বউ। শাড়িখানা রক্তে রাঙা। নাক-মুখ ফুলে উঠেছে। ডান দিকের ভুরুর ওপর থেকে এক খাব্‌লা মাংস উঠে গেছে।

শুনলাম। কাল সন্ধ্যার পর মনোহর ঘরের টাকা-পয়সা গয়নাগাঁটি সমস্ত নিয়ে যখন রওনা হচ্ছে সেই সময় বউ বাধা দিতে যায়। ফলে বউ-এর এই অবস্থা। বাবাজী সব গুছিয়ে নিয়ে সেই যে বেরিয়েছেন এখনও দেখা নেই। সারা রাত কোনও রকমে কাটিয়ে অন্ধকার থাকতেই বউটা ছুটে এসেছে আমার কাছে।

সে কাহিনী শুনছি, এমন সময় যেন আগুন লাগল নিচে।

"ওগো আমার কি সর্বনাশ হল গো! হাঁকডাতে হাঁকডাতে কে উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে।

গাঙ্গুলী গিন্নী!

কাল সন্ধ্যার পর থেকে তাঁর ভাইঝিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

দুই আর দুই যোগ করলে কি হয়?

নিমেষের মধ্যে ঠিক করে ফেললাম যোগ-ফল। তৎক্ষণাৎ ওঁদের সকলকে দু' হাতে ঠেলে সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে নিচে নেমে গেলাম। এখনই একটা লোক পাঠাতে হবে শঙ্করীপ্রসাদের কাছে।

রাস্তার ধারের ঘরটায় চাকর ঘুমোচ্ছে। তাকে ডেকে তোলবার জন্যে তার

দরজায় ঘা দিচ্ছি—নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে এক জাগুয়ার।

গাড়ির সামনের দরজা খুলে নেমে পড়ল পাগড়ি-পরা তকমা-আঁটা একজন। নেমে পেছনের দরজা খুলে ধরে একপাশে সরে দাঁড়াল।

লাফিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, "নেমে কাজ নেই আর এখানে দয়া করে এখুনই আমায় নিয়ে চলুন হিন্দু ইউনিভারসিটি। গাড়িতে সব বলছি আপনাকে।"

সম্মতির অপেক্ষা না করেই তার পাশে উঠে বসলাম। নিজেই বললাম চালককে, "চালাও, হিন্দু ইউনিভারসিটি।"

তিনি শুধু বললেন, "তাই চল।" গাড়ি ছুটল নিঃশব্দে।

চাপা গলায় তখন বললাম তাঁকে, "কাল সন্ধ্যার পর থেকে আপনার ভাইয়ের বউ কল্যাণীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দেওয়া—তিনি আঁতকে উঠলেন, "এ্যাঁ—"

"হ্যাঁ—আরও একটু সুসংবাদ আছে। মনোহর কাল সন্ধ্যায় তার বউকে মেরে-ধরে গয়না-গাঁটি সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে।"

আর কোনও আওয়াজ বেরুলো না তাঁর গলা দিয়ে। ঘোমটা খুলে দু'চোখ মেলে বোকার মত চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে।

"আপনার কাছে একটি কথা জানতে চাই। শেষবার কখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে মনোহরের? সে সময় সে কি বলে গেছে আপনাকে?"

একটি ঢোক গিলে তিনি বললেন, "তবে যে সে কাল সকালে নিয়ে গেল টাকা—দেনা-টেনা শোধ দেবে বলে। মানে আজ রাতের গাড়িতেই তো আমাদের মালদহ যাবার কথা।" আর কিছু তাঁর গলা দিয়ে বার হ'ল না।

"কত টাকা দিয়েছেন তাঁকে?"

রানী চুপ করে রইলেন—সদ্য-ওঠা রক্তবর্ণ সূর্যের দিকে চেয়ে। দৃঢ়স্বরে বললাম, "মনোহর আর মালদা যাবে না আপনার সঙ্গে। কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন আপনার ভাই-এর বউকে বাঁচানো। চরম সর্বনাশ হয়ে যাবার আগে তাদের ধরতে হবে।"

রানী সোজা হয়ে বসলেন এবং আবার আমার মুখের দিকে চাইলেন। দেখলাম তাঁর চোখ জ্বলছে। বললেন—"ঠিক তাই। হয়ত এখনও তাদের ধরা যাবে। বৃন্দাবন ভিন্ন অন্য কোথাও তারা যায়নি। 'বৃন্দাবনে নিয়ে যাবে'—এ-কথা না বললে কল্যাণীকে এক পা-ও নড়ানো যাবে না। প্রথমেই বৃন্দাবনে না নিয়ে গেলে সে এমন গোলমাল শুরু করবে যে, তখন তাকে সামলাতেই পারবে না।

কোনও লোভেই কল্যাণীকে কেউ সহজে ভোলাতে পারবে না। আমি তাকে ভাল করে চিনি। তার সর্বনাশ করা এত সহজ নয়। একবার যদি ধরতে পারি সেই ছোঁড়াকে, তবে—"

দাঁতে দাঁত ঘষবার শব্দ পেলাম পাশ থেকে। রানী নিজেকে সামলে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?"

"এই যে এসে গেছি। দাঁড় করাও গাড়ি, সামনের ঐ বাঁ-দিকের বাঙলোর সামনে।"

রানীকে বললাম, "নাম আপনি জানেন—শঙ্করীপ্রসাদ শর্মা। যাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে আপনি আমার কাছে গিয়েছিলেন। শঙ্করীপ্রসাদ আর আপনি—আপনারা দু'জন ছাড়া কল্যাণীর একান্ত আপনার জন আর কেউ নেই। তাই এঁর কাছে ছুটে এসেছি। কল্যাণীকে খুঁজে পাবার জন্যে ইনি নরকেও ধাওয়া করবেন এখুনই। চলুন নামি!"

শঙ্করীপ্রসাদ শর্মা নিচেকার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। তারপর ছুটলেন তাঁর গাড়ি নিয়ে তাঁর এক বন্ধুর কাছে। সেই ভদ্রলোক একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার। বলে গেলেন যে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবেন তিনি। তখন বোধহয় আমরা শুনতে পাব—কোন্ পথে কখন কাশী ছেড়ে গেছে ওরা। আর যদি এখনও কাশীতেই থাকে তবে—

যাবার সময় সাহেব একখানা উচ্চশ্রেণীর চাবুক নিয়ে গেলেন।

রানী আমায় মঠে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁকে বললাম—তৈরী থাকবার জন্যে। হয়ত আজ রাতেই আমাদের বৃন্দাবন রওনা হতে হবে। কাশীতে এখনও তারা আছে এ বিশ্বাস করা কঠিন। রানী সংক্ষেপে জানালেন যে, এখনই গাড়ি রিজার্ভ করবার ব্যবস্থা করছেন তিনি। যদি বৃন্দাবনে না-ও যেতে হয় তবু ব্যবস্থা করে রাখা ভাল।

বেলা দশটার মধ্যে শঙ্করীপ্রসাদ সংবাদ নিয়ে ফিরলেন— সেই পুলিশ অফিসারের সাহায্যে। কাল সন্ধ্যার পর আগ্রার প্রথম শ্রেণীর দু'খানা টিকিট পাওয়ার জন্যে কে একজন হাড়হদ্দ চেষ্টা করে স্টেশনে। শেষে চাওয়া হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর। দ্বিতীয় শ্রেণীর সব কটা বার্থ রিজার্ভ থাকায় তাও তারা পায়নি। লোকটি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে পীড়াপীড়ি করে দুখানা টিকিটের জন্যে। স্টেশন মাস্টার তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেননি। অত তাঁর খেয়াল নেই। তবে তার বয়স যে বেশী নয় এটুকু তাঁর মনে আছে।

রানী বৃন্দাবনে তাঁর পাণ্ডার কাছে টেলিগ্রাম করলেন যে সেইদিন রাতের

গাড়িতেই তিনি কাশী থেকে রওনা হচ্ছেন। টাকায় কিনা হয়। রানীর কর্মচারীরা অসাধ্য সাধন করতে পারেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেল।

শঙ্করীপ্রসাদকে বললাম, শ্রীমতী অরুণাও সঙ্গে যাবেন। তিনি প্রবল আপত্তি তুললেন, "না-না, সে আবার সেখানে গিয়ে করবে কি?"

বললাম, "তাহলে আমারই বা গিয়ে কাজ কি সেখানে? আপনি একলাই চলে যান। নিশ্চয়ই তাদের খুঁজে পাবেন বৃন্দাবনে। তখন খপ করে কল্যাণীকে ধরে নিয়ে ফিরে আসবেন। আমি আর অরুণা আমরা দু'জনেই আপনার কর্মচারী। বরং এক্ষেত্রে তাঁরই আপনার সঙ্গে থাকা বেশী দরকার। তিনি হচ্ছেন সেক্রেটারী আপনার—আমি তো শুধু মাইনে-করা পুরুত।"

আমার দিকে একবার রক্ত-চক্ষুতে চেয়ে আর কথা বাড়ালেন না সাহেব।

গাড়িতে উঠলাম আমরা ছ'জন। রানী, তাঁর একজন দাসী আর তাঁর ম্যানেজার—আর আমরাও তিনজন, সাহেব, তাঁর সেক্রেটারী আর আমি। আমরা সবাই সেই 'বৃন্দাবন-পথযাত্রী'।

বৃন্দাবনে পৌঁছে সবাই একসঙ্গে উঠলাম এক ধর্মশালায়। রানীর পাণ্ডারা তৈরী হয়েই ছিল। এবার রানী তাঁর প্রভাব আর প্রতিপত্তি দেখালেন। মথুরায় আর বৃন্দাবনে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হোক- কোথাও এই রকমের দু'জনকে পাওয়া যায় কিনা। দুই গুষ্টি পাণ্ডা নামল কোমর বেঁধে। রানীর শ্বশুর কুল আর বাপের কুল—দুই বংশের দুই পাণ্ডা-বংশ হন্যে হয়ে লেগে গেল।

শঙ্করীপ্রসাদ এনেছিলেন এখানকার পুলিশের কর্মকর্তাদের নামে চিঠি। রানী হাত জোড় করে তাঁকে নিবারণ করলেন। তাঁর ভাইয়ের বউ কল্যাণী, তার পিতৃবংশের মাথা কাটা যাবে যদি কথাটা পাঁচ-কান হয়। অন্ততঃ একটা দিন তিনি সময় চান। তার মধ্যে যদি কল্যাণীকে না পাওয়া যায়, তখন যা ইচ্ছে করতে পারেন শঙ্করীপ্রসাদ।

সুতরাং সাহেব শুধু ঘর-বার করতে লাগলেন ঘণ্টা দুয়েক। তারপর সংবাদ এলো।

বৃন্দাবনেই এক ধর্মশালায় দরজা বন্ধ করে বসে আছে একটি বউ। কিছুতেই দরজা খুলছে না সে। যে লোকটি তাকে সঙ্গে করে এনেছিল, প্রথম দিন সন্ধ্যার পরই জোর করে তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই যে দরজা বন্ধ করেছে বউটি, এখনও পর্যন্ত সে দরজা কেউ খোলাতে পারেনি। বাইরে থেকে যত রকমের চেষ্টা করা হয়েছে—তার কোনটাই ফল দেয়নি। ঘরের ভেতর থেকে একই উত্তর

আসছে—"না, তোমায় আমি কিছুতেই দরজা খুলে দেব না। তুমি আমার সে শ্যাম নও। আমার কৃষ্ণ কিশোরকে এনে দাও, তবেই দরজা খুলব।"

ঘরের ভেতর কখনও শোনা যাচ্ছে ভজন, কখনও হাসি, কখনও কান্না। ধর্মশালার কর্মচারীরা ভেবে পাচ্ছে না—কি করা উচিত। এটুকু তারা বুঝেছে যে, মাথা খারাপ হোক আর যাই হোক, ঘরের মধ্যে যিনি দরজা বন্ধ করে রয়েছেন, তিনি ঘরোয়ানা ঘরের বউ। কিন্তু উপোস করে কতক্ষণ বাঁচবে বউটি ?

যমুনা নদীর ধারে নির্জন জায়গায় ধর্মশালাটি। আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন বিস্তর লোক জমা হয়েছে সেখানে। চোখ রাঙিয়ে পাণ্ডারা সকলকে সরিয়ে দিলে। দোতলার একখানা দরজা-বন্ধ ঘরের সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। ঘরের ভেতর কে কাঁদছে সুর করে। কান্না নয়—ভজন গাইছে। গাইছে কাঁদতে কাঁদতে—"ওগো নিঠুর, এতেও তোমার দয়া হ'ল না। দাসীর দুঃখ তুমি বুঝলে না। তোমায় পাবার উপযুক্ত প্রেম যে আমার বুকে নেই। তাই শুধু একবিন্দু প্রেম ভিক্ষা চাচ্ছি আমি তোমার কাছে। ওগো পাষাণ—লোকে যে তোমায় প্রেমময় বলে। দাসীকে একবিন্দু প্রেমও কি তুমি ভিক্ষা দিতে পারো না ?"

আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। আছড়ে গিয়ে পড়লেন তিনি বন্ধ দরজার গায়ে, দু'হাত চাপড়াতে লাগলেন দরজার ওপর—"কল্যাণী, কল্যাণী, দরজা খোল, দরজা খোল আগে। আমি, আমি এসেছি কলী।" আর কথা বেরুলো না তাঁর মুখ দিয়ে, শুধু দুমদাম ঘা দিতে লাগলেন দরজার গায়ে।

গান বন্ধ হ'ল। দরজার ঠিক পেছন থেকে প্রশ্ন হ'ল প্রায় চুপি চুপি—

"তুমি কে—কে তুমি ?"

শঙ্করীপ্রসাদ নিজের দেহ মুখ-মাথা সর্বাঙ্গ দরজার গায়ে চেপে ধরেছেন। আমরা যে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি, এ জ্ঞানটুকুও তাঁর নেই। তিনি চুপি চুপি বলতে লাগলেন দরজার গায়ে মুখ চেপে—"আমি, আমি কলী, আমি তোমার ভুলুদা। আগে দরজা খোল কলী—নয়ত মাথা খুঁড়ব এই দরজার গায়ে। খোল, খোল বলছি দরজা—এই আমি মাথা খুঁড়ছি।" সত্যিই মাথা খুঁড়তে আরম্ভ করলেন দরজার গায়ে ডক্টর সাহেব।

ভেতর থেকে ধমকের সুর শোনা গেল—"আঃ, কি করছ ভুলুদা! বাব্বা বাব্বা-কি মানুষ বাপু তুমি। এতদিন পরে মনে পড়ল। এই খুলছি, খুলছি আমি দরজা, কিন্তু তুমি ঠেলে থাকলে খুলব কেমন করে।"

ভেতরের খিল আছড়ে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। টাল সামলাতে পারলেন না

শঙ্করীপ্রসাদ। গিয়ে পড়লেন কল্যাণীর গায়ের ওপর। দু'জনে দু'জনকে আঁকড়ে ধরলেন। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত—

রানী গিয়ে ধরলেন কল্যাণীর কাঁধ চেপে। "বউ, ও বউ"—বলতে বলতে দুই ঝাঁকানি দিলেন তার কাঁধ ধরে। চমকে উঠে কল্যাণী ছেড়ে দিলে শঙ্করীপ্রসাদকে। যেন সদ্য ঘুম ভাঙ্গল তার। তাড়াতাড়ি মাথার আঁচল তুলে দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললে। তৎক্ষণাৎ নিজের গায়ের চাদর খুলে তার আপাদ-মস্তক ঢেকে দিলেন রানী। চোখ দিয়ে কি ইশারা করলেন তাঁর ম্যানেজারকে। ম্যানেজার নিচু গলায় কি বললেন পাণ্ডাদের। পাণ্ডারা ওঁদের ঘিরে নিয়ে নিচে নেমে গেল।

আমরাও নেমে এলাম। কিন্তু আমরা ধর্মশালা থেকে বার হয়ে আর তাঁদের ধরতে পারলাম না। পাণ্ডাদের একখানা মোটর গাড়িতে করে উধাও হয়ে গেলেন তাঁরা। আস্তানায় ফিরে এসে আমরা দেখলাম যে রানী, কল্যাণী বা ম্যানেজার কেউ ফেরেন'নি। আবার ঘর-বার করতে লাগলেন ডক্টর সাহেব। গেলেন কোথায় তাঁরা? অবশেষে তাও জানা গেল। এক ঘণ্টা পরে রানীর চিঠি নিয়ে ম্যানেজার উপস্থিত হলেন। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

রানী একসঙ্গে আমাদের তিনজনকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন যে, আপাতত তাঁরা বৃন্দাবনে থাকবেন ঠিক করেছেন। এখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না বলে দুঃখ জানিয়েছেন। এটুকুও দয়া করে লিখেছেন যে, আবার যখন কাশীতে যাবেন তখন নিশ্চয়ই আমাদের স্মরণ করবেন তিনি। আমাদের কাশী ফিরে যাবার গাড়িভাড়া তিনশ' টাকাও পাঠিয়েছেন তাঁর ম্যানেজারের হাতে।

লাল হয়ে উঠল সাহেবের মুখ। অপমানের এতবড় ধাক্কা সত্যিই তাঁর পক্ষে সামলানো শক্ত। ম্যানেজারবাবুকে বললাম—টিকিট ইতিমধ্যেই আমাদের কাটা হয়ে গেছে। সুতরাং টাকা নিতে পারলাম না বলে আমরা দুঃখিত।

তৎক্ষণাৎ স্টেশন।

আগ্রায় পৌঁছে হোটেলে শঙ্করীপ্রসাদ মুখ খুললেন—"চলুন, তাজ দেখে আসি। আজ আর ফেরবার গাড়ি নেই।"

তাজের কাছে পৌঁছোতে সন্ধ্যা হ'ল। মাত্র এক-আনা-আন্দাজ-ক্ষয়ে-যাওয়া মস্ত একখানা চাঁদ তাজের মাথার ওপর এসে দাঁড়াল সেই সময়। আমাদের তাজ প্রদক্ষিণ শুরু হ'ল। তিনজনেই নির্বাক। চরম অপমান মানুষকে মূক করে ফেলে।

সত্যিই তো রানী তাঁর ভাইয়ের বউকে সামলাবেন—এ তো একান্ত স্বাভাবিক! ঐ তিনশ' টাকা দিতে আসাটাও এমন কিছু নয়। সামর্থ্য থাকতে কেন তিনি দেবেন না আমাদের ফেরবার গাড়িভাড়া! আমরা নিছক পর বই তো নয়! না-হয় এসেছি তাঁর সঙ্গে তাঁর একটু বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল বলে। তাও তাঁর টাকায় রিজার্ভ-করা গাড়িতে এসেছি। তাহলে ফিরে যাবার ভাড়াটা যদি তিনি না দেন —তবে সেটা যে তাঁর সম্মানে লাগে। সুতরাং—

সুতরাং কিছুমাত্র অন্যায় তিনি করেননি। তবু তাঁর এই একান্ত ন্যায্য কর্মটি এমন এক নিরীহ জাতের থাপ্পড় লাগিয়েছে আমাদের মুখের ওপর যে, তার জ্বালাটুকু সহজে ভোলা যাচ্ছে না কিছুতেই। কথা কইতে গেলে পাছে সেই জ্বলুনির কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়ে—এজন্যে তিনজনই মৌনব্রত অবলম্বন করেছি।

তাজ থেকে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ একটি প্রশ্ন করলাম আমার মনিবকে।

"আচ্ছা বলুন তো—স্ত্রীর কাছ থেকে কি পেলে তবে পাওয়াটা সার্থক হ'ল বলে বিবেচনা করা যায়?"

আচমকা এই প্রশ্নে ওঁরা দু'জনেই চাইলেন আমার দিকে। তখন আবার আরম্ভ করলাম—"একটানা দশ বছর ধরে সেবা দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে, এমন কি নিজের প্রাণের মায়া পর্যন্ত ভুলে গিয়ে, যে নারী ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে মুখ টিপে ঘুরে মরছে—সে হ'ল মাইনে-নেওয়া চাকরানী। হায়রে, আলেয়ার পেছনে ছুটে মরা আর কাকে বলে!"

আমার আর অরুণার মাঝখানে হাঁটছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। গেটের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। রুপালী আলোয় তাজের পাষাণে হয়ত আজও প্রাণ আছে। কিন্তু আমাদের মনের যে দগদগে অবস্থা তাতে প্রলেপ দিতে পারলে না প্রাণময়ী পাষাণী তাজ। তাই আমরা পালাচ্ছি তাজের কাছ থেকে।

শঙ্করীপ্রসাদ ঘুরে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর সেক্রেটারীকে—"অরুণা, আজ কত তারিখ?"

"উনিশ, উনিশে ফেব্রুয়ারী।"

"ঠিক, এতক্ষণ খেয়াল করতে পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা মনে পড়ে তোমার অরুণা সেদিনটার তারিখ, যেদিন ফাদার উইলসন তোমাকে আমার হাতে তুলে দেন?"

অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর হ'ল—"তেসরা মার্চ বোধ হয়।"

বহুদূর থেকে যেন বলছেন শঙ্করীপ্রসাদ—"তেসরা মার্চই বটে। সেটা হচ্ছে

ছাব্বিশ সাল। আজ হচ্ছে উনিশ শ' সাঁইত্রিশ"—

বেশ কয়েক পা আমরা এগিয়ে গেলাম নিঃশব্দে। যেন নিজেকে নিজে বলতে লাগলেন ডক্টর সাহেব—"যে ভুল করেছি তা আর কিছুতেই শোধরাবার নয়। এগারটা বছর অনর্থক গড়িয়ে চলে গেছে। এতবড় লোকসান অরুণা ভুলতে পারবে না কিছুতেই।"

ঝপ করে বলে ফেললাম, "খুব পারবেন।"

"কিন্তু কেন? কিসের জন্যে সব জেনেশুনে আমার মত একটা অপদার্থকে স্বামী বলে নিতে যাবে অরুণা?"

আমিই উত্তর দিলাম, "কেন বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন আপনি? আজ পর্যন্ত কটা ব্যাপারে আপনি তাঁর সম্মতির জন্যে অপেক্ষা করেছেন? মুখ বুজে নির্বিচারে আপনার ন্যায়-অন্যায়ের ভাল মন্দ সব আদেশ সব আব্দার যদি দশ বছর ধরে সহ্য করতে পেরে থাকেন, তাহলে আজও পারবেন। আপনি আপনার দাবীটা করুন না চোখ কান বুজে। তারপর আমি আছি কি করতে? একটা শক্ত গোছের বশীকরণ করে দোব।"

একান্ত সংকোচের সঙ্গে সন্তর্পণে তাঁর সেক্রেটারী একখানি হাত তুলে নিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। সেক্রেটারীর মুখখানি তখন প্রায় বুকের কাছে এসে ঠেকেছে। সাক্ষী রইল দু'জন—তাজমহলের প্রাণ যে নারী সেই নারী, আর মাথার ওপরে প্রায় ষোল আনা-পূর্ণ একখানা চাঁদ। আর আমি—সাহেবের মাইনে করা পুরুত বিবাহের মন্ত্রটা আগে শিখিনি। শেখা থাকলে দু-একটা আওড়ে কিছু ফালতু দক্ষিণাও পাওয়া যেত বোধ হয়।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখা গেল, একখানিমাত্র টাঙ্গা দাড়িয়ে আছে। দৌড়ে গিয়ে আগে চড়ে বসলাম তার পিছন দিকে। গাড়োয়ানকে বললাম, "জলদি হাঁকাও শেখ সাহেব, বহুত জলদি। ট্রেন পাকড়ানে হোগা।"

ওরা দু'জনেই ভয়ঙ্কর চমকে উঠলেন। অরুণা মানে শ্রীমতী শর্মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "সে কি, আমরা যাব না?"

"আপনারা পরে আসুন। আরও গাড়ি পাবেন, এই তো সবে সন্ধ্যে। আমার তাড়া আছে। আধঘণ্টা পরে একখানা ট্রেন আছে। সেটা ধরতে পারলে কাল সকালেই দিল্লী পৌঁছতে পারব।"

ডক্টর আঁতকে উঠলেন—"দিল্লী। দিল্লী কেন?"

শ্রীমতী শর্মা প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "তার মানে, আপনি কাশী যাবেন না আমাদের সঙ্গে?"

গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে। চেঁচিয়ে উত্তর দিলাম—"কি করে ফিরি বলুন কাশী? হতভাগা মনোহরটাকে নিয়ে না ফিরলে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব সেই একরত্তি বউটার সামনে? আপনি দয়া করে তাকে রক্ষা করবেন, তার আর কেউ নেই।"

আকুল হয়ে বলে উঠলেন আমার মনিব সাহেব—"আমাদের যে আর আপনার বলতে কেউ রইল না এ জগতে—" শেষটুকু কান্নার মত শোনালো।

তাঁর কথার শেষ উত্তর দেবার আর অবকাশ পেলাম না।

টাঙ্গার ঘোড়াটি আদত পক্ষীরাজ জাতের। রাশীকৃত ধুলো উড়িয়ে ওঁদের দু'জনকে আড়াল করে ফেললে।

৪

ফক্কড—লক্কড—টিক্কড।

লক্কড হচ্ছে চেলা কাঠ। তিনখানা জুটলেই যথেষ্ট। আরও জোটাতে হবে পোয়া-দেড়েক আটা। কৌপীনের ওপর যে ন্যাকড়ার ফালিটুকু কোমরে জড়ানো থাকে, সেখানি কোমর থেকে খুলে নিয়ে মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর জল দিয়ে মাখতে হবে আটাটুকু, বানাতে হবে দুটো থ্যাবড়া থ্যাবড়া চাকার মত জিনিস। এইবার লক্কড তিনখানিতে আগুন জ্বেলে তাতে সেঁকে নাও সেই আটার চাকতি দুটো। হয়ে গেল টিক্কড বানানো। রামরস সংযোগে সেই টিক্কড চিবিয়ে ফক্কড বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার দায়ে দিনান্তে দেড় পোয়া আটা আর তিনখানি চেলা কাঠ মাত্র দাবী করে ফক্কড। তার বেশি সে চায়ও না, পায়ও না।

ফক্কড-তন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুশাসন—ফক্কড কখনও ঝপ্পড বাঁধবে না। ঝপ্পড বেঁধে তার তলায় মাথা গুঁজে বসলে তার ফক্কড়ত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। ফক্কড আমৃত্যু অনিকেত। 'চলতা পানি রমতা ফকির'। জলের স্রোতের মত ফকিরও গড়িয়ে চলবে। যে পাথর অনবরত গড়ায় তার গায়ে শেওলা ধরার ভয় নেই।

শেওলা ধরা দূরে থাক, মশা মাছি পিঁপড়েও বসে না ফক্কড়ের শরীরে। রসকষ-শূন্য পোড়া কাঠের ওপর কিসের লোভে বসবে তারা? এক ফালি ন্যাকড়া জড়ানো কোমরে, বড় জোর আর এক ফালি আছে কাঁধের ওপর, সর্বাঙ্গে ছাইভস্ম মাখা, লাল সাদা হলদে নানারঙের তিলক ফোঁটা আঁকা কপালে, এক মাথা রুক্ষ জট-পাকানো চুল, এই রকমের মূর্তির ওপর মশা মাছি বসে না, রোগ ব্যাধি দূরে সরে থাকে, সাপ-বিছেরাও ভয় পায় এদের কাছে ঘেঁষতে।

এই হতচ্ছাড়া বীভৎস জীবেরা নিজেরা নিজেদের বলে ফক্কড়। এদের দিকে

তাকিয়ে বৈরাগ্যের বিপুল মহিমা লজ্জায় অধোবদন হয়। আত্মবঞ্চনার আত্মপ্রসাদে মশগুল হয়ে ত্যাগ ও তিতিক্ষার জয়ধ্বজা কাঁধে নিয়ে এই সর্বহারার দল ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করে।

যোগে-যাগে-মেলায়-তীর্থস্থানে হামেশা নজরে পড়ে ফক্কড়। তীর্থময় এই দেশের যেখান দিয়ে যে ট্রেনখানিই ছুটুক, তাতে অন্ততঃ সিকিভাগ যাত্রী যে তীর্থ দর্শনে চলেছেন—এ কথা চোখ বুজে বলা যায়। তেমনি অন্ততঃ কুড়ি দুয়েক ফক্কড়ও যে লুকিয়ে চলেছে সেই গাড়িতে, এও একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। রেলের লোক টিকিট দেখতে গাড়িতে ঢুকে প্রথমেই পায়খানার দরজা খুলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখবে, কোনও ফক্কড় সেখানে বসে আছে কিনা। তারপর সব ক'টা বেঞ্চির নিচে পা চালাবে। যদি কিছু ঠেকে তখন পায়ে, তাহলে বুট-সুদ্ধ পা দিয়ে গুঁতিয়ে দেখবে কিছু নড়ল কি না। নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে একজনের পর আর একজন বেরিয়ে আসবে তখন লোকচক্ষুর সামনে।

সামনের স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালে ধাক্কা গুঁতো দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হবে তাদের। হয়ত তখন অর্ধেক রাত্রি, ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে, সেই স্টেশনের দশ ক্রোশের মধ্যে লোকালয় নেই। কিংবা স্টেশনটি মরুভূমির মাঝখানে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে মরে গেলে একবিন্দু জল মিলবে না। হয়ত বিশাল জঙ্গল আর পাহাড়ের ভেতর স্টেশন, স্টেশন থেকে বার হলেই পড়তে হবে বাঘের কবলে। তা হোক, তাতে কিছুই যায় আসে না ফক্কড়ের।

ফক্কড় কখনও টিকিট কাটে না। যে-বস্তুর বদলে টিকিট মেলে সে বস্তু সভয়ে ফক্কড়কে এড়িয়ে চলে। টিকিট না কেটে চার ধাম আর চৌষট্টি আড্ডা ঘুরছে ফক্কড়। একবার দু'বার তিনবার—যতবার খুশি ঘুরছে—আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ। যে যতবার ঘুরেছে চার ধাম আর চৌষট্টি আড্ডা, ফক্কড়-সমাজে তার সম্মান তত বেশি।

বড় বড় ধর্মমেলায় ফক্কড়েরা গিয়ে না জুটলে মেলাই জমবে না। তীর্থস্থানে গিয়ে ফক্কড় না দেখতে পেলে লোকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সাধু-সন্ন্যাসীরা তেমন আসেনি বলে সকলে মুখ বাঁকায়। পাপক্ষয়ের জন্যে তীর্থে যাওয়া, আবার কিছু পুণ্যার্জনের জন্যে তীর্থে দান-ধ্যান করা। ঘরে বসে রাস্তার ভিখিরীকে কিছু দিলে যেটুকু পুণ্য ক্রয় করা যায়—তার চেয়ে ঢের বেশি মুনাফা হয় তীর্থে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর দিকে পয়সা ছুঁড়লে। কিন্তু সেই সাধু-সন্ন্যাসীদেরই দর্শন যদি না মেলে তীর্থস্থানে বা কুম্ভস্নানে গিয়ে—তাহলে লোকে দান-ধ্যান করবে কাকে। কাজেই মেলায় ভিড় জমাবার জন্যে রেলের কর্তারা ফক্কড়ের ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন লটকান।

প্রকাণ্ড মেলার মাঝখানে সকলের চোখের সামনে রাশীকৃত বেল-কাঁটার ওপর শুয়ে যিনি তপস্যা করছেন, চাকা লাগানো একখানা কাঠে ছুঁচোলো মাথা একশ' গণ্ডা লোহা পুঁতে তার ওপর মহা আরামে শুয়ে যিনি ধ্যান লাগিয়েছেন, যে রাস্তায় জনতা সব চেয়ে বেশি, সেই রাস্তার পাশে গাছের ডালে পা বেঁধে হেঁট মুণ্ডে ঝুলে যিনি শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করছেন কিংবা সারা শরীর মাটির তলায় পুঁতে মাত্র একখানি হাত বার করে যিনি অনায়াসে বেঁচে রয়েছেন সেই সব মহাপুরুষদের চাক্ষুষ দর্শন-লাভের জন্যেই তীর্থে যাওয়া, যোগে-যাগে মেলায় ভিড় করা। কাজেই ফক্কড় না জুটলে মেলার মেলাত্বই মারে মারা যায় যে!

কিন্তু কোনও মেলায় এদের জন্যে কেউ মাথা ঘামায় না। হিসেবের মধ্যে ধরা হয় না ফক্কড়দের। ধর্মশালায় এদের প্রবেশ নিষেধ। গৃহস্থের সুখ-সুবিধা আরামের জন্যে গৃহস্থ ধর্মশালা বানায়, ফক্কড় কোথাও ধর্মশালা বসায়নি। ফক্কড় থাকবে কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব—ধর্মের ষাঁড়েরা তীর্থস্থানে বা ধর্মমেলায় কোথায় থাকে? ফক্কড় থাকবে গাছতলায়, তাও যদি না জোটে, থাকবে খোলা আকাশের তলায়। আর যাত্রীর ভিড়ে যদি কোথাও এতটুকু স্থান না থাকে, তখন ওদের মেলার বাইরে বার করে দেওয়া হবে।

এই ভাবে ফক্কড়ের দিন কাটে, রাত কাবার হয়, পেট ভরে, তৃষ্ণা মেটে। তার পর একদিন ফক্কড় মিলিয়ে যায়, বেমালুম 'হাওয়া' হয়ে যায়। কারণ ফক্কড় মরে না কখনও, ও কর্মটি সম্পাদন করবার জন্যে আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে শয়নের স্থান আবশ্যক। অতবড় বিলাসিতা ফক্কড়ের কপালে আকাশ-কুসুম তুল্য। ফক্কড়ের বরাতে মরাও ঘটে ওঠে না। ওরা একদিন রাম পেয়ে যায়। ওদের ভাষায় "রাম মিল গিয়া।" ব্যাস আর কিচ্ছু না!

এই হচ্ছে পেশাদার ফক্কড়ের স্বরূপ।

অ-পেশাদার ফক্কড় চাকরি না হওয়া পর্যন্ত বা বিয়ে না করা পর্যন্ত পাড়ার রকে বসে, সভায় গিয়ে, খেলার মাঠে জুটে বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ফাঁদ পেতে ঘরের খেয়ে ঘরের পরে ফক্কুড়ি চালিয়ে যান। তারপর যখন সংসারে ঢুকে ফক্কুড়ি পরিত্যাগ করেন তখন তাঁদের অনুবর্তীগণকে দেখে ব্যাজার হন। চোখ পাকিয়ে বলে বসেন—"ফক্কুড়ি করবার আর জায়গা পাওনি না হ্যা ছোকরা!"

ফক্কড়-তন্ত্রের আর একটি নিয়ম হ'ল, যে-ছোকরাটি সবেমাত্র এই পথে পা দিলে, তাকে হাতে ধরে সব কিছু শেখাবেন ঝানু ফক্কড়। নিজের দু'খানা টিক্কড়ের একখানা অম্লান বদনে নবদীক্ষিতের মুখে তুলে দেন পাকা ফক্কড়। অনেক সময় নতুন

ফক্কড়ের অর্জিত লাঞ্ছনা গালাগালি বা প্রহারটুকু পর্যন্ত পিঠ পেতে নিয়ে তিনি তাকে রেহাই দেন। এই সমস্ত দেখে সন্দেহ হয় যে, ফক্কড়েরও হৃদয় বলে একটা কিছু বালাই আছে। কে জানে! কিন্তু হৃদয় থাকুক না থাকুক, ফক্কড়ের জীবনেও যে অনেক সময় অনেক রকমের মজা জোটে, তার একজন জলজ্যান্ত সাক্ষী আমি। কারণ বেশ কিছুদিন আমি পেশাদার ফক্কড় ছিলাম।

কেন ফক্কড় হতে গিয়েছিলাম, কি লোভে ফক্কড় হয়ে কি লাভ হয়েছে আমার —এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারব না কিছুতেই। লাভ কিছু না হোক, লোকসান যে কিছুই হয়নি আমার, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। ঘুরেছি দেখেছি আর দেখেছি ঘুরেছি। সে বড় মজার দেখা দেখেছি এই দুনিয়াটাকে, ফক্কড়ের চোখ দিয়ে। মরে যাবার পর মরা-চোখের দৃষ্টি দিয়ে এতদিনের চেনা-জানা এই দুনিয়াটাকে কেমন দেখতে লাগবে, মানুষের গড়া সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা আর সংস্কৃতি তখন কোন্ রঙে রঙিন দেখব তা জ্যান্ত অবস্থাতেই ফক্কড় হয়ে দেখা হয়ে গেছে আমার। যাঁরা জ্ঞানী আর হিসেবী মানুষ তাঁরা বললেন—"এতে কার মাথাটি কিনেছ বাপু তুমি? মূল্যবান সময়টুকু ওভাবে অযথা অপব্যয় না করে দু' পয়সা উপরি উপার্জন আছে এমন একটি চাকরি জুটিয়ে কিছু কামিয়ে রাখলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারতে।" মূল্যবান হক্ কথা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু করবার মত কিছু না জোটার দরুনই যে ফক্কড় হতে গিয়েছিলাম। আর ফক্কড় হয়ে কপালে যা জুটল তাতে এমনই মজে গেলাম যে, তখন ভবিষ্যতের চিন্তাটি একবারও মনের কোণে উদয় হ'ল না। ফক্কড় জীবনের মজাই হচ্ছে ঐটুকু। মানুষ যখন ফক্কড় হয় তখন আর তার ভবিষ্যৎ থাকে না। দৈহিক আয়াস আমোদের কথা বাদ দিলে সেইটুকুই হচ্ছে ফক্কড়ের আসল সান্ত্বনা। বেঁচে থাকার আনন্দ সজ্ঞানে ষোল আনা উপভোগ করতে হলে ভবিষ্যৎ ভোলা চাই। ভবিষ্যৎ ভূতের ভয় বুকে নিয়ে মজা লোটা অসম্ভব।

সকলেই খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, রোজগারের চিন্তা করছে, কিংবা অপরে কেন তার মনের মত হয়ে চলছে না, এই নিয়ে হা হুতাশ করছে। কিন্তু নিজে যে বেঁচে আছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে, এই সামান্য কথাটি দিনে-রাতে ক'বার মনে পড়ছে কার। গৃহিণী যখন উনুন ধরাতে গিয়ে ঘুঁটের ধোঁয়ায় ঘর বোঝাই করে দেন তখন একবার বেঁচে থাকার কথাটা স্মরণ হয়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় বলে চিৎকার করে উঠি—'দম আটকে মারা গেলাম যে!' নয়ত বদ্যি এসে নাড়ী ধরে ঘাড় না নাড়া পর্যন্ত বেঁচে যে ছিলাম বা সমানে অনবরত নিঃশ্বাস যে নিচ্ছিলাম, এ কথাটি মনের কোণেও একবার উদয় হয় না।

কিন্তু আমার ফক্কড়-জীবনে প্রতি মুহূর্তে হাড়ে হাড়ে মালুম হয়েছে যে সশরীরে বেঁচে আছি। বেঁচে থেকে মৃত্যুকে চাখা বা মরে গিয়ে জীবনকে উপভোগ করাই ফক্কড়ত্বের আসল লাভ। এই লাভটুকু কি সত্যই তুচ্ছ করবার মত বস্তু!

এখন আর আমি ফক্কড় নই। একদা যাঁরা আমার পরমাত্মীয় ছিলেন সেই সারা ভারতের অসংখ্য ফক্কড়রা এখন আর আমায় চিনতেও পারেন না। সামনা-সামনি পড়ে গেলে পাশ কাটান। আমার আর তাঁদের মাঝে সন্দেহ অবিশ্বাসের উঁচু পাঁচিলটা মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। ফক্কড়-তন্ত্রের সর্বপ্রধান অনুশাসনটি অমান্য করে ঝপ্পড় বেঁধে তার তলায় মাথা গুঁজেছি যে এখন। ভাল করেছি না মন্দ করেছি, এ প্রশ্ন না তুলে এ কথা মানতে বাধ্য যে, ঝপ্পড়ের সঙ্গে ঝঞ্ঝাট যা জুটেছে তার তুলনায় সেই কৌপীন-সম্বল ফক্কড়ের জীবনে আনন্দ ছিল। সুখ না থাকুক স্বস্তি ছিল তখন। এখন সুখের মুখ তো দেখতেই পাই না, ঝামেলার উৎপাতে প্রাণ যাবার দাখিল হয়েছে। পদে পদে বাইরে ও ভেতরে বেধড়ক ঠোক্কর খাচ্ছি। কিন্তু আর একবার সেই ফক্কড়-জীবনে ফিরে যাওয়ার কথাও ভাবা যায় না যে।

যায় না, তার কারণ আমি বাঙালী। ফক্কড় হবার জন্যে সর্বাগ্রে যে কর্মটি করা প্রয়োজন তা শুধু ঝপ্পড় ছাড়া নয়, একেবারে বাঙলা দেশ জন্মের মত ত্যাগ করা। বাঙলা ভাষা ভুলেও না মুখে আনা, বাঙালীর খাদ্য ভাত মুখে তোলার দুরাশা মন থেকে মুছে ফেলা। অসংখ্য মঠ আখড়া আশ্রম আছে বাঙলায়, সেই সব আস্তানায় সাধু সন্ন্যাসী-মোহন্ত বাবাজীরা পরম শান্তিতে ভাত রাঁধছেন, ভোগ লাগাচ্ছেন। ভাত রান্না করতে স্থান চাই, জোড়জোড় চাই। টিক্কড় পুড়িয়ে খেয়ে বা ছাতু মেখে গিলে বাঙালী বাঁচে না। সেই জন্যেই ঘর ছেড়ে বাঙালী আশ্রমে আখড়া বানায়। আর যাদের ভাতের পরোয়া নেই তারা ঘর ছেড়ে খোলা আকাশের তলায় আশ্রয় নেয়। তাই ফক্কড় কথাটির সঙ্গে টিক্কড় আর লক্কড় বেশ খাপ খায়। ওর একটাকে ত্যাগ করলে অপর দুটির কোনও মানেই হয় না। তাই অবাঙালী ঝট করে ফক্কড় হতে পারে, কিন্তু বাঙালী তা পারে না।

যদিও কেউ পারে তার প্রাণ কাঁদে বাঙলার জন্যে। পুঁইশাক আর সজনে-ডাঁটার জন্যে জিভে জল না এলেও বাঙলার জন্যে বাঙালীর প্রাণ কাঁদবেই, বাঙলা ভাষায় দুটো কথা বলার জন্যে মনটা ছটফট করবেই। তাও বোধ হয় আসল কথা নয়, আসলে যে বস্তুর জন্যে বাঙলার ছেলের প্রাণ কাঁদে তা হচ্ছে এক জাতের গন্ধ, যা শুধু বাঙলা দেশের বাতাসেই মেলে। বর্ধমান না পৌছলে সে গন্ধ পাওয়া যায়

না, আর ওধারে সিলেট ছাড়িয়ে শিলং পাহাড়ে পা দিলেই সে গন্ধ হারিয়ে যায়। ঐ গন্ধটুকুই বাঙালীর জীবন। থাকুক সেই গন্ধের সঙ্গে মিশিয়ে সব রকমের মারাত্মক রোগের বীজাণু, তবু সেই গন্ধের লোভেই বার বার ছুটে এসেছি বাঙলায়। ভাদ্র মাসের পনেরো বিশ দিন পার হলে কেমন যেন একটা আকুলি-বিকুলি উঠত প্রাণের ভেতর। সুদূর কাথিওয়াড়ে বা কন্যাকুমারীতে বসে থাকলেও মন ছুটে আসত বাঙলা দেশে। আর কাছাকাছি গয়া কাশীতে থাকলে তো আর কোনও কথাই নেই। ফক্কড-তন্ত্রমতে অদৃশ্যভাবে ট্রেনের কামরায় আশ্রয় গ্রহণ। তারপর নামতে উঠতে আর উঠতে নামতে যেটুকু সময় ব্যয় হ'ত, একদিন হঠাৎ দেখতাম বর্ধমানের এধারে পৌঁছে গেছি। তখন পা দু'খানা আছে কিসের জন্যে?

আর একটি পথ ছিল বাঙলায় ঢোকার। এলাহাবাদ থেকে ছোট রেলে চেপে লালমান, লালমনি থেকে সেই গাড়িতেই আমিনগাঁও। তারপর কামাখ্যা দর্শন করে গৌহাটিতে গাড়িতে উঠে ভায়া লামাডিং বদরপুর—সোজা চন্দ্রনাথ। তখন ছিল আসাম বেঙ্গল রেল। মাত্র পাঁচ টাকার একখানি টিকিট কেটে একবার গাড়িতে উঠে কোথাও যাত্রাবিরতি না করে ওই লাইনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছনো যেত।

পাণ্ডুঘাটের স্টেশন-মাস্টারমশাই দু'টাকা উপার্জন করতেন। তিনি কিনে দিলেন একখানি পাঁচ টাকার টিকিট। ঝাড়া আটচল্লিশ ঘণ্টার ওপর একটানা গাড়িতে বসে থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে নামলাম।

আকাশে বাতাসে বাজছে মায়ের বোধনের সুর। রক্ত নেচে উঠল ফক্কড়ের পোড়া-কাঠ দেহের মধ্যে, বাঙলার দুর্গাপূজা যে মিশে রয়েছে রক্তের সঙ্গে। প্রায় দশ বছর তখন কেটে গেছে বাঙলার বাইরে। ঠিক করলাম, যেভাবে হোক এবার থাকবই বাঙলা দেশে বিজয়া দশমী পর্যন্ত।

সারা শহর চষে বেড়ালাম জুতসই একটি আস্তানার খোঁজে। মঠ মন্দির আশ্রম সঙ্ঘ কত যে রয়েছে শহরময়, তা গুনে শেষ করা যায় না। ফক্কড় দেখে দূর থেকেই হুঁশিয়ার হয় সকলে। মুখে হিন্দী ছোটে—"যাও, যাও, চলা যাও হিঁয়াসে, কুছ নেই মিলেগা।" আবার বিশেষ দয়াল কেউ একটি পয়সা ছুঁড়ে দেন। অর্থাৎ শহর-সুদ্ধ ইতর-ভদ্র সকলের ধারণা হয়েছে যে আমি একটি উড়ে বা মেড়ো। বহুদিন পরে এক পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মূর্তিখানি দর্শন করলাম। বুঝলাম, কাউকে দোষ দেওয়াও যায় না। চুল, দাড়ি, পোড়া কাঠের মত রঙ, চোয়াড়ের মত হনু-উঁচু মুখ, তার ওপর যে চমৎকার

বেশভূষা ধারণ করে আছি শ্রীঅঙ্গে—তা দেখে আমায় বাঙালী সন্তান ধারণা করার সাধ্য বোধহয় স্বয়ং বাবা চন্দ্রনাথেরও হবে না।

তখন হঠাৎ একটি উচ্চশ্রেণীর ফন্দি উদয় হ'ল চিত্তে। মা দুর্গা ছেলেপুলে নিয়ে বাঙলা দেশে এসে তিন চার দিন কাটিয়ে যান প্রতি বছর। খাওয়া-দাওয়া করেন, কাপড়-চোপড় বারবার বদলান, পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে স্নানটানও করান দেখেছি, কিন্তু কেউ একটি বাপের জন্যে একটিও কথা কন না তো! কেন?

কারণ এ দেশে মুখে ফড়ফড় করালেই ফাজলামি করা বলে। ফাজলামি যে করে তার নাম ফক্কড়। মুখ চালানো বন্ধ করলে ফক্কড় আর তখন ফক্কড় থাকে না, ভবিষ্যুক্ত নায়েক বলে গণ্য হয়। মা দুর্গা ছেলেমেয়ে-ক'টিকে শাসিয়ে নিয়ে আসেন—"খবরদার কেউ মুখ খুলিসনি আমার বাপের বাড়ির দেশে, তাহলে নিন্দে হবে সেখানে। লোকে ফক্কড় বলবে।" কাজেই ছেলেমেয়েরা থাকে মুখ বুজে, সেই সঙ্গে মা ও চুপ করে থাকেন।

বাঙলায় এসে কথা বলার ফাঁকও পান না তাঁরা। মূল সভাপতি, প্রধান অতিথি, টাকার সম্পাদক, সাধারণ সভ্য ও অসাধারণ অসভ্য—তার সঙ্গে ঢাক ঢোল সানাই আর "সবার উপরে যে মাইক সত্য" সেই মাইক—এই সমস্ত মিলিয়ে এত রকমের [illegible] কথা আওড়ানো হয় এক একটি সাবজনীন পূজায় যে মা'র বা তাঁর ছেলেমেয়ে ক'টির আর কিছু বলবার দরকারই করে না।

ঠিক করলাম মুখ বন্ধ করে থাকব। নিশ্চিন্তে পূজার ক'টি দিন বাঙলায় কাটাবার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে মা দুর্গা আর তাঁর ছেলেমেয়েদের মত মৌনব্রত ধারণ করে থাকা। মৌনীবাবার দেদার সুবিধে। বেঁচে থাকা আর কথা বলা এ দু'টি কর্ম এমনভাবে এক সঙ্গে জট পাকিয়ে গেছে যে, কেউ বেঁচে থেকেও মুখ চালাচ্ছে না, এই রকমের ব্যাপার দেখলে সকলে তাজ্জব বনে যায়। অতি সহজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হল মৌনব্রত নেওয়া। মৌনবাবা কত দরের সাধু তা কেউ যাচাই করতে আসে না। স্রেফ ফাঁকি দিয়ে চুপ করে ভগবান বস্তুটিকে হাতের মুঠোয় পোরার উপায় কি, সে প্রশ্ন করার পথ নেই মৌনীবাবার কাছে। যার মুখ বন্ধ তার কাছে লটারি বা রেসে টাকা জেতবার মন্ত্র জানতে চাওয়াও নিরর্থক। ভবিষ্যৎ বাতলাবার আব্দার করে তার নাকের ডগায় হাতের চেটো মেলে ধরাও নেহাত বিড়ম্বনা।

সকলের মাঝে থেকেও মৌনী সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এ যেন নিজেকে সিন্দুকে পুরে ফেলার সামিল। নির্জন স্থান খুঁজতে গভীর জঙ্গলে ঢুকে বাঘ সাপ মশার খপ্পরে পড়বার দরকার কি, ঘরে বসে মৌনব্রত নিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়। দেখবার মত

চোখ আর শোনবার মত কান যদি থাকে, তাহলে চারিদিকের হালচাল দেখে শুনে হাজার রকমের মজা পাওয়া যায়। অচেনা অজানা জায়গায় মৌনব্রতীর আর একটি বিশেষ সুবিধেও আছে। গায়ে তো আর কারও লেখা থাকে না যে সে কোন্ মুল্লুকের মানুষ। মুখ দিয়ে কোনও ভাষা না বার হলে কারও ধরার সাধ্য নেই যে, মানুষটা বাঙালী মাদ্রাজী না উড়িষ্যাবাসী। উড়ে মেড়ো পাগল বা ভিখারী এই ধরনের কিছু একটা ধারণা হলে বাঙালী তখন অবাধে তার সামনে প্রাণের কথা আলোচনা করে। এই সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করে বাঙলা ভাষায় কথা কইবার লোভ সংবরণ করলাম।

চট্টগ্রাম তিনতলা শহর। ছোট ছোট টিলাব ওপর কাঠ টিন আর ছেঁচাবাঁশেব তৈরী ছবির মত সুন্দব নানা বঙের বাঙলোগুলি হচ্ছে ওপবতলা। ওসব উঁচু জায়গায় দেশী বিলেতী সাহেব মেমসাহেব লোক উঁচুদরের আভিজাত্য বজায় রাখেন। ধারে-কাছে ঘেঁষতে গেলে দামী কুকুরে তাড়া করবে ফক্কড়কে।

তার পরের তলায় বাস করেন বাবুরা, যাঁরা নিজেদের কালচাবড্ অর্থাৎ কৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান করেন। সেই সব পাড়াতেই পূজার ধুমধাম। কিন্তু ফক্কড় দেখলে ওঁরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করেন। ওসব পাড়ায় যাওয়া-আসা কবেন সিল্কের গেরুয়া লুটিয়ে শ্রীশ্রী১০৮শ্রী শ্রীমৎ স্বামী তৎপুরুষানন্দ পরমহংস মহারাজারা। নজব উঁচু বাবপাড়ার, কানও উঁচু পর্দায় বাঁধা। বাণী শুনতে না পেলে মন ওঠে না কারও। মৌনব্রত ফক্কড়ের কোনও আশা নেই সেখানে।

মগপাড়া বুদ্ধপাড়া মুসলমানপাড়া হচ্ছে সব নিচের তলা। পচা পাঁকের দুর্গন্ধ অগ্রাহ্য করে সেসব পাড়ায় গিয়েও কোনও লাভ নেই। নিজেদেব জান বাঁচাতেই তাদেব জানান্ত, পরের দিকে নজর দেবাব ফুরসৎ কোথায়?

বাকী থাকে বাজার। কয়েক ঘর কাঁইয়া অর্থাৎ মাড়োযারী মহাজন যদি থাকেন বাজারে তাহলে দু'দশটা ফক্কড়ের টিক্কড় লক্কড় অনায়াসে জুটবে কিছুদিন। মৌনীবাবার কদর আছে সেখানে, না মাঙলেও সব কিছু মিলবে। সুতরাং বাজারের দিকেই পা বাড়ালাম। যথেষ্ট মাড়োয়ারী রয়েছেন। নিশ্চিন্ত হয়ে রণছোড়জীর মন্দিরের পাশে হনুমানজীর মন্দিরের সামনে এক পাট-গুদামেব ছায়ায় কাঁধ থেকে ছেঁড়া কম্বলের টুকরাখানি নামালাম। পাট-গুদামের ওপাশে নদী, নদীর নাম কর্ণফুলী।

বেশ গিন্নী-বান্নী গোছের চেহারা কর্ণফুলীর, নিজের ঘর-গৃহস্থালী নিয়ে মহাব্যস্ত। বড় বড় জাহাজ আসছে যাচ্ছে, ঠাসাঠাসি করে রয়েছে অসংখ্য সাম্পান। সেই সব সাম্পানে জন্ম মৃত্যু বিবাহ সব কিছু সমাপন করছে চীনা

বর্মী আরাকানী আর চট্টগ্রামী মগ। দিবারাত্র ভোঁ ভোঁ, সোঁ সোঁ, হৈ-হল্লা চলছেই কর্ণফুলীর সংসারে।

বহু বড বড পাট-গুদাম নদীর পাডে। বিনা আড়ম্বরে দারোয়ানজীরা টিক্কড বানাবার আটা, রামরস আর লক্কড জুগিয়ে মৌনীবাবার সেবা শুরু করে দিলে। কমিটি বানালে না, প্রস্তাব পাশ করলে না, চাঁদা তুললে না বা একজন লোককে খেতে দিচ্ছি এই সংবাদটি ছাপবার জন্যে সংবাদপত্রের দ্বারস্থ হ'ল না। বাবু-পাডায় আশ্রয় মিললে এতক্ষণে চুলোচুলি লেগে যেত সেখানে। যে সাধু পুলিশ-সাহেবের বাডি এসেছেন, তিনি ডেপুটি বাবুর শ্বশুর মহাশয়ের আমদানী সাধুর চেয়ে নামে ও দামে ভাঁটো না খাটো—এই নিয়ে গণ্ডা-কতক বিচার-সভা বসে যেত। যে বাবুর বাডিতে আশ্রয় মিলত, তিনি সাধুর অলৌকিক মহিমা প্রচার করতে এমন ভাবে কোমর বেঁধে লেগে যেতেন যে, তাঁর মুখরক্ষার জন্যে দিনে ছত্রিশবার চোখ উল্টে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে সমাধিমগ্ন হ'তে হ'ত সাধুকে।

পাট-গুদামের ছায়ায় বসে সে সব ভিট্‌কিলিমির কোনও প্রয়োজনই হ'ল না। দারোয়ানজীরা সহজ মানুষ, তাদের সোজা কারবার। যে কেউ একবার আধ সের আটা আর খানকয়েক লকডি নামিয়ে দিয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে ফুরসৎ মিললে এসে সামনে বসে ছিলিম টানে। বাডাবাড়ির ধার ধারে না তারা। নিশ্চিন্তে বসে রইলাম গ্যাঁট হয়ে।

মহালয়া।

ভোরের আলোয় আগমনী সুর। বাতাসে পূজো-পূজো গন্ধ। নতুন শিশিরে গায়ে-দেওয়া ন্যাকডাখানি ভিজে গেছে। আকাশ বাতাস আলো শিশির যেন ব্যঙ্গ করছে আমার সঙ্গে। ফক্কড এখানে বড অসহায়, বড বেমানান।

আকাশের আলো মনে করিয়ে দেয় বহুকাল আগের পূজার দিনগুলি। তখনকার মহালয়ার প্রভাতে যে হাসি খেলা করত আকাশের চোখে, আজও সেই হাসি খেলা করছে। কিন্তু বদলে গেছি আমি, সে আমি কবে মরে গেছি। কেন আবার ফিরে এলাম এই লক্ষ্মীছাডা বিতিকিচ্ছি চেহারা নিয়ে বাঙলার পূজার আকাশ বাতাস ঘুলিয়ে তুলতে। ফক্কড এখানে আপদের সামিল ব্যাপার। যে মন নিয়ে বাঙালী মায়ের পূজা করে—সে মনের সুর কেটে যাবে ফক্কডের উপস্থিতিতে। কেন মরতে এলাম এই হাডহাভাতে মূর্তি নিয়ে বাঙলার শিশির-ভেজা মন-আকাশে কালি লেপে দিতে!

দূরে আছি দূরেই থাকব। তফাৎ থেকে পরের মত আর একটিবার শুধু দু'

চোখ মেলে দেখে যাব বাঙলার মাতৃ-আরাধনা। তার বেশি আর কিছু আশা করার স্পর্ধা নেই ফক্কড়ের, থাকাও অনুচিত।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহর ঘুরছি। কোথায় ক'খানি প্রতিমায় রঙ দেওয়া হচ্ছে তাই দেখে বেড়াচ্ছি। চারিদিকে হৈ-হৈ লেগে গেছে, শহর-সুদ্ধ মানুষ বেচা-কেনায় ব্যস্ত। বড় বড় প্যাণ্ডেল সাজানো হচ্ছে। লাল সালুর ওপর তুলো দিয়ে বা সোনালী রুপালী ফিতে দিয়ে লেখা সার্বজনীন দুর্গোৎসব। কয়েকখানি ঠাকুর-দালানের প্রতিমাও সাজানো হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর-দালানের পূজা যেন বড় প্রাণ-হীন ফ্যাকাশে গোছের ব্যাপার। প্যাণ্ডেলের পূজার প্রদীপ্ত সমারোহের আঘাতে ঠাকুর-দালানের পূজা বড়ই ঝিমিয়ে পড়েছে।

দূর থেকে চেয়ে থাকি আর লোভ হয়। আমায় যদি ওরা ডাকত। কাজ-কর্ম করবার জন্যে কত লোকেরই তো দরকার। যে কোনও কাজে আমায় লাগিয়ে দিলে বাঁচতাম। ওদেরই একজন হয়ে যেতাম। বহুকাল পরে আবার মেতে উঠতাম পূজার কাজে। মা কি মুখ তুলে চাইবেন আমার দিকে ?

শেষ পর্যন্ত মা চাইলেন মুখ তুলে।

পঞ্চমীর সন্ধ্যা। এক পূজামণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মণ্ডপে বাতি জ্বালাবার তোড়জোড় চলেছে। একটু পরে উদ্বোধক, প্রধান অতিথি ইত্যাদি মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণের শুভাগমন হবে। সকলেই ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কারণ বাতি জ্বলছে না। সমস্ত বাতি একবার জ্বলেই আবার দপ করে নিভে যাচ্ছে। বার পাঁচ-ছয় এ রকম হ'ল। হৈ-হট্টগোল বেধে গেল চারিদিকে। অন্ততঃ হাজার দুয়েক স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত মণ্ডপের মধ্যে। উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এলেন বলে। এধারে আলো তো জ্বলে না কিছুতেই। একি কম আপসোসের কথা!

দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছি। যখন সাধু ছিলাম না, তখন ইলেকট্রিকের কাজে হাত পাকিয়েছিলাম। সেই অ-সাধু জ্ঞানটি এতদিন পরে কাজে লেগে গেল। কোথায় গোলমাল হচ্ছে দূর থেকেই তা বেশ বুঝতে পারছি, আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, এতগুলি মানুষের মধ্যে কারও মাথায় ঐ সামান্য ব্যাপারটুকু ঢুকছে না কেন! শেষে আর চুপচাপ না থাকতে পেরে এগিয়ে গেলাম। ঘড়াঞ্চি ঘাড়ে করে যাঁরা হিমসিম খাচ্ছিলেন তাঁদের কাছে গিয়ে জোড়হাতে ইশারা করলাম—আমায় একবার ঘড়াঞ্চিটা দেওয়া হোক। থতমত খেয়ে গেলেন সকলে। এ ব্যাটা ভিখিরী না পাগল এল এই সময় জ্বালাতে! একে ঢুকতেই বা দিলে কে প্যাণ্ডেলে! দু'জন তেড়ে এলেন—দাও ব্যাটাকে প্যাণ্ডেল থেকে বার করে।

আমিও নাছোড়বান্দা, বার বার ওঁদের জোড়হাতে বোঝাবার চেষ্টা করছি,

আমাকে একবার ঘড়াঞ্চিটা দাও, এখনই ঠিক করে দিচ্ছি আলো।

শেষে এক ভদ্রলোক তেড়ে উঠলেন—"দাও না হে লোকটাকে একবার ঘড়াঞ্চিখানা। দেখাই যাক না ও কি করে। তোমাদের কেরামতি তো সেই বেলা চারটে থেকে চলছে, এধারে রাত তো অর্ধেক কাবার হতে চলল।"

চারিদিকে নানারকম টিপ্পনী কাটা শুরু হ'ল।

হয়েই হয়েছে, ও ব্যাটা সারবে লাইন। আজ আর উদ্বোধন হচ্ছে না হে। না-হয় আনাও তাড়াতাড়ি গোটাকতক হ্যাজাগ। আরে লোকটা সত্যিই যে উঠল ঘড়াঞ্চিতে। পড়ে না মরে, তাহলেই কেলেঙ্কারি। কোন্ দেশের হ্যা লোকটা? নিশ্চয়ই মাদ্রাজী। না হে না, লোকটা খাঁটি উড়ে। বোধ হয় ইলেকট্রিকের মিস্ত্রী ছিল আগে, এখন ভেক নিয়ে ভিক্ষে করছে।

শুনতে শুনতে যেটুকু করবার করে ফেললাম। দুটো তার আলাদা করে দিলাম। যেখানে গোলমাল হচ্ছিল, সেখানটা কেটে বাদ দিয়ে অন্য তার জুড়ে দিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ হ'ল, আলো জ্বলতে লাগল নির্বিঘ্নে।

সম্পাদক মশাই এখন এগিয়ে এসে হিন্দিতে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর কথা বুঝতে পারছি কিনা। ডান হাতের তর্জনীর মাথায় বুড়ো আঙুলটি ঠেকিয়ে তাঁর সামনে ধরে নাক বরাবর তুলে বারবার ঘাড় নাড়তে লাগলাম। অর্থাৎ একটু একটু বুঝতে পারছি।

কথা বলছ না কেন?

মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে সম্পাদকের মুখ তুলে হাঁ করলাম। সেই সঙ্গে তর্জনীটি মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে মাথা নাড়লাম কয়েকবার। অর্থাৎ বোবা, কথা বলার শক্তি নেই।

কোথাকার লোক তুমি?

ডান হাত মাথার ওপর ঘুরিয়ে দিলাম। মানে, যা খুশি বুঝে নাও।

তখন ওঁদের ভেতর পরামর্শ শুরু হ'ল। পুজোর ক'দিন লোকটাকে আটকে রাখলে কেমন হয়। দুটো খেতে দিলে এটা সেটা করিয়েও নেওয়া যাবে। আবার যদি ইলেকট্রিক বেগড়ায় তখন লোকটা কাজে লাগবে। পুজোর বাজারে একজন মিস্ত্রী ডাকতে গেলে লাগবে অন্ততঃ নগদ আড়াইটি টাকা। আর সময়মত মিস্ত্রী খুঁজে পাওয়াও সহজ নয়। সুতরাং আমাকে আটকে রাখাই সাব্যস্ত হয়ে গেল। তবে সকলেই খাস চট্টগ্রামী ভাষায় বলাবলি করলেন যে, কড়া নজর রাখা উচিত লোকটার ওপর। বলা তো যায় না, যদি সটকায় কিছু নিয়ে। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার সামনে এসে তাঁর নিজস্ব হিন্দীতে চিৎকার করে বলতে লাগলেন

—"এই ব্যাটা জংলী ভূত, কেন ভিক্ষে ক'রে মরবি পূজোর ক'দিন। থাক আমাদের এখানে, জলটল তুলবি, এটা-সেটা করবি, খেতে পাবি। তবে কিছু নিয়ে যেন গা ঢাকা দিসনি। আমাদের পাড়ার ছেলেরা ধরতে পারলে পিঠের ছাল তুলে ছাড়বে।"

উদ্বোধন হয়ে গেল।

প্রতিমার সামনের পর্দা টানতে যে মহামান্য ব্যক্তিটিকে সসম্মানে আনা হয়েছিল, কি জানি কেন, তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগলেন আর রুমালে চোখ মুছতে লাগলেন। বক্তৃতাটি শোনাই গেল না। তা হোক, সকলেই কিন্তু মনে প্রাণে বুঝলেন যে, উদ্বোধন-ক্রিয়াটি সার্থকভাবে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। মায়েব নামে যাঁর চোখে জল আসে তাঁকে ধরে এনে উদ্বোধন করানো গেল, এজন্যে প্রত্যেকেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলেন। উদ্বোধনের জয়গান গাইতে গাইতে সকলে খুশী হয়ে ঘরে ফিরলেন।

তখন বসল তাঁদের ঘরোয়া সভা, দুর্গোৎসব কমিটির নিজস্ব বৈঠক। মহানবমীর দিন যে কাঙ্গালী-ভোজন করানো হবে, তাই নিয়ে আলোচনা চলল। এক পাশে বাঁশে ঠেসান দিয়ে মাটিতে বসে সব শুনলাম। ওঁরা কেউ নজর দিলেন না আমার দিকে। বাঙলা ভাষা যখন বুঝতে পারবে না তখন থাকুক বসে।

বৈঠকের আলোচনা শুনে জানলাম, এই পূজা কমিটির প্রাণ হচ্ছেন ওঁদেব সুযোগ্য সম্পাদক সুরেশ্বরবাবু, চট্টগ্রাম কলেজের তরুণ অধ্যাপক। তিনি সম্পাদক হবার পর থেকে এই সার্বজনীন পূজার সুনাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখানে আজকাল যেভাবে কাঙ্গালী-ভোজন করানো হয় তা আর অন্য কোথাও হয় না। শুধু দু'হাতা খিচুড়ি দিয়ে বিদেয় করা হয় না কাউকে, বসিয়ে পাতা-গেলাস দিয়ে ডাল-ভাত-তরকারি-চাটনি আর বোঁদে খাওয়ানো হয়। আগে যে খরচ হ'ত, তার চেয়ে এমন কিছু বেশি খরচ হয় না এখন। তৃপ্ত করে কাঙ্গালীদের খাওয়ান সম্পাদক মশাই। তিনি বলেন—"কেন ওরা কি মানুষ নয় নাকি—তোমাদের মত ওরাও খেতে জানে। গরীব ছোটলোক বলে তারা যেন মানুষ নয়।" হক কথা শুনে সকলে চুপ করে থাকে।

আগে কাঙ্গালী-ভোজনের জিনিসপত্রে টান পড়ত। যত লোকের আয়োজন করা হ'ত তার অর্ধেক লোক খেতে বসলেই খাবার জিনিস যেত ফুরিয়ে। কাঙ্গালী জাতটাই হাড় নচ্ছার কিনা। খেতে না পারলেও চেয়ে চেয়ে নেবে, তারপর পাত সুদ্ধ আঁচলে বেঁধে নিয়ে উঠে চলে যাবে। এখন আর সেসব হবার উপায় নেই। অর্থবিদ্যার অধ্যাপক সুরেশ্বরবাবু একা একশ' জন হয়ে স্বয়ং পরিবেশন করেন। যে

যতটুকু খেতে পারবে তার বেশি ছিটেফোঁটা ওঁর হাত হতে গলে পড়বে না। কাঙ্গালীরা জব্দ থাকে ওঁর কাছে। শহরের গণ্যমান্য সকলে দাঁড়িয়ে দেখেন কাঙ্গালী-ভোজন করানো। আর এক বাক্যে সুখ্যাতি করেন সম্পাদক মশায়ের।

চাল-ডালের হিসেব শেষ করতে অনেকটা রাত হয়ে গেল। বৈঠক শেষ হ'ল কখন তা বলতে পারব না। ওরা কেউই কিছু যখন বলছেন না আমায়, তখন আর কি করব। ফিরে চললাম নিজের আস্তানায়। দিনান্তে একবার টিক্কড ন' পোড়ালে পোড়া পেট যে প্রবোধ মানে না।

যে মাঠে প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে, সেখান থেকে বড় শহর পর্যন্ত একটি সোজা চওড়া রাস্তাও বানানো হয়েছে মাটি ফেলে। দু'টি তোরণ বাঁধা হয়েছে সেই পথটির দু-মুখে। অন্যদিকে আর একটি সরু গলি আছে, যা দিয়ে গেলে বাজারে পৌঁছানো যায়—অনেক কম সময়ে। রাস্তা কমাবার জন্যে সেই গলির মধ্যেই ঢুকলাম। গলির ভেতর বেশ অন্ধকার। তাতে কিছমাত্র যায় আসে না। অন্ধকারে ফক্কড়ের চোখ জ্বলে। হনহন করে পা চালালাম।

একটা বাঁক ঘুরতেই কানে এল—"ঐ যে আসছে।"

নজর করে দেখলাম, ডান ধারে একটা বারান্দার ওপর দু'টি প্রাণী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

"আ মরণ—আবার এগিয়ে চলল যে লো।"

একজন নেমে এল বারান্দা থেকে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল আমার পিছনে।

"বলি রাগ করে চললে কোথায় নাগর ?"

একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন, গায়ে হাত দেয় আর কি আঁৎকে উঠল—"ওমা, এ কে লো। এ একটা ভিখিরী—এ মড়া এখন মরতে এল কেন এখানে ?"

দুম দুম করে ছুটে গেল। হাসির আওয়াজ শুনলাম পিছনে। মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে জোরে পা চালালাম। ভাবনার কি আর কূল-কিনারা আছে।

ফক্কড়। ফক্কড়ের মাংস শকুনেও ছোঁয় না।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালাম—তারাগুলোও আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। ভয়ানক রাগ হ'ল—বোধ করি নিজেরই ওপর।

অহেতুক সেই রাগের জ্বালায় তখন ছুটতে লাগলাম নির্জন গলিটা পার হবার জন্যে।

ষষ্ঠী—

ভোরবেলা স্নানটান শেষ করে তাড়াতাড়ি চললাম সেই পূজা-মণ্ডপে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই পৌঁছতেই পড়ে গেলাম স্বয়ং সম্পাদক মশায়ের নজরে। চিনতে পারলেন, হাত নেড়ে কাছে ডেকে হিন্দীতে হুকুম করলেন—"যাও, কাজে লেগে যাও। সাধুগিরি ফলিয়ে চুপ করে বসে থাকলে কিছুই মিলবে না এখানে। জলের ড্রামগুলো ভর্তি করে ফেল।"

নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন আমায়—সামনের বাড়ির ছাদের ওপর। কাঙ্গালী-ভোজনের রান্না সেই ছাদের ওপরই হবে—বড় বড় তিনটে ড্রাম বসানো রয়েছে সেখানে। আমার হাতে একটা মস্ত পেতলের কলসী দিয়ে নিচের উঠানে একটা টিউব-ওয়েল দেখিয়ে দিলেন। শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সামান্য একটু বক্তৃতা দিয়ে অন্য কাজে চলে গেলেন তিনি। তবে যাবার সময় সেই বাড়ির কর্তাকে বলে যেতে ভুললেন না একটি কথা। কথাটি হচ্ছে—লোকটার ওপর নজর রাখবেন, কলসী নিয়ে যেন গা-ঢাকা না দেয়।

সুতরাং শ্রমের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বেলা ন'টা পর্যন্ত সমানে নিচে থেকে ওপরে জল তুললাম। আরও দু'জন লাগল জল তুলতে। ওরা আমার মত শুধু শুধু শ্রমের মর্যাদা রক্ষা করতে আসেনি। দস্তুরমত মজুরি নেবে।

জল তোলা শেষ হতে দেখি ঘাড়ে আর হাতে ব্যথা হয়ে গেছে। ভাবলাম—দূর ছাই, এবার চলে যাই। কিন্তু চলে যাওয়া সত্যিই হ'ল না। একটা হ্যাংলা বেহায়াপনা পেয়ে বসেছে তখন আমাকে। নিজেকে নিজে বোঝালাম—না, পালালে চলবে না, আবার কবে বাঙলায় আসা ঘটে উঠবে তার ঠিক কি? এ জীবনে দুর্গাপূজার সময় বাঙলায় আসা আর না-ও ঘটতে পারে। এই রকম পূজার কাজকর্ম করবার সুযোগ আর কখনও যক্কড়ের ভাগ্যে না-ও জুটতে পারে।

আবার ফিরে গেলাম প্যাণ্ডেলে। সেখানে সকলেই মহাব্যস্ত, কারও কোনও দিকে নজর দেবার অবকাশ নেই। সকলে সকলকে হুকুম করছেন। প্যাণ্ডেল সাজানো, মাইক ফিট করা, বিকেলে যে ফাংশন হবে তার ব্যবস্থা করা—এই সমস্ত নিয়ে সকলে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যেই কয়েকবার সম্পাদক মশায়ের চোখে পড়ে গেলাম। তিনি হুকুম করলেন সামনের বাড়ি থেকে শতরঞ্চি বয়ে আনতে। সে কাজটি শেষ করতেই আবার হুকুম হ'ল চেয়ার সাজাতে। বেলা দেড়টা-দুটো নাগাদ যে যার বাড়ি চলে গেলেন নেয়ে খেয়ে আসতে। গরু ছাগল প্যাণ্ডেলে না ঢোকে—এজন্যে একজন লোক থাকা প্রয়োজন। সুতরাং আমার ঘাড়েই সে কাজের ভার পড়ল।

আমারও কোনও আপত্তি নেই তাতে। সন্ধ্যার পর আস্তানায় ফিরে টিক্কড পোড়াব, এখন এতটা পথ গিয়ে ফিরে আসা পোষাবে না। এঁদের ফাংশনটি না দেখে ফিরছি না আজ। কিন্তু তেষ্টা পেয়ে গেছে তখন, জল তুলে আর শতরঞ্চি বয়ে বেশ ক্লান্তও হয়ে পড়েছি। আমার সামনেই কর্মকর্তারা বার বার চা-টা খেলেন, সে সবের ব্যবস্থাও রয়েছে তাঁদের জন্যে। কিন্তু এত ব্যস্ত ওঁরা যে, আমার কথাটা কারও বোধ হয় মনেই পড়ল না। কি আর করি—সেই টিউব-ওয়েল থেকে এক পেট জল খেয়ে এসে বসে রইলাম গেটের পাশে গরু ছাগল তাড়াতে।

কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হৈ-চৈ করে খেলা করছে মণ্ডপের ভেতর। গেটের বাইরে রাস্তার পাশে একটি বুড়ো লোক, সামনে একটা তোবড়ানো টিনের বাটি পেতে, সেই সকাল থেকে বসে আছে। মাথা নিচু করে বসে একঘেয়ে সুরে সে চেঁচাচ্ছে। তার বক্তব্য হচ্ছে—সে অন্ধ নাচার, কোনও কিছু করে খাবার উপায় নেই তার, তাকে এক পয়সা দান করলে দাতা রাজা হবেন এবং অক্ষয় স্বর্গ লাভ করবেন। এই ক'টি কথাই অনবরত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে সে ঘ্যানঘ্যান করে। যেন একটা কথা-বলা কল, দম দিয়ে কে বসিয়ে রেখে গেছে, দম না ফুরোলে কিছুতেই থামবে না। কি যে বলছে সেদিকে ওর বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গেছে, নিরবচ্ছিন্ন কান্নার মত বার হচ্ছেই সেই সুর ওর ভেতর থেকে। একমাথা-পাকা-চুল সুদ্ধ মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বসে আছে লোকটি, ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কথাগুলো যেন ওর মাথা দিয়ে বা সর্বাঙ্গ দিয়ে বার হচ্ছে, মুখ দিয়ে নয়।

উঠে গেলাম লোকটির সামনে। কেউ তো নেই এখন, এ সময় একটু থামুক না। অনর্থক এখন চেঁচিয়ে মরছে কেন?

ওর সামনের টিনের বাটিতে পড়ে আছে মাত্র তিনটি পয়সা। ভুলে গেলাম যে, বোবা মানুষ আমি। নিচু হয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—"শুনছ কর্তা—এখন আর চেঁচিও না। এখন সবাই চলে গেছে এখান থেকে। কে শুনছে তোমার কথা।"

ও মাথা তুললে চোখ পিটপিট করছে—যেন সত্যিই অন্ধ। জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় গেল সব?"

বললাম, "এখন খাওয়া-দাওয়া করতে বাড়ি গেছেন সকলে।"

ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল বুড়ো। আঁকু-পাকু করে টিনের বাটি থেকে পয়সা তিনটে তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজে ফেললে। সেই সঙ্গে গজ গজ করে কি সব বলতে লাগল, যার একবর্ণও আমি বুঝলাম না।

হাউমাউ করে উঠল কে আমার পেছনে। একটি স্ত্রীলোক আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বুড়োর বাটির ওপর। পরমুহূর্তেই একটি কানফাটা চিৎকার। খাঁটি চাটগাঁইয়া ভাষায় চেঁচাচ্ছে আর ধেই ধেই করে নাচছে স্ত্রীলোকটি। কি যে হ'ল, বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ছুটে এল লোকজন, ভিড় জমে গেল আমাদের চারিদিকে। স্ত্রীলোকটি চেঁচাচ্ছে, নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে আর আমাকে দেখিয়ে কি সব বলে যাচ্ছে, যার কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়। কিন্তু আমি না বুঝলে কি হবে, যাবা বোঝবার তারা সবই বুঝলে। ফলে তৎক্ষণাৎ সবাই মারমুখো হয়ে উঠল আমার ওপর। একটি তরুণ এগিয়ে এসে আমার একটা হাত চেপে ধরলে।

"শালা চোর বার কর্ কি নিয়েছিস বুড়োর বাটি থেকে।"

ভিড় ঠেলে সামনে এলেন এক ভদ্রলোক। তাঁকে চিনতে পারলাম, সামনের বাড়ির কর্তা। সকালে জল তোলবার সময় কলসী নিয়ে না পালাই আমি, সেজন্যে আমার উপর নজর রাখবার ভার দেওয়া হয়েছিল যাঁকে। যে ছোকরা আমার হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে বুড়োর পয়সা ফেরত পাবার জন্যে সে বোধ হয় ওঁর ছেলে। ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তারপর ধমক দিলেন—"ছেড়ে দে—ছেড়ে দে শীগগির হাত।"

তখন অনেকের হাত নিশপিশ করছে। যার যা মুখে আসছে বলছে—"দে ঘু'ঘা লাগিয়ে ব্যাটাকে, খুঁজে দেখ ওর কাছে কি আছে, হারামজাদা পাকা বদমাইশ, চুল দাড়ি গজিয়ে ভস্ম মেখে সাধু সেজে মানুষের গলায় চাকু চালায়।"

যিনি আমার হাত ছাড়ালেন তিনি প্রচণ্ড ধমক দিলেন সকলকে। গোলমাল কমল একটু। তখন তিনি এগিয়ে গেলেন চোখ-পিটপিট অন্ধ বুড়োর দিকে।

"তোমার বাটি থেকে পয়সা নিয়েছে কেউ?"

স্ত্রীলোকটি কি বলতে গিয়ে এক দাবড়ি খেলে। বুড়ো গোঁ গোঁ করে কি জবাব দিলে। তখন তার কাছে যা আছে, সব বার করতে হ'ল। গোনা হ'ল—বার আনা তিন পয়সা।

আমার কোমরে-জড়ানো ন্যাকড়ার টুকরোটা খুলে ঝেড়ে দেখা হ'ল, হাঁ করিয়ে মুখের ভেতর দেখা হ'ল, কৌপীনও খুলতে হ'ল আমাকে, মাথার চুলের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল। না, একটি কানাকড়িও নেই কোথাও।

তখন আর একচোট সকলে মার মার করে উঠল স্ত্রীলোকটির ওপর। সে মুখ নিচু করে বুড়োর হাত ধরে চলে গেল।

এমন সময় স্বয়ং সম্পাদক মশাই পান চিবোতে চিবোতে উপস্থিত হলেন।

সামনের বাড়ির কর্তামশাই পড়লেন তাঁকে নিয়ে।

"বলি ব্যাপার কি হে সুরেশ্বর, এই লোকটা যে সকাল থেকে খাটছে, এর খাবার ব্যবস্থা কোথাও করেছ?"

আর যাবে কোথা! বিরাট হৈ-চৈ লেগে গেল। সম্পাদক মশায় তম্বিতম্বি জুড়ে দিলেন সহ-সম্পাদকের ওপর। তিনি গর্জন করে ডাকতে লাগলেন স্বেচ্ছাসেবকদের কাপ্তেনকে। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে কোষাধ্যক্ষকেই ধরে আনলে কারা। তিনি এসে রুখে উঠলেন—"আমার কি দায় পড়েছে, কে খেলে না খেলে তার হিসেব রাখবার? পূজার পর আমার কাছ থেকে টাকার হিসেব বুঝে নিও এক পয়সা এধার ওধার যদি হয় তো দশ ঘা জুতো মেরো আমায়।"

গোলমালের মাঝখান থেকে আমি টুপ করে সরে পড়লাম।

দুপুরবেলা, রাস্তায় লোকজন কম। আনমনে হাঁটছি আর মনে মনে হাসছি। হাসছি ফকুড়ের বরাতের কথা ভেবে। ফকুড়ের কপালখানি সে সঙ্গেই এনেছে বাংলায়। সেই কপাল-সুদ্ধ এখানকার পূজা উৎসব ফাংশন হত্যা। ও নাক গলাতে গেলে অনর্থক গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলব। দূরে থাকাই ভাল। তার এখনও কাছে এগোনো নয়। সে বৌতুক সংবরণ করে তফাৎ থেকে বাজনা শুনে আর বাতি জ্বালা দেখে সরে পড়ি। যা প্রয়োজন শুধু শুধু জল ঘোলা করে।

কোন দিকে যাচ্ছি খেয়াল নেই। আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে চলেছি। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমাকে নাম ধরে ডাকছে পিছন থেকে। পিছন ফিরে দেখি সেই স্ত্রীলোকটি—খালি পায়ে দৌড়চ্ছে সে এখন হাত নেড়ে আমায় দাঁড়াবার জন্যে ইশারা করে।

ও আবার পিছু নিলে কেন? আরও জোরে পা চালালাম। এবার সত্যিই সে ছুটতে লাগল, আর কি যেন বলতে লাগল ব্যাকুল হয়ে। দাঁড়াতে হল। কি চায় ও আমার কাছে?

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় যাচ্ছ এখন গোসাঁই?"

হাঁ করে মুখের ভেতর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ঘাড় নাড়লাম। যেন জ্বলে উঠল স্ত্রীলোকটি—"মিথ্যে কথা, তখন তো বেশ কথা বলছিলে বুড়োর সঙ্গে" বলে চোখ পাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাঁপাতে লাগল।

ভাল করে দেখলাম তাকে। বয়স কত তা বোঝা শক্ত। ছাব্বিশও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে। শুকনো শরীর। চোখের কোলে বড় বেশি কালি জমেছে, উঁচু হয়ে আছে গলার কণ্ঠা, তিন ফের তুলসীর মালা জড়ানো রয়েছে

গলায়। একটা শেমিজ আর একখানা শত-জায়গায় সেলাই-করা শাড়ি পরে আছে। জামা-কাপড়ের আদি বর্ণ যে কি ছিল, তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু ওর নিজের রঙ খুব ময়লা বলা চলে না। অত্যধিক তেল মেখে, কপালে একটা মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে, নাকের ওপর সাদা তিলক এঁকে, পান চিবিয়ে চিবিয়ে দাঁতগুলোকে বিশ্রী কালো করে ফেলে এমন অবস্থা করে তুলেছে নিজের যে, ওর দিকে চেয়ে থাকলে গা ঘিনঘিন করে। ওই সমস্ত বাদ দিয়ে একখানা ফরসা শাড়ি পরলে অতটা বিদঘুটে দেখাত না বোধ হয় ওকে। হয়ত তখন ওর কোটরে-বসা চক্ষু দু'টির দিকে চেয়ে মন এতটা চড়ে যেত না আমার।

মুখ বুজে ওর আপাদ-মস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি বলে সে আরও চটে গেল। "আহা-ঢঙ দেখ না মিন্‌সের! আমার সঙ্গে কথা কইলে ওঁর কারবারটি মাটি হয়ে যাবে! আমি লোককে বলে বেড়াতে যাচ্ছি যে উনি বোবা নন! এখন যাচ্ছ কোন্ চুলোয়, তাই বলো না।"

ওর নির্ভেজাল নিজস্ব ভাষার সবটুকু না বুঝলেও ওর চোখের দিকে চেয়ে মনের ভাবটুকু বেশ পড়ে নেওয়া যায়। কোটরে-বসা চক্ষু দু'টিতে যথেষ্ট আগুন রয়েছে, ঠোঁট দু'খানির তেরছা ভঙ্গিমায় রয়েছে বিস্তর ইঙ্গিত। অর্থাৎ নারী তখনও বেশ বেঁচে রয়েছে তার হাড় ক'খানির অন্তরালে। কিন্তু নিয়তির নিষ্করুণ নিপীড়নে একেবারে তেতো হয়ে গেছে সেই নারী।

কিন্তু ওর মতলব যে কি, তা ঠিক ঠাহর করতে না পেরে আবার পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। সেও ছুটতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে—"আ মরণ, কথা শোনে না যে গো, দেখ শুনছ—তোমায় সঙ্গে নিয়ে না গেলে খোয়ারের চূড়ান্ত হবে আমার, মেরে আমার হাড় গুঁড়িয়ে দেবে বুড়োটা।" তার গলা ভেঙে পড়ল।

আর কান দিলাম না ওর কথায়। আরও জোরে পা চালালাম। সেও প্যান প্যান করতে করতে পিছনে ছুটল। একটু পরেই খেয়াল হ'ল, এভাবে ওকে সঙ্গে নিয়ে আস্তানায় পৌঁছলে সেখানকার তারাই বা ভাববে কি! এদিকে তখন রাস্তার লোকজন থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের দিকে। দেখবার কথাই, কিম্ভুত-কিমাকার একটা পুরুষের পেছনে লক্ষ্মীছাড়া একটা মেয়েমানুষ ছুটছে কেন?

আবার ভিড় জমবার ভয়ে মরিয়া হয়ে দাঁড়ালাম। বেশ জোরে ধমক দিলাম তাকে—"কি চাও আমার কাছে!"

থতমত খেয়ে সেও দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে। বোবা পশুর নিরুপায় চাহনি তার চোখ দু'টিতে, আর অনেকটা জলও টলটল করছে।

আন্দারা খাঁ দীঘির পশ্চিম পাড় ঘুরে, বাবুপাড়া অনেক পিছনে ফেলে রেখে, মণিপুরীদের গৌরাঙ্গ-মন্দিরের পেছন দিকে, প্রাণ হাতে করে এক বাঁশের সাঁকো পার হলাম। তারপর মাঠ, মাঠের মধ্যে একটা ছোট পল্লীতে গিয়ে পৌঁছলাম তার সঙ্গে। যেতেই হ'ল, আমাকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরলে নাকি বুড়ো আর বুড়োর ছেলে ওর হাড় গুঁড়িয়ে ফেলবে। বুড়োর ধারণা হয়েছে, আমি একটি মহাপুরুষ। পাপীতাপীদের উদ্ধার করার জন্যে শ্রীধাম থেকে সোজা উপস্থিত হয়েছি চাটগাঁ শহরে। মহাপুরুষের নিয়মমাফিক—ছদ্মবেশ ধরে বুড়োর সামনে আবির্ভূত হয়ে ঠিক যখন তাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছিলাম, সেই সময় এই হতভাগী বাধা দিয়েছে। কাজেই বুড়োর উদ্ধার না হবার হেতু হচ্ছে এই পাপিষ্ঠা। অতএব বুড়ো হুকুম দিয়েছে, যেখান থেকেই হোক আমায় খুঁজে বার করে ধরে নিয়ে যেতেই হবে। এতক্ষণ বাড়ি ফিরে বুড়ো তার ছেলেকেও বলেছে সব কথা। আমি যদি সঙ্গে না যাই, তাহলে আজ ওর রক্ষে থাকবে না। দু'জনে গায়ের চামড়া তুলে নেবে।

আরও অনেক কথা জানতে পারলাম একসঙ্গে পথ চলতে চলতে। এখানকার মানুষ নয় ওরা। নোয়াখালি থেকে আকালের বছর পালিয়ে এসেছে। কে ন এক বাবাজী সম্প্রদায়ের লোক ওরা। যখন ওর বয়স ছিল কাঁচা তখন ওর মা ত্রিশ টাকার বদলে মেয়েকে দিয়ে দেয় এক বাবাজীর হাতে। কয়েক বছর পরে সেই বাবাজীও ওর মূলধন উশুল করে নেয় আর একজনের কাছ থেকে। এই ভাবে বার পাঁচেক ও হাতবদল হয়েছে। ওর বর্তমান মালিক বুড়োর ছেলে ঘরে বসে গামছা বোনে তাঁতে। বুড়োকে পথের ধারে কোথাও বসিয়ে দিয়ে সে সারা শহর ভিক্ষা করে বেড়ায় কিন্তু এখন ওকে দেখে কেউ ভিক্ষাও দেয় না। সে বয়স নেই, সে রসও নেই। কাজেই কিছুতেই কিছু হয় না। শুধু-হাতে ঘরে ফিরে রোজ মার খেতে হয়।

হাসি পেল ঘর কথাটি শুনে। হঠাৎ বলে ফেললাম, "কার ঘর? যাও কেন ওদের ঘরে? পালাতে পারো না ওদের কাছ থেকে?"

কোনও উত্তর দিলে না। আবার সেই বোবা পশুর বোবা চাহনি দেখা দিল ওর চোখে। সেই দৃষ্টি বলতে চায়, কোথায় পালাব? কার কাছে পালাব? যেখানেই যাব ঐ বুড়োর ছেলে গিয়ে ঠিক ধরে আনবে। এক কুড়ি নগদ টাকা দিয়ে কিনেছে ওরা, সেই টাকা ক'টা দিয়ে অন্য কেউ যদি কিনে নিত তাকে। কিন্তু সেদিন কি আর ওর আছে?

পৌঁছলাম ওদের বাড়িতে। বাড়ি নয়, আখড়া। পল্লীর সব ক'খানি বাড়িই

আখড়া। মালা-চন্দনের বেড়াজালে আটক পড়েছে কতকগুলি মানব-মানবী। জাল ছিঁড়ে পালাবার না আছে সাহস, না আছে সামর্থ্য। পচা ঘোলা জলে পচে মরছে। না মরা পর্যন্ত রেহাই পাবে না কেউ।

ছিটে বেড়ার একখানি মাত্র ঘর আর ছোট একটি উঠান। উঠানের এক কোণে তুলসী-মঞ্চ। উঠানখানি নিকোনো। ঘরের দাওয়াও নিখুঁতভাবে নিকোনো। দাওয়ায় বসে সেই বুড়ো খল-নুড়িতে কি মাড়ছে। ঘরের মধ্যে খটাখট শব্দ হচ্ছে তাঁতের। আমাদের সাড়া পেয়ে তাঁত বন্ধ হ'ল। মিশকালো একটি লোক ঘর থেকে বেরিয়ে সটান হয়ে পড়ল আমার পায়ের ওপর। দণ্ডবৎ সম্পন্ন করে উঠে বসতে বুঝলাম, লোকটি ভক্ত বটে। ভক্ত যে কত পাকা তা ওর সর্বাঙ্গে লেখা রয়েছে। কপালে নাকে বুকে পিঠে অষ্টাঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে তিলক কেটেছে। মাথাটি নেড়া, চৈতনের গোছাটি এতই সুপুষ্ট যে ওর খেংরা কাঠির মত মূর্তির সঙ্গে একদম বেমানান দেখাচ্ছে। রক্তজবার মত লাল চোখ দু'টি শুধু নামামৃত পানে অতটা লাল হয়নি নিশ্চয়ই। অন্য কোনও পার্থিব বস্তু পেটে পড়েছে। হাঁটু মুড়ে জোড় হাতে বসে রইল আমার সামনে, মুখটা যতদূর সম্ভব কাঁচুমাচু করে।

লাঠি ধরে বুড়ো নেমে এল দাওয়া থেকে। এসে সেও উপুড় হয়ে পড়ল পায়ের ওপর। ততক্ষণে আরও কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ জমা হয়ে গেল—চেহারা, তিলক, মালা, চৈতন্য সকলেরই এক রকম। ভক্তি যথেষ্ট সকলের। জানতে পারলাম, বিখ্যাত সোনাচাঁদ বাবাজীর দলভুক্ত বোষ্টম ওরা। বাবাজী বহুকাল আগে গোলোকে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর দল আর মত বেঁচে রয়েছে। সেই সঙ্গে আর যা জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে, তা স্পষ্ট লেখা রয়েছে এই মেয়ে পুরুষ ক'টির সর্বাঙ্গে।

অর্থাৎ কিছুই ওদের আটকায় না। সহজভাবের ভজন কিনা ওদের, কাজেই ওদের কাছে সবই সোজা। ভজনের সময় বাছবিচার নেই কিছু। মন যাকে চায় তাকে নিয়েই ভজন করা চলে।

বুড়ো আর তার ছেলে দু'জনে আমার কাছে দু'টি বর চাইলে। বুড়ো বললে —হারামজাদীর জন্যে সে মহাপুরুষের কৃপা হতে বঞ্চিত হতে বসেছিল। "আহা, সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর মত গলা আর নিতায়ের মত দেখতে! জয় প্রভু নিত্যানন্দ, এবার কৃপা করে এই অন্ধের চোখে আলো দান করো বাবা।"

পুত্ররত্নটির কামনা আরও সহজ ও সরল। এই পাপ পৃথিবী থেকে তাকে শুধু উদ্ধার করে দিতে হবে।

সকলেরই ঐ এক প্রার্থনা—উদ্ধার করে দাও। উদ্ধার না হয়ে কেউ ছাড়বে

না আমায়। অন্ততঃ একটা রাত ধরে রাখবে। বয়স-কম দু'টি মেয়ে এল তেলের বাটি নিয়ে অঙ্গ-সেবা করতে। সহজভাবের অঙ্গ-সেবা, অঙ্গ-সেবাই প্রধান সেবা।

কিন্তু আমার তো থাকবার উপায় নেই। প্রভুপাদ গুরুর কৃপায় আমাকে যে তখন অন্য একপ্রকার ভজন করতে হচ্ছে। সে বড় উঁচু রসের ব্যাপার। তাতে অঙ্গ-সেবা নিষিদ্ধ আর নির্জনে থাকা প্রয়োজন। তাঁর আদেশেই মৌনব্রত নিয়ে আছি। শুধু বুড়ো একজন উঁচুদরের ভক্ত বলেই তার সঙ্গে কথা না বলে পারিনি।

সুতরাং এবার সকলে বুড়োকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলে। আমাকে কথা দিতে হ'ল যে, ব্রজরাণীর ইচ্ছা হলে আবার দেখা হবে তাদের সঙ্গে। রাসমণির কৃপায় বুড়ো ফিরে পাবে দৃষ্টিশক্তি, শুধু দৃষ্টিশক্তি কেন, অন্তর্দৃষ্টি পাবে সে এবার। আর উদ্ধার? উদ্ধার তো হয়েই গেছে সবাই। আহা, এত ভক্তি যাদের, তাদের আর উদ্ধার হতে আটকাচ্ছে কোথায়!

সেবার জন্যে কিছু দিতে এল ওরা। কিন্তু কিছুই ছুঁই না যে, বারণ আছে গুরুর। গুরু হে, তুমিই সত্য! চোখ বুজে কপালে জোড় হাত ঠেকালাম আর একবার ওদের ভক্তি দেখানো শেষ হলে বিদায় নিলাম। সাঁকো পর্যন্ত এল সকলে সঙ্গে সঙ্গে। সাঁকোর ওপর উঠে হাত নেড়ে ওদের আর এগোতে মানা করে একলা এপারে নেমে এলাম। আরও দেরি হলেই হয়েছিল আর কি! অন্ধকারে সাঁকো পার হতে না পেরে ঐ নরকে পচে মরতাম সারা রাত। এবার সত্যিই একটি ধন্যবাদ দিলাম আমার বরাতকে।

দিয়েই চমকে উঠলাম। এ আবার কে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে! আবছা আলোয় চিনতে কষ্ট হ'ল না। আবার কি চায় ও?

সরে এল কাছে। ভাঙা গলায় বললে, "চলুন গোসাঁই এগিয়ে দিই আপনাকে।"

সভয়ে বললাম, "তার দরকার নেই। তুমি ফিরে যাও। মন্দ ভাববে যে ওরা।"

ফোঁস করে উঠল, "ভাবুক যার যা খুশি। আর পারি না আমি, আমার মরণও নেই! সারাদিন পথে পথে ঘুরে কিছুই পাইনি আজ। ওদের নেশার যোগাড় না নিয়ে গেলে সারারাত দুই বাপ-বেটায় ছিঁড়ে খাবে আমায়। নেশা করিয়ে ওদের ফেলে রাখতে পারলে তবে সে রাতটা রক্ষা পাই আমি। ঐ বুড়ো মড়ার বেশি হ্যাংলামো। বুড়োর কথায় রাজী না হলে ওর ছেলে বুকে চেপে বসবে আমার, আর বাপটা রক্ত চুষে খাবে। নেশার লোভে পাড়ার কুত্তা-কুত্তীগুলোকেও ডেকে আনে, তখন খোল-খত্তাল বাজিয়ে আরম্ভ হয় চাটাচাটির মচ্ছব। লাথি মারি ওদের ভজনের মুখে।"

হঠাৎ দাঁড়িয়ে মারলে এক লাথি রাস্তার ওপরেই। শরৎ-আকাশের ষষ্ঠীর চাঁদ

ওর মুখের ওপর আলো ফেলেছে। চোখ দুটো যেন জলছে ওর। ধারালো লম্বা একখানা ইস্পাতের মত দেখাচ্ছে ওকে। সদ্য ঘুম ভেঙেছে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর, এবার চিবিয়ে খাবে সব, অপমান-নিপীড়ন-প্রবঞ্চনা সব গ্রাস করে ফেলবে।

বললাম, "আমার সঙ্গে গিয়ে কি ওদের নেশার যোগাড করতে পারবে?"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "যতক্ষণ পারি থাকি বাইরে। হয়ত আট আনা চার আনা পেয়েও যেতে পারি।"

অনাবশ্যকবোধে পাবার উপায় সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করলাম না, শুধু বলে ফেললাম, "পালাও না কেন ওদের কাছ থেকে?"

নারী আর জবাব দিলে না আমার কথার। মাথা হেঁট করে চলতে লাগল পাশে পাশে, কিছুক্ষণ পরে স্পষ্ট শুনলাম—ও কান্না চাপবার চেষ্টা করছে।

আরও অনেকটা পথ পার হলাম এক সঙ্গে পা ফেলে। ডান দিকে নদীর ধারে যাবার রাস্তা। আর ওকে নিয়ে এগোনো যায় না। একটা কিছু বলে তখন বিদেয় করতে পারলে বাঁচি। বললাম—"চট্টেশ্বরীর বাড়ির দরজার পাশে কাল দুপুরবেলা দাঁড়িয়ে থেকো। আমি যাবো, দেখা যাক—কি করতে পারি!"

রাস্তার ওপরেই ও আমার পায়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে আর কোনও কথা না বলে চলে গেল বাঁ হাতি রাস্তায়।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। সারা শহর ঢাক-ঢোলের শব্দে কাঁপছে। দলে দলে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সাজগোজ করে পথে বেরিয়ে পড়েছে। সেই আনন্দ উচ্ছ্বাসের মাঝে একান্ত অশোভন, ফক্কড, বিশ্রী বেখাপ্পা বেমক্কা, ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বাঙলার আকাশের তলায় ফক্কড়ের উপস্থিতি। নিজেকে নিয়ে কোথায় লুকোব তাই ভেবে অস্থির হয়ে উঠলাম।

কিন্তু এই ধরনের মানসিক অবস্থা কখনও হয় না বাঙলার বাইরে কোথাও। বাঙালী যেখানে নেই সেখানে মানুষ ভাল জামা-কাপড় পরে উৎসব করতে বার হয় পথে। কই, তাদের সামনে ফক্কড়ের ঘোরাফেরা করতে বাধে না তো কখনও! এত তুচ্ছ ব্যাপারে কখনও মাথা ঘামাতে হয় না, লজ্জা-সঙ্কোচের ধার ধারতে হয় না। এ আমার হ'ল কি! কেন মরতে এলাম এ সময়ে বাঙলা দেশে?

পথের মানুষের চোখ এড়াবার জন্যে—পথ ছেড়ে বিপথ ধরে সোজা চললাম নদীর কিনারায়। আগে জলে নামব, স্নান করে তবে গিয়ে উঠব ফক্কড়ের আসনে। যেখান থেকে ঘুরে আসছি সেখানকার দুর্গন্ধ ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে কর্ণফুলীতে ডুব দিয়ে।

কিন্তু কর্ণফুলী পারলে না ফক্কড়ের অঙ্গ থেকে দুর্গন্ধ দূর করতে। সে জিনিস ভেতরে বাসা বেঁধেছে তখন ভাল করে। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় এক হতভাগী কি আশা বুকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে মরতে লাগল। কোথায় কতটুকু প্রভেদ আছে তার আর আমার মধ্যে? দু'জনেই পথের কুকুর, বেঁচে থাকার নির্লজ্জ লালসায় দু'জনেই পথের ধুলায় গড়িয়ে মরছি। কোথায় এমন কি বস্তু আমার আছে যা তার নেই, অথবা তার যা আছে আমার তা নেই—এখন কিছুর নাম মনে আনবার জন্য মনের অন্ধিসন্ধি খুঁজতে লাগলাম।

নিজের ওপর নিদারুণ বিতৃষ্ণায় দম বন্ধ হয়ে এল। এই মুহূর্তে যদি এই খোলসটা বদলে ফেলতে পারতাম। চুল-দাড়িসুদ্ধ এই শতধা বিদীর্ণ চামড়া ঢাকা 'আমি'টিকে ছেঁড়া জুতোর মত টান মেরে ফেলে দিয়ে যদি কোথাও পালাতে পারতাম। নাঃ, এত ঘৃণা এত বিদ্বেষ আর কখনও জন্মায়নি নিজের ওপর।

ফক্কড়—কখনও কারও ছিটেফোঁটা উপকারে লাগে না ফক্কড়। বেঁচে থেকেও মরে ভূত হয়ে গিয়ে, লক্কড় জ্বেলে টিক্কড় পুড়িয়ে খেয়ে, খোলসটাকে বজায় রাখার অবিরাম চেষ্টা করবার কি সার্থকতা। হ্যাংলা কুকুরের মত দুনিয়াটার দিকে চেয়ে জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে আর নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিচ্ছি—এভাবে দিন গুজরান করবার অর্থ কি?

অর্থ খুঁজতে খুঁজতে, অন্যমনস্ক হয়ে নদী থেকে উঠে, কখন আস্তানার দিকে চলতে আরম্ভ করেছি। কানে এল খচ খচ খচ খং ভক্তরা ঢোল আর করতাল নিয়ে খচ খং জুড়ে দিয়েছে। খচ খং আবার ফক্কড়ের বক্ষে দোলা লাগিয়ে দিলে। জোরে পা চালালাম।

ওদের সামনে গিয়ে দাড়াতে আরও উদ্দাম হয়ে উঠল খচ-খং খচ-খং। একে একে উঠে এসে গোড় পাকড়ালে সকলে। মাঝখানের উঁচু আসনটি আমার জন্যে। সামনে এক গোছা ধূপ জ্বলছে। একখানা থালায় সাজিয়েছে পেঁড়ো আর ফল। পাশে আর একখানা থালায় সাজানো রয়েছে পুরি কচুরি-মিঠাই। মনে পড়ে গেল, আজ ভোরে যখন যাই তখন এরা বলেছিল বটে যে, কোন্ শেঠজী আজ ভোজন দেবেন আমায়। একটু বেলাবেলি ফিরতে অনুরোধ করেছিল এরা। সবই ভুলে মেরে দিয়েছি।

এও এক জাতের মদ। এদের ভক্তি, সাধু হিসাবে ভিন্ন রকম মর্যাদা দেওয়া, বেশ কড়া জাতের উগ্র মদ একরকম। নিজেকে নিজে ফিরে পেলাম এতক্ষণে।

স্মরণ হ'ল জাত ফক্কড়ের বাণী একটি।

"আরে, দুনিয়া যার পায়ের তলায় লোটায় সে ফক্কড়, সে রাজার রাজা।"

শিরদাঁড়া খাড়া করে উঁচু আসনে চোখ বুজে বসে রইলাম। পাঁচ গুণ জোরালো হয়ে উঠল ওদের উৎসাহ।

"শ্রীরামভকত শ্রীবজরঙ্গবালী মহারাজকে জয়।"

শাঁখ বাজছে।

একসঙ্গে অসংখ্য শাঁখ বাজছে। তার সঙ্গে উঠছে সহস্র কণ্ঠের উলুধ্বনি। শঙ্খ আর উলুধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুম ভাঙল ফক্কড়ের।

উলুধ্বনি—এই ধ্বনি শোনা যায় শুধু বাঙলায় আর যেখানে বাঙলার মেয়েরা যায় সেখানে। বাঙলার মেয়ের কণ্ঠের এই বিচিত্র ধ্বনির বিশেষ তাৎপর্য কী—তা বলতে পারব না। কিন্তু এই ধ্বনি কানে গেলে মনটা যেন কেমন হয়ে যায়—মনের তন্ত্রীগুলো বেজে ওঠে ঝনঝন করে। একটু বেশী রকম ছুটোছুটি করে শরীরের রক্ত। বাঙলার ছেলেরই এই সব উপসর্গ দেখা যায় উলুধ্বনি কানে গেলে—আঁতুড় ঘরে নাড়ীকাটার আগেই এই ধ্বনি কানে যায় কিনা বাঙালীর

তারপর বেজে উঠল ঢাক ঢোল কাঁসি চারিদিকে।

মহাসপ্তমী।

জেগে উঠেছে বাঙলা দেশ। ভবার আবির্ভাবের আগে বাঙলা আবাহন জানাচ্ছে মহাসপ্তমী তিথিকে। জগৎজননীর আবির্ভাবের তিথিকে বরণ করছে বাঙলা। এই মাহেন্দ্রক্ষণে যে বাঙালী তার মনে প্রাণে সমগ্র সত্তায় ঘুম ভাঙানো গান শুনতে পায় না, সে যেন নিজেকে বাঙলার সন্তান বলে পরিচয় না দেয়

সেদিন সূর্যোদয়ের অনেক আগে, কর্ণফুলীর তীরে পাট-গুদামের আড়ালে রণছোড়জীর মন্দিরের পাশে হনুমানজীর মন্দিরের সামনে, ছেঁড়া কম্বলের ওপর শোয়া ফক্কড়ও উঠে বসল।

আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে স্বচ্ছ আকাশের গায়ে ফুটে উঠল একখানি মুখ। স্পষ্ট চিনতে পারলাম মুখখানি। তীব্র একটা মোচড় দিল বুকের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেললাম।

এ সেই মুখখানি আর সেই আঁখি দু'টি। মায়ের বুকের মূক অভিমান মুখর হয়ে উঠেছে আঁখি দু'টিতে, উথলে উঠেছে মাতৃ-হৃদয়ের অমৃতের উৎস। ঘর-পালানো হতভাগা সন্তানের জন্যে নিরুদ্ধ বেদনায় কাঁপছে মায়ের ঠোঁট দু'খানি মৃদু মৃদু। বহুকাল পরে শুনতে পেলাম মায়ের আকুল আহ্বান।

"ফিরে এলি বাবা—ফিরে এলি নিজের ঘরে। মিছিমিছি কেন এত কান্না কাঁদালি আমায়। মাকে আর জ্বালা দিস নে বাবা—আর পালাস নে ঘর ছেড়ে।

এবার ঘরের ছেলে ঘরে থাক।"

কর্ণফুলীর অপর তীরে আকাশের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। আলোর হাসি—আমার জননীর মুখের মধুর হাসি ঝলমল করছে পূব আকাশে।

বসে বসে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

বহুকাল আগে, মনে হয় যেন এ জন্মের আগের জন্মে একে একে অনেকগুলি মহাসপ্তমীর প্রভাত উদয় হয়েছিল। ঠিক এই সময়েই মায়ের সঙ্গে গঙ্গা স্নান করে ফিরে আসতাম। তারপর আবার যেতাম গঙ্গায় লাল চেলী পরে কলাবৌ স্নান করাতে। দুধে-গরদের জোড় পরে দু'হাতে বুকের কাছে মস্ত তামার ঘট ধরে বাবা যেতেন পুরুত মশায়ের পাশে পাশে। পুরুত মশাই নিতেন কলাবৌ। ওঁদের সামনে থাকতাম আমি ধুনুচি হাতে, ধুনো গুগগুল চন্দনকাঠের গুঁড়ো পোড়াতে পোড়াতে যেতে হত আমায়। তিনখানা ঢাক, পাঁচখানা ঢোল, কাঁসি, সানাই থাকত আমার সামনে। বাজনার তালে তালে বক্ষে লাগত প্রচণ্ড দোলা।

সেদিন প্রভাতে এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া-জড়ানো ফকড়ের বক্ষে সেই জাতের দোলা লাগল। সামলাবার জন্যে দু'হাতে বুকটা চেপে ধরলাম, জানতেও পারলাম না, পেশাদার ফকড়ের চিরশুষ্ক দুই চোখ দিয়ে কখন অবিরল ধারায় জল গড়াতে শুরু করেছে।

দূর থেকে কথার আওয়াজ কানে এল। এত ভোরে কারা আসছে এদিকে? এ সময় আবার কার কোন প্রয়োজন হল আমার কাছে আসবার? নাঃ, এতটুকু শান্তি নেই কোনও চুলোয়, একান্তে বসে নিজস্ব করে একটুকু সময় পাবার উপায় নেই। সদা সন্ত্রস্ত ফকড়ের জীবন সর্বজীবের সামনে সদা সর্বদা উলঙ্গ উন্মুক্ত বে-আবরু। ব্যক্তিত্বই যার নেই, তার আবার ব্যক্তিগত গোপনীয়—এসব বালাই থাকবে কেন?

যাঁরা আসছিলেন তাঁরা এসে পড়লেন কাছে। সস্ত্রীক এক শেঠজী আর তাঁর দরোয়ান। দরোয়ানজীকে চিনলাম, সন্ধ্যার সময় আমার কাছে বসে ছিলিম টানেন। কিন্তু এই সাত-সকালে মনিব সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হবার হেতুটি কি?

শেঠ-পত্নী চাল-ঘি-ডাল-লবণ দিয়ে সাজানো একখানি থালি নামিয়ে দিলেন আমার সামনে। এক জোড়া সাদা ধুতি চাদর আর একখানি গামছা রাখলেন শেঠজী আমার কম্বলের উপর। কয়েকটি চকচকে টাকা পায়ের ওপর রেখে দু'জনে প্রণাম করলেন।

কাঠ হয়ে বসে রইলাম। জোড়হাতে আমার মুখের দিকে চেয়ে ওঁরা বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে চাপা-গলায় শেঠজী মন্তব্য করলেন—"বহুৎ প্রেমী হায়

মৌনীবাবা, রোতা হায়।" তাঁর পত্নী মস্ত নথ নেড়ে স্বামীর কথায় সায় দিয়ে ফিসফিস করে বোধ হয় নিজের মনস্কামনা জানাতে লাগলেন।

ওধারে পূর্ব আকাশ আরও লাল হয়ে উঠল। দূর থেকে প্রভাতী হাওয়ায় ভেসে আসতে লাগল ঢাক-ঢোল-কাঁসির শব্দ—তার সঙ্গে শঙ্খ আর উলুধ্বনি। সামনে পড়ে রইল কাপড় চাদর টাকা চাল ডাল ঘি। জল সমানে গড়াতেই লাগল পোড়া-কাঠ ফক্কড়ের পোড়া চোখ থেকে।

মহাসপ্তমীর ভোরে কার হাত দিয়ে তুই এ সমস্ত পাঠালি মা? এখনও তুই সত্যিই ভুলিসনি তোর এই দুষ্টু বজ্জাত ঘর-পালানো ছেলেকে। তোর ভাঁড়ারে এখনও তাহলে আমার জন্যে সব কিছু সাজানো থাকে।

পূজা দেখতে বাঙলায় বাঙালীর কাছে হ্যাংলার মত ছুটে এসেছি। তারা ভুলে গেল সারাদিনে এক মুঠো খেতে দিতে। আর হাজার মাইল দূরের শেঠ শেঠানীর হাত দিয়ে কিছুই যে দিতে বাকী রাখলিনি মা আমায়।

চোখ বুজে প্রণাম করতে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল দু'খানি পা। যে পা দু'খানির ওপর মাথা রেখে এ জীবনের বহু জ্বালা জুড়িয়েছে, বহু আশ্বাস মিলেছে জীবনে যে চরণ দু'খানি স্মরণ করে।

ওঁরা উঠে গেলেন।

তার পরক্ষণেই পাট-গুদামের ওপাশ থেকে সামনে এসে দাঁড়াল শতছিন্ন কাপড়-পরা এক কাঙালিনী। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ আমার দিকে, আচমকা ওর অকল্পনীয় আবির্ভাবে আমার যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম মুখের দিকে।

একটা কাল-নাগিনী হিসহিস করে উঠল—"পালিয়ে এসেছি গোসাঁই, পালিয়ে এলাম তাদের কাছ থেকে।"

এ কি রকম গলার আওয়াজ ওর! পাট-গুদামের পাশ থেকে ভোরের লাল আলো তেরছা হয়ে পড়েছে ওর মুখের ওপর। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, সদ্য রক্ত-স্নান করে এল নাকি?

"এবার বাঁচাও গোসাঁই, লুকিয়ে ফেল আমাকে। কিছুক্ষণ পরেই ওরা আমায় ধরতে বার হবে। ধরতে পারলে কেটে ফেলবে আমায়। বলো গোসাঁই, বলো কোথায় লুকোব আমি?"

কে যেন ওর গলা চেপে ধরলে, থরথর করে কাঁপছে ওর সারা দেহ, সবটুকু প্রাণ এসে জমা হয়েছে দুই চোখে।

স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। এ কি ফ্যাসাদ! কি করে ও

জানলে আমার আস্তানা? কি দুষ্কার্য করে এল ও? কোথায় ওকে লুকিয়ে রাখব আমি?

একান্ত অসহায় ভাবে ওকেই জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, "কোথায় যাবে এখন?"

আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল ও—"আমি তা কি করে জানব গোসাঁই? কাল তো তুমি বললে ওদের কাছ থেকে পালাতে, তাই তো পালিয়ে এলাম তোমার কাছে।"

উন্মাদের মত হয়ে উঠল ওর মুখ-চোখের ভাব। হাড়িকাঠে ফেলবার পর কোপ দেবার পূর্ব-মুহূর্তে যে দৃষ্টি দেখা যায় পশুর চোখে, সেই জাতের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে ওর দুই চোখে। ওর বুকের মধ্যে যে ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছে, তাও যেন আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

টপ করে কাপড় চাদর আর টাকা কটা তুলে নিলাম সামনে থেকে। নিয়ে জোর করে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। বললাম, "নাও, পালাও এই নিয়ে। যদি পারো কিছুদিন লুকিয়ে থাকো গিয়ে চন্দ্রনাথে। কিংবা চলে যাও অন্য কোথাও। গতর খাটিয়ে খাওগে। ঝি-রাঁধুনী, যে কোন কাজ পাও, তাই নিয়ে বেঁচে থাক স্বাধীনভাবে।

চুপ করে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। চোখের পাতা, ঠোঁট দুখানি, কাপড় চাদর ধরা হাত দু'খানিও থরথর করে কাঁপছে। কি যেন বলতে গিয়েও পারলে না বলতে। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, সেই সঙ্গে কাপড় চাদরসুদ্ধ দু'হাত বুকে চেপে ধরে পিছন ফিরে ছুটে চলে গেল।

ওর যাবার পথের দিকে চেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক্—বাঁচুক ও নরক-যন্ত্রণার হাত থেকে। ওর বুকের মধ্যে নারীত্ব বলতে কোনও কিছু যদি এখনও বেঁচে থাকে, তবে সে জেগে উঠুক আজ এই মহাসপ্তমীর মহালগ্নে। তিলে তিলে দগ্ধে মরার হাত থেকে মুক্তি পাক ও—নবজন্ম লাভ করুক নতুন জগতের মাঝে।

নতুন প্রভাত। কর্ণফুলীর জলে টলটল করছে নতুন জীবন। উৎকট দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কর্ণফুলীর জলে। বহুক্ষণ ডুব দিলাম, ডুব দিয়ে দিয়ে নিঃশেষে ধুয়ে ফেলতে চাই অমঙ্গলের ছায়া মন থেকে। না, কিছুতেই কিছু হ'ল না। কোনও উপায়েই তাড়াতে পারলাম না তাকে বিস্মৃতির অন্তরালে। একটা অতি তুচ্ছ প্রশ্ন খচখচ করতে লাগল বুকের ভেতর।

কি যেন বলবার ছিল তার। কি যেন শোনানো বাকী রয়ে গেল তার আমাকে! শেষ কথাটা বলবার জন্যে কাঁপছিল তার ঠোঁট দু'খানি। হয়ত

শোনার মত কথাই শোনাত সে, হয়ত বলার মত বলাই বলত আমায় কিছু। অত তাড়াহুড়ো করে বিদেয় না করলেও চলত। অত ভয় যদি না পেতাম আমি। কিসের পরোয়া আমার? কার ভয়ে ব্যাকুল হয়ে বেহায়ার মত বিদেয় করে দিলাম আমি তাকে? এমন কি সর্বনাশ হয়ে যেত আমার, যদি সে আরও কিছুক্ষণ থাকত আমার কাছে? শোনা হ'ল না—তার শেষ কথাগুলি শোনা হ'ল না যে আমার। কি সেই কথা?

স্নান সেরে ফিরে এসে বসলাম আবার নিজের আসনে।

"গোড লাগি বাবা, গোড লাগি বাবা" একে একে পাঁড়ে চোবে মিশিরজীরা এসে চারিদিক ঘিরে বসতে লাগল। আগুন চড়ল ছিলিমে। সব ক'জনের মুখের ওপর খুঁজে দেখতে লাগলাম। কই—কারও মুখে তো দুশ্চিন্তার কালো ছায়া খুঁজে পাওয়া যায় না। সবাই সুখী, সকলেই মশগুল আপন আপন আনন্দে। শুধু আমি জ্বলে-পুড়ে মরছি—তুচ্ছ নোংরা একটা মেয়েমানুষের কথা ভেবে ভেবে। জাত-জন্মের ঠিক-ঠিকানা নেই, নামগোত্রহীনা একটা আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা। খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু যার মাথায় ঢোকেনি সারা জীবনে, তার আবার কি বলবার থাকতে পারে আমাকে? সেই সব ছাই-ভস্ম শোনা হ'ল না বলে এত খুঁত খুঁত করছে কেন আমার বেয়াড়া মন? কেন?

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলাম নিজের ওপর। আমি ফক্কড়, পাকা পোড়-খাওয়া পেশাদার ফক্কড় আমি। এই মাত্র শেঠ-শেঠানীর শির লুটিয়ে পড়ল আমার চরণে। সেই আমি নোংরা বিশ্রী একটা যা-তা ব্যাপার নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামিয়ে মরছি। ছিঃ!

বেশি করে ভস্ম লেপে দিলাম কপালে আর সর্বাঙ্গে তারপর যত্ন করে লাগালাম এক মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা কপালে। কৌপীন এঁটে ন্যাকড়াখানি মেলে দিলাম রোদে। দু-মিনিট পরেই শুকিয়ে যাবে। তখন ওখানি জড়িয়ে পূজো দেখতে বার হবো শহরে।

শ্রীবজরঙ্গ মহারাজের স্নান আরম্ভ হ'ল তেল-সিঁদুর মাখিয়ে। দূরে শহরময় ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। সেই সঙ্গে শুনতে পেলাম বহুবার শোনা মন্ত্রধ্বনি—অনেন গন্ধেন—অনয়া হরিদ্রয়া—অনেন দয়া। নিশ্চয়ই এতক্ষণে মহাস্নান আরম্ভ হয়েছে মায়ের। তন্ত্রধারক আর পুরোহিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে মহাস্নানের মন্ত্র। গম গম করছে সব পূজা-মণ্ডপ। কিন্তু এদের ছেড়ে এখন উঠে যাওয়া যায় কি করে?

ওধারে ফক্কড়ের বুকের মধ্যে যে যন্ত্রটা অবিরাম টিক টিক করে চলে, সেটা যেন

বড্ড বেচালে বেতালে চলতে লাগল মহাসপ্তমীর মাহেন্দ্রক্ষণে। সেই আঁস্তাকুড়ের আবর্জনার মুখ থেকে যা শোনা হ'ল না, তার জন্যে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলতে লাগল মনের মধ্যে। অসহ্য রাগ হ'ল নিজের ওপর। কি বিশ্রী কৌতূহল। যাই এবার বেরিয়ে পড়ি, তুচ্ছ আপনাদের কথা নিয়ে বসে বসে মাথা ঘামিয়ে এমন দিনটি মাটি করে কি লাভ?

কোন লাভই নেই। অথথা লাভ যাতে হয়, তেমনি একটি কারবার হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল সামনে। ইনি সেই দরোয়ানজী—যিনি সকালে শেঠ-শেঠানী'র সঙ্গে এসেছিলেন। সেই মুহূর্তেই আমাকে যেতে হবে শেঠজীর বাড়ি দরোয়ানজীর সঙ্গে। শেঠজীর বাড়ি দু' কদম তফাতে। কৃপা করে যেতেই হবে তৎক্ষণাৎ যেতেই হবে—দরোয়ানজী গোড় পাকড়াতে তেড়ে এলেন।

কেন যেতে হবে? কি এমন ঘটল যে তৎক্ষণাৎ যেতে হবে?

মুখ বন্ধ মৌনীবাবার, কাজেই প্রশ্ন করার উপায় নেই। অতএব উঠলাম এবং রওয়ানা হলাম। আর তখনই প্রথম খেয়াল হ'ল দরোয়ানজীর—এ কি সেই ধুতি চাদর গেল কোথায়?

কপালে হাত ঠেকিয়ে মাথা নাড়লাম।

"কেয়া! চোরি হো গিয়া?"

মাটির দিকে চেয়ে একান্ত বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক সঙ্গে সকলে হৈ হৈ করে উঠল। এত বড় স্পর্ধা চোর ব্যাটার? এখান থেকে, সাক্ষাৎ বজরঙ্গ লালের সামনে থেকে মৌনীবাবার কাপড় চাদর নিয়ে চম্পট দিলে! কখন হ'ল চুরি? নিশ্চয়ই যখন আমি নদীতে স্নান করতে গেছি সেই ফাঁকে নিয়েছে চোবে পাঁড়ে মিশিরজীরা ক্ষেপে উঠলেন। শালা ডাকুকো পাকড়াতে পারলে একদম 'জানসে খতম' করে দেওয়া হবে। আস্ফালন চরমে পৌঁছল। আমি আর কি করব—দরোয়ানজীর পিছু পিছু শেঠজীর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম।

শেঠ ব্রজকিষণলাল হরসুখরাম দাসের গদিতে পৌঁছতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। শেঠজী স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার ওপর। আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এগিয়ে এলেন। রাস্তার ওপরেই আমার দু'পায়ে তাঁর দু'হাত ঠেকালেন। দরজার সামনে চাকর দরোয়ান, অন্য সব কর্মচারীরা তটস্থ হয়ে আছেন। চাপা উত্তেজনা, থমথম করছে সকলের চোখে মুখে। ব্যাপার কি?

শেঠজী হাত জোড় করেই আছেন, জোড়হাত করেই সকলের মাঝখান দিয়ে নিয়ে চললেন আমাকে। গদি-ঘরের মধ্যে পদার্পণ করলাম, সাজসজ্জা দেখে মালুম হ'ল মালিকের ধন-দৌলতের বহর। বিশ হাত লম্বা আর হাত পনেরো চওড়া

ঘরখানায় চার দেওয়ালের মাথা জুড়ে পাশাপাশি টাঙানো হয়েছে বড় বড় ছবি। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনও ঘটনা বাদ নেই। তার সঙ্গে কিষণ ভগবানের রাসলীলা কয়েকখানি। ঘর জুড়ে এক হাত উঁচু গদি পাতা, যার ওপর বসে এঁরা ধর্ম আস্বাদন করতে করতে ব্যবসা করেন বা ব্যবসা করতে করতে ধর্ম আস্বাদন করেন। সেই গদির মাঝখানে কার্পেটের আসন বিছানো হয়েছে। আমার কাদা-মাখা আটফাটা শ্রীচরণ দু'খানি নিয়ে দুধের মত সাদা গদি মাড়িয়ে গিয়ে বসতে হবে সেই কার্পেটের আসনে।

ফক্কড়োচিত বেপরোয়া ভাবটুকু বজায় রেখে তাই করলাম, বসলাম গিয়ে কার্পেটের আসনে। অনেক দূরে গদির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সকলে প্রণাম করতে লাগল। এক ধারে দাঁড়িয়ে শেঠজী চাপা গলায় একে ওকে কাকে হুকুম দিচ্ছেন। বেশ বড় গোছের একটা কিছু আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু কি সেটি?

নির্বিকার ভাবটি ষোল আনা বজায় রেখে, চোখ বন্ধ করে, সোজা হয়ে বসে রইলাম গদির মাঝখানে। জানবার জন্যে যতই মন ছটফট করুক, বাইরে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলেই সব মাটি। নির্লিপ্ত অনাসক্ত নিষ্কাম মুক্তপুরুষ হচ্ছে জাত-ফক্কড়, সেই গুণগুলি বজায় রাখতেই হবে। নয়ত এত ভক্তি শ্রদ্ধা ভয় এসবের কোনও মূল্যই থাকে না যে। সময় যখন হবে তখন সবই জানা যাবে, এই বলে মনকে দাবড়ে দিলাম।

এই রকমই হয়। এইভাবে অসংখ্যবার ফক্কড়ের ভাগ্য ফক্কুড়ি করে। আচমকা বানায় রাজার-রাজা, আবার চক্ষু না পালটাতেই আছাড় মারে পথের ধূলায়। ভাগ্যের এই ফাজলামিটুকু যতদিন না ঠিক মুখস্থ আর ধাতস্থ হয়ে যায়—ততদিন মানুষ কুলীন ফক্কড় হতে পারে না।

একখানি দু'খানি করে অনেকগুলি গাড়ি এসে জমা হ'ল বাড়ির সামনে। শেঠজীরা নেমে এসে আমার চার পাশে আসন গ্রহণ করলেন। মস্ত ঘোমটা টেনে শেঠানীরা চলে গেলেন বাড়ির ভেতর। গুজগুজ ফুসফুসে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করবার উপায় নেই মৌনীবাবার।

অবশেষে কমলা রঙের কাপড় হাতে ব্রজকিষণবাবু উপস্থিত হলেন। আমায় বস্ত্র পরিবর্তন করতে হবে। হাতে নিয়ে দেখি সিল্কের তৈরী মহামূল্যবান বামিজ লুঙ্গি দু'খানি। ওই জাতের কাপড়ের মূল্য জানা ছিল। অন্ততঃ দশ টাকা দাম হবে সেই হাত-ছয়েক করে লম্বা দু'খানি কাপড়ের। তা হোক, তাতেও ঘাবড়ালে চলবে না।

একান্ত তাচ্ছিল্য-ভরে অত জোড়া চোখের সামনে কাপড় চাদর অঙ্গে ধারণ

করে ফেললাম। অন্তর্ধান করল ফক্কডের ছেঁড়া ন্যাকড়া

তখন এল সুগন্ধি তেল আর আতর। দু'জন চাকর আমার ফাটা ঠ্যাং দু'খানিতে তেল মাখাতে বসল। রুক্ষ জটপাকানো চুলে অনেকটা আতর ঢেলে দিলেন স্বয়ং শেঠজী। হলুদ রঙের চন্দন থাবড়ানো হ'ল কপালে। নির্বিকার ভাবে সহ্য করতে হ'ল সমস্ত আদর—মহাপুরুষ যে।

তখন শেঠজীরা একে একে উঠে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলেন এক গাদা নোট টাকা জমে উঠল সামনে। কিন্তু সেদিকেও ফক্কড় নজর দেবে না।

শেষে আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল বাড়ির ভেতর। এবার শেঠানীরা ভক্তি দেখাবেন। সুতরাং দু'চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। আর একবার মাথায় আতর ঢালা হ'ল, কপালে হলুদ রঙের চন্দন দেওয়া হ'ল, পায়ের ওপর প্রণামী রেখে সকলের প্রণাম করা হ'ল।

দম প্রায় ফাটবার উপক্রম তখন। এদের এই হিমালয়ের মত ভক্তির ঢেউটা হঠাৎ ঠেলে ওঠবার হেতুটি কি। হাবুডুবু খেয়ে মারা যাব যে ভক্তির অতল সাগরে? কি এমন হ'ল যার দরুন এঁরা পাগল হয়ে উঠলেন?

ওধারে তখন স্বয়ং শেঠজী আবার উপস্থিত হয়েছেন একখানি রুপার থালা হাতে নিয়ে। থালাখানি সামনে নামাতে দেখি, তার ওপর এক ছড়া সোনার হার। ব্রজকিষণ-পত্নী এগিয়ে এসে হারটি আমার পায়ের ওপর রাখলেন শেঠজী তুলে নিয়ে গলায় পরিয়ে দিলেন আমার। তারপর এল প্রকাণ্ড এক থাল সন্দেশ। একখানি সন্দেশের কোণ ভেঙে মুখে ফেললাম। শেঠ-পত্নী থালাখানি মাথায় তুলে নিয়ে চলে গেলেন প্রসাদ বিতরণ করতে।

তখন ফাঁকা হয়ে গেল ঘর। দরজা বন্ধ করে শেঠজী এসে বসলেন আমার সামনে। তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম, বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা আ[illegible]।

একবার ওপর দিকে তাকিয়ে, একবার ঘাড় চুলকে নিয়ে, তারপর ডান হাতের হীরে-বসানো আংটিটি নিরীক্ষণ করতে করতে বিনীতভাবে বললেন শেঠজী— "মহারাজ, দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাব কি?"

তাঁকে একদম স্তম্ভিত করে আমি পাল্টা একটি প্রশ্ন করে বসলাম—"আমাকে নিয়ে এত সমারোহ লাগিয়েছ কেন শেঠ?"

মৌনীবাবা এত স্পষ্ট করে হঠাৎ কথা বলে ফেলবেন, তা শেঠজীর ধারণায় ছিল না। আমতা-আমতা করে বললেন—"সবই তো আপনি জানেন মহারাজ। আজ ভোরে আমার স্ত্রী মনে মনে আপনার কাছে মানত করে এসেছিলেন, যদি আমরা আমাদের হারানো ছেলের সংবাদ পাই, তাহলে আপনাকে পূজা করব।

এক ঘণ্টার মধ্যে দেশ থেকে 'তার' পেলাম যে, ছেলে বাড়ি ফিরেছে। পাঁচ বছর তার কোন পাত্তা ছিল না। হাজার হাজার রুপেয়া খরচ হয়ে গেল কিন্তু এতটুকু সংবাদ পর্যন্ত আমরা পাইনি তার। আপনি কৃপা করলেন, আমার গুদামের সামনে ধুনি লাগালেন, কি খেয়াল হ'ল শেঠানীর, সে গিয়ে আপনার কাছে মানত করে এল আর আমার হারানো ছেলে ফিরে পেলাম। এ সবই আপনার কৃপা, সাক্ষাৎ অবতার আপনি। কৃপা ক'রে যখন অধমের ঘরে পদার্পণ করেছেন তখন দু'একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে সেবককে কৃতার্থ করুন।"

হাত তুলে তাঁকে থামালাম। বললাম—"শেঠ, তুমি ভক্ত, তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। তোমার প্রশ্ন যে কি তাও আমার মালুম আছে। আজ উত্তর পাবে না, যা জানতে চাও তিন দিন পরে জানতে পারবে। আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বললাম, তোমায় কৃপা করলাম, এ তুমি কাউকে বলো না—সাবধান!"

হাত জোড় করে বললেন শেঠজী—"নিশ্চয়ই, কেউ কোনও কথা জানতে পারবে না মহারাজ। কিন্তু আমার এক ভিক্ষা আছে—আপনি আব পায়ে হেঁটে শহরে ঘুরতে পারবেন না। আমাকে যখন কৃপা করেছেন তখন আমার এ আব্দার-টুকু আপনাকে রাখতেই হবে। একখানা গাড়ি আপনার জন্যে রাতদিন হাজির থাকবে। যখন যেখানে যাবেন সেই গাড়িতেই যাবেন। আমার চাকর দরোয়ান সঙ্গে যাবে আপনার। যে ক'দিন এই শহরে দয়া করে থাকবেন, সে ক'দিন সেবকের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করতেই হবে।"

মনে মনে হাসলাম। আমার ওপর পাহারা বসাতে চায় বেনিয়া। ফুড়ুৎ করে উড়ে না যায় পাখী—তাই এত সাবধনতা। কিছু ক্ষতি নেই, প্রয়োজন হলে বেমালুম হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাবে ফক্কড়।

আধ ঘণ্টা পরে সোনার হার গলায় দিয়ে, কমলা রঙের বাফিজ কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে, শেঠ ব্রজকিষণলালের চকচকে মোটরে গিয়ে উঠলাম। ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল সকালের সেই দরোয়ানজী, হাতে একটা লাল খেরোর থলি নিয়ে। ওটার মধ্যে নোট-টাকা বোঝাই, দরাজ হাতে প্রণামী দিয়েছেন শেঠ-শেঠানীরা। ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন শেঠজী—শহরের সব ক'খানি ঠাকুর দেখিয়ে আনতে হবে। গাড়ি ছুটল।

স্বপ্ন!

যে পথের ওপর দিয়ে তিন মিনিটে এক মাইল পার হয়ে চলেছি, কাল সন্ধ্যার পরে এই পথে যখন ফিরছিলাম ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে, তখন কি মনের কোণেও একবার উদয় হয়েছিল যে, রাত পোহালে এই পথের ওপর দিয়ে ঘণ্টায়

বিশ মাইল বেগে ছুটে যেতে পারব! কাল এই পথ ফুরোতে চাচ্ছিল না কিছুতেই —আর আজ চক্ষের নিমিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঐ যে কোণের বটগাছতলায় বসে বুড়িটা শাক-পাতা বেচছে, ঐ সেই চায়ের দোকানটা, যার সামনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দু'দিন আমি চা কিনে খেয়েছিলাম আর ঐ সেই শুঁটকি মাছের দোকানটা। দোকানটার সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পেটের নাড়িভুঁড়ি উঠে আসবার যোগাড় হত। হুস হুস করে উল্টো দিকে ছুটে যাচ্ছে সব। স্বপ্ন, একেই বলা চলে নির্জলা স্বপ্ন—যা অন্য কারও বরাতে কখনও সত্য হয়ে ওঠে না, একমাত্র ষণ্ডের বরাত ছাড়া।

প্যাণ্ডেলের সামনে থামল গাড়ি। দৌড়ে এল কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক। ভিড় সরিয়ে খাতির করে এগিয়ে নিয়ে চলল প্রতিমার সামনে। কর্তা ব্যক্তিরা সামনে পিছন থেকে ফিরেয়ে দিয়ে গেলেন মোটরে। খাতিরের চূড়ান্ত।

প্রতিমার সামনে পৌঁছে হাটু গেড়ে প্রণাম করলাম। দরোয়ানজী বোলাটা সামনে ধরলে। তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো টাকা বার করে ছুঁড়ে দিলাম দেবীর সামনে। ঝনঝন করে উঠল চারিদিক। ফিস্‌ফিস করে তখন দরোয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করছেন সকলে—"কে ইনি? কে এই মহাপুরুষ?"

"শেঠ ব্রজকিষণলাল হরসুখ রামদাসবাবুর গুরুজী মহারাজ?" চোখে মুখে ভক্তি নয়, একটা যেন আতঙ্ক ফুটে উঠল সকলের। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহসই হ'ল না কারও। বাপ্‌স্—কত বড় মানুষের গুরু। গুরু সম্বন্ধে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করাও হয়ত অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে দাঁড়াবে!

একে একে তিনটি প্রতিমা দর্শন করে শেষে গাড়ি এসে দাঁড়াল সেই প্যাণ্ডেলের সামনে—কাল অনেক ঘড়া জল তুলে রেখে গেছি যেখানে, সেই বাড়ির দরজায়। ছুটে এলেন স্বয়ং সুরেশ্বরবাবু সম্পাদক মশাই। না জানি কোন্ মহামান্য অতিথি এলেন দয়া করে দেবী দর্শন করতে চক্‌চকে গাড়ি চেপে! ড্রাইভারের পাশ থেকে নেমে দরোয়ানজী পেছনের দরজা খুলে ধরলে। মাথা নিচু করে আমি নামলাম।

সামনেই সুরেশ্বরবাবু, হাসি-হাসি মুখ করে দু'হাত কচলাচ্ছেন। আমি মুখ তুলতেই ঝপ্ করে তাঁর মুখের হাসি উবে গেল! গোল গোল চোখ দু'টি কপালে উঠে গেল একেবারে! নিচেকার ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল, হাঁ করে এক পায়ে সরে দাঁড়ালেন তিনি। যে ছোকরাটি কাল আমার হাত চেপে ধরেছিল, সেও ছুটে এল হন্তদন্ত হয়ে। সামনা-সামনি পড়েই একটি উৎকট বিষম খেলে গলায়—আর সেই সঙ্গে এক বেসামাল হোঁচট পায়ে। কোনও রকমে হাসি চেপে ধীর পদক্ষেপে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পূজো আরম্ভ হয়েছে। পুরোহিত তন্ত্রধারক আপন আপন কর্মে ব্যস্ত। ডান পাশে বাঁশের ওধারে বসে আছেন কয়েকজন ভদ্রমহিলা। তাঁদের কাপড়ের খসখস শব্দ আর গহনার আওয়াজ কানে এল। আমার অঙ্গ-বস্ত্রের শব্দও কিছু কম হচ্ছে না। গলায়-ঝোলানো সোনার হারটাও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে সকলে। বহুমূল্য আতরের গন্ধে তো প্যাণ্ডেল ভরে গেছে। হাঁটু গেড়ে, অত্যন্ত ভক্তিভরে বেশ অনেকটা সময় নিয়ে, প্রণাম করলাম। দরোয়ান থলিটা সামনে এগিয়ে ধরলে।

দু'হাত পুরে এক আঁজলা টাকা তুলে নিলাম। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বুকের কাছে ধরে রইলাম দু'হাত ভর্তি টাকা। তারপর যেন পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি, এইভাবে জোড়-হাত মাথার ওপর তুলে ফেলে দিলাম টাকাগুলো বাঁশের ওধারে। এইভাবে বার বার তিনবার। টাকা পড়ার ঝনঝন শব্দে যে যেখানে ছিল ছুটে এল। ভয়ানক হাসি পাচ্ছিল—না জানি মা দুর্গা কি ভাবছেন এখন মনে মনে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, মাও হাসছেন মুখ টিপে—আমার কাণ্ড দেখে। আবার নত হয়ে একটি প্রণাম করে উঠে ফিরে চললাম কোনও দিকে না চেয়ে। পিছনে চলল এক বিরাট ভীড়। বহুবার এক কথা বলতে হচ্ছে দরোয়ানজীকে—শেঠ ব্রজকিষণলালের গুরুজী মহারাজ।

গাড়িতে ওঠবার আগে সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিলেন। হুড়োহুড়ি লেগে গেল পায়ের ধলোর জন্যে। ভ্রুক্ষেপ না করে মোটরে গিয়ে উঠলাম। মোটর চলতে আরম্ভ করল। হাসিতে তখন আমার পেট ফুলছে। ওঁরা এখন যা বলাবলি করছেন, তা যদি শুনতে পেতাম। জল তুলিয়ে, শতবস্তি বইয়ে, যে মহাপরাধ করে ফেলেছেন সুরেশ্বর, তার জন্যে হয়ত এখন নিজের চুল ছিঁড়ছেন। নিশ্চয়ই সম্পাদক মশায়ের গোঁড়া ভক্তরা এতক্ষণে মারমুখো হয়ে উঠেছে তাঁর ওপর। হায়—সম্পাদক হবার কি চরম বিড়ম্বনা!

হঠাৎ গাড়ি থামল। সজোরে এক ঝাঁকানি খেলাম। চোখ তুলে দেখি, গাড়ির সামনে পড়েছে একটা মেয়েমানুষ। রাস্তার দু'ধার থেকে অনেক লোক মার মার করে তেড়ে আসছে তার দিকে। নজর পড়ল স্ত্রীলোকটির মুখের ওপর। আঁতকে উঠলাম একেবারে।

দু'জন পুলিশ তার দু'হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে সামনের রাস্তা সাফ করে দিলে। বুক-ফাটা আর্তনাদ করছে সে। গাড়ির পাশ থেকে কে বলে উঠল, "খুনী মেয়েমানুষ, খুন করে পালাচ্ছে! পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা নয়। এইবার বাছা টের পাবে খুন করার মজা।"

গাড়ির ভেতর এক কোণে মুখ লুকিয়ে বসে রইলাম। আমার বুকের মধ্যে ঘা মারতে লাগল সেই অসহায় আর্তনাদ। আমার দেওয়া নতুন কাপড-চাদর পরে আছে সে। একবার মাত্র দেখতে পেলাম তার চোখের দৃষ্টি। কি ভীষণ, কি নিদারুণ অসহায় সেই দৃষ্টি, যেন দিশাহারা হয়ে কাকে খুঁজছে।

ভয়ে কুঁকড়িমুকড়ি মেরে বসে রইলাম গাড়ির কোণে। কি সর্বনাশ—ঐ নতুন কাপড-চাদর কেন মরতে দিতে গেলাম ওকে? কাপড-চাদরের খোঁজ নিয়ে নিশ্চয়ই পুলিশ সব জানতে পারবে। আমার সঙ্গে ওর কি সম্বন্ধ, তা জানবার জন্যে তখন পুলিশ আসবে আমার কাছে। আমার নামে পুলিশের কাছে যে কি বলবে নচ্ছার মেয়েমানুষটা তাই বা কে জানে। পুলিশ আমাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করবেই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, থামকা কি একটা জঘন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম।

কিন্তু কাকে ও খুন করে পালাচ্ছে? খুন সে করেছে নিশ্চয়ই। তার চেহারার অবস্থা দেখে আমারও সন্দেহ হয়েছিল যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে এসেছে সে। ও-রকম মেয়েমানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। খুন, জখম, গলাকাটা, কিছুই ওই জাতের স্ত্রীলোকের পক্ষে আটকায় না। চুলোয় যাক্ গে, যা খুশি করে মরুক, কিন্তু এখন আমিও যে জড়িয়ে পড়ব সেই কাপড-চাদরের জন্যে। কেলেঙ্কারির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি?

সব চেয়ে মুখস্থ আছে যে উপায়টি, সেইটিই সর্বপ্রথম মগজে উদয় হ'ল। পাটগুদামে যাবার রাস্তার মোড়ে গাড়ি থামতে ইশারা করলাম দরোয়ানের পিঠে ঠেলা দিয়ে। এখন যত শীঘ্র পারা যায় মহাপুরুষকে মহাপ্রস্থান করতে হবে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে।

যেখানে পাতা ছিল আমার ছেঁড়া কম্বলের টুকরো, সেখানে পৌঁছে আর চিনতেই পারলাম না জায়গাটাকে। ইতিমধ্যে আগাগোড়া ভোল ফিরে গেছে। মস্ত একটা রঙিন চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে সেখানে। ধুনির জন্যে বড় বড় কাঠের কুঁদো এনে জমা করা হয়েছে। একখানা বেঁটে তক্তাপোশ পেতে তার ওপর নতুন কম্বল আর কার্পেটের আসন বিছানো হয়েছে। আশপাশ সাফ্ করে ফেলবার জন্যে ঝাড়ু কোদাল হাতে লেগে গেছে কয়েকজন। ব্রজকিষণবাবুর গুরুজী মহারাজ বেশ কিছুদিনের জন্যে ধুনি জেলে তিষ্ঠোবেন এখানে, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই সব তোড়জোড় চলেছে।

চলুক—আমার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই তাতে। কিন্তু আমাকে এখন খুঁজে বার করতে হবে ফক্কড়ের আদি ও অকৃত্রিম সুহৃদ, সেই ছেঁড়া ন্যাকড়া দু'খানিকে।

এই মহামূল্য চাদর-কাপড় জড়িয়ে সরে পড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। রাস্তায় নামলে এই পোশাক অন্ধেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গলার হার-ছড়াটার হাত থেকেও গলাটা বাঁচানো প্রয়োজন, নয়ত এটার জন্যেই পড়তে হবে পুলিশের খপ্পরে।

সোজা গিয়ে ঢুকলাম শ্রীহনুমানজীর বেঁটে মন্দিরে। কাছা দিয়ে, খাটো গামছা সেঁটে পরে, আড়াইমণি পুরুত মশাই একখুরি তেল-সিঁদুর গোলা নিয়ে প্রভুর অঙ্গ-সেবা করছিলেন তখন। সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালেন এক পাশে। গলা থেকে সোনার হারছড়া খুলে নিয়ে বজরঙ্গ মহারাজের গলায় পরিয়ে দিলাম। তারপর খুব ভক্তি-ভরে একটা প্রণাম করলাম মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে।

"জয় ভগবান রামচন্দ্র-ভকত বজরঙ্গ মহারাজ!"

আকাশ-ফাটা চিৎকার উঠল। পুরুতেরও চক্ষু তখন চড়ক গাছে উঠেছে। সোনার হারছড়া ঠাকুরের গলায় চাপিয়ে দেব, এতটা ভয়াবহ ভক্তি তিনি আশা করেননি। তেল-সিঁদুরের খুরি ফেলে সেই হাতেই তিনি আমার গোড় পাকড়ালেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকেও কৃপা করে বসলাম। গা থেকে চাদরখানি খুলে তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গে জড়িয়ে দিলাম। মৌনীবাবা না হলে এই বলে তাঁকে আশীর্বাদ করতাম যে, নিম্নাঙ্গে খাটো গামছা সেঁটে ঠাকুর-সেবা করবার প্রবৃত্তি থেকে যেন তিনি মুক্ত হন। কারণ যত বড়ই বজরঙ্গ-ভক্ত হোক তবু মানুষ মানুষই। সুতরাং সব কিছুর শালীনতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

হঠাৎ আর একটি মতলব খেলে গেল মাথায়। এই পুরুত-পুঙ্গবই তো আমায় মুক্তি দিতে পারেন—আমার নিম্নাঙ্গের বার্মিজ লুঙ্গির বেষ্টন থেকে। শালীনতা গোল্লায় পাঠিয়ে, এতটুকু দ্বিধা না করে, কোমর থেকে খুলে সেখানি পুরুতের কোমরে জড়িয়ে দিলাম। দিয়ে শুধু নেংটি-পরা অবস্থায় বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। বিরাট হৈ-চৈ লেগে গেল। কেউ কি কখনও দেখেছে নাকি এতবড় ত্যাগী মহাপুরুষ! তৎক্ষণাৎ শেঠজীর কাছে সংবাদ জানাতে লোক ছুটল—সর্বস্ব দান করে গুরুজী মহারাজ আবার যে কে সে-ই হয়ে বসে আছেন। এক দরোয়ানজীর কাঁধে ছিল একখানা গামছা, সেখানা টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে আসনে গিয়ে বসলাম। তাড়াতাড়ি ভক্তরা কলকেয় আগুন চাপাতে লেগে গেল।

কিন্তু তারপর?

কপালে হাত দিয়ে বসে উপায় ঠাওরাতে লাগলাম। সহজ নয়, এত জোড়া চোখের সামনে থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। এতক্ষণে পুলিশ নিশ্চয়ই খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই মানুষটিকে, যার কাছ থেকে খুনে মেয়েমানুষটা নতুন কাপড়-চাদর পেয়েছে। যে জামা-কাপড় পরে রাত্রে সে খুন করেছে,

সেগুলো ভোরবেলাই পালটে ফেলবার জন্যে নতুন কাপড়-চাদর পেল কোথা থেকে সে? খুনের প্রমাণ রক্ত-মাখা কাপড়-জামা লোপাট ক'রে ফেলতে কে ওকে সাহায্য করলে? সেই লোকটির সঙ্গে খুনীর সম্বন্ধই বা কি? তারপর যখন জানতে পারবে, কাল আমি ওদের বাসায় গিয়েছিলাম আর আমিই ওকে পালিয়ে আসতে প্ররোচনা দিয়েছিলাম, তখন আমাকে খুনের সঙ্গে জড়াতে পুলিশের এতটুকু দ্বিধা হবে না।

হয়ত এখন পুলিশ ব্রজকিষণবাবুর কাছে বসে নানা কথা জিজ্ঞাসা করছে আমার সম্বন্ধে। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়েই এখানে আসবে আমায় গ্রেপ্তার করতে। তখন কি কুৎসিত কাণ্ডই না হবে এখানে! এতগুলি সাদাসিধে মানুষের মনে কি আঘাতই না লাগবে। এক বেটা ভণ্ডকে নিয়ে ওরা মাতামাতি করছে, একটা খুনে মেয়েমানুষের সঙ্গে যার যোগাযোগ তার পায়ে ওরা মাথা লুটিয়ে দিয়েছে, সাধু সেজে একটা ঝানু বদমাশ ওদের ঠকাচ্ছিল এতদিন, এই সব বুঝতে পেরে রাগে ক্ষোভে অপমানে সেই লোকগুলির চোখ-মুখের অবস্থা যে কত-[illegible] [illegible] হয়ে উঠেছে তখন, তা কল্পনা করে শিউরে উঠলাম।

বাইরে নির্বিকার ভাবটি বজায় রেখে কলকে হাতে নিয়ে প্রসাদ করে দিলাম। এক লোটা ভাঙ-ঘোঁটা এসে নামল সামনে। লোটাটা উঁচু করে তার ভেতরের পদার্থ খানিকটা গলায় ঢেলে ওদের ফিরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ একটা এসপার-ওসপার করবার জন্যে তৈরী হলাম। এক পাশে বসানো ছিল জল-ভর্তি আমার তোবড়ানো পেতলের লোটাটি, সেটি হাতে নিয়ে চললাম নদীর দিকে। একবার যদি নামতে পারি নদীতে, তারপর দেখা যাবে এরা আমার পাত্তা পায় কেমন করে। যতক্ষণ পারব সাঁতরাব, তারপর যা [illegible] আছে কপালে। শাম্পান-নৌকো-জাহাজ যে কোন একটায় আশ্রয় পাবই, তারপর আরাকান, বর্মা বা আরও দূরে কোথাও গিয়ে পৌছব। নয়ত সোজা যমের বাড়ি গিয়ে উঠব। তবু এদের সামনে ধরা পড়ে এদের মনে আঘাত দেব না কিছুতেই। আমার মত একটি আস্ত ঈশ্বরের অবতারকে হাতের মুঠোয় পেয়েও হারাতে হ'ল বলে সবাই চিরকাল হায় হায় করতে থাকুক। এদের ভক্তি দেখানো সার্থক হ'ক।

গুরুজীকে লোটা হাতে নদী বা জঙ্গলের দিকে যেতে দেখলে ভক্তরা পিছু নেয় না। ভাগ্যে এই নিয়মটি এখনও চালু আছে জগতে! সুতরাং ভক্তরা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাঙের লোটা আর কল্কেতে মশগুল হয়ে রইল, আমি মহাপুরুষ-জনোচিত গুরু-গম্ভীর চালে লোটা হাতে সরে পড়লাম। পাটগুদাম ঘুরে নদীর পাড়ে পৌছতে দু'মিনিটও লাগল না। একবার পিছনে ফিরে দেখে নিলাম, কেউ আসছে কিনা

পিছু পিছু। কেউ না। তরতর করে নেমে গেলাম জলের ধারে। এইবার দুর্গা নাম নিয়ে একটি ঝম্প-প্রদান—ব্যস!

সামনে থেকে কি একটা আওয়াজ আসছে না? ভট্‌ ভট্‌ ফট্‌ ফট্‌ করে এক-খানা মোটর-বোট এসে থামল সামনে। এ-সময়ে এখানে এ আপদ আবার জুটল কোথা থেকে? আর কি জায়গা ছিল না কোথাও বোট ভিড়োবার? জনা তিনেক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা নামলেন। এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। ওদের একজন বললেন, "এই ঘাটেই নামতে হবে, ভাল করে জেনে এসেছ তো?" আর একজন জবাব দিলেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ—এই তো সামনেই ব্রজকিষণবাবুর গুদাম। গুদামের ওপাশে সেই ছোট্ট হনুমানজীর মন্দিরের সামনে তাঁর আসন পড়েছে। সেই কথাই তো বলে দিলেন সুরেশ্বরবাবু।"

ভদ্রমহিলাটি বললেন—"বোটে না এসে গাড়িতে এলেই হত। শেঠজীর গদিতে খোঁজ নিয়ে আসা যেত।"

"আবার কে যায় অত ঘুরতে, সপ্তমী পূজোর দিন, এতক্ষণে লোকের ভিড়ে গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে রাস্তায়। এই ভাল হ'ল, চট করে পৌঁছে গেলাম।"

মহাপুরুষ দর্শন করতে ওঁরা ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন আমার পাশ দিয়ে। চট্টগ্রাম বন্দরের নাম খোদাই-করা পেতলের তকমা-আঁটা একটি চাপরাসী বসে রইল বোটের সামনে। বন্দরের হোমরা-চোমরা কর্মচারীরা চলেছেন শেঠজীর গুরু দর্শন করতে। যান—ততক্ষণে এধারে গুরুজী অন্তর্ধান করুক কর্ণফুলীর জলে।

কিন্তু বোটের পাশে জলে নামা গেল না। আরও এগিয়ে চললাম ডান দিকে, চাপরাসীর নজর এড়িয়ে জলে নামতে হবে।

এগিয়ে যাচ্ছি আর পিছনে ফিরে দেখছি। বোটের ওপর বসে লোকটি চেয়ে আছে আমার দিকে। কাজেই আরও অনেকটা এগিয়ে যেতে হ'ল। সেইখানে সামান্য ঘুরে গেছে নদী। ভালই হ'ল, বাঁকটা ঘুরে গিয়ে চাপরাসীর নজরের আড়াল হয়ে জলে নামব। জোরে পা চালালাম।

বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ল, জলের ধারে নামানো হচ্ছে একখানা দুর্গা-প্রতিমা।

এ কি কাণ্ড! মহাসপ্তমীর দিন দুপুরবেলা দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দিচ্ছে কেন?

ভুলে গেলাম নিজের বিপদের কথা, ভুলে গেলাম যে আমাকে তখনই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জান-মান বাঁচাতে হবে, ভুলে গেলাম যে আমি একটি মৌনীবাবা। দৌড়ে গেলাম প্রতিমার কাছে। দশ-পনেরো জন, ভদ্রলোক

এসেছেন প্রতিমার সঙ্গে। জনা-আষ্টেক মুটে প্রতিমা নামিয়ে হাঁপাচ্ছে। সামনে যাঁকে পেলাম, তাঁরই হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "এ কি সর্বনাশ করছেন আপনারা? আজ বিসর্জন দিচ্ছেন কেন মাকে?"

এক ঝটকায় তিনি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রুখে উঠলেন, "দিচ্ছি বেশ করছি—তাতে তোমার কি?"

তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দয়া করে বলুন না মশাই, আজ মহাসপ্তমীর দিন কেন প্রতিমা ভাসিয়ে দিতে এসেছেন?"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—"সে কথা শুনে কি লাভ হবে তোমার? আমাদের দ্বারা মায়ের পূজো হ'ল না, তাই ভাসিয়ে দিচ্ছি।"

ওধার থেকে কে ভারী গলায় হুকুম দিলেন—"লেও, আভি উঠাও ঠাকুর।"

দৌড়ে গিয়ে প্রতিমার কাঠামো আঁকড়ে ধরলাম—"না, কিছুতেই দেব না প্রতিমা তুলতে, আগে আপনাদের বলতেই হবে কেন বিসর্জন দিচ্ছেন আজ মাকে?"

তেড়ে এসে একজন আমার ঘাড় চেপে ধরলেন, আর দু'জনে ধরলেন দুই হাত। টানাটানি হেঁচড়াহেঁচড়ি শুরু হয়ে গেল। দু-এক ঘা পড়লও আমার পিঠে। দূর থেকে কে হুকুম দিলেন—"মার বেটা পাগ্‌লাকে, আচ্ছা করে বেটাকে শিক্ষা দিয়ে দে, পাগলামি ছেড়ে যাক।" সবাই 'মার মার' করে চেঁচাতে লাগলেন। এই সময়ে সকলের গলা ছাপিয়ে বাজখাঁই গলায় কে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"আরে ক্যা হুয়া, ক্যা চল্ রহা উধার?"

কোনও রকমে মুখ তুললাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার এক গর্জন—"আরে গুরুজী মহারাজকো—" আর কিছু আমার কানে গেল না। কিল চড় ঘুষির শব্দে, পরিত্রাহি চিৎকারে নিমেষের মধ্যে নদীতীর কাঁপতে লাগল। রৈ রৈ শব্দ উঠল পাট-গুদামের দিক থেকে, লম্বা লম্বা লাঠি হাতে হনুমানজীর চেলারা হুড়মুড় করে নেমে এলেন। বিসর্জন দিতে এসেছিলেন যাঁরা, তাঁরা অন্তর্ধান করলেন, এক পাশে দাঁড়িয়ে মুটেরা ভয়ে ঠক্‌ঠক করে কাঁপছে তখন। আর বজরঙ্গবালীর সাক্ষাৎ বংশধরেরা আমাকে আর প্রতিমাকে ঘিরে প্রচণ্ড বিক্রমে গর্জন করছে—"জয় দুর্গামাইকী জয়।"

ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন শেঠ ব্রজকিষণলাল, তাঁর পিছনে পিল পিল করে নামতে লাগল মানুষ। মাড়োয়ারী-গুষ্টির যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় এসে গেলেন। চাকর-দরোয়ান-কর্মচারীদের মধ্যে কেউ বাকি রইল না আসতে। ওপরে দাঁড়িয়ে ঘোমটা ফাঁক করে মহিলারাও দেখতে লাগলেন ব্যাপারটা।

খাকী-পরা বিশাল এক পুলিশ সাহেবও তাঁর অনুচরদের নিয়ে নামতে লাগলেন। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। হায়, কেন মরতে প্রতিমা ধরতে গেলাম। এখন উপায় কি? ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, হাজারখানেক মানুষ ঘিরে রয়েছে। এতটুকু সম্ভাবনা নেই আর কোন চালাকি করবার। দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিমার কাঠামো ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম মাটির দিকে চেয়ে।

চিৎকার করে গোলমাল থামালেন ব্রজকিষণবাবু। আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাও বেশি চোট লেগেছে কিনা? মাথা নাড়লাম।

তখন খোঁজ পড়ল, প্রতিমাখানি কাদের, কারা এনেছে প্রতিমা বিসর্জন দিতে। মুটেরা বললে, শহরের কোন বারোয়ারি পূজার প্রতিমা এখানি। বাবুদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হওয়ায় সকালবেলা পূজা শুরু হয়নি। যখন কিছুতেই ঝগড়ার নিষ্পত্তি হ'ল না, তখন একদল বাবু ক্ষেপে গিয়ে প্রতিমা তুলে আনলে নদীতে ডুবিয়ে দিতে, পূজার লেঠা চুকিয়ে দিতে একেবারে।

শুনে হাসব, না কাঁদব, ঠিক করতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে রইলাম মায়ের মুখের দিকে।

পুলিশ সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, "ঐ বারোয়ারির ব্যাপারই ঐ রকম। প্রতিবারই কেলেঙ্কারি হয় ওখানে। এবার একেবারে চরমে দাঁড়িয়েছে।"

ব্রজকিষণবাবু সাহেবের পরিচয় দিলেন আমায়। সাহেব হচ্ছেন ডি. এস. পি., ব্রজকিষণবাবুর বিশেষ বন্ধুলোক। বড় ভক্ত মানুষ, মহাপুরুষ দর্শন করতে এসেছেন। সাহেবের বাড়ি বেহারে। নাম তেওয়ারী সাহেব।

তখন তেওয়ারী সাহেব মাথার টুপি খুলে, পাশের লোকের হাতে দিয়ে, কোনও রকমে নিচু হয়ে আমার পায়ে হাত ঠেকালেন। যাঁরা মোটর-বোট থেকে নেমে ওপরে গিয়েছিলেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তেওয়ারী সাহেবের পেছনে। তাঁরা বললেন, "বোট থেকে নেমেই মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি আমরা। ওঁকে চিনতাম না, আর তখন বুঝতেও পারিনি, কেন উনি সে-সময় নদীর ধারে একলা দাঁড়িয়ে ছিলেন।"

মহিলাটি বললেন, "অন্তর্যামী না হলে কি করে উনি জানতে পারলেন যে, এ-সময় ওখানে কেউ প্রতিমা নিয়ে আসছে?" পুলিশ সাহেবকে পাশ কাটিয়ে, সামনে এসে তিনি আমার পায়ে মাথা ঠেকালেন।

তখন আর এক চোট রৈ-রৈ উঠল, "জয় গুরুজী মহারাজকো জয়।"

শেঠ ব্রজকিষণলাল হুকুম দিলেন—"নিয়ে চল প্রতিমা, আমরা পূজা করব।

সাক্ষাৎ গুরুজী প্রতিমা কেড়ে নিয়েছেন। কাজেই পূজা করতেই হবে। দুর্গা মাই কৃপা ক'রে শেষে এসেছেন আমাদের কাছে।"

বার বার আকাশ বাতাস কাঁপতে লাগল জয়ধ্বনিতে। দুর্গামাইকী জয়। তুলে আনা হ'ল প্রতিমা, এনে বসানো হ'ল সেই চাঁদোয়ার তলায়। পণ্ডিত পুরোহিত খুঁজে আনতে ছুটল গাড়ি নিয়ে কয়েকজন। যিনি এখনও উপবাস করে আছেন, তাঁকে আনতে হবে যে-কোনও উপায়ে। পুলিশ লাইনে পূজা হচ্ছিল। তেওয়ারী সাহেব বললেন—"এতক্ষণে বোধ হয় সেখানকার পূজা শেষ হয়েছে। সপ্তমী আছে রাত ন'টা পর্যন্ত। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি সেখানকার পণ্ডিত দু'-জনকে। তারা আজ এখানেও পূজা করুন। কাল অন্য ব্রাহ্মণ ঠিক করা যাবে।

মোটের ওপর যে কোন উপায়ে পূজা হওয়া চাই, এই হচ্ছে সকলের মত।

পয়সায় কি না হয়। ঢাক-ঢোল-কাঁসি-সানাই আধঘণ্টার ভেতর পৌঁছে গেল। বহু লোক লেগে গেল বাঁশ পুঁততে। পাটগুদামের বড় বড় ত্রিপল ঢাকা দিয়ে মস্ত বড় প্যাণ্ডেল খাড়া হয়ে গেল। স্তূপাকার হ'ল পূজার উপচার। তিনজন উপবাসী ব্রাহ্মণ এসে, বারবেলা বাদ দিয়ে, সন্ধ্যার আগেই পূজা আরম্ভ করলেন। কেড়ে-নেওয়া দুর্গার পূজা দেখতে শহর সুদ্ধ মানুষ ভেঙে পড়ল। মস্ত বড় গেট বেঁধে তার মাথায় নহবত বাজতে লাগল।

এলেন সুরেশ্বরবাবু, এলেন যাঁদের পূজা মণ্ডপের সবাই। বাঁশ পুঁতে মোটা কাছি দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে আমার আসন। কাছির বাইরে দাঁড়িয়ে সকলে মহাপুরুষ দর্শন করে গেলেন। সহজ মহাপুরুষ নয়, সাক্ষাৎ মায়ের আদেশ পেয়ে প্রতিমা কেড়ে এনেছেন। কিন্তু মহাপুরুষের কাছে যাবার অধিকার নেই কারও। এক ডজন পুলিশ আর এক কুড়ি দরোয়ান ঘিরে রয়েছে মহাপুরুষকে। নয়ত লোকের চাপে পিষে মারা যাবেন যে।

না গেলেও বরং ছিল ভাল। কি ভয়ানক ফাঁদে পড়ে গেলাম। আজ হোক কাল হোক পুলিশ আসবেই, ধরে নিয়ে যাবেই আমাকে। কি ভয়ানক কাণ্ডই যে হবে তখন। হয়ত এরা মায়ের পূজাই দেবে বন্ধ করে। একটা ঠক-জোচ্চোরে যে প্রতিমা বিসর্জন দিতে না দিয়ে তুলে এনেছে—সে প্রতিমার পূজা করে অনর্থক পয়সা নষ্ট করবে কেন এরা? ভাববে সকলে, প্রতিমা কেড়ে আনার মধ্যেও কিছু বদ মতলব ছিল আমার।

কিন্তু কোনও ক্রমেই আর একলা এক পা নড়বার উপায় নেই। লোটা হাতে নদীতে যাবার সময়ও চারজন দরোয়ান লাঠি ঘাড়ে করে সঙ্গে চলেছে। শেঠজীর হুকুম—খবরদার যেন গুরুজী একলা কোথাও না যান। বলা তো যায়

না, মার খেয়ে যারা প্রতিমা ফেলে পালিয়েছে, তারা কোথাও ওৎ পেতে বসে থাকে।

নিরুপায় পঙ্গুর মত বসে রইলাম চুপ করে। ছিলিমের পর ছিলিম এল, এল লোটার পর লোটা ভাঙ। ক্রমে ভিড় কমে এল। ব্রজকিষণবাবু আর কয়েকজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তখন এসে আমার সামনে আসন গ্রহণ করলেন। মায়ের আরতি শেষ হ'ল। ব্রাহ্মণরা জল খেতে চলে গেলেন। এমন সময় দূরে দেখা গেল সেই পুলিশ সাহেবকে, আরও দু'জন খাকী-পরা অফিসার সঙ্গে করে গেট পার হয়ে এগিয়ে আসছেন। গেটের ওপর নহবত তখন মল্লার ধরেছে।

ডি. এস পি. সাহেব সোজা এগিয়ে আসছেন। কেন আসছেন ওঁরা, তা আমার চেয়ে ভাল করে কেউ জানে না। একবার মা-দুর্গার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। তারপর চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। না, কোন উপায় আর নেই। এতগুলি লোকের মাঝ থেকে ছুটে পালাবার কথা চিন্তা করাও পাগলামি। এক মাত্র উপায় উবে যাওয়া। কিন্তু ফক্কড় কর্পূর নয়। সুতরাং চোখ বুজে নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

ব্রজকিষণবাবু খাতির করে আহ্বান করলেন তেওয়ারী সাহেবকে। জিজ্ঞাসা করলেন—"এত দেরি হবার কারণ কি?"

আসন গ্রহণ করে তেওয়ারী সাহেব বললেন—"পুলিশের চাকরি কবি জানেন তো শেঠজী? খুন খারাপি নোংরা ব্যাপার নিয়ে দিন কাটে। লেগেই আছে একটা না একটা হুজ্জুৎ-হাঙ্গামা। কাল রাতে একটা লোক ভয়ানক জখম হয়েছে। সে এক জঘন্য ব্যাপার। তাই নিয়েই এতক্ষণ কাটল।"

অনেকেই এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে লোকটা? কে জখম করলে তাকে?"

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাত্মাজী কি এখন ধ্যান লাগিয়েছেন?"

শেঠজী জবাব দিলেন, "প্রায়ই তো ঐভাবে থাকেন। বাবা এখন সমাধিতে আছেন।"

তখন চাপা গলায় বললেন তেওয়ারী সাহেব—"শহরের পশ্চিম দিকের বাবাজী পাড়ায় একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে কাল রাত্রে। একটা মেয়েমানুষ এক বাবাজীকে কামড়ে জখম করেছে। মেয়েমানুষটাকে আমরা আজ সকালে ধরে ফেলেছি। তার কাছ থেকে সেই সব বাবাজীদের কীর্তিকলাপ আমরা জানতে পেরেছি। সেই পাড়াসুদ্ধ হারামজাদাদের বেঁধে আনা হয়েছে। সব ব্যাটা নচ্ছারের বেহদ্দ। একজনকেও সহজে ছাড়া হবে না। শুধু স্ত্রীলোকটাকে ছেড়ে

দেবার হুকুম হয়েছে। বড় সাহেব তাকে মোটা রকম বকশিশ করবেন। সেই জানোয়ারটা এখন হাসপাতালে আছে, যদি প্রাণে বাঁচে তাকে আমরা জেল খাটিয়ে ছাড়ব।"

তারপর আরও নিচু গলায় পুলিশ সাহেব শেঠজীদের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। কেন জখম করেছে, কি করে জখম করেছে, শরীরের কোন্‌খানে জখম করেছে। তাঁর জবাব আর আমার কানে গেল না।

চোখ খুললাম, চেয়ে রইলাম মা-দুর্গার মুখের দিকে। জ্বল জ্বল করছে মায়ের মুখ। একটা নরপশুর পশুত্বের বলি হয়েছে জেনেই কি মায়ের মুখ অত উজ্জ্বল? হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রাণ ভরে মাকে একটি প্রণাম করলাম।

মহাতিথি মহাষ্টমী।

প্রভাতের আলোয় ধরণীর বুকে জন্মগ্রহণ করেছে একটি দিন। কে জানে, কি আছে নবজাতকের ভাগ্যে? কি সঙ্গে নিয়ে এল এই নতুন অতিথিটি, আজব আশঙ্কা না আশ্বাসের আলো? মাত্র অষ্টপ্রহর এর পরমায়ু, এই সামান্য সময়-টুকুর মধ্যে কত রকমের বল বিক্রম জাহির করবে এই ক্ষণজন্মা, তারপর আর একটি আগন্তুকের জন্য স্থান ছেড়ে দিয়ে অন্তর্ধান করবে বিস্মৃতির অন্তরালে।

ফক্কড় কখনও স্বাগত জানায় না এদের, বিদায়ও দেয় না সমারোহ করে। কারণ এদের একটির সঙ্গে অপরটির কোথাও কোনও মিল নেই, জাত-কুল, মন-মেজাজ সবই বিভিন্ন ধরনের। এইটুকু ভাল করে জানে বলেই ফক্কড়ের অভিধানে চমক বলে কোনও কথা নেই। সহসা-অকস্মাৎ-হঠাৎ এই সব শৌখিন শব্দগুলি ভদ্র মানুষদের নিজস্ব সম্পদ। ফক্কড় জানে, তার জীবনের এই স্বল্পায়ু অতিথিদের কাছ থেকে তার ভিক্ষে করবার কিছু নেই। যা দেবার এরা দিয়ে যায়, আর যা নেবার তা নিয়ে বিদেয় হয়। এই দেওয়া-নেওয়ার ে‍ায় ফক্কড়ের কিছুমাত্র লাভ-লোকসান নেই।

রামকেলী ধরেছে সানাই।

বাঙলার মায়েদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ মহাষ্টমী তিথি। এই তিথিতে বাঙালী মা জগৎ-জননীর কাছে সন্তানের জন্যে কল্যাণ ভিক্ষা করেন—আয়ু দাও, যশ দাও, ভাগ্য দাও আমার সন্তানকে, তাকে জয়দান করো মা—শ্রী দান করো। মহাতিথি মহাষ্টমীতে বাঙলার আকাশ-বাতাস শোধিত হয় মাতৃ-হৃদয়ের অমৃত-সিঞ্চনে। তাই বাঙালী মরলেও বাঙলার প্রাণ কিছুতেই মরে না, বাঙালীর জয়যাত্রা কিছুতেই ব্যাহত হয় না।

সানাইয়ের সুরে কেমন যেন নেশার আমেজ আছে। উঠি উঠি করেও উঠতে পারছিলাম না। শুয়ে শুয়েই হিসেব করে ফেললাম। আজ যেতে হবে ডি. এস পি. সাহেবের বাড়িতে। তাঁর বৃদ্ধা মা সাধু দর্শন করবেন। দুপুরবেলা স্বয়ং তেওয়ারী সাহেব এসে সঙ্গে নিয়ে যাবেন আমায়। তার আগে একবার বার হবো অন্য পূজা-মণ্ডপগুলি ঘুরে আসতে। কিন্তু এরা কি ভাববে তাহলে? এখন অন্য কোথাও পূজা দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন কি আমার? সেধে এসেছেন মা আমায় কৃপা করতে, চোখের সামনে দশ দিক আলো করে বসে আছেন জগৎ-জননী, এঁকে ফেলে রেখে কেন আমি ছুটছি অন্য সব পূজা-মণ্ডপে?

যা খুশি ভাবুক এরা, তবু একবার আজ সকালে বার হতেই হবে। দেখে আসতেই হবে সেই দৃশ্যটা, যা এখানে দেখা ঘটবে না কপালে। দেখে আসব লালপাড় মটকা বা গরদের শাড়ি পরে ছেলে-মেয়ে সঙ্গে নিয়ে মায়েরা এসেছেন মহাষ্টমীর পূজা দিতে। গলায় আঁচল দিয়ে অঞ্জলি ভরে ফুল-বেলপাতা চন্দন-সিঁদুর নিয়ে আকুল নয়নে চেয়ে আছেন দুর্গতি-নাশিনী দশপ্রহরণ-ধারিণী দশভূজার দিকে। এক অনুচ্চারিত অব্যক্ত মহামন্ত্র সাকার রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছে মহামায়ার সামনে। জননীর বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকে সেই মহামন্ত্র কোনও শাস্ত্রে, কোনও পণ্ডিতের পাঁজি-পুঁথিতে যা লেখা থাকে না।

শেষ পর্যন্ত উঠে বসতেই হ'ল। সানাইয়ের সুরে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে শুয়ে মানসিক রোমন্থন করা আর চলল না। গান গাইতে গাইতে শেঠজী-বাড়ির মহিলারা উপস্থিত হলেন সেই ভোরবেলায়। তাঁদের সমবেত কণ্ঠের সুমধুর সুর মস্ত মস্ত ঘোমটার ভেতর থেকে বার হয়ে বামকেলীকে দেশছাড়া করে ছাড়লে।

আমার স্নানের দ্রব্যগুলি থালায় সাজিয়ে এনেছেন ওঁরা। সুতরাং স্থির হয়ে বসে রইলাম আসনের ওপর। আবার আমার মাথায় ঢালা হ'ল সুগন্ধি তেল, আর মহামূল্য আতর। সকলেই ঢাললেন একটু করে। ফলে সেই সকাল বেলাতেই তেলে আর আতরে চুল-দাড়ি, নাক-মুখের এমন অবস্থা হ'ল যে নদীতে না গিয়ে আর উপায় রইল না। ওঁদের কর্ম শেষ করে ওঁরা বিদায় হলেন। তখন আধ ডজন দরোয়ান সঙ্গে নিয়ে চললাম নদীতে। স্নান সেরে এসে দেখলাম, নতুন গরদের জোড় আর একবাটি হলুদ রঙের চন্দন-বাটা এসে গেছে। কাপড় চাদর পরে আসনে বসার পর দরোয়ানজীরা সেই চন্দনটা সব লেপে দিলে কপালময়। প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিলে গলায়। তাতেও মন উঠল না কারও, আরও খানিক আতর আনিয়ে গায়ে ঢেলে দিলে। তখন জ্যান্ত ঠাকুর সেজে

পুরোহিতদের পিছনে একখানা জলচৌকির ওপর বসে রইলাম।

কোনও দিকে এতটুকু অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। ঘড়ি ধরে পূজা হচ্ছে। শহর-বিখ্যাত দু'জন পণ্ডিত এসেছেন পূজা করতে। তাঁদের আত্মীয়স্বজনরাই পূজার আয়োজন করে দিচ্ছেন। ওধারে নানা রঙের কাপড় দিয়ে সাজানো হয়েছে তোরণটি। তোরণের ওপর নহবতখানার সাজসজ্জাই হয়েছে সবচেয়ে অপরূপ, সেখানে বসে সবচেয়ে নামজাদা বাজনাদাররা প্রহরে প্রহরে রাগরাগিণী পালটাচ্ছে। এই নহবতের ব্যবস্থা আর একটিও পূজা-মণ্ডপে নেই। এই বাজনা হচ্ছে শেঠজীদের জাতীয় সম্পদ। পূজা-পার্বণ, বিয়ে সাদি সমস্ত উৎসবে নহবত বাজা চাই। উৎসবের মান-মর্যাদার মূল্য নিরূপণ হয় নহবতখানার সাজসজ্জার ওপর, আর তোরণের সামনে যে ক'জন রাজস্থানী বীর কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে গোঁফে তা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের পাগড়ি, সোনালি জরির কাজ-করা বিচিত্র পোশাক আর শুঁড়-তোলা নাগরার মস মস শব্দের ওপর। দু'জন পহেলা নম্বরের পালোয়ান যাত্রাদলের প্রধান সেনাপতি সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের তোরণের সামনে, তাতেই এমন একটা আতঙ্কজনক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে, কেউ ফস করে গেট পার হতে সাহস করছে না। ইতিমধ্যেই বাঙালী ছেলেমেয়েদের একটি ছোটখাটো দল জমে গেছে ওখানে। ভাবছে ওরা, গেট পার হতে গেলে তলোয়ার খুলে তেড়ে আসবে না তো!

দেখছি আর ভাবছি। ভাবছি এ পূজো ঠিক বাঙলার পূজো নয়। নানা রঙের পোশাক পরে যারা হৈ-চৈ করছে চারিদিকে, তারা বাংলা দেশের ছেলেমেয়ে নয়। এরা জানেও না দুর্গা পূজাটা কি। ওরা এসেছে তামাশা দেখতে। পূজো তো পূজো, বাঙালীরা করে এ পূজো, এ পূজোর সঙ্গে ওদের এতটুকু পরিচয় নেই, যোগাযোগ নেই। হঠাৎ একটা বড়গোছের তামাশা জুটে গেছে, ওদের বাপ-দাদার পয়সায় হচ্ছে তামাশাটা। কাজেই ওরা আমোদ-স্ফূর্তি করবে বৈকি।

আর ঐ দূরে গেটের বাইরে এদের চেয়ে অনেক হীন বেশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মনের ভাবও তাই। ওরাও জানে, এ পূজোর সঙ্গে ওদের কোনও সম্বন্ধ নেই। মারোয়াড়ীরা পয়সার জোরে রাতারাতি হুলস্থূল বাধিয়েছে, এ হ'ল বড়লোকের ব্যাপার। এর সঙ্গে বাঙালীর কি সম্পর্ক থাকতে পারে? মায়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। মনে হ'ল, কোথায় যেন কি অভাব রয়ে গেছে। প্রতিমার চোখের দৃষ্টিতে যেন সেই ভাবটি নেই—যা ফুটে উঠেছে অন্য সব পূজামণ্ডপের প্রতিমাগুলির চোখে। যেন ঠিক তেমনিভাবে জলজল করছে না মায়ের মুখ, মহাষ্টমীর দিন প্রতিটি প্রতিমার মুখ যেমন জলজল করা উচিত! যেন

—যেন মা বড বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

আরও কত কি যে মনে হ'ল। ভয়ানক রাগ হ'ল নিজের ওপর। এ সমস্ত ছাই-পাঁশ কেন চিন্তা করছি আমি? অহেতুক অযথা কৃপা করেছেন কৃপাময়ী আমাকে, রাস্তার কুকুরকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছেন রাতারাতি। তবু কেন সন্তুষ্ট হতে পারছি না আমি? যারা আমার মুখের দিকে চেয়ে আমায় তুষ্ট করবার জন্যে এতবড একটা কাণ্ড-কারখানা করে যাচ্ছে, তাদের আপনার জন বলে মনে করতে পারছি না কেন আমি? কি হীন মন আমার! কি বিশ্রী আত্মাভিমান! ছি!

সামনে দু'জন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রজকিষণলালের বাঙ্গালী ম্যানেজার রূপনারায়ণবাবু। তিনি সঙ্গে এনেছেন এঁদের, সুতরাং এঁরা সহজ লোক নন।

প্রণাম সেরে উঠে বসতে চিনতে পারলাম। সুরেশ্বরবাবু এবং একজন মহিলা। বড আপনাব জন মনে হ'ল সুরেশ্বরকে। গায়ে হাত দিয়ে ইশারা করলাম বসবার জন্যে। কৃতার্থ হয়ে ওঁরা মাটির উপরেই বসে পডলেন।

নিচু গলায় সুরেশ্বর রূপনারায়ণবাবুর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। সুরেশ্বর এসেছেন আমাকে তাঁদের পূজামণ্ডপে নিয়ে যাবার জন্যে। মহাপুরুষ যখন সেধে গিয়েছিলেন তাঁদেব কাছে, তখন তাঁরা কেউ চিনতে পাবেন নি। অসংখ্য অপরাধ করে ফেলেছেন সকলে। কিন্তু মহাপুরুষ তো অপমান অবহেলা গাযে মাখেন না। সেই বিশ্বাসেই সুরেশ্বর সাহস করে এসেছেন। একবার আমায নিযে গিয়ে চুটিযে দেখাবেন, ভক্তি-করা কাকে বলে আর কতবড উঁচুদবেব ভক্ত তাঁরা। এখন রূপনারায়ণবাবু যদি দযা করে একটু বলে দেন শেঠজীকে, কারণ শেঠজীব হুকুম ভিন্ন তো আর মহাপুরুষকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

রূপনারায়ণবাবু ছুটে গিয়ে আগে মুখ থেকে পানের পিকটা ফেলে এলেন মণ্ডপের বাইবে। তারপর বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—"শেঠজীর সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে জানাব আপনাদের কথা। বহু জায়গা থেকেই লোক এসে ধরেছে শেঠজীকে, ওঁকে নিযে যাবার জন্যে। হাকিম, পুলিশ সাহেব, সরকারী উকিল সেন সাহেব, তারপর ওধারে শহরের অনেকগুলো বারোয়ারী-পূজার পাণ্ডারা। এখন কোথায় কবে ওঁকে পাঠানো হবে, তা ঠিক করবেন শেঠজী নিজে। আপনাদের কথাও তাঁকে জানাবো সময়মত। দেখি কতদূর কি করতে পারি!"

শুনে হাত কচলাতে লাগলেন সুরেশ্বর, তাঁর সঙ্গিনীর মুখ লাল হয়ে উঠল।

আর আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। এ কি রকম কথা? আমি কি বন্দী নাকি এঁদের কাছে? আমার যখন ইচ্ছে, যেখানে খুশি যাবো এঁরা বাধা দেবার কে? আচ্ছা দেখি, কি করে এঁরা বাধা দেন।

উঠে দাঁড়ালাম। স্বরেশ্বরও তখন উঠেছেন। তৎক্ষণাৎ সকলকে হতভম্ব করে দিয়ে স্বরেশ্বরের হাত ধরে সোজা এগিয়ে চললাম গেটের দিকে। রূপনারায়ণবাবু চিৎকার করতে লাগলেন দরোয়ানদের নাম ধরে। কয়েকজন চাকর-দরোয়ান ছুটে এল। আমার পিছনে তারা দল বেঁধে চলতে শুরু করে দিলে। রূপনারায়ণ ছুটলেন শেঠজীর গদিতে। স্বয়ং স্বরেশ্বর এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছেন যে, আমার হাতের মধ্যে ধরা তাঁর হাতখানা থরথর করে কাঁপছে। পিছন ফিরে দেখে নিলাম, মহিলাটিও আসছেন কিনা। আসছেন ঠিকই, তবে চাকর-দরোয়ানদের পিছনে পড়ে গেছেন।

গেট পার হবার আগেই দু'খানা গাড়ি এসে থামল গেটের সামনে। একখানা থেকে নামলেন ব্রজকিষণলাল। নেমে পরিষ্কার বাঙলায় স্বরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"নিয়ে তো চলেছেন গুরুজী মহারাজকে, কিন্তু সামলাবেন কি করে? শহরসুদ্ধ মানুষ ভেঙে পড়বে, এমন হাঙ্গামা হবে যে, ওঁর শরীরেও চোট লাগতে পারে। এ সমস্ত ভেবে দেখেছেন তো?" ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন স্বরেশ্বর। কোনও রকমে বললেন, "আমি তো এখনই এঁকে নিতে আসিনি হঠাৎ যে উনি এখনই যাবেন আমার সঙ্গে, তাও জানতাম না।"

হাসলেন শেঠজী। বললেন—"উনি তো যাবেনই ঐভাবে ওঁর কি পরোয়া আছে কিছুতে, কিন্তু আমাদের সব দিক বিবেচনা করা দরকার"

পিছন ফিরে তাঁর ম্যানেজারের সঙ্গে খাটো গলায় কি পরামর্শ করলেন। ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ একখানা গাড়িতে উঠে কোথায় চলে গেলেন। এখন ধীরে-সুস্থে আর একখানা গাড়িতে আমাদের তুলে দিলেন শেঠজী। পিছনের আসনে আমি বসলাম। দু'জন দরোয়ান দু'পাশের দরজায় উঠে দাঁড়াল। স্বরেশ্বর আর তাঁর সঙ্গিনী বসলেন ড্রাইভারের পাশে। ধীরে ধীরে গাড়ি গিয়ে বড় রাস্তায় উঠল।

কিছু পরে পিছন ফিরে দেখি, একখানা পুলিশের লরি আসছে সঙ্গে সঙ্গে। অন্ততঃ এককুড়ি পুলিশ ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে লরির ওপর, আর ড্রাইভারের পাশে বসে রূপনারায়ণবাবু দাঁতের ফাঁকে দেশলাইয়ের কাঠি চালাচ্ছেন।

ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে ব্যাপারটা! ওরা আবার কেন চলেছে সঙ্গে? ও কিছুই নয়, শেঠজী একটু জাঁকজমক দেখাতে চান। তেওয়ারী

সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার দরুন এক লরি পুলিশ পাঠাতে পেরেছেন আমার পিছনে। তার মানে, লোকে এবার বুঝুক যে কত বড় শেঠের পোষা-সাধু আমি। নয়ত কি-এমন কাণ্ড ঘটতে পারে সেখানে, যার জন্যে এত সাবধানতার প্রয়োজন ?

ভয়ানক কাণ্ড না হলেও যেটুকু ঘটে বসল সুরেশ্বরবাবুর পূজামণ্ডপে, তাতে পুলিশ না থাকলে আমার উদ্ধার পাওয়া কঠিন হত বৈকি।

গাড়ির ভেতর বসেই দেখতে পেলাম, টুপি-মাথায় দু'জন অফিসার তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গেটের সামনে। লরি থামল আমাদের গাড়ির পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে কনেস্টবলরা লাফিয়ে নেমে সার বেঁধে দাঁড়ালো দু'পাশে। সুরেশ্বর নামলেন, মহিলাটি নামলেন, তারপর আমি নামলাম। তৎক্ষণাৎ ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি চরমে গিয়ে পৌঁছল। পুলিশ কেন এল, তাই দেখবার জন্যে যে যেখানে ছিল ছুটে এল। সুরেশ্বর যে একেবারে মহাপুরুষ সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন, তা নিশ্চয়ই কেউ জানত না। কিন্তু যে মহাপুরুষকে পাহারা দেবার জন্যে এক লরি পুলিশ প্রয়োজন হয়—তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত ভিড় না হলে চলবে কেন ? সুতরাং ছুটে আসতে লাগল পাড়াসুদ্ধ মানুষ। দাবানলের মত সংবাদটি ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কয়েক হাজার মেয়ে-পুরুষ ছেলে-ছোকরা জমা হয়ে গেল। সুরেশ্বর তখন আমায় নিয়ে মণ্ডপের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। দরজা রুখে পুলিশ খাড়া, আর একটি প্রাণীকেও ভেতরে আসতে দেওয়া হবে না। তাতে বড় বয়েই গেল। অন্য দিক দিয়ে তখন এত লোক ঢুকে পড়েছে মণ্ডপের মধ্যে যে আর তিল ধারণের স্থান নেই।

আমার কপালে মা-দুর্গার সামনে পৌঁছনো ঘটে উঠল না। তার দরকারও নেই। নিজেই মা-দুর্গার চেয়ে অনেক বেশি খাতির পাচ্ছি। আমাকে দর্শন করতে এত লোক পাগল হয়ে উঠেছে, আমার আবার দুর্গা দর্শন করার প্রয়োজন কি ? হাজারখানেক মা-দুর্গার সাক্ষাৎ অনুচরীরা ঘিরে ধরেছেন তখন। পায়ের ধুলোর জন্যে তাঁরা ঠেলাঠেলি চুলোচুলি লাগিয়েছেন। ভাগ্যে এদের দশটি করে হাত নেই, থাকলে আর রক্ষে ছিল নাকি!

একখানা উঁচু টেবিল এনে তার ওপর বসিয়ে দেওয়া হ'ল আমাকে। সুরেশ্বর-বাবু গর্জন করতে লাগলেন। সত্যিই যে তিনি একজন সার্থক সম্পাদক তা দেখিয়ে দিলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা মারমুখো হয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমার চারিদিকে। ঘন-ঘন অসংখ্য শাঁখ বাজতে লাগল। গোলমালটা একটু ঠাণ্ডা হ'ল। আমার গরদের কাপড়-চাদরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে তখন। গোল্লায় যাক্ কাপড়-

চাদর, দম আটকে যে মারা পড়িনি এই যথেষ্ট। টেবিলের ওপর বসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।

তখন আরম্ভ হ'ল প্রণামী দেওয়া আর পায়ের ধূলো নেওয়া। টাকা-নোট এমন কি ছোটখাটো সোনার অলঙ্কারও স্তূপাকার হয়ে উঠল পায়ের কাছে। বাঙালীও যে ভক্তি দেখাতে জানে তার ষোল-আনা প্রমাণ হয়ে গেল।

প্রণাম সারতে লেগে গেল ঘণ্টাখানেকের ওপর। ওধারে বাইরে তখন আরও কয়েক হাজার মানুষ জমা হয়েছে। তাদের চিৎকারে কানের পর্দা ফাটবার উপক্রম। এখন ঐ ব্যূহ ভেদ করে বার হতে হবে। ভাবতেই বুকের ভেতর হিম হয়ে এল।

আবার দেখা দিলেন সম্পাদক মশাই। স্বেচ্ছাসেবকদের আদেশ দিলেন ভিড় সরিয়ে পথ করতে। তারপর আমার পিছনে কাকে লক্ষ্য করে বললেন—"এবার তুলে নিয়ে চল এঁকে।"

এতক্ষণ পরে আমার পিছন ফিরে তাকাবার অবকাশ হল। দেখলাম স্বরেশ্বরের সেই সঙ্গিনীকে। তাঁর চোখ-মুখ, মাথার চুল, জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম, আমার পৃষ্ঠরক্ষা করতে কি ধকল সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে।

হাত জোড় করে বাঙলা ভাষায় নিবেদন করলেন স্বরেশ্বর—"দয়া করে একবার অধমের বাড়িতে পায়ের ধূলো দিতে হবে যে!"

সভয়ে ঘাড় নাড়লাম। আর না, আর এতটুকু ভক্তি সহ্য হবে না। এবার রেহাই দাও, যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরে যাই।

মুখ শুকিয়ে গেল স্বরেশ্বরের, তিনি অসহায় ভাবে চাইলেন মহিলার দিকে। তখন সেই মহিলা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে এমন ভাবে চেয়ে রইলেন আমার চোখের দিকে যে, আমাকে চোখ নামাতে হ'ল। অনেক কিছু ছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, সবচেয়ে মারাত্মক যা ছিল তা হচ্ছে—যদি না যাও তা-হলে আমি গলায় দড়ি দেব।

ভেবে দেখলাম—যাওয়াই উচিত। না গেলে নেহাত নিমকহারামি করা হয়। সম্পাদক মশায়ের একটা মর্যাদা আছে। যদি উনি মহাপুরুষকে একবার নিজের বাড়িতে না নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে লোকের কাছে মুখ দেখাবেন কেমন করে! তাছাড়া ঐ মহিলাটি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে এত কষ্ট সহ্য করেছেন, তারও একটা মূল্য আছে তো!

নেমে দাঁড়ালাম টেবিল থেকে। যে চাদরখানা পাতা ছিল টেবিলে, টাকা-কড়িসুদ্ধ সেখানা গুটিয়ে নিয়ে রূপনারায়ণবাবুর হাতে দিলেন স্বরেশ্বর।

স্বেচ্ছাসেবকেরা দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়াল। সামনে সেই মহিলা আর পিছনে সুরেশ্বরকে নিয়ে এগিয়ে চললাম প্রতিমার সামনে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মাকে প্রণাম করলাম। কিন্তু আজ আর প্রণামী দেবার নেই কিছু হাতের কাছে। তারপর প্রতিমার বাঁ পাশের বেড়ার গায়ে একটি ছোট ফাঁক দিয়ে আমাকে বার করে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সে-ধারে কেউ নেই। খোলা আকাশের তলায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

একটি বড় পুকুরের পাড় দিয়ে চললাম ওঁদের সঙ্গে। সুরেশ্বর বললেন, "কাছেই আমার বাসা। সামনের পথ দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবার উপায় নেই। এই পথে যেতে আপনার কষ্ট হচ্ছে!"

ভদ্রমহিলা শব্দ করে হেসে উঠলেন। বললেন, "হবেই তো, তবে ছাদের ওপর জল তুলতে যেটুকু কষ্ট হয়েছিল ততটা হবে না নিশ্চযই।"

থতমত খেয়ে সুরেশ্বর নির্বাক হয়ে গেলেন।

পুকুর-পাড় ছেড়ে ছোট একটু বাগানের মধ্যে ঢুকলাম আমরা। বাগানটুকু পার হয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম বন্ধ দরজার সামনে। টিনের চাল টিনের দেওয়াল দেওয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একখানি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি।

যিনি দরজা খুলে দিলেন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমরা বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তিনি স্বহস্তে দরজায় খিল দিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। তারপর আমার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তাঁর হাবভাব দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল আমার। এভাবে কি দেখছেন উনি? আমার দু'পাশে দাঁড়িয়ে সুরেশ্বর আর মহিলাটি বৃদ্ধের রায় শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

পরীক্ষা শেষ করে বৃদ্ধ আমার সামনে হাত নেড়ে বেশ চিৎকার করে বললেন, "আমি পিতু, কাশীর পিতু মুখুয্যে আমি, আমায় চিনতে পারছ ব্রহ্মচারী?"

সত্যিই একটু চমকে উঠলাম। সাদা চুল সাদা দাড়ির মধ্যে দেখা যাচ্ছে শুধু ঘোলাটে চক্ষু দু'টি, আর ধনুকের মত বাঁকা নাকটি। তাহলে পিতু মুখুয্যে এখনও বেঁচে আছেন! আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গেলাম। সেই মুহূর্তে পিতুবাবু আবার বলতে লাগলেন, "এই সুরেশ্বর হচ্ছে আমার জামাই, এখানকার কলেজে প্রফেসারি করে। আর ঐ আমার মেয়ে গৌরী। এবার মনে পড়ছে আমাদের?"

আর একবার ভাল করে দেখলাম মহিলাটিকে। গৌরী অর্থাৎ পিতু মুখুয্যের

মেয়ে এবং প্রফেসার সুরেশ্বরবাবুর স্ত্রী রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে চেয়ে আছেন আমার দিকে। এ সেই দৃষ্টি, যা দেখে প্যাণ্ডেল থেকে এসেছি আমি ওঁর সঙ্গে। এর দৃষ্টি বলতে চায়—বলো—চিনতে পারছ, না বললে এখনই আমি গলায় দড়ি দেব।

হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, "কি করে চিনি বলুন? গৌরী যে এমন একজন গিন্নীবান্নী হয়ে পড়েছে, এ কি ধারণা করা সহজ?"

আমার হাসিতে ওঁরা কেউ যোগ দিলেন না। বেশ শব্দ করে গৌরী একটি নিঃশ্বাস ফেললে। যেন এতক্ষণে তার বুকের ওপর থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। পিতুবাবু দু'হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সুরেশ্বর বললেন—"আমি প্রথম দিনই বুঝেছিলাম উনি বাঙালী।"

গৌরী এবার হেসে ফেললে। বললে—"তা তো নিশ্চয়ই, তা না বুঝলে কি ওঁকে দিয়ে অত জল তোলাতে পারতে?"

পিতুবাবু তখনও জড়িয়ে ধরে আছেন আমাকে। বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তিনি। কম্পিত গলায় বলতে লাগলেন বৃদ্ধ—"সকলকে ফাঁকি দিয়ে যখন পালালে কাশী থেকে, তখন পিতু বুড়োর জন্যেও কি একবার তোমার মন খারাপ হ'ল না ব্রহ্মচারী? একবার মনেও হ'ল না তোমার যে, বুড়োটা হয়ত পাগল হয়ে যাবে বা মরে যাবে?"

ততক্ষণে গৌরী চলে গেছে ঘরের মধ্যে। সেখান থেকেই সে বললে, "এবার ছেড়ে দাও বাবা তোমার ব্রহ্মচারীকে। ঘরের ভেতর এনে বসাও। এবার একটু মুখে জল-টল দিতে হবে তো ওঁকে।"

পিতুবাবু ছেড়ে দিলেন আমাকে। বললেন—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই তো, ঠিকই তো। আগে একটু সরবৎ দে গৌরী। ভিড়ের চাপে নিশ্চয়ই ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে ব্রহ্মচারীর।"

তখনও সুরেশ্বর মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। তাঁর কাঁধের ওপর হাত রেখে বললাম, "একটুও মন খারাপ করবেন না আপনি আমাকে দিয়ে জল তোলাবার জন্যে। আপনার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ, তাতে ও-রকম একটু-আধটু ঠাট্টা করা চলে।"

হা হা করে হেসে উঠলেন পিতুবাবু। কাশীর সেই পিতুবাবু—এই হাসির জন্যেই বাঙালীটোলায় বিখ্যাত ছিলেন পিতু বুড়ো। আরও অনেকটা বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর হাসিটি এখনও ঠিক তেমনিই আছে। হাসি তো নয় যেন একটা জলপ্রপাত। ভাসিয়ে নিয়ে যায় যা-কিছু সামনে পড়ে। মারাত্মক সংক্রামক জিনিস হচ্ছে পিতুবাবুর ঐ প্রাণ-খোলা হাসি। ঐ হাসির তোড়ে কাশীতে কয়েকটা

বছর কেমন অনায়াসে কেটে গেছে আমার। ঐ হাসি দিয়ে পিতুবাবু আমার মনের কালি ধুয়ে দিয়েছিলেন। যতবার মাথা তুলতে গেছি, ততবার পিতুবাবুর হাসি আমার মাথার ওপর ছড়ছড় করে ঝরে পড়েছে আর একেবারে শীতল হয়ে গেছি আমি। ভালই হয়েছে, কোথায় কাশী, কোথায় চট্টগ্রাম। পিতুবাবু এখন জামায়ের বাড়িতে বাস করছেন। প্রফেসার জামায়ের শ্বশুর এখন কাশীর পিতু বুড়ো। আমারও বেশ উন্নতি হয়েছে। ছিলাম কালীবাড়ির পুরুত, এখন হযেছি ফক্কড। বন্য জন্তুব মত স্বাধীন প্রাণী ফক্কড। দরোয়ান, পুলিশ, গরদের কাপড-চাদর, টাকা, নোট, সোনার অলঙ্কাব এই সব দিযে বাঁধা যায় না ফক্কডকে, কিছুতেই ফক্কডকে বশীভূত করা যায় না। কিন্তু যায়ও তো আবার ফক্কডকে বশীভূত করা। এই তো গৌরী অনায়াসে তার চোখেব দৃষ্টি দিয়ে বশীভূত কবে বাডিতে নিয়ে এল ফক্কডকে। নামকরা প্রফেসারপত্নী গৌরীর চোখেব দৃষ্টি এখনও বদলায়নি তাহলে।

বাবান্দায শতরঞ্চি বিছিযেছে গৌরী। আমরা তিনজনে উঠলাম বারান্দায়। একখানা আসন হাতে ছুটে এল সে। আসনখানা হাত থেকে টেনে নিয়ে ফেলে দিলাম ওপাশের চেয়ারের ওপর। বসে পডলাম শতরঞ্চিতে। চোখ পাকিয়ে বললাম, "দেখ ক্ষেপিও না বলছি বাডাবাডি কবে। সম্পাদক মশাই আমার মত একজন মহাপুরুষকে সসম্মানে নিযে এসেছেন। তুমি অপমান করছ কেন? নালিশ করলে মজা টের পাবে।"

এতক্ষণে সুরেশ্বরেব মুখের কালো মেঘ কাটল। বললেন—"তা করবেন পরে। এখন একটু সেজেগুজে বসুন আসনের ওপর। আমি ম্যানেজারবাবুকে ডেকে আনি এখানে। আপনাব সামনে তাঁকে বলে দি এবেলা যাবেন না আপনি।"

এ-বেলা যাব না আমি। বলে কি?

পিতুবাবুর টনটনে আক্কেল আছে। তিনিই বাধা দিলেন জামাইকে।

"সেটা ভাল দেখায় না সুরেশ্বর। তাতে গোলমাল আরও বাডবে, লোক ভেঙে পডবে এ বাডিতে। এখন জলটল খাইয়ে ব্রহ্মচাবীকে পৌছে দাও মারোয়াডীদের হাতে। পূজার হাঙ্গামা চুকলে আমবা আবার নিযে আসব। ততদিনে মানুষের উৎসাহেও একটু ভাঁটা পডবে।"

ঘরের ভেতর থেকে গৌরী বললে, "সে যা হয় হবে'খন খানিক পরে। এখন না খেয়ে এক পা নডতে পারবে না কেউ বাডি থেকে।"

চেপে বসলাম। সুরেশ্বরের হাত ধরে টেনে বসালাম পাশে। যার যা খুশি ভাবুক। কে কি ভাববে, তার জন্যে থোডাই কেয়ার করে ফক্কড়। শুধু ফক্কড

কেন, মহাপুরুষ ফক্কড়। মহাপুরুষের ইচ্ছায় বাধা দেওয়া পাপ, কার এত সাহস হবে শেঠজীর গুরুজীকে বিরক্ত করবার? অতএব থাকুক ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

মস্ত একটা সাদা পাথরের বাটি সামনে ধরলেন গৌরী। হাত থেকে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খালি করে দিলাম বাটিটা। নুন চিনি দই লেবুর রস দিয়ে চমৎকার বানানো হয়েছে সরবৎটা, বেশ যত্ন করেই বানিয়েছেন গৌরী। বহুদিন আগেই এই রকম এক বাটি সরবৎ আমার প্রাপ্য ছিল গৌরীর কাছে। অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে মাঝখানে। তখন হয়ত এত যত্ন করে এই রকম চমৎকার সরবৎ বানাতে পারত না গৌরী। তা না পারুক তবু অন্ততঃ একটি দিন আমাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতে পারতেন পিতুবাবু। না-হয় মেয়ের হাতের সরবৎ না খাইয়ে শুধু মুখেই আমায় বিদায় দিতেন সেদিন, না-হয় আজকের এই প্রফেসরবাবুর স্ত্রীর মত তখনকার সেই গৌরী এত অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারত না। তবুও তখনকার সেই হতদরিদ্র কালীবাড়ির পুরুতের অতি-তুচ্ছ মর্যাদার কিছুমাত্র হানি হত না। এতবড় একটা মহাপুরুষকে বাড়িতে ধরে এনে এত উচ্ছ্বাস এত আদর-আপ্যায়ন দেখানোর চেয়ে তখনকার সেই হতভাগা কালীবাড়ির বামুনকে একবার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলে পিতাপুত্রীর উদার প্রাণের পরিচয় পেয়ে আরও বেশী মুগ্ধ হতাম আমি। আর তাহলে হয়ত—

"হয়ত তুমি ভাবছ ব্রহ্মচারী, তোমায় আমি চিনলাম কি করে? আমি তোমায় চিনতে পারিনি। গৌরী তোমায় চিনতে পেরেছিল। তোমায় জল তুলতে দেখে এসে গৌরী আমায় বললে তোমার কথা। আমার বিশ্বাস হয়নি। আমার ধারণা ছিল, তুমি এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছ। হয়ত এতদিনে আবার সংসারী হয়ে বিয়ে-থা করে শান্তিতে—"

হেসে উঠলাম পিতুবাবুর কথা শুনে। বললাম 'শান্তিতেই তো আছি পিতুবাবু, এত ভক্ত, এত মান-মর্যাদা, এত ধন-দৌলত আমার পায়ে আছড়ে পড়ছে তবু বলেন সংসারী হলেই শান্তি পেতাম।"

বৃদ্ধ আর একটি কথা বললেন না। দূর আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। বাটি নিয়ে গৌরী আবার ঘরের মধ্যে চলে গেছে। সুরেশ্বরও উঠে গেছেন। ঘরের ভেতর থেকে ওদের স্বামী-স্ত্রীর কথার আওয়াজ আসছে। মহাপুরুষকে জল খাওয়াবার আয়োজন হচ্ছে ওখানে।

সজোরে একটি ধাক্কা দিয়ে জাগালাম ফক্কড়কে। সাবধান—এলিয়ে পড়া সাজে না তোমার। তুমি একটি পোড়-খাওয়া পেশাদার ফক্কড়। রক্ত-মাংসে গড়া একটি

আস্ত উপগ্রহ তুমি। ঘুরতে ঘুরতে এমন জায়গায় এসে পড়েছ, যখন আলোয় আলো হয়ে গেছে তোমার ওপর-ভেতরে। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যে? আবার তোমায় ছুটতে হবে তোমার আপন পথে, ঘুরতে হবে অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে। এই তোমার বিধিলিপি, কার সাধ্য খণ্ডন করে?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিতুবাবু বললেন—"তুমি যে বেঁচে আছ, এ কথা তখন কেউ বিশ্বাস করেনি। শুধু এই পিতু বুড়ো তিন বছর ধরে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে মরেছে। আমি শুধু গলা ফাটিয়ে বলেছিলাম তখন—ব্রহ্মচারী মরেনি, মরতে পারে না সে হীন অবস্থায়। লোকে হেসেছে, পাগল বলেছে আমাকে, আমি বাবা বটুকনাথের কাছে মাথা খুঁড়েছি। এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন বটুকনাথ, তোমায় ফিরে পেলাম তাঁর দয়ায়। কাল সকালে যখন তুমি রাজ-রাজেশ্বর সেজে প্রতিমা দর্শন করতে এসেছিলে, তখন দূর থেকে দেখে তোমায় চিনে ফেললাম। তাই তো পাঠালাম আজ গৌরী আর সুরেশ্বরকে তোমার কাছে। একবার আমার সঙ্গে তুমি কাশীতে চল ব্রহ্মচারী, সেই হতভাগা-হতভাগীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব যে, পিতু বুড়ো পাগল নয়। মিথ্যে কথা বলে পিতুকে ভোলানো অত সহজ নয়।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি মরে গেছি এ কথা রটল কি করে?"

"কি করে যে কি রটে কাশীতে, তা বাবা বিশ্বনাথই জানেন।" পিতুবাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ঘরের ভেতর থেকে গৌরী বললে, "আবার সে-সব কথা আজ তুলছ কেন বাবা? তাঁরা সব ব্রহ্মচারী মশায়ের একান্ত আপনার লোক ছিলেন। পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরা ছাড়া আর তো কাউকে চিনতেন না ব্রহ্মচারী মশায়। তাঁরা যা করেছিলেন, ওঁর ভালর জন্যই করেছিলেন।"

পিতুবাবু বললেন, "সেই কথাটাই ব্রহ্মচারীর জানা দরকার। একেবারে জল-জ্যান্ত মিথ্যে কথা রটাতে লাগল। গঙ্গোত্তরীর পথে উত্তরকাশীতে তোমার কলেরা হয়েছিল। চিনতে পেরে অনেক সেবা শুশ্রূষা করে তারা। তারপর সব শেষ হয়ে গেলে, শেষ কাজটুকু করে, তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে গঙ্গোত্তরী চলে যায়। সবাই বিশ্বাস করলে তাদের গল্প। আমি বললাম—না, তা কখনও হতে পারে না। এ মিথ্যে, অমন ইতরের মত মরতে পারে না ব্রহ্মচারী। জগৎজননী রাজ-রাজেশ্বরীর সন্তান, না হয় ঘুরছেই পথে পথে, তা বলে—"

আবার জিজ্ঞাসা করলাম—"সে তারা কারা? কারা রটালে এ সমস্ত কথা?"

আড়াল থেকে ঝাঁজিয়ে উঠল গৌরী, "অন্য কে রটাতে যাবে অমন অলক্ষুণে কথা? রটালেন শঙ্করীপ্রসাদ আর তাঁর মেম সাহেব। যাঁরা এখন স্বামী

শঙ্করানন্দ আর করুণাময়ী ভৈরবী সেজে কালীবাড়িতে জাঁকিয়ে বসে ব্যবসা চালাচ্ছেন।"

পিতুবাবু বললেন, "রক্তের দোষ, বিষাক্ত রক্তে জন্ম। লেখাপড়া শিখে দেশ-বিদেশ ঘুরে এলে হবে কি, ওর রক্তে মিশে আছে ব্যভিচার। আসল কাল-কেউটের পেটে জন্ম, ঠিক সময় সব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। সেই সর্বনাশী কালীর দোহাই দিয়ে চুটিয়ে স্ফূর্তি চালাচ্ছে। তারানন্দ পরমহংসের মেয়ের পেটে জন্মে যা করা উচিত তাই করছে। বড বড লোক তার চেলা হয়েছে। বড বড ঘরের সর্বনাশ করছে। যে কালীবাডিতে সন্ধ্যে-দীপ জ্বলত না, এখন তার জাঁকজমক দেখে কে। এখন তুমিই আর চিনতে পারবে না সেই কালীবাড়িকে।"

সুরেশ্বর এসে বললেন, "এবার উঠুন। হাতে-মুখে জল দিন। মহাষ্টমবী প্রসাস মুখে দিন একটু।"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন পিতুবাবু, "হ্যা-হ্যাঁ—উঠে পড ব্রহ্মচারী। আর দেরি করে কাজ নেই। ওরা হয়ত এখানেও এসে পডবে।"

এবার সুরেশ্বর বাধা দিলেন শ্বশুরকে—"অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি। তাঁরা ওঁকে ভাল করে চেনেন। উনি নিজে ইচ্ছা করে না গেলে কেউ ডাকতে আসতে সাহস করবে না। পুলিশ গলির মুখে দাঁডিয়ে আছে। এক প্রাণীকে ভেতরে আসতে দেবে না। ইতিমধ্যে ডি. এস. পি. সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজকিষণবাবু নিজে সব ব্যবস্থা করে গেছেন।"

বেশ ধোঁকায় পড়ে গেলাম। আমাকে বিদেয় দেবার জন্যে এত ব্যাকুল কেন পিতুবাবু? এখনও কি আমায় ভয় করেন নাকি তিনি?

গৌরী চেঁচিয়ে উঠল ওধার থেকে, "জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি যে আমি।"

সুরেশ্বরের সঙ্গে নেমে গেলাম উঠানে। আপন হ ত পা ধুয়ে দেবে গৌরী। ঘটিটা কেড়ে নিয়ে বললাম, "রক্ষে কর, অত ভক্তি সহ্য হবে না আমার। শেষ পর্যন্ত কিছু না খেয়েই তোমার ঐ নিচু পাঁচিল টপকে উধাও হয়ে যাব।"

গজগজ করতে করতে গৌরী ফিরে গেল—"গুণের মধ্যে শুধু ঐটুকুই তো আছে, উধাও হয়ে যাব। শুনলেও গা জ্বালা করে আমার।"

সুরেশ্বর হেসে ফেললেন। বললেন, "তা যে যাবেনই সে তো আমরা সবাই জানি। এখন দয়া করে মুখ-হাত ধুয়ে চলুন ঘরে। নয়ত গৌরী আরও চটে যাবে।"

বললাম, "দেখুন, আপনিই বিচার করুন। এতবড় একটা মহাপুরুষকে যে নিয়ে এলেন, তা গৌরী কি মানতে চাচ্ছে! ও এখনও আমাকে সেই কালীবাড়ির

পুরুতই মনে করে।"

হাত-মুখ ধুয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়ে যা দেখলাম, তা চক্ষুস্থির হবার মত ব্যবস্থা! প্রায় এক বিঘত উঁচু আসন পাতা হয়েছে। প্রথমে খান দু'য়েক কম্বল পাট করে পেতে তার ওপর কার্পেটের আসন দেওয়া হয়েছে। শ্বেত পাথরের প্রকাণ্ড থালায় সাজানো হয়েছে ফলমূল সন্দেশ। তার পাশে কয়েকটা পাথর-বাটিতে বোধ হয় দই-দুধ-ক্ষীর। গৌরী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, আমি বসলে থালাখানি সামনে ধরে দেবে।

আবার হো হো করে হেসে উঠলাম। সুরেশ্বরের দিকে ফিরে বললাম, "তাহলে এবার চলুন আমায় পৌঁছে দেবেন পুলিশের কাছে।"

আঁতকে উঠল গৌরী, "তার মানে?"

"মানে অত্যন্ত সরল। পরম তৃপ্ত হলাম তোমার ভক্তির বহর দেখে। এভাবে তো কেউ কাউকে খেতে দেয় না। এই রকম ব্যবস্থা করার অর্থ হচ্ছে, কিছু খেও না যেন, শুধু প্রসাদ করে দিও।"

চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল গৌরীর। পিতুবাবু এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের পিছনে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "এ সমস্ত কাণ্ড কেন করতে গেলি তুই ব্রহ্মচারীর জন্যে। ঐ কম্বলখানা তুলে নাও তো সুরেশ্বর, শুধু আসনেই যথেষ্ট হবে।"

বললাম, "আর দু'খানা আসনও চাই যে। আপনারা দু'জনও বসবেন আমার সঙ্গে। গৌরী সামনে বসে সব ভাগ করে দেবে আমাদের আর আমরা ভাল মানুষের মত গল্প করতে করতে পেট পুরে খাব।"

ছুটে বেরিয়ে গেল গৌরী, তার দু'খানা আসন এনে পেতে দিলে। তখন আমরা তিন জনে খেতে বসলাম।

নারকেলের চিঁড়ে, নারকেলের সন্দেশ বহুকাল চোখে দেখিনি। আগেই এক মুঠো নারকেলের চিঁড়ে মুখে ফেলে চর্বণ শুরু করলাম। সামনে বসে গৌরী বকে যেতে লাগল, "মহাষ্টমীর দিনটাও হয়ত এই খেয়েই কাটবে। দুটো রেঁধে খাওয়াবো তার সময় কই। বেলা বারোটা বেজে গেছে। ভক্তরা এতক্ষণে হন্যে হয়ে উঠেছে। আর দেরি করলে শেষে বাড়ি চড়াও করবে।"

শুনতে পেলাম একটি নিঃশ্বাসের শব্দ। যা মুখে পুরেছিলাম তা গলা দিয়ে নামিয়ে বললাম, "হুঁ, এই খেয়েই দিন কাটবে বৈকি! চল আমার সঙ্গে, গুরুজী মহারাজের ভোগের আয়োজন দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে।"

সুরেশ্বর বললেন, "সে কথা আমরা জেনে এসেছি। ওঁরা যত আয়োজন

করেন, সব আপনি প্রসাদ করে দেন। ওঁরা আশ্চর্য হয়ে ভাবেন কিছু না খেয়ে আপনি বেঁচে আছেন কি করে?"

"এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি, কেমন করে বেঁচে আছি।" বলে এক মনে ফলমূল খেয়ে যেতে লাগলাম।

পিতুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আরও কিছুদিন আছ নাকি এখানে?"

সংক্ষেপে জবাব দিলাম, "তা জানি না তো।"

"কিছুই উনি জানেন না, কবে যে সরে পড়বেন এখান থেকে, তাও ওঁর ঠিক করা নেই। সে কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করবারও অধিকার নেই কারও। যখন যেদিকে খুশি চলে যাবেন। আর পাপীতাপী যারা, তারা পড়ে থাকবে, মাথা খুঁড়বে, তাতে ওঁর কি। একেবারে ষোল আনা মহাপুরুষ না হলে মানুষ এ রকম পাষাণ হতে পারে কখনও?" বলে আরও খানিকটা ক্ষীর বাটিতে ঢেলে দিতে এল গৌরী। দু'হাতে বাটি চাপা দিয়ে বললাম, "মাপ কর, আরও খেতে হলে এ বাড়ি থেকেই বার হতে পারব না, অন্য কোথাও সরে পড়ব কেমন করে?"

সুরেশ্বর বললেন, "ধীরে সুস্থে খান আপনি। স্বেচ্ছাসেবকরা একটি প্রাণীকে ওপরে আসতে দেবে না। বাড়ির সামনে গলির মুখে পুলিশের লরি দাঁড়িয়ে আছে। ওধারে প্যাণ্ডেলের সামনে আপনার গাড়ি ঘিরে আছে মানুষে। তারা জানতেও পারবে না, আপনি পুলিশের লরিতে উঠে সোজা চলে যাবেন ব্রজকিষণ-বাবুর ওখানে।"

দরজায় কারা ধাক্কা দিচ্ছে। পিতুবাবু শুধু একটু সরবৎ খেয়ে বসেছিলেন। তিনি উঠে গেলেন দেখতে। গৌরী বলল, "এবার ওরা এসেছে। আর তো ধরে রাখা যাবে না আপনাকে। বলে যান, আবার কখন দেখা হবে?"

সুরেশ্বর বললেন, "আমি এখানকার পূজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি। কাল কাঙ্গালী-ভোজন হবে এখানে। আমার আর এতটুকু সময় হবে না আপনার কাছে যাবার। গৌরী যাবে আপনার কাছে বিকেলে। মারোয়াড়ী মহিলাদের নিমন্ত্রণ করে আসবে। সম্ভব হলে আজ রাত্রেই তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে এখানকার আরতি দর্শন করিয়ে দেবে। ভালই হ'ল, আপনার জন্যে এখানকার বাঙালী-সমাজের সঙ্গে মারোয়াড়ীদের ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। আমরাও হিন্দু ওঁরাও তাই। অথচ আমরা কেউ কারও পূজা-উৎসবে যোগ দিই না। ওঁদের হাতে টাকা আছে, ওঁরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছু ভাল করতে পারেন মানুষের। কিন্তু আমরা কেউ কাউকে চিনি না, বাঙালী মাড়োয়াড়ী একে অপরকে এড়িয়ে চলে। সেই ভাবটা যদি আপনার এখানে আসার দরুন ঘোচে তো মহা উপকার হবে।"

পিতুবাবু ফিরে এসে জানালেন, "ম্যানেজারবাবু আর পুলিশ অফিসাররা উপস্থিত হয়েছেন। ভিড আরও বাড়ছে, এখন তোমাকে বার করে না নিয়ে যেতে পারলে শেষে বিপদ ঘটবে।"

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। তৈরী হয়ে দাঁড়ালাম আর একবার ভক্তির ঠেলা সামলাবার জন্যে। সুরেশ্বর গেলেন পুলিশের সঙ্গে পরামর্শ করতে। গলায় আঁচল জডিযে প্রণাম কবলে গৌরী। আমার একখানা হাত ধরে আছেন পিতুবাবু। তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বললাম, "অনেক কথা বলবার আছে আমার। অনেক কথা জানতে হবে আপনার কাছে।"

ধরা গলায় জবাব দিলেন বৃদ্ধ, "আব কেন সে-সব কথা নিয়ে শুধু শুধু মাথা ঘামানো। ভুলে যাও সে-সব কথা।"

গৌরী প্রায চুপি চুপি বললে, "ভুলতে দেবি হবে না মোটেই।"

বার হলাম সুরেশ্বরবাবুর বাডির সামনের দরজা দিয়ে। ছোট গলি, গলির মুখে দাঁডিয়ে আছে লরি। ড্রাইভারের পাশে উঠে বসলাম। পিছনে উঠলেন রূপনারায়ণবাবু আর কয়েকটি কনেস্টবল। মুখ বাডিয়ে দেখলাম গৌরী সুরেশ্বর পিতুবাবুকে। মনে হ'ল, গৌরীর দুই চোখ যেন টলটল করছে।

মোড় ফিরল লরি। মনে মনে হাসলাম। ফক্কডেব জন্যেও চোখের জল পডে তাহলে! শুকনো ভস্ম-লেপা ফক্কডের কপালে চোখের জল পডলে যে ভস্ম ধুয়ে যাবে। এই যে দু'টি মুক্তার মত বিন্দু টলটল করছে গৌরীর চোখে ও নিশ্চয়ই ফক্কডের জন্যে নয়। বেনাবনে কেউ মুক্তা ছডায় না। ফক্কডের কপালে আছে তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, কুকুরের মত দূর দূর করে খেদানো—নয়ত পাহাড পর্বত ভেসে যায়, এমন প্রচণ্ড ভক্তির বন্যা। এ ছাডা অন্য কিছু ফক্কডের কপালে জুটতেই পারে না।

লরি এসে থামল ডি. এস পি সাহেবের বাঙলোয়। আধ ঘণ্টা পরে আবার সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। এবার ডি. এস পি. সাহেবের গাডিতে। প্রায় দুটোর সময় পৌছে গেলাম যথাস্থানে। মহাসমারোহে আমাকে নামানো হ'ল। শেঠজীরা নিজেদের সম্পত্তি ফিরে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। ইতিমধ্যে প্যাণ্ডেলের মাঝখানে অনেকটা জায়গা শক্ত করে বেডা দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। তার মাঝখানে তক্তাপোশ পেতে তার ওপর ওঠানো হয়েছে আমার জলচৌকি। জলচৌকিখানি কিংখাব দিয়ে মুডে তার ওপর দেওয়া হয়েছে বহুমূল্য কার্পেটের আসন। আসনের সামনে একটা ফুলের তোড়া আর একখানা মস্ত রূপার পরাত

রাখা হয়েছে। পরাতের ওপর বসানো রয়েছে সেই লাল খেরোর থলিটি। থলিটি বেশ বোঝাই। বুঝলাম, সুরেশ্বরের ওখানে যা প্রণামী পড়েছে সে সমস্ত বোঝাই আছে থলিতে!

বসলাম গিয়ে আসনের ওপর। জ্বলন্ত কলকে নিয়ে ছুটে এল একজন। মায়ের সামনে তখন হোমাগ্নি জ্বলছে, আহুতি দিচ্ছেন পুরোহিত।

"ও বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ, সর্বকর্মণি স্বাধয় স্বাহা।"

নহবতে ভীমপলশ্রী চলছে। দলে দলে মানুষ ঢুকছে প্যাণ্ডেলে। প্রতিমা দর্শন করে এসে দাঁড়াচ্ছে বেড়ার চারধারে। জোড়হাতে মহাপুরুষ দর্শন করছে সকলে। কেউ কেউ আবার চোখ বুজে বিড় বিড় করে কি বলছে। জানাচ্ছে নিজেদের মনস্কামনা। বেশীক্ষণ কারও দাঁড়াবার উপায় নেই। এক দলকে সরিয়ে আর এক দলের স্থান করে দিচ্ছে দরোয়ানরা। অজস্র আনি দোয়ানি সিকি ছুঁড়ছে লোকে, একজন সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে থালায় জমা করছে। মাঝে মাঝে কলকে আসছে, ফিরিয়ে দিচ্ছি প্রসাদ করে। ব্রজকিষণবাবুর বাড়ি থেকে রূপার গেলাসে সরবৎও এসে গেল একবার।

হোম সমাপ্ত করে পুরোহিত মশায় এসে ফোঁটা দিয়ে গেলেন কপালে। সানাইয়ে পিলু ধরেছে তখন। হঠাৎ নানা রঙের অজস্র আলো জ্বলে উঠল প্যাণ্ডেলের মধ্যে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সহ্য হচ্ছে না। আর গোলমাল, লোকের ভিড়, সানাইয়ের বাজনা। একটু কোথাও নিরিবিলিতে যদি শুয়ে থাকতে পারতাম!

একদা সে সুযোগ ছিল আমার। সারা জীবনই নিরালায় কাটিয়ে দিতে পারতাম আমি তারানন্দ পরমহংসের মঠে দশ টাকা ঠিকায় মা কালীর সেবা পূজা করে। মাথা গুঁজে থাকবার স্থানটুকু অন্ততঃ মিলেছিল সেখানে। সেই আনন্দে মশগুল হয়ে পড়ে থাকতাম সিঁড়ির নিচের অন্ধকার ঘরে। দম ফাটবার উপক্রম হলেও কারও সঙ্গে একটি বাক্যালাপ করতাম না। এই পিতু বুড়ো সর্বপ্রথম টেনে বার করেন আমাকে সেই অন্ধকার ঘর থেকে। পরমাত্মীয়ের বেশে একদিন উদয় হন তিনি আমার সমাধি-গহ্বরে, অখণ্ড নির্জনতার মৃত্যুর মত শান্তি নষ্ট করার জন্যে। সেদিন সন্ধ্যারতির পর মন্দির থেকে বেরিয়ে দারুণ চমকে উঠেছিলাম। সাদা চুল সাদা দাড়ি সুদ্ধ আমার চেয়ে অন্ততঃ এক হাত উঁচু এক মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে অন্ধকার কোণায়। কে ও।

শুনেছিলাম, তারানন্দের রহস্যময় মঠে কত কি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদেরই কেউ হবেন মনে করে আর একটু হলে আঁতকে উঠেছিলাম আর কি! সেই মুহূর্তে

কানে গেল ধীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর!

"ব্রহ্মচারী, আমি কেদারঘাটের পিতু বুড়ো, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম বাবা।"

মানুষের গলা শুনে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। তবু সেই মূর্তির দিকে চেয়ে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়েছিলাম।

আরও এগিয়ে এলেন তিনি। মন্দিরের আলো পড়ল তাঁর ওপর। ভাল করে দেখতে পেলাম তখন তাঁকে। হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে সাদা থান, মোটা শুভ্র এক গোছা পৈতা-গলায় এক শান্ত সৌম্য বৃদ্ধ। আগেও কয়েকবার নজরে পড়েছে এই মূর্তি পথে-ঘাটে। কম্পিতকণ্ঠে প্রায় চুপি চুপি বললেন—"আমার ছেলেটা যদি বেঁচে থাকত, তার বয়স তোমার চেয়ে ঢের বেশি হত এখন। বুড়োমানুষ বিরক্ত করতে এসেছি বলে রাগ করছ না তো বাবা?"

এমন কিছু ছিল সে কণ্ঠস্বরে যে, আমাব বড সাধের দুর্ভেদ্য খোলসটা খসে পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কি উত্তব দিয়েছিলাম তাঁকে, তাও বেশ মনে আছে এখনও। বলেছিলাম—"বুড়ো বাপ সেধে দেখা করতে এলে ছেলে কি রাগ করতে পারে কখনও?"

উত্তর শুনে দু'হাতে আমায় বুকে জাপটে ধরেছিলেন বৃদ্ধ। আর একটি কথাও সেদিন তাঁর মুখ দিয়ে বাব হয়নি। তাঁর বুকে কান পেতে আমি সেদিন শুনতে পেয়েছিলাম এক অন্য জাতের ভাষা। সে ভাষা বুকের ভাষা, তাতে কোনও ভেজাল ছিল না, কারণ তা মুখের ভাষা নয়।

দিনের পর দিন উন্নতি হতে লাগল কালীবাড়িব। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষের খাড়া মই বেয়ে ক্রমেই ওপর দিকে উঠে যেতে লাগলাম আমি। আর তফাতে দাঁড়িয়ে পিতু বুড়ো পরম তৃপ্তিতে হাসতে লাগলেন আমার উন্নতি দেখে। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এই ধরনের একটা রহস্যময় জাল দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখলেন। সমঝদার দ্রষ্টার ভূমিকায় আগাগোড়া সার্থক অভিনয় করে গেলেন। কালীবাড়ির ঘূর্ণি হাওয়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারলে না।

অথচ কালীবাড়ির হাড়হদ্দ সবই ছিল তাঁর নখাগ্রে। পরমহংস তারানন্দের সাক্ষাৎ মন্ত্র-শিষ্য তিনি। গুরুর জীবদ্দশায় প্রবল প্রতাপ ছিল তাঁর কালীবাড়িতে। তাঁর মুখেই আমি শুনেছিলাম কালীবাড়ির অনেক গুহ্যাতিগুহ্য কাহিনী। কিন্তু কেন যে পিতুবাবু অমন নির্লিপ্ত হয়ে দূরে সরে রইলেন তাঁর গুরুর মঠের ছোঁয়াচ এড়িয়ে, শত চেষ্টা করেও তা জানতে পারিনি কোনও দিন। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, তাঁকে কালীবাড়ির উৎসবাদিতে নামাতে—অদ্ভুত কায়দায় বিন্দুমাত্র

আঘাত না দিয়ে তিনি এড়িয়ে গেছেন।

কিন্তু আমার ওপর ছিল তাঁর কড়া নজর। মানুষের খোশামোদিতে আর সগুলব্ধ সিদ্ধপুরুষ পদের গরমে আমার মাথাটা ঘুলিয়ে না ওঠে, সেজন্যে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। উপদেশ না দিয়ে, শাসন না করে বা কারও নিন্দে না করে শুধু নিজের সাহায্য দিয়ে, তিনি আমায় রক্ষা করেছেন। একবার আমার বেশ শক্ত জাতের জ্বর হয়। তখন মাথার কাছে বসে রাত কাটিয়েছিলেন পিতুবাবু। সবই তিনি করেছিলেন, বাপের যা করা উচিত সাবালক ছেলের জন্যে। কিন্তু সামান্য একটা ব্যাপার, নির্জলা মিথ্যা একটা খ্যাতি আমার, পিতুবাবুর মত লোকের মাথা খারাপ করে দিলে। অতি সাধারণ লোকের মত তিনি বিশ্বাস করে ফেললেন যে, আমি একটি মহাগুণী সাধক মানুষ, বিশ্ব-সংসারসুদ্ধ মানুষকে শুধু আমার এই পোড়া চোখের দৃষ্টি দিয়েই বশীভূত করে ফেলতে পারি। নিজেই অনেকের কাছে বলে বেড়াতে লাগলেন যে, তারানন্দের গদির উপযুক্ত মানুষ আমি। আর কোনও শক্তি থাকুক, না থাকুক, তারানন্দের মত সর্বনেশে চক্ষু দু'টি আছে আমার। সুতরাং সকলের সাবধান হওয়া একান্ত উচিত।

আর কেউ সাবধান হোক না হোক, নিজে তিনি যথেষ্ট সাবধান হলেন। একটি দিনের জন্যেও তিনি আমাকে তাঁর বাড়ির দরজা পার হতে দিলেন না। বরং সুবিধা পেলেই উপদেশ দিতেন ব্রহ্মচারী মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে। তাঁর মতে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মচারীর কোনও গৃহস্থ-বাড়িতে না যাওয়াই একান্ত উচিত। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, কোনও দিন পিতুবাবুর বাড়ি থেকে কেউ এল না মা কালী দর্শন করতে। লোকের মুখে শুনতাম, ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকে তাঁর স্ত্রী শয্যাশায়িনী হয়ে আছেন। আর থাকবার মধ্যে ছিল এক মেয়ে। সে মেয়ের মুখও ত্রিভুবনে কেউ কোনও দিন দেখতে পেত না।

রোজ ব্রাহ্মমুহূর্তে আসতেন পিতুবাবু। পাথর-বাধানো গলিতে উঠত তার লাঠির ঠক্‌ঠক্ শব্দ। বিছানায় শুয়েই শুনতে পেতাম তাঁর স্তোত্রপাঠ :

কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানাধঃ।

ত্রিলোচনোজ্জ্বলন্নেত্র স্ত্রী শিখা চ ত্রিলোকপাৎ॥

মন্দিরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে জপ করতেন পিতুবাবু। কখনও বসতেন না। মঙ্গলারতি শেষ হলে মাকে প্রণাম করে লাঠি ঠক ঠক করে ফিরে যেতেন। এই ছিল তাঁর নিত্যকর্ম, মঙ্গলারতির সময় একটি দিনও অনুপস্থিত হননি তিনি। কিন্তু অন্য কোনও সময় কালীবাড়িতে ঢুকতেন না। বিশেষ পূজা-উৎসবের দিনে একবার আসবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছি, অন্ততঃ মায়ের প্রসাদ একটু

বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে মিনতি করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। একটু হেসে তিনি এড়িয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হলে বিকেলবেলা কেদারঘাটে যেতে হত আমায়। ঘাটে বসে তাঁর কাছ থেকে শুনতাম তাঁর গুরু তারানন্দের অমানুষিক সব কীর্তিকাহিনী। শুনতাম, কি রকম জাঁকজমক ছিল তখন কালীবাড়িতে। কিন্তু মঠ ধ্বংস হয়ে গেল, মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি অভিচার-ক্রিয়া আর উদ্দাম পঞ্চ-মকারের স্রোতে তলিয়ে গেল তাঁর গুরুর সুনাম ও মানমর্যাদা। বলতে বলতে পিতুবাবু আকুল হয়ে উঠতেন। জড়িয়ে ধরতেন আমার দু'হাত। বলতেন, "সাবধান ব্রহ্মচারী, খুব সাবধান। এ বড় ভয়ঙ্কর পরীক্ষা। যেটুকু শক্তি পেয়েছ তা সামলে রাখাই সবচেয়ে বড় কথা। নয়ত নিজেও মরবে, অপরকেও মারবে।"

আপ্রাণ চেষ্টা করতাম তাঁকে বিশ্বাস করাতে যে, বিন্দুমাত্র কোনও শক্তি পাইনি আমি। সে জিনিস যে কি তা আমি জানিও না, বিশ্বাসও করি না। হুজুগে মেতে যাব যা খুশি বলছে। কিন্তু পিতুবাবুর মত মানুষ কি করে বিশ্বাস করেন তাদের কথা?

ফল হত একদম বিপরীত। পিতুবাবু ভাবতেন, আমি তাঁর চোখেও ধুলো দেবার চেষ্টা করছি। তাঁকেও ঠকাবার চেষ্টা করছি বলে তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠত। বলতেন, "আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না বাবা। তুমি যে কি পারো আর কি পারো না, আমি তা ভাল করে জানি। তোমার চক্ষু দু'টি দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমার ভয় হয়, নিজে তুমি কোনও দিন কারও ফাঁদে না পা দাও।"

কেটে গেল গোটা তিনেক বছর। এত উঁচুতে পৌঁছে গেলাম আমি যে, পিতুবাবুর কথা ভেবে তখন আর মন খারাপ হত না। একান্ত আপনার লোক হয়েও পিতুবাবু একটি দিনের জন্যে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন না তাঁর বাড়িতে, এজন্য তাঁর ওপর রাগ অভিমান করবারও আমার ফুরসুৎ রইল না। তখন নাম-করা মানুষেরা সাধ্য-সাধনা করছেন আমাকে একবার তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, যাঁরা ডক্টর শঙ্করীপ্রসাদের সমান দরের মানুষ তাঁরা আমার কৃপা লাভের জন্যে ধর্না দিচ্ছেন তখন। কাজেই একান্ত কাছের মানুষ হয়েও দিন দিন দূরে সরে গেলেন পিতুবাবু।

ইতিমধ্যে এমন একটি ব্যাপার ঘটে বসল যার ফলে পিতুবাবুর সব সতর্কতা ভণ্ডুল হয়ে গেল। একান্ত যত্নে আমার সর্বনেশে চক্ষু দু'টির নাগালের বাইরে রেখেছিলেন তাঁর একমাত্র কন্যাকে। বাবা কেদারনাথের যোগসাজসে সেই

মেয়েই পড়ে গেল একেবারে আমার হাতের মুঠোয়। দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল কেদারেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে শিবরাত্রির দিন বেলা তিনটের সময়। অনেক বিচার বিবেচনা করে সেই অসময়ে পিতুবাবু মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন কেদারনাথের মাথায় জল ঢালাতে। কালীবাড়ির ভক্তদের ছেড়ে সেই সময় আমিও যে যাবো শিব-পূজা করতে, এ তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

যথারীতি কেদারনাথের একটিমাত্র দরজায় তুমুল সংগ্রাম চলেছে। এক দল মানুষকে মন্দিরে ঢুকিয়ে দরজা আটকানো হচ্ছে। তারা বার হতে না হতে এক-দল মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দরজার ওপর। এক হাতে ফুলের সাজি আর এক হাতে দুধ-গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে, মানুষের চাপে এগিয়ে যাচ্ছি দরজার দিকে। নজরে পড়ল পিতু বুড়োকে। মানুষের ধাক্কায় তিনি ছিটকে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। সেই মুহূর্তে পিছন থেকে প্রচণ্ড চাপ পড়ল। আমরা অনেকগুলি লোক সেই চাপের চোটে দরজা পার হয়ে মন্দিরে ঢুকে পড়লাম।

তখন ফুলের সাজি আর জলের ঘটি সুদ্ধ দু'হাত মাথার ওপর তুলে ধরেছি। মন্দিরের মধ্যে অন্ধকার, কোনও দিকে মুখ ফেরাবার উপায় নেই। এক সময়ে পৌঁছবই শিবের সামনে। তখন দুধ-গঙ্গাজল ফুল-বেলপাতা তার ওপর ফেলে দিয়ে আবার মানুষের চাপেই বেরিয়ে যাবো মন্দির থেকে। এই হচ্ছে চিরকালের ব্যবস্থা, এইভাবেই শিবরাত্রির দিন আমাদের সব ক'টি প্রসিদ্ধ শিববাড়িতে বাবাদের মাথায় জল ঢালে লোকে। গুঁতোগুঁতি ঠেলাঠেলি আর হৃদয়-বিদারক চিৎকার, এইগুলি হচ্ছে আমাদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলির সবচেয়ে মারাত্মক মহিমা।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল, পেছন থেকে টান পড়ছে আমার কোমরের কাপড়ে। বেশ বুঝতে পারলাম মুঠো ক'রে কে ধরে আছে আমার কোমরের কাপড়। মুখ ফেরাবার উপায় নেই। কিন্তু বেশ মালুম হ'ল, যে ধরে আছে আমার কোমর, সে পুরুষ নয়। ধরে আছে সে আমার কোমরের কাপড় যাতে ধাক্কার চোটে ছিটকে না যায় অন্য দিকে।

কোনও রকমে মানুষ গুঁতিয়ে এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেও ঠিক পৌঁছে গেল আমার সঙ্গে। দু'জনে দেওয়ালের গায়ে চেপটে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন তার মুখ আমার কানের কাছে। কানে গেল দু'টি কথা, "আমি পিতু মুখুয্যের মেয়ে, আমাকে বার করে নিয়ে চলুন মন্দির থেকে।"

বলেছিলাম, "যেমন ধরে আছ তেমনি ধরে থাক, খবরদার যেন হাত না ফসকায়।"

হাত ফসকায়নি পিতুবাবুর মেয়ের। যথানিয়মে মানুষের চাপে আবার

বেরিয়েও এসেছিলাম মন্দির থেকে।

বাইরে পদার্পণ করেই আমার কোমর ছেড়ে দিয়েছিল সে। দূর থেকে দেখলাম, পিতুবাবু পাগলের মত খুঁজছেন মেয়েকে। একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে মেয়ে ছুটে চলে গেল বাপের কাছে। আমিও আবার মানুষের ঠেলায় মন্দিরে ঢুকলাম। পূজাটা যে আমার সারা হয়নি তখনও!

শিবরাত্রির দিন কেদারেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে ঘটেছিল সেই তুচ্ছ ঘটনাটি। একমাত্র বাবা কেদারনাথ ছাড়া আর কেউ সাক্ষী ছিল না তার। প্রয়োজনও ছিল না অন্য সাক্ষীর। অতি তুচ্ছ সাধারণ ঘটনা, হয়ত মনেও থাকত না আমার। কিন্তু পিতুবাবুই খোঁচাখুঁচি করে সেই সাধারণ ঘটনাকে অসাধারণ করে ছাড়লেন।

তিন দিন পরে কেদারঘাটে বসে পিতুবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি কি হয়েছিল সেদিন মন্দিরের মধ্যে, কি আমি বলেছিলাম তাঁর মেয়েকে, তাঁর মেয়েই বা কি বলেছিল আমাকে। কোনও কথাই হয়নি আমাদের মধ্যে, সেই ভিড়ে আর গোলমালে আলাপ-আলোচনা সম্ভবই নয়, আর অত অল্প সময়ের মধ্যে কতটুকু আলাপ হওয়া সম্ভব! নানা রকম প্রশ্নের জবাব দিলাম প্রাণপণে, কিন্তু পিতুবাবুকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। তারপর পিতুবাবু বেমালুম ভুলে গেলেন সেদিনের ঘটনাটা। আর একটি দিনের জন্যেও একটি কথা উত্থাপন করলেন না সে সম্বন্ধে।

তিনি ভুলে যান, কিন্তু মেয়েটিও যে অনায়াসে ভুলে যাবে সেদিনের ঘটনাটা, তা আমি ধারণা করতে পারিনি। আশা করে রইলাম যে, একবার অন্ততঃ পিতু-বাবুর মেয়ে আসবে মঠে কালীদর্শন করতে বা পিতুবাবু নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন আমায় তাঁর বাড়িতে। আশা করতে অবশ্য কেউ আমায় পরামর্শ দেয়নি। নিজের গরজে আশা করলাম, আত্মীয়তার কাঙাল হয়ে উঠেছিলাম তখন, তাই অনর্থক আশা করে রইলাম। তারপর নিরাশ হলাম। ফলে রাগ, দুঃখ, অভিমান জমে উঠল মনের মধ্যে। বুঝলাম, ওঁরা নিজেদের আমার চেয়ে এত উচ্চস্তরের জীব বলে জ্ঞান করেন যে, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না আমাকে। সত্যিই তো, কালীবাড়ির পুরুতকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাবার কি এমন গরজ পড়েছে পিতুবাবুর, আর তাঁর কন্যাই বা সেধে ভদ্রতা দেখাতে আসবেন কেন সামান্য পুরুতের কাছে?

আট-আটটি বছর গড়িয়ে গেল আর একবার পিতুবাবুর কন্যার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করতে। শুধু আটটি বছরই নয়, অনেকটা স্থানও পার হতে হ'ল আমায়।

কোথায় কাশী, কোথায় চট্টগ্রাম। এতটা পথ পার হয়ে দেখা হ'ল আমার সঙ্গে পিতুবাবুর মেয়ের। না, তা ঠিক নয়, আজ যার সঙ্গে পরিচয় হ'ল তিনি অধ্যাপক সুরেশ্বরবাবুর স্ত্রী। আর আমিও সেই কালীবাড়ির দশ টাকা দামের পুরুত নই, শহরের সবচেয়ে বড়লোক শেঠ ব্রজকিষণলালের গুরুজী মহারাজ।

সুতরাং এবার ভদ্রতা দেখিয়েছে গৌরী। শুধু সাধারণ ভদ্রতা নয়, অসাধারণ আত্মীয়তাও দেখিয়েছে, মায় দু' বিন্দু চোখের জল। আর কি চাই আমি? আর তো আক্ষেপ করবার মত কিছুই রইল না, সুদে-আসলে আজ সব মিটিযে দিয়েছে গৌরী।

মনে মনে ঠিক করলাম, এখান থেকে যাবার সময় অধ্যাপকের স্ত্রীকে একখানি দামী বেনারসী কিনে দিয়ে যাব। টাকা, নোট, গয়না-গাঁটিতে বোঝাই লাল খেরোর থলেটা রয়েছে সামনের থালার উপর। ফক্কড়ের সম্পত্তি, কিন্তু কোন্ চুলোয় নিয়ে যাবে ফক্কড় ওগুলো বয়ে? কার কাছে গচ্ছিত রাখবে ঐ সম্পদ? ফক্কড়ের কি উপকারে লাগবে ঐ থলে-বোঝাই জঞ্জাল?

আপদ—আপদ জুটেছে এক গাদা। ইচ্ছে হ'ল, এক লাথি মেরে ফেলে দি থালা থলে সব কিছু সামনে থেকে।

কে কল্‌কে বাড়িয়ে ধরলে সামনে। কল্‌কে নিয়ে চোখ বুজে দিলাম একটা মোক্ষম টান। ওধারে তখন পিলু শেষ করে গৌরীতে পৌঁছেছে সানাই।

চোখ চাইতে হ'ল আবার। দামী বেনারসী পরে কে একজন গলায় আঁচল দিয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করছে। পাশে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ব্রজকিষণের পত্নী। প্রণাম সেরে সোজা হয়ে উঠে বসতে চিনতে পারলাম। সাজে-পোশাকে-অলঙ্কারে অপরূপ মানিয়েছে অধ্যাপক মহাশয়ের স্ত্রীকে।

সানাই তখন গৌরী ছেড়ে পূরবীতে পৌঁছল।

মানুষের নজর বেশি করে আকর্ষণ করার সৎ বাসনায় যে সব মহিলা ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা দেন, তাঁরা এক বিশেষ ধরনের অঙ্গুলিবিন্যাস জানেন। দু'হাতের অঙ্গুলি-কটির সাহায্যে মুখের ওপরের ওড়না অল্প একটু তুলে ধরবার কায়দাটুকু সত্যিই দেখবার মত জিনিস। সেই সময় অঙ্গুলিগুলির যে চমৎকার ভঙ্গিমা দেখান তাঁরা, তার নাম হওয়া উচিত ওড়না-মুদ্রা। অবগুণ্ঠন-মুদ্রা তো শাস্ত্রেই আছে। পুরাণ শাস্ত্রকাররা ওড়না-মুদ্রার চিন্তা করা প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ আমাদের একটি দেবীর মুখও ওড়না-ঢাকা নয়। ভবিষ্যৎ শাস্ত্রকারদের ওড়না-মুদ্রার কথাটি চিন্তা করা উচিত। হয়ত কোনও প্রগতিবাদী শিল্পী ওড়না-ঢাকা

দেবীমূর্তিও বানিয়ে ফেলতে পারেন।

শেঠজীর ঘরণী—ওড়না-মুদ্রায় অল্প অবগুণ্ঠন সরিয়ে অনেক রকমের দামী পাথর-বসানো নথটি দেখিয়ে ফিসফিস করে নিবেদন করলেন যে, সুরেশ্বরবাবুর স্ত্রী এসেছেন নিমন্ত্রণ করতে। আরতি দেখার জন্যে মাড়োয়ারী মহিলাদের সসম্মানে নিয়ে যাবেন তাঁদের পূজামণ্ডপে। শেঠজীদের আপত্তি নেই, এখন আমার অনুমতি পেলেই হয়।

আমার অনুমতির জন্যে ওঁদের যাওয়া আটকাচ্ছে! অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে।

চোস্ত হিন্দীতে গৌরী তখন তার আরজি পেশ করলে।

"নিজেদের পুজো ছেড়ে অন্য পুজো দেখতে গেলে যদি কোনও অপরাধ হয় এই ভয় করছেন এঁরা। এখানের আরতি হয়ে গেলে আমি এঁদের নিয়ে যাব। এখানে আরতি তো একটু পরেই আরম্ভ হবে। আমাদের ওখানে আরতি হয় রাত ন'টার পর। কৃপা করে যদি আপনি আদেশ দেন—"

চোখ-মুখের ভাব, গলার স্বর, মায় হাতজোড় করে থাকা, সব মিলিয়ে একেবারে নিখুঁত অভিনয়। ভনিতা করা কাকে বলে তা জানে বটে গৌরী। ওর হাবভাব দেখে গাম্ভীর্য বজায় রাখা সহজ নয়! শিবনেত্র হয়ে রইলাম কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর শেঠপত্নীর দিকে চেয়ে হাসিমুখে ঘাড় নাড়লাম।

ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ হাতে প্রতিমার সামনে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বাঁশ দিয়ে ঘিরে মহিলাদের জন্যে আলাদা স্থান বানানো হয়েছে প্রতিমার ডান পাশে। শেঠানী গৌরীকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইলেন। গৌরী শুনতেই পেলে না, তখন সে জোড়হাতে ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তার ধ্যানভঙ্গ না করে শেঠানী একাই চলে গেলেন—তাঁর আপনজনদের কাজে। চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে যারা সাধু দর্শন করছিল, তারাও আরতি দেখতে দাঁড়াল গিয়ে প্রতিমার সামনে। সকলের দৃষ্টি প্রতিমার দিকে। অনেকক্ষণ পরে মানুষের দৃষ্টির আড়াল হতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আরতির সময় দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ম। আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। বাজনার তালে তালে পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি শিখা ওঠা-নামা করছে। সেইদিকে চেয়ে আছি। মাত্র দু'হাতের মধ্যে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে, মনে হ'ল যেন কি বলছে। ওরু দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। জোড়হাতে প্রতিমার দিকে চেয়ে আছে কিন্তু ঠোঁট নাড়ছে। কান পেতে রইলাম। ঢাক-ঢোলের তুমুল আওয়াজের মধ্যেও কানে গেল—"কাল একবার আমাদের ওখানে যাওয়া চাই কিন্তু।" আবার চাইতে হ'ল।

ওর দিকে। চোখে চোখে মিলল। মিনতি উথলে উঠেছে ওর চক্ষু দু'টিতে।

পঞ্চপ্রদীপ নামিয়ে অর্ঘ্যপাত্র হাতে তুলে নিলেন পুরোহিত। অপরূপ ভঙ্গিমায় অল্প অল্প কাঁপিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগলেন জলপূর্ণ শঙ্খটি প্রতিমার সামনে। একটি স্নিগ্ধ জ্যোতি ঘিরে রয়েছে মা-দুর্গার মুখখানি আরতির, বাজনাতেও উন্মাদনা নেই। প্যাণ্ডেল-ভর্তি মানুষ এতটুকু নড়াচড়া করছে না। সকলের একাগ্র দৃষ্টি মায়ের মুখের ওপর।

ঢাক-ঢোলের শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার উঠল কোথা থেকে—"আগুন! আগুন!" চমকে উঠে চারিদিকে দেখতে লাগলাম। "কৈ আগুন? কোথায় আগুন?"

ত্রিপল আর পাট পোড়ার গন্ধে দম আটকে এল। নজর গিয়ে পড়ল প্রতিমার পিছন দিকে। কুণ্ডলী পাকিয়ে বার হচ্ছে কালো ধোঁয়া। যেন অসংখ্য অজগর সাপ ফুঁসিয়ে উঠে তেড়ে আসছে মায়ের চারিদিক ঘিরে।

পুরোহিতের হাত থেকে খসে পড়ল শঙ্খটি। বন্ধ হয়ে গেল ঢাক ঢোল-কাঁসির বাজনা। আকুল আর্তনাদ উঠল—"আগুন। আগুন।" যে যেখানে ছিল সেইখানেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল চারিদিকে। বড় বড় ত্রিপল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে মোড়া মণ্ডপটির মধ্যে নানা জায়গায় বাঁশ বেঁধে বেড়া দেওয়া হয়েছে মেয়ে-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা বানাবার জন্যে। বার হবার পথ মাত্র একটি, যার ওপর নহবতের ঘর তৈরী হয়েছে সেই মূল তোরণটি। সমস্ত লোক একসঙ্গে আছড়ে গিয়ে পড়ল তোরণটির ওপর। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল তোরণটি। বাজনাদাররা তাদের বাদ্যযন্ত্রসহ হুড়মুড় করে পড়ল মানুষের ঘাড়ের ওপর। ইলেক্‌ট্রিকের তার আনা হয়েছিল তোরণের ভিতর দিয়ে। সেই তার গেল ছিঁড়ে, ফলে সমস্ত আলো একসঙ্গে ঝপ করে নিভে গেল।

মণ্ডপের ভেতর তখন ধোঁয়ায় বোঝাই হয়ে গেছে। নিবিড় অন্ধকারে দম-আটকানো ধোঁয়ার মধ্যে উঠছে মেয়ে-পুরুষের করুণ আর্তনাদ। হঠাৎ তখন মনে পড়ল গৌরীর কথা। সেই মুহূর্তে খেয়াল হ'ল আমার একখানা হাত কে আঁকড়ে ধরে আছে। বুঝতে পারলাম, যে ধরে আছে সে ঠকঠক করে কাঁপছে।

কড় কড় কড়াৎ।

বজ্রাঘাতের মত শব্দ উঠল কোথা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন গোটাকতক বোমা ফাটল কোথায়। তারপর সব রকমের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল দরোয়ানদের সমবেত কণ্ঠের হুঙ্কার।

"ভাগো—ভাগো, টিনা ছুটতা হ্যায়।"

ঠিক সেই সময় আবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম প্রতিমাখানি। মা তখন অগ্নিবর্ণ ধারণ করেছেন। আগুন ধরেছে চালচিত্রে। লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ-অসুর-সিংহ সব কটির মুখ আগুনের আভায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ষোল আনা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন সকলে। সবার উপরে মায়ের মুখখানির দিকে চাওয়া যায় না। জননী জেগেছেন, এ হচ্ছে সেই রূপ—

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা॥

সেইদিকে চেয়ে ক্ষণিকের জন্যে সব ভুলে গেলাম।

হুঁশ ফিরে এল একটা ভীতিবিহ্বল চাপা কণ্ঠস্বর শুনে। বুকের খুব কাছ থেকে সে বললে—"চল পালাই, পালাই চল এখান থেকে।"

মনে পড়ে গেল, বজরঙ্গবালীর মন্দিরের গায়ে ত্রিপল আলগা করে বাঁধা আছে আমার বাইরে যাওয়া-আসার জন্যে। গৌরীকে একরকম তুলে নিয়ে আন্দাজ করে ছুটলাম সেইদিকে। অন্ধকারে জায়গাটার ঠাহর পেতে দু'একবার ভুল হ'ল। তারপর নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলাম প্যাণ্ডেল থেকে। পিছন ফিরে দেখলাম, পাট-গুদামটি লালে লাল হয়ে উঠেছে। লম্বা গুদামটির সর্বাঙ্গ দিয়ে সহস্রমুখ বৈশ্বানরের সহস্র লেলিহান জিহ্বা বার হচ্ছে। মনে পড়ে গেল কয়েক ঘণ্টা আগে শোনা পুরোহিতের আহুতি-মন্ত্র—"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা।"

দু'চোখ ফেটে জল এল। সর্বকর্মই সুন্দরভাবে সাধন করলেন বৈশ্বানর। করবার আর কিছুই বাকি রাখলেন না। বাঁশের ওপর অজস্র ত্রিপল ঢাকা প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেলটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সভয়ে আমায় জাপটে ধরলে গৌরী। আগুনের আঁচে গা ঝলসে যাচ্ছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—"চল, পালাই এখন এখান থেকে।"

চারিদিক থেকে মানুষ ছুটে আসছে তখন। মানুষের সামনে পড়বার ভয়ে পাটগুদামের সামনে দাঁড়-করানো মালগাড়িগুলির আড়াল দিয়ে ছুটতে লাগলাম দু'জনে। বড় বড় খোয়ায় হোঁচট খেয়ে গৌরী দু'একবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলে আমাকে ধরে। তখন তার একখানা হাত চেপে ধরলাম শক্ত করে। তারপর কোন্ পথে কোথা দিয়ে ঘুরে কোথায় যে গিয়ে পৌঁছলাম, সে সম্বন্ধে দু'জনের একজনেরও কিছুমাত্র খেয়াল ছিল না।

প্রথমে গৌরীর মুখেই কথা ফুটল। হঠাৎ সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর চারিদিকে চেয়ে সভয়ে বলে উঠল—"এ আমরা কোথায় এলাম?"

চমকে উঠলাম! দু'পাশে অন্ধকার মাঠ, মাঝে মাঝে নিবিড় কালো বড় বড় টিলা, ঘর-বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। তবে ভাগ্য ভাল আমাদের যে পাকা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছি।

বললাম—"তাই তো, কোথায় এসে পৌছলাম আমরা? যাচ্ছিই বা এখন কোন্‌দিকে?

ডানদিকে বহুদূরে অনেকগুলি আলো জ্বলছে। সেই দিকে দেখিয়ে গৌরী বললে—"ঐ যে আলো জ্বলছে, ওখানে গেলেই একটা উপায় হবে। চল, ঐ ধারেই যাওয়া যাক।"

বললাম—"তাই চল, কিন্তু ও তো অনেক দূর—অতদূর হাঁটতে পারবে তুমি?"

গৌরী তখন হাঁটতে শুরু করেছে, উত্তর দিলে না।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছি দু'জনে। রাস্তায় বড় বড় গর্ত-খানা-খন্দ। ফক্কড়ের চোখ অন্ধকারে জ্বলে। ও বেচারা ঘরের বৌ, ও পারবে কেন অন্ধকারে চলতে। মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল দু'একবার আমাকে ধরে। শেষে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—"আমার হাত ধরে চল গৌরী, নয়ত পড়ে দাঁত মুখ ভাঙবে।"

হাত ধরলে গৌরী। কিছুক্ষণ পরে যেন নিজেই নিজেকে বলতে লাগল—'এইবার নিয়ে দু'বার হ'ল। ভয়ানক একটা কাণ্ড না ঘটলে কিছুতেই আমাদের দু'জনের কাছাকাছি হবার উপায় নেই।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর শুনতে পেলাম আবার গৌরীর কণ্ঠস্বর। প্রায় চুপিচুপি বললে সে—"মনে পড়ে সেই শিবরাত্রির কথা?"

বললাম, "পড়লেও কারও কিছুমাত্র লাভ-ক্ষতি নেই। ভুলে যাবার যে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তোমার, তার কৃপায় এই মহাষ্টমীর রাতের কথাও বাড়ি গিয়ে বেমালুম মন থেকে মুছে যাবে তোমার! এখন একবার যে কোনও উপায়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌছতে পারলে হয়!"

বিশ্রী শব্দ করে বিদঘুটে হাসি হেসে উঠল গৌরী। বললে—"না ভুললে চলবে কি করে আমার? ভুলতে না পারলে হয় গলায় দড়ি দিতে হয়, নয়ত খোলা আকাশের তলায় রাস্তায় নেমে আলেয়ার পিছনে ছুটে মরতে হয়। মানুষের কাছ থেকেই মানুষের ব্যবহার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু যিনি মানুষ নন, যাঁর শরীরে দয়া-মায়া কিছুই নেই, সেই ধর্মের কড়া সাধক মহাপুরুষের কথা মনে রাখলে কপালে জোটে শুধু লাঞ্ছনা যন্ত্রণা আর অপমান। যা হচ্ছে মরার বাড়া,

শুধু শুধু দগ্ধে মরে লাভ কি ?"

চুপ করে রইলাম। বলুক ওরা যা খুশি, যা বলে ওর তৃপ্তি হয় বলুক। বলে শান্তি পাক ও। ভাল করে জানি ওর কথার মূল্য কি। কালীবাড়ির দশ টাকা মাইনের পুরুতকে একবার দেখা দিতে তখন ওদের বাপ-বেটির সম্মানে বেধেছিল। সেই শিবরাত্রির পরে অনর্থক বৃথা আশায় আমি দিন গুনেছিলাম। ঘুণাক্ষরে কেউ টের পায়নি আমার মনের অবস্থা। একটা নির্লজ্জ কাঙালপানা তখন পেয়ে বসেছিল আমাকে। মুখ বুজে তার ফলও ভোগ করেছিলাম। এই গৌরীর জন্যে অনেকগুলো রাতের ঘুম আমায় বিসর্জন দিতে হযেছে সে সময়। সে ভুল আর একবার করব না কিছুতেই সুরেশ্বরবাবুর স্ত্রীর নাকি কান্না শুনে। এখন আমি অনেক পোড খেযেছি। এখন আমি একটি ঝানু ফক্কড। ফক্কডের জন্যে আকাশ অকৃপণ হস্তে জল-বাতাস-আলো ঢেলে দেয। তার চেয়ে বেশি আর কিছুর ওপর দাবিও নেই আমার, লোভও নেই।

গৌরী অবার আরম্ভ করলে—"কি লোভে আমার মাথাটা চিবিযে খেতে গেলে তুমি, তা তখন বুঝতে পাবিনি। জানতাম না যে, ওটা তোমার একটা খেলা। সবাই বলত যে, শুধু চোখের দৃষ্টি দিযে তুমি মানুষকে পাগল করে দাও। আমি তা বিশ্বাস করিনি। কেন বাবা আপ্রাণ চেষ্টায় আমাকে তোমার চোখের নাগালের বাইরে রেখেছিলেন, তা বোঝবার মত বয়সও নয় তখন আমার। তারপর যেদিন ভাল করে বুঝতে পারলাম তোমাব খেলা, সেদিন কোথায় যে পোড়ার মুখ লুকাব তা ভেবে পেলাম না। যতগুলি চিঠি লুকিয়ে আমি পাঠিযেছিলাম তোমায়, সবগুলি যেদিন আমার হাতে ফিরিযে দিযে বাবা মাথা-কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন, সেদিন—"

হাঁটা আমার বন্ধ হয়ে গেল। যে হাতটা ওর ধরেছিলাম, সেটাতে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিযে ওকেও থামালাম। কোনও রকমে মুখ দিয়ে বার হ'ল—"কি ? কি বললে তুমি গৌরী ?"

হাতটা ছাডাবাব জন্যে মোচডাতে লাগল গৌরী। দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগল—"থাক, আর ন্যাকা সেজে কাজ নেই। যা বললাম তার প্রতিটি অক্ষর যে সত্যি, তা আমরা দু'জনেই ভাল করে জানি। আজ আমায় ভোলাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না তোমার। সে বয়স আমি পার হয়ে এসেছি। এখন আর ঐ চোখ দিয়ে তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না। ও চোখের দৃষ্টিতে আর এতটুকু বশীকরণের শক্তি নেই। তুমি এখন একটি বিষহীন ঢোঁড়া। আজ আর তুমি কোন সর্বনাশই করতে পারবে না আমার।"

আরও জোরে চেপে ধরেছিলাম ওর হাত। বোধ হয় প্রাণপণে চেঁচিয়েও উঠেছিলাম—"ভুল, আগাগোড়া মিথ্যে। কাকে তুমি চিঠি লিখেছিলে? কে পেয়েছে তোমার চিঠি? কার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলে চিঠি? বল—বলতেই হবে তোমাকে।"

কে যেন আমার গলা চেপে ধরলে। আর একটি কথাও মুখ দিয়ে বার হ'ল না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন গৌরী আমার সামনে। অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি খুঁজতে লাগল আমার দুই চোখে। স্পষ্ট দেখলাম, তার চক্ষু দু'টিতে যেন কিসের আলো ফুঠে উঠেছে।

কয়েকটি মুহূর্ত নিঃশব্দে গড়িয়ে গেল। কানে বাজতে লাগল একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। তারপর বেশ লম্বা একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল গৌরীর বুক খালি করে। কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করলে সে—"ভুল! কার ভুল? কোথায় ভুল হ'ল?"

ওর হাত ছেড়ে দিলাম। বললাম, "ভুল আমার ভাগ্যের। কালীবাড়ির তুচ্ছ পুরুতের দোষ সব। নয়ত কোন ছুতোয় অন্ততঃ একবার তুমি দেবী-দর্শন করতে আসতে। কিংবা তোমার বাবা একটিবার আমায় ডেকে নিয়ে যেতেন তোমাদের বাড়িতে। শিবরাত্রির তিন দিন পরে কেদারঘাটে বসে তোমার বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন, মন্দিরের মধ্যে কি কি আলাপ হয়েছিল তোমার সঙ্গে আমার। সেদিন কিছুতেই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি জবাব দিয়ে। অত অল্প সময়ের মধ্যে সেই ভিড়ে যে কোনও আলাপই সম্ভব নয়, তা তিনি বিশ্বাস করেননি। বিশ্বাস তিনি না করুন, কিন্তু আমি ভাল করে বুঝেছিলাম যে, তুমি বলেছ তোমার বাবাকে, কে তোমায় মন্দির থেকে বার করে নিয়ে আসে। তার-পর দিনের পর দিন আশা করে রইলাম, হয় তুমি এক ' আসবে কালীবাড়িতে, নয় তোমার বাবা একবার ডেকে নিয়ে যাবেন আমায় তোমাদের বাড়িতে। কেউ আমায় আশা করতে পরামর্শ দেয়নি। কালীবাড়ির তুচ্ছ পুরুতকে তোমরা কি চোখে দেখতে, তা ঠিক বুঝতে না পেরে মহা ভুল করেছিলাম আমি। তার ফলও ভোগ করেছি। একটি প্রাণীও জানতে পারেনি, জ্বালায় জ্বলে মরেছি রাতের পর রাত—"

গৌরীর গলার স্বরে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। যেন একটা ক্রুদ্ধা ফণিনী হিসহিস করে উঠল—"তার মানে, একখানা চিঠিও পাওনি তুমি?"

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে গৌরী? কার চিঠি পাব আমি? কে আমায় চিঠি দেবে?"

"কালীবাড়িতে যে অন্ধ বুড়ীটা থাকত, যাকে তুমি খাওয়াতে পরাতে, সেই বুড়িটা আমার কোনও চিঠি দেয়নি তোমার হাতে ?"

উত্তরও দিলাম না আর। শুধু নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম ওর চোখের দিকে ; স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও। ঘন ঘন পড়ছে ওর নিঃশ্বাস, বুকটা ওঠা-নামা করছে অস্বাভাবিকভাবে। তারপর ওর গলার স্বর একেবারে ভেঙে পড়ল—"উঃ, কত বড় শয়তানী সেই অন্ধ বুড়ী! আর কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করেছে আমার বাবা! নয়ত, নয়ত আজ আমাকে—"

কে যেন ওর গলা চেপে ধরলে। তারপর শুনতে পেলাম অস্ফুট কান্নার শব্দ, যেন অন্ধকারটাই কান্না চাপার চেষ্টা করছে।

অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম দু'জনে। অনেকক্ষণ ধরে সেই কান্না চাপবার শব্দ শুনতে পেলাম। অনেকদিন আগে কেদারেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে আমার পিঠের সঙ্গে লেপটে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, তার গায়ের উত্তাপ যেন স্পষ্ট টের পেলাম। তার চুলের মিষ্টি গন্ধ আবার আমার নাকে গেল বহুদিন পরে। সেই ভীরু চোখ দুটির অসহায় ব্যাকুল দৃষ্টি স্পষ্ট চিনতে পেরে দারুণ মোচড় খেলাম নিজের বুকের মধ্যে।

সে দিনটি ছিল শিবচতুর্দশী—আর আজ মহাষ্টমী। আট বছর পরে আবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি দুজনে, খোলা আকাশের তলায় জনমানবহীন মাঠের মধ্যে। রাত কত হবে এখন!

আকাশের দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম। শুক্লাষ্টমীর চাঁদ পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে।

সেদিনকার সেই কুমারী মেয়েটির সঙ্গে আজকের এই অধ্যাপকের স্ত্রীর কত প্রভেদ! আহা, এতক্ষণে হয়ত স্ত্রীর খোঁজে পাগল হয়ে উঠেছেন অধ্যাপক মশাই, আর তাঁর বৃদ্ধ শ্বশুর মেয়ের শোকে মাথা খুঁড়ে মরছেন। না, আর দেরি করা কিছুতেই উচিত হবে না। বললাম—"এবার চল তোমায় পৌঁছে দিই। হয়ত এতক্ষণে তাঁরা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, হয়ত এখন—"

বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করলে গৌরী—"কোথায় যাবো? কেন যাবো?"

অদ্ভুত প্রশ্ন, কি জবাব দেব! চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু সামলে নিয়ে গৌরী বলে যেতে লাগল, "দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলে তুমি। তোমার খেয়ে তোমার পরে সেই বুড়ীটা বেঁচেছিল। তুমি চলে যাবার পর তাকে ঘাটে বসে ভিক্ষে করতে হয়। যখন মরল তখন দেহটা তুলে নিয়ে গেল ডোমেরা। কত দিন তাকে আমি লুকিয়ে খাইয়েছি, চুরি করে টাকা-পয়সা দিয়েছি,

তাকে। আর শয়তানী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আগাগোড়া। হঠাৎ তুমি চলে গেলে কাশী ছেড়ে, আমি পড়লাম রোগে। রোগে পড়েও কত খোশামোদ করেছি বুড়ীকে, যা-হোক একটু তোমার কাছ থেকে লিখিয়ে আনবার জন্যে। আমার চিঠির উত্তর তার মুখে পাঠাতে তুমি। কি বিশ্রী ন্যাকামি সে সব! তখনই আমার সন্দেহ হত, তোমার মত লোক অতটা বে-হুঁশ হয়ে ওসব কথা বলতে পারে না বুড়ীকে। তবুও তোমার হাতের একটু লেখা পাবার জন্যে বুড়ীকে পীড়াপীড়ি করতাম আর ঘুষ দিতাম। আর বুড়ী আমায় বলত যে, লিখে উত্তর দিতে তুমি ভয়ানক ভয় পাও। তারপর সেই অসুখের সময়ই এল তোমার প্রথম চিঠি।"

সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনতে শুনতে প্রায় দম বন্ধ হয়ে এসেছে আমার তখন।

কোনও ক্রমে মুখ দিয়ে বার হ'ল, "কোথা থেকে পাঠিয়েছি সে চিঠি আমি? কি লেখা ছিল সেই চিঠিতে?"

যেন মরা মানুষে কথা বলছে, এমনভাবে বলে গেল গৌরী:

"যা লেখা ছিল তোমার চিঠিতে, তা পড়ে আমার মনে হয়েছিল কোনও উপায়ে উঠে দাঁড়াবার শক্তি থাকলে আমি গলায় দড়ি দিতাম। আমার বাবাকে তুমি লিখেছিলে চিঠিখানা দিল্লী না হরিদ্বার থেকে, আর তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলে বাণ্ডিল বেঁধে আমার সব ক'খানি চিঠি। লিখেছিলে তুমি—আপনার কন্যার গুণরাশি আপনাকে জানাবার জন্যে তার সব চিঠিগুলি এই সঙ্গে পাঠালাম। আমি ব্রহ্মচারী মানুষ, আমার কোনও ক্ষতি সে করতে পারেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি সাবধান হবেন।"

অতি কষ্টে উচ্চারণ করলাম, "তারপর গৌরী—তা:পর?"

বোধ হয় আমার সেই মর্মন্তুদ কণ্ঠস্বর শুনেই গৌরী চমকে উঠল। এবার আমার একখানা হাত ধরে ফেললে সে। বললে, "থাক, আর দরকার নেই শুনে তোমার। চল ফিরি এবার। তারপর আর কিছুই নেই। তারপর একবার কাশীতে রটে গেল, কলেরায় তুমি মরে গেছ উত্তরকাশীতে। তারপর গৌরীও মরে গেল একদিন।"

চুপচাপ দু'জনে হাঁটতে লাগলাম। বহুবার দু'জনের গায়ে গা ঠেকল। বহুক্ষণ দু'জনে হাঁটলাম পাশাপাশি। দূরের আলো কাছাকাছি এসে গেল। চিনতে পারলাম, রেল স্টেশনের দিকেই এগিয়ে চলেছি আমরা।

আবার গৌরীই প্রথমে কথা বললে—"সত্যি কথা বলবে ব্রহ্মচারী, একটি খাঁটি জবাব দেবে আমায়?"

বললাম, "মিথ্যে কথা আমি সহজে বলি না গৌরী, গুরুতর প্রয়োজন হলে মৌনব্রত ধারণ করি। বল, তুমি কি জানতে চাও আমার কাছে?"

"লজ্জাও করে সে-কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতে। তবু বড় জানতে ইচ্ছে করে একবার মাত্র আমায় মন্দিরের মধ্যে দেখে কি লোভে তুমি বশীকরণ করতে গেলে? কি এমন দেখেছিলে আমার মধ্যে যে, তৎক্ষণাৎ একেবারে মাথাটা খেয়ে দিলে আমার? আর করলেই যদি সর্বনাশটা, তাহলে অন্ততঃ একবার আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলে না কেন? তুমি তো ভাল করেই জানতে তোমার নিজের বিদ্যের গুণ, তোমার ঐ চোখ দু'টি দিয়ে যখন যার সর্বনাশ করবার ইচ্ছে হয়, অনায়াসে করতে পারো তুমি। আমার মাথাটা খেয়ে আমাকে দগ্ধে মারবার জন্যে ফেলে রেখে গেলে কেন? ও ভাবে একটা নিরপরাধ মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়ে কি সুখ পেলে তুমি?"

আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে ওর দুই কাঁধ ধরে চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হলে তুমি বিশ্বাস করবে গৌরী, বশীকরণ কি ব্যাপার তাও আমি জানি না। যদি এখনই এই চোখ দুটো নষ্ট করে ফেলি, তাহলে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে?"

সভয়ে গৌরী দু'হাত দিয়ে আমার চোখ-মুখ চেপে ধরলে। সেই মুহূর্তে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে একটা কালপেঁচা উড়ে গেল কি একটা শিকার মুখে নিয়ে। শিকারটা চিঁ চিঁ করে চেঁচাচ্ছে তখনও।

ভয়ানক চমকে উঠল গৌরী ওপর দিকে চেয়ে। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল —"চল ব্রহ্মচারী, চল পালাই এখান থেকে।"

শক্ত করে ওর একখানা হাত ধরে বললাম, "চল।"

হঠাৎ এক সময় নজর পড়ল নিজের কাপড়-চাদরের দিকে। পরে আছি শেঠ ব্রজকিষণের দেওয়া মহামূল্য সেই গরদের কাপড়-চাদর। একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক খালি করে। হায় এখন আমি ফক্কড়ও নই। আর একবার আমার জাত নষ্ট হ'ল।

কাল সপ্তমীর দিন গঙ্গার-ঘাটে-পাওয়া প্রতিমাখানির কথা মনে পড়ে গেল। যারা বিসর্জন দিতে এনেছিল, তাদের কাছ থেকে বড় স্পর্ধা করে কেড়ে নিয়েছিলাম মাকে। আমার মত ফক্কড়ের পূজা মা গ্রহণ করবেন কেন? মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় দাউ দাউ করে জ্বলে গেল আমার চোখের সামনে প্রতিমাখানি। পুড়ে ছাই হয়ে গেল ফক্কড়ের স্পর্ধা। ফক্কড়ের হঠাৎ—নবাবী ছাই হয়ে উড়ে গেল আকাশে। চক্ষের নিমেষে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ভাগ্যদেবতা যে, খোলস,

পালটালেই সব কিছু পালটানো যায় না। হ্যাংলার মত কোনও কিছুর জন্যে হাত বাড়িয়েছো কি হাতে ফোস্কা পড়বে। আগুনের আঁচে হাত আর মুখ দুই-ই পুড়ে কালো হয়ে যাবে।

তাই হয়েছে। এই মুখ নিয়ে দিনের আলোয় আর চট্টগ্রাম শহরে টেঁকা যাবে না এক দণ্ড। কি করে এখন গিয়ে দাঁড়াব আমি মারোয়াড়ীদের সামনে? সর্বনাশ হয়ে গেল ওদের, হয়ে গেল আমার জন্যেই। ঐ সর্বনাশী দুর্গাকে তুলে নিয়ে গিয়ে না বসালে হয়ত এত বড় সর্বনাশটা হত না ওদের। এতটুকু কারও উপকারে লাগে না ফক্কড়। ফক্কড়ের পোড়া কপালের ওপর আতর ঢাললে বা চোখের জল ফেললে নিজের কপালেও আগুন লাগে।

নিজের চিন্তায় ডুবে পথ চলছিলাম। হাতে টান পড়ল। গৌরী বললে—"ঐ যে দেখা যাচ্ছে স্টেশন। একখানা গাড়ি ভাড়া কর। অনেক রাত হয়েছে, তাড়া-তাড়ি পৌঁছতে হবে বাসায়।"

হাত ছেড়ে দিলাম। অত রাতে গাড়ি পাওয়া সহজ নয়। পাঁচটা টাকা দিতে রাজী আছি বলাতে একজন ঘোড়া খুঁজতে বার হ'ল। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়া ধরে এনে গাড়িতে জোতা হল যখন, তখন স্টেশনের ঘড়িতে একটা বাজল। মনে মনে ঠিক করলাম, গৌরীকে নামিয়ে দিয়ে সেই গাড়িতেই আবার স্টেশনে ফিরে আসব, তারপর সামনে যে ট্রেন মেলে—কাল দিনের আলোয় এ মুখ কেউ যেন না দেখতে পায় এ দেশে।

ঝড় ঝড় ছড় ছড় শব্দে চলল গাড়ি। চাটগাঁর নিজস্ব ভাষায় ঘোড়া দুইটিকে আপ্যায়িত করে অনর্গল বকছে গাড়োয়ান—তার সঙ্গে উঠছে চাবুকের সাঁই সাঁই আওয়াজ। সামনাসামনি দু'জনে বসে আছি আমরা। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

হঠাৎ গৌরী বললে—"এই নাও ধরো।"

"কি। কি ওটা?"

"তোমার সেই লাল থলেটা, যার মধ্যে টাকা-কড়ি বোঝাই ছিল।"

"ওটাকে তুমি পেলে কোথায়?"

"আগুন-আগুন শুনেই আমি ওটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম। এতক্ষণ আমার জামার ভেতরে ছিল। এখন মনে পড়ল।"

হাঁ করে চেয়ে রইলাম থলেটার দিকে। তারপর চাইলাম গৌরীর দিকে। চিরন্তনী নারী—মৃত্যুকালেও পোঁটলার কথা ভুলতে পারে না।

গৌরী বললে—"থলেটা এবার বেশ করে বেঁধে রাখ কোমরে। এখান থেকে

পালাতে হলে টাকার দরকার। এখন আর কিছুতেই এখানে থাকা চলে না তোমার, যার যা মুখে আসবে বলবে। তোমার মহিমাও মা-দুর্গার সঙ্গে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শেঠজীরা আবার উল্টে কোনও ফ্যাসাদ না বাধালে বাঁচি। এতক্ষণে তোমার ভক্তরা হয়ত তোমার রক্ত পান করার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে।"

মনে মনে মানলাম গৌরীর কথাটা। থলেটা নিয়ে কোমরের কাপড়ের সঙ্গে কষে বেঁধে ফেললাম। বেশ উঁচু হয়ে উঠল উদরটি। উঁচু জাতের বিলাতী কুকুরের মত ফক্কড়ের উদর পিঠের সঙ্গে লেগে থাকা নিয়ম। পেটে হাত বুলিয়ে বুঝলাম, নেহাত বেমানান হয়ে উঠেছে সেখানটা।

বেশ কিছু রসদ বাঁধা রয়েছে পেটে। তার অনিবার্য ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল মাথার মধ্যে। নিরালম্ব নিঃস্বের আর যত দুঃখই থাকুক, থাকে না ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথার মধ্যে প্যাঁচ কষবার যন্ত্রণা-ভোগ। এই জন্যেই ফক্কড় সুখী ফক্কড় শুধু ফক্কড় বলেই রাজার রাজা। পেটে-বাঁধা থলেটার টাকা-পয়সাগুলো দারুণ গোলমাল বাধালে মাথার মধ্যে।

ফক্কড়ের নিজস্ব চলন চলতে হবে না এখন কিছু দিন। সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, অদৃশ্যভাবে নেমে উঠে আর উঠে নেমে, বেঞ্চির তলায় শুয়ে আর বাথরুমের মধ্যে বসে ট্রেন-ভ্রমণ নয়। হিসেব করা সময়ের মধ্যে যেখানে খুশি গিয়ে পৌঁছে যাব।

কিন্তু গিয়ে পৌঁছবার সেই স্থানটির নাম কি?

কে বলে দেবে কোথায় গিয়ে নামতে হবে ফক্কড়কে?

গৌরী বলে উঠল, "থামাও, থামাও। থামাতে বল গাড়ি এখানে। বাঁ দিকের ঐ গলির ভেতর দিয়ে যেতে হবে আমাদের।"

মুখ বাড়িয়ে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে বললাম।

তারপর?

গাড়ি থেকে নেমে মাটির ওপর পা দেবার পর-মুহূর্তেই মাটি ফুঁড়ে সামনে আবির্ভূত হ'ল একটি মূর্তিমান 'তারপর'। দুই চোখ লাল করে দু'হাত মেলে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর কি করতে চাও তুমি?"

ভয়ানক ঘাবড়ে গেলাম। সত্যিই তো কি করতে যাচ্ছি আমি গৌরীর সঙ্গে? কেন যাচ্ছি আর? আর একবার ওর সঙ্গে ওর বাড়িতে গিয়ে কি লাভ হবে আমার? পিতু বুড়ো আর এক প্রস্থ কাঁদুনি গাইবেন, সুরেশ্বর আর একবার চুটিয়ে আদর-আপ্যায়ন করবে। তার গৃহিণীকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনেছি বলে

একটু বেশি করে কৃতজ্ঞতা জানাবে। আর গৌরী সাজাতে বসবে জলখাবারের থালা।

কিন্তু তারপর? তারপর কি?

পা দুটো যেন গেড়ে বসে গেল মাটিতে। এক হাতে গাড়ির দরজা ধরে মাটির দিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গলির ভেতর কয়েক পা এগিয়ে গেল গৌরী। এগিয়ে যেতে যেতে বললে—"গাড়োয়ানকে সঙ্গে নিয়ে এস। বাড়ি গিয়ে ভাড়া দিয়ে দোব।"

কথাটা বলে সাড়া-শব্দ না পেয়ে পিছন ফিরে দেখলে। পিছনে কাউকে আসতে না দেখে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর আবার ফিরে এল গাড়ির কাছে।

"কি হ'ল? দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

আমার গলা দিয়ে শুধু বার হ'ল—"আর কেন?"

আরও আশ্চর্য হয়ে গেল গৌরী—"তার মানে? আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে এখান থেকেই তুমি চলে যাবে নাকি? তাহলে কি বলব আমি তাদের? কোথায় এতক্ষণ কাটিয়ে এলাম, তার জবাব কি দোব আমি?"

বিস্ময়-ব্যাকুলতা-ত্রাস এক সঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠেছে গৌরীর কণ্ঠস্বরে। গাড়ির মিটমিটে আলো পড়েছে ওর মুখের ওপর। ওর অসহায় চক্ষু দু'টির দিকে চেয়ে যেন চাবুক খেলাম পিঠে।

তাই তো! এতক্ষণ কোথায় কাটালাম আমরা? কি করে কাটল এতটা সময়? কেন এত দেরি হ'ল ফিরতে? এই রকমের শত শত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হবে যে এখনই। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে গেলে কোন্ দিকে কতটুকু সুরাহা হবে, তা ঠিক বুঝতে না পেরে ওর চোখ দু'টির দিকে চেয়ে রইলাম।

দপ করে জ্বলে উঠল গৌরীর চোখ।

"তুমি কি সত্যিই মানুষ নও? এভাবে আমাকে এখানে ফেলে পালালে কি অবস্থা দাঁড়াবে আমার, তাও কি ঢুকছে না তোমার মাথায়? কোন্ মুখে এখন আমি দাঁড়াব তাদের সামনে গিয়ে?"

কান্নায় না উৎকণ্ঠায়, ঠিক বলতে পারব না, ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

খুব জোরে একটা ঝাঁকানি দিলাম নিজের মাথায়। গাড়োয়ানকে বললাম—"মিঞা সাহেব, এখানে একটু থাকো গাড়ি নিয়ে। এই গাড়িতেই আমি ফিরে যাবো স্টেশনে। আবার পাঁচ টাকা পাবে তুমি।" বলে কোমর থেকে থলে বার করে তার হাতে পাঁচটি টাকা দিলাম।

গৌরীকে বললাম—"চল এবার, কিন্তু আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে যে তোমার

কতটুকু উপকার হবে, তা বুঝতে পারছি না।"

গলিটা পার হতে দু' মিনিটও লাগল না। দরজার গায়ে হাত দিয়ে গৌরী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পিছনে আমাকেও দাঁড়াতে হ'ল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে কার গলার স্বর—কে কথা বলছে।

একটু সময় লাগল কথাগুলি স্পষ্ট বুঝতে। পিতুবাবুর গলা, আস্তে আস্তে থেমে থেমে কথাগুলি বলছেন তিনি, বেশ কষ্ট হচ্ছে তাঁর কথা বলতে।

"তোমার কোন দোষ নেই বাবা, সব দোষ আমার এই পোড়া কপালের। তাকে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, তোমাদের পাঠালাম তার কাছে। এখনও যে তার মনে আমার সর্বনাশ করার ইচ্ছে লুকিয়ে আছে, তা সন্দেহ করতে পারিনি। মৃত্যুকালে চরম ভুল করলাম। বুক দিয়ে মেয়েটাকে বাঁচিয়েছিলাম তার সেই সর্বনেশে চোখ দুটোর নাগাল থেকে। নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম তোমার হাতে তাকে তুলে দিয়ে। যাতে ওদের দু'জনের চোখে চোখ না মেলে, তার জন্যে বহু ছল-চাতুরী করতে হয়েছে আমাকে। সব শেষ হয়ে গেল। এত দিনের এত চেষ্টা, এত সাবধান হওয়া, সব নিজে পণ্ড করে দিলাম।"

শেষটুকু বলতে যেন বুক ভেঙে গেল পিতুবাবুর। গৌরীর দিকে চেয়ে দেখলাম। দরজার গায়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। আবার সেই মর্মান্তিক হাহাকার ভেসে আসতে লাগল বাড়ির ভেতর থেকে।

"আজ আর তোমার কাছে কোনও কথা লুকোবো না সুরেশ্বর, আর তোমায় ঠকাবো না আমি। তোমায় মানুষ করে দাঁড় করিয়ে দোব, তোমার হাতে তোমার বাবার সম্পত্তি বুঝিয়ে দোব, এই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি তোমার বাবার মৃত্যুকালে। আজ তুমি মানুষের মত মানুষ হয়েছ, পাঁচজনের একজন হয়ে দেশের শিক্ষিত সমাজে স্থান পেয়েছ। তোমায় হাতে তোমার বাবার সম্পত্তি দিতে পেরে খালাস পেয়েছি আমি। অনেকগুলো বছর তোমার জন্যে আমি দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি। নাবালক ছেলেটিকে পথে বসালাম না দেখে লোকে ধন্য ধন্য করেছে আমাকে, আমার মত সামান্য মানুষের এত বড় নির্লোভ নিঃস্বার্থপরতা দেখে তাক্ লেগে গেছে সকলের। কিন্তু তারা কেউ জানতো না যে, একদিন তোমার গলায় একটি কাল-সাপিনীকে ঝুলিয়ে দেবার বাসনা বুকে পুরে আমি তোমার পরম হিতৈষী সেজে বসে ছিলাম। তুমি বড় হয়েছ, একটার পর একটা পরীক্ষায় পাশ করেছ, তোমার বাবার টাকা তোমায় পাঠিয়েছি আমি, আর মনে মনে দিন গুনেছি, কবে তোমার চরম সর্বনাশটুকু করতে পারব, কবে তোমার জীবনটা বিষিয়ে দিতে পারব সেই চিন্তায় রাত জেগে কাটিয়েছি।"

উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল পিতুবাবুর গলা।

"জ্যান্ত কালকেউটের বাচ্চা, ওই মেয়ের শিরা-উপশিরার মধ্যে বইছে বিষ, তারানন্দের রক্তের বিষ। মায়ের পেটে থাকতে সেই বিষ খেয়ে ও বেড়েছে, ওর হাড়-মাংস-রক্ত-মজ্জা তৈরী হয়েছে সেই বিষ থেকে। পেটে থাকতেই ওর মা ওকে নিকেশ করে দিতে চেয়েছিল। আমি বাধা দিয়েছিলাম, ভূমিষ্ঠ হবার পর কেড়ে নিয়েছিলাম ওর মায়ের কাছ থেকে। আমার বিশ্বাস ছিল, এক ফোঁটা মায়ের দুধ যদি ওর পেটে না যায়, যদি কস্মিনকালে ওর জানতে না পারে কোন্ মায়ের পেটে জন্মেছে, তাহলে বিষক্রিয়া শুরু হবে না ও দেহ-মনে। ভুল ভুল, কালকেউটের বাচ্চাকে দুধ-কলা দিয়ে পুষলেও তার বিষ যাবে কোথায়?"

অনেকক্ষণ কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। সরু গলিটার মধ্যে দম আটকে এল আমার। মনে হ'ল, আকাশ নেমে এসেছে একেবারে মাথার ওপর। আকাশের চাপে এবার পিষে মারা যাবো। একেবারে আমার বুকের কাছে দরজার গায়ে লেগে আছে আর একটি প্রাণী। ওর লাল বেনারসীর রঙ পালটে গেছে। চিকচিকে কালো জেল্লা ঠিকরে বার হচ্ছে ওর সর্বাঙ্গ থেকে। ঘোমটা খসে পড়েছে, দুটো রূপোর কাঁটা গোঁজা রয়েছে খোঁপায়। খোঁপাটা যেন সাপের ফণা, কাঁটা দুটো সাপের দুই জলন্ত চক্ষু। ফণা তুলে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সাপটা। একটু নড়লে চড়লেই মারবে ছোবল।

আমার দুই চোখ জ্বালা করে উঠল। কি একটা যেন ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আটকে গেল গলায়। কয়েক ঘণ্টা আগে এই কাল-সাপিনীকে তুলে নিয়ে পালিয়েছিলাম জলন্ত প্যাণ্ডেল থেকে। ইচ্ছে হ'ল, তৎক্ষণাৎ আর একবার তাকে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাই সেই দম-আটকানো গলিটার ভেতর থেকে। সেখানে ছিল আগুন আর এখানে নেই একবিন্দু বাতাস। আকাশ নেমে এসেছে মাথার ওপর, দু'পাশে অন্ধকার—নিরেট পাঁচিল, সামনে বন্ধ দরজা। পিছনে পালাবার পথটি খোলা আছে এখনও। একটু পরে যদি পিছনের পথও বন্ধ হয়ে যায়! তখন দম আটকে মরা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

হাত তুললাম, ওর কাঁধ ধরে টেনে আনবার জন্যে হাত বাড়ালাম। সেই মুহূর্তে আবার কানে এল একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

"ওর বাবা কে?"

থমকে থেমে রইল কয়েকটি মুহূর্ত। আবার শুনতে পাওয়া গেল সেই থমথমে গলা।

"তারানন্দের মেয়ের স্বামী বড় ছেলে জন্মাবার আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

তারও অনেকদিন পরে জন্মায় এই মেয়ে।"

"তাহলে ওর বাপের কি কোনও পরিচয়ই নেই?"

"আছে, সুরেশ্বর আছে! বাপের পরিচয়ই আছে তার—"

কে যেন চেপে ধরলে পিতু বুড়োর মুখ।

হঠাৎ সামনে থেকে আমি একটা ধাক্কা খেলাম। আমাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল গৌরী, পরমুহূর্তে দুর্দান্ত বেগে আছড়ে গিয়ে পড়ল দরজার ওপর। সে আঘাত সহ্য করতে পারল না দরজাটা, ভেতরের খিল ছিটকে বেরিয়ে গেল। খোলা দরজা পার হয়ে গৌরীও ছিটকে গিয়ে পড়ল উঠানের ওপর। চক্ষের নিমেষে উঠে দাঁড়াল সে, এক লাফে রোয়াকের ওপর উঠে সামনের খোলা দরজার দু'পাশে দু'হাত দিয়ে দাঁড়ালো। কয়েকটি মুহূর্ত—সব নিস্তব্ধ। তারপর একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার চিরে ফেললে অন্ধকার আকাশটাকে।

"বল, বল শিগ্‌গির কে আমার বাবা?"

ঘরের ভেতর থেকে আলো পড়েছে গৌরীর দেহের ওপর। ওর পিছন দিক অন্ধকার। অদ্ভুত দেখাচ্ছে দৃশ্যটা, ঠিক যেন একখানি ছবি। দরজাটা হচ্ছে ছবির ফ্রেম। ফ্রেমে-আঁটা একখানি ছবি। অন্ধকারে একটি দেহের চারিদিক দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে। জ্যোতির্ময়ী আঁধার-কন্যা।

বুক-ফাটা আর্তনাদ করে উঠল গৌরী—"বল, বল দয়া করে আমার বাবা কে?"

উত্তর শোনার জন্যে আকাশ-বাতাস-বিশ্বচরাচর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে। সেই নিরুদ্ধ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটানা ভেসে আসতে লাগল একটা গোঙানি।

"সর্বনাশী; এই জন্যেই একদিন তোকে তোর রাক্ষসী-মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বুকে করে বাঁচিয়েছিলাম আমি? তোর গর্ভধারিণীর পরিচয় মুছে দিতে চেয়েছিলাম তোর কপাল থেকে? জন্ম দিয়েছিলাম বলে মুখ বুজে ষোল আনা ফল ভোগ করেছি। তবু তোকে রক্ষা করতে পারলাম না, যে বিষ তোর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে সে বিষের ফল ফলে তবে ছাড়ল।"

প্রাণহীন ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে গৌরী। সুরেশ্বরের কথা শোনা গেল, একান্ত নিরাসক্ত তার কণ্ঠস্বর।

"কেন আবার ফিরে এলে এখানে?"

আবার নিস্তব্ধতা। আমার চোখের সামনে ফ্রেম-আঁটা আলো-ঘেরা কালো ছবিখানি নিথর নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। পাষাণের মত ভারী সময় এতটুকু নড়ছে না। নিজের বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ শব্দও শুনতে পাচ্ছি আমি তখন।

নিস্তরঙ্গ পুকুরে একটা মস্ত ঢিল ছুঁড়লে কে। আকাশের দিকে ছিটকে উঠল অনেকটা জল। অনেকগুলো ঢেউ উঠল জলের বুকে।

"যাও, দূর হয়ে যাও। দিনের আলোয় ও মুখ আর দেখিও না এখানে। আগুনে পুড়ে মরেছে এই ধারণা করবে সকলে।"

সুরেশ্বরের বলা শেষ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন পিতুবাবু।

"যা, যা, পুড়িয়ে ফেল্ তোর ঐ পোড়ার মুখ। তোকে সুখী করবার জন্যে আজীবন আমি জ্বলেপুড়ে মরেছি। এব'র তুই মর্। তুই মরেছিস জেনে তবে যেন আমি মরি।"

টলতে টলতে নেমে এল গৌরী। উঠান পার হয়ে দরজার সামনে এসে পৌঁছল। ধরে ফেললাম তার একখানা হাত। মুখ তুলে সে চাইল একবার আমার দিকে। তারপর মাথা হেঁট করে হু হু করে কেঁদে উঠল।

চিৎকার করে উঠলাম আমি, "সুরেশ্বরবাবু?"

রোয়াকের ওপর থেকে ধীরে শান্তকণ্ঠে সাড়া দিলে সুরেশ্বর—"বলুন!"

"কেন তাড়িয়ে দিচ্ছেন গৌরীকে? কি অন্যায় করেছে সে আপনার কাছে?"

সুরেশ্বর নেমে এল, এসে দাঁড়াল গৌরীর পিছনে। প্রায় চুপি চুপি বলতে লাগল—"কোনও অন্যায় করেনি গৌরী, অন্যায় করেছে এ-কথা আমি বলিনি। আমি শান্তি চাই, ও মরে গেছে এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে আমি শান্তিতে থাকতে চাই। এর বেশি আর কিছু চাই না আমি ওর কাছে। হয় ও যাক, নয়ত আমিই যাচ্ছি।"

শেষ চেষ্টা করলাম।

"গৌরীকে তুমি অবিশ্বাস করছ সুরেশ্বর, তাকে তুমি—"

সুরেশ্বর থামিয়ে দিলে আমাকে—"না, তা করি ন আমি। বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনও কিছুই করবার দরকার করে না আমার! ওর ায়ের পরিচয় পাবার পরে ওকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই আম'র।"

তখনও ধরেছিলাম গৌরীর হাত। টান পড়ল। আর্তনাদ করে উঠল গৌরী: "আমায় ছেড়ে দাও, যেতে দাও আমায়।"

ছাড়লাম না গৌরীর হাত, বেরিয়ে এলাম দরজ পার হয়ে ওর হাত ধরে। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর সামলাতে পারলাম না নিজেকে। চিৎকার করে বলে ফেললাম—"ওর মায়ের সম্বন্ধে এত হীন ধারণা যার মনে বাসা বেঁধে রইল, তার সং র বাস করার চেয়ে মরাই ভাল! চল গৌরী।"

ভেতর থেকে পিতুবাবু জবাব দিলেন, "হ্যা তাই যা। মরগে যা ঐ ভণ্ড বুজরুকটার সঙ্গে। যা করে তোর গর্ভধারিণী মরেছে, তাই করে তুইও মরগে যা। নয়ত তোর—"

আর যাতে শুনতে না হয় সেজন্য হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলাম গলি থেকে।

ছড়ছড় শব্দে গড়িয়ে চলেছে গাড়ি, সামনাসামনি বসেছি দু'জনে। গাড়ির এক কোণে মাথা রেখে পড়ে আছে গৌরী। নিঃশেষে নিভে গেছে ওর ভেতরের আগুন। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম। দেখলাম কেউ আসছে কিনা। কেউ না। নজরে পড়ল পূব আকাশটা, সেখানে তখন খুব ফিকে সাদা রঙ্ ধরতে শুরু করেছে।

মহানবমী।

ব্রাহ্মমুহূর্তে ঢাক-ঢোল বাজছে শহরময়। প্রভাতের বাতাসে ভেসে এল মহানবমীর বাজনা। ভয়ানক মুচড়ে উঠল বুকের ভেতরটা। মায়ের পূজা দেখতে ছুটে এসেছিলাম বাঙলায়। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, পূজার কটা দিন থাকবই বাঙলা দেশে। সে প্রতিজ্ঞা গোল্লায় গেল। মহানবমীর ব্রাহ্মমুহূর্তে আবার ট্রেনের কামরায় চড়ে বসে আছি।

বসে আছি দ্বিতীয় শ্রেণীর গদি-মোড়া আসনে। আমরা দু'জন ছাড়া আর একটি প্রাণীও নেই গাড়িতে। বাইরের দিকে চেয়ে ওপাশের আসনে বসে আছে গৌরী। রক্তবর্ণ বেনারসী-জড়ানো, হাতে-গলায় সোনার অলঙ্কার, কপালে সিঁথিতে লাল ডগডগে সিঁদুর—চমৎকার! কে জানে ঠিক এই সাজেই একদিন ও এসেছিল কিনা সুরেশ্বরের ঘরে! যেভাবে এসেছিল সেইভাবেই বিদেয় হচ্ছে। আসা-যাওয়ার মাঝে যে সময়টুকু অযথা অপচয় হয়েছে, তার জন্যে অনর্থক মন খারাপ করে কি লাভ? হঠাৎ নিজের দিকে নজর পড়ল। বহুমূল্য কাপড় চাদর রয়েছে আমার অঙ্গে, মাথা থেকে ছড়াচ্ছে মহামূল্য আতরের গন্ধ। না, নেহাত বেমানান দেখাচ্ছে না আমাকে গৌরীর সঙ্গে। চমৎকার!

এক প্যাকেট সিগারেট কিনে পোড়াতে লাগলাম। অনেকটা সময় পরে গলা দিয়ে ধোঁয়া নামাতে মাথাটা সাফ হয়ে গেল। এক সঙ্গে অনেকগুলো মিল খুঁজে পেলাম। সর্বস্ব খুইয়ে বসলে মনের যে অবস্থা হয়, তার সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে সব কিছু। হাতের মুঠোয় পাওয়ার অসীম তৃপ্তি। বেঁচে থাকার চরম আনন্দের সঙ্গে চমৎকার স্বাদ পাচ্ছি মৃত্যুর ওপারের পরম শান্তির। সামনে চোখ বুজে বসা

মূর্তিটিকে সঙ্গে নিয়ে এই যাত্রার শেষে যেখানে গিয়ে পৌছব, সেই নাম না-জানা ঠিকানার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে জীবন-নদীর ওপারের একটি ঠিকানা, যেখানে এপারের কলঙ্ক পৌছতে পারবে না। এক নৌকার যাত্রী আমরা দু'জনে, নির্ভয়ে পাড়ি দিয়েছি এবার। এই মহাযাত্রার শেষে যেখানে গিয়ে লাগবে আমাদের তরী, সেখানে কেউ কাউকে মিথ্যে সন্দেহ করে না। জন্মমৃত্যুহীন সেই দুনিয়ায়, কার গর্ভে কে জন্মেছে, এজন্যে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করবার রেওয়াজ নেই।

কান-ফাটা চিৎকার করে উঠল ইঞ্জিন। গাড়ি চলতে শুরু করলে। মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় পুড়ে গেল সেই প্রতিমাখানি, যাকে তুলে এনেছিলাম নদীর ধার থেকে। বিসর্জিতা প্রতিমার পূজা হ'ল না। আবার মহানবমীর প্রভাতে আর একখানি বিসর্জিতা প্রতিমা নিয়ে যাত্রা শুরু হ'ল। কোন্ বিধাতা বলে দেবে, কি লেখা আছে এই প্রতিমাখানির কপালে!

নিরালম্ব নিরাশ্বাস নিরুদ্বেগ ফক্কড়ের জীবনে শান্তি আছে কিন্তু সান্ত্বনা নেই। জাগরণের অবিচ্ছিন্ন উন্মাদনা আছে, নেই সুপ্তির মদির মাধুর্য, নেই স্বপ্ন দেখার নিশ্চিন্ততা। ফক্কড়ের চোখের পাতা যখন মুদিত হয়, হাত-পা হয় অচল, দেহটা নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে পথের পাশে, গাছতলায় বা কোনও দেবালয়ের উঠানের কোণে, তখন তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন ধারণা করা ভুল। ধারণা করতে হবে যে, যন্ত্রটা কিছুক্ষণের জন্যে থেমে আছে, একটু পরেই আবার চলতে শুরু করবে।

ঘুম কখনও স্পর্শ করে না ফক্কড়কে, ফক্কড় কিছুতে ঘুমায় না। ঘুমাতে হলে খাট-বিছানা না হলেও চলে, কিন্তু চাই একটি মন। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, আশা-নিরাশায় হাবুডুবু খেতে জানে, এমন একটি সহৃদয় মনের সাহায্য না পেলে ঘুমাতে পারে না কেউ। দুশ্চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না, ও একটা কথার কথা। খারাপ ভাল যে কোনও জাতের চিন্তা না থাকলে মনেরও অস্তিত্ব থাকে না। তখন ঘুমাবে কে? মনে হয় জেগে থাকে, নয় স্বপ্ন দেখে, নয় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু খোরাক চাই মনের, যেখানে মনের খোরাক জোটে না সেখানে মনও নেই।

বেচারা ফক্কড় কোথায় পাবে মনের খোরাক? কি দিয়ে মনকে খেলা দেবে ফক্কড়? কোনও দিন কিছু না পেয়ে মন ফক্কড়ের মুখে পদাঘাত করে সরে পড়ে। তখন সদাজাগ্রত ফক্কড় সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে হিসেব করে, নিঃশ্বাস নেবার মেয়াদ কতটা খরচ হয়ে গেল। অসহায়ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে, অবিরাম চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে কলসীর জল, ফুরিয়ে আসছে চিরজাগ্রতের দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ। শেষে নেমে আসে সেই চরম মুহূর্তটি ফক্কড়ের দুই চোখের ওপর, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে তখন

ফক্কড। এমন ঘুম ঘুমায় যে তা ভাঙবার সাধ্য নেই স্বয়ং সৃষ্টিকর্তারও!

গাড়ি ছাড়বার পর এক ফাঁকে আমার সেই পুরনো বন্ধুটি এসে উপস্থিত। বহু কাল আগে যিনি আমার মুখে চড় মেরে সরে পড়েছিলেন, সেই হ্যাংলা বন্ধুটি আমার খোরাকের গন্ধ পেয়েই নির্লজ্জের মত উদয় হলেন আসমান থেকে। টেরও পেলাম না, কখন তিনি বেশ সপ্রতিভভাবে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন আমার সঙ্গে। লাল বেনারসী-পরা যে প্রাণীটি চোখ বুজে বসে রয়েছে সামনে, তার সম্বন্ধেই আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গেল বন্ধুটির সঙ্গে। নাছোড়বান্দা বন্ধুটি জেগে রইলেন সঙ্গে, কানের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করতেই থাকলেন। ফলে ঘুমিয়ে পড়লাম, ফক্কড়ের ঘুম নয়, আসল স্বপ্ন-দেখার ঘুম। যে ঘুম ঘুমিয়ে মানুষ ফানুসের মত উড়ে চলে যায় আকাশে, এই হৃদয়হীনা ধরণীর ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাইরে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পার হয়ে গেলাম অনেকটা পথ আর অনেকটা সময়। তারপর লাগল ঘুমের গায়ে ধাক্কা, যাকে অবলম্বন করে মন আমার ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই অবলম্বনটি নড়ে উঠল ভয়ানক ভাবে। চোখ চেয়ে দেখলাম তার মুখখানি। দুভাবনা-দুঃখ-ক্লান্তি অবসাদের চিহ্নমাত্র নেই সে মুখে। তার বদলে দেখতে পেলাম সদ্য ছুটি-পাওয়া একটি স্কুলের মেয়ের মুখের ছেলেমানুষ চপলতা। আমার একখানা হাতে সজোরে নাড়া দিতে দিতে গৌরী বলছে—"ওঠ, ওঠ। এসো, নেমে পড়ি এবার। এখানে বদল করে নাও টিকিট। চাঁদপুর থেকে স্টীমারে গোয়ালন্দ যাব আমরা। যে করে হোক, কালই কাশী পৌঁছতে হবে আমাদের। এতটুকু সময় নেই নষ্ট করবার। কাশীতে খবর পৌঁছবার আগে আমি গিয়ে ঢুকতে চাই বাড়িতে।"

হেসে ফেললাম ওর হাবভাব দেখে। বললাম—"কালই কাশী পৌঁছতে হলে দু'খানা ডানা গজানো দরকার তোমার এখনই। উড়ে না গিয়ে উপায় নেই।"

হিসেব করতে লেগে গেল গৌরী।

"কেন পৌঁছব না কাল? ভোরবেলা গোয়ালন্দ পৌঁছব, দুপুরের দিকে কলকাতা। সন্ধ্যার পর হাওড়া থেকে যে কোনও মেলে উঠলেই ভোর-রাতে মোগলসরাই গিয়ে নামা যাবে। তারপর—"

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—"তারপর আগে চাঁদপুর পৌঁছে স্টীমারে চড়ো, সেই স্টীমার গিয়ে যথাসময়ে পৌঁছক গোয়ালন্দ। তখন আবার হিসেব আরম্ভ করো।"

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, লাকসাম জংশনে গাড়ি ঢুকছে। এ গাড়ি সোজা চলে যাবে লামডিং বদরপুর হয়ে গৌহাটি! দু'খানা গৌহাটির টিকিট কিনেছিলাম চট্টগ্রাম থেকে। তখন পরামর্শ করার মত অবস্থা ছিল না গৌরীর সঙ্গে।

কোনও কিছু না ভেবে চিন্তেই কিনেছিলাম গৌহাটির টিকিট। জানতে পেরেছিলাম যে, গৌহাটি পর্যন্ত একটানা যাবে গাড়িখানা, সুতরাং অন্ততঃ দুটো দিন আর দুটো রাত নিশ্চিন্তে থাকতে পারব গাড়ির মধ্যে, এই আশাতেই কিনেছিলাম টিকিট দু'খানা।

নিশ্চিন্ততাকে নির্বিবাদে গৌহাটি পর্যন্ত চলে যাবার সুযোগ দিয়ে আমরা নেমে পড়লাম লাকসাম জংশনে। সংবাদ নিয়ে জানলাম, ঘণ্টা তিনেক পরে আসছে চাঁদপুরের গাড়ি সাঁলেট থেকে।

গৌরী বললে, "চল কোথাও, মানুষের চোখের আড়ালে গিয়ে বসা যাক, আমাদের সাজ-পোশাক দেখে সকলে হাঁ করে চেয়ে আছে। এগুলো ছেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচতাম।"

ওয়েটিংরুমের দিকে চললাম দু'জনে। পাশে চলতে চলতে গৌরী বললে—"একটা বাক্স-বিছানা অন্ততঃ সঙ্গে থাকা উচিত ছিল আমাদের। একেবারে কিছু নেই সঙ্গে, লোকে ভাববে কি?"

লোকে কি ভাববে? কত কি না ভাবতে পারে লোকে, কেউ কারও ভাবনার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তা না পারুক, কিন্তু আর একটি নতুন জাতের মনের খোরাক জুটল বটে আমার। এখন থেকে চোখ কান সজাগ রেখে অতি সাবধানে পা ফেলা প্রয়োজন। চতুর্দিকের তাবৎ মানুষ কে কি ভাবছে, সে সম্বন্ধে নিখুঁত হিসেব রাখতে হবে। ভাল করে বুঝতে পারলাম, শুধু যে গৌরীকেই পেয়েছি তা নয়, তার সঙ্গে ফাউ হিসেবে আরও অনেকগুলি ফ্যাসাদ জুটেছে—যার কোনওটিকেই অবহেলা করা চলবে না।

ওয়েটিংরুমের দরজার পাশে একখানা বেঞ্চি পাতা রয়েছে। বেঞ্চির ওপর রয়েছে কার টিনের বাক্স আর বিছানার বাণ্ডিল। গৌরী বসে পড়ল এক ধারে। বললে—"যাক, বাঁচা গেল এতক্ষণে। এইবার লোকে ভাববে, এই বাক্স-বিছানাটা আমাদের সম্পত্তি।"

গৌরীর চাল-চলন দেখে সত্যিই বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। শেষ রাত্রে যে বিশ্রী কাণ্ডটা ঘটে গেল, তার কিছুই কি মনে পড়ছে না ওর? এতটুকু সময়ের মধ্যে বেমালুম ভুলে মেরে দিলে নিজের ঘর-বাড়ি-স্বামীর কথা। যে লোকটিকে সে এতকাল বাবা বলে ডেকেছে, যে তাকে বুকে করে মানুষ করেছে, ক্ষোভে দুঃখে হয়ত সে মারাই গেল এতক্ষণে! তার কথাও কি একবার মনে পড়ছে না গৌরীর? ঘর-সংসার, মান-সম্মান, নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে কোথায় ছুটেছে ও আমার সঙ্গে? কি করতে চলেছে এখন কাশীতে? সবচেয়ে বড় কথা, আমায় সঙ্গে নিয়ে চলেছে

কেন? আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি? কি পরিচয় দেবে ও লোকের কাছে আমার?

চট্টগ্রাম থেকে রওয়ানা হবার আগে যে চিন্তাগুলি মাথার মধ্যে উদয় হওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল, অনেকটা পথ পার হয়ে এসে সেগুলি একে একে উঁকি দিতে লাগল। ওর দিকে চেয়ে সিগারেটে টান দিতে দিতে একটা প্রশ্ন গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠল। স্পষ্ট করে একবার ওকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হ'ল যে—

গৌরী মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেললে। "অমন করে চেয়ে থেকো না আমার দিকে। লোকে কি ভাববে। মহাপুরুষ মানুষ না তুমি?"

হালকা পরিহাসের সুর ওর গলায়। নিঃশ্বাস চেপে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। স্পষ্ট করে জানবার প্রশ্নটা আর করা হ'ল না আমার। চাপা গলায় অনর্গল বলে যেতে লাগল গৌরী—

"ঐ রাগ-অভিমানটুকুই শুধু সম্বল মহাপুরুষের। আমাদের মত সাধারণ মানুষের বোধজ্ঞান যদি থাকত, তাহলে একটি বারের জন্য অন্ততঃ আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতেন তখন কাশীতে। তা নয়, উনি অভিমান করে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন, কেন একটা আইবুড়ো মেয়ে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল না! আর ওধারে আমি একটার পর একটা চিঠি লিখে ম'লাম। সেই হারামজাদী বুড়ী সবগুলো চিঠি পৌঁছে দিলে আমার শত্রুর হাতে। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।"

কিছুই বলবার নেই আমার। জবাব দেবার আছে কি? হয়ত বলতে পারতাম—"কই, চিঠি লিখতে তো বলিনি আমি তোমাকে!" জবাব শুনে নিশ্চয়ই মুখ বন্ধ হত গৌরীর, আর মুখের মত জবাব দিতে পারার বিমল আনন্দ লাভ হত আমার। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি পেলাম জবাব না দিয়ে। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, তবু যে আমিই হতে পেরেছি ওর সর্বনাশের হেতু, এই কথা শুনেই একটি অনাবিল আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলাম। অন্ততঃ এইটুকু মূল্য আমায় দিলে গৌরী যে, আমি তার সর্বনাশের হেতু হতে পারি। আর ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক, শেষ পর্যন্ত গৌরী যে এসে পড়েছে আমার হাতেই, তার জন্যে নিজের বরাতকে ঠুকে একটি ধন্যবাদ দান করলাম। কিন্তু আবার ও ছুটেছে কেন কাশীতে তাড়াতাড়ি?

সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করে ফেললাম সর্বপ্রথম, "আবার যাচ্ছ কেন কাশীতে?"

তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন করে বসল গৌরী—"নয়ত কোথায় যাবো আর মরতে!"

তাই তো! কোথায় যে যাবো আমরা, কোথায় যে চলেছি ওকে নিয়ে, সে-কথা তো একবারও ভেবে দেখিনি। ফক্কড কোথায় নিয়ে যাবে ওকে? কোথায় লুকিয়ে রাখবে ঐ সম্পত্তি ফক্কড? হাতের মুঠোয় পেয়েছি যাকে, তাকে নিয়ে এখন আমি করব কি? আজন্মকাল গৌরী নিশ্চয়ই ফক্কড়ের চলনে চলতে পারবে না। এখন উপায়?

আমার মুখের অবস্থা দেখেই বোধ হয় গৌরীর দয়া হ'ল। মিষ্টি হেসে গলায় মধু ঢেলে বললে—"বেশ তো, আগে চল না কাশীতে। বাড়িতে যে ভাড়াটে আছে তার কাছে খবর পৌছবার আগেই আমরা পৌছে যাব। একখানা খাতা আছে আমার বাবার, খাতাখানা আমার চোখে পড়েছে অনেকবার। কিন্তু কখনও সেখানা হাতে পাইনি। খাতাখানা খুব যত্ন করে লুকিয়ে রাখত বুড়ো, তাতেই ও নিজের হাতে লিখে রেখেছে নিজের কীর্তিকাহিনী। আমার জন্মবৃত্তান্তও তাতে লেখা আছে নিশ্চয়ই। সেই খাতাখানা আমি দখল করতে চাই। তারপর যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব। যা করতে বলবে তাই করব।"

সামান্য আদর করলেই একেবারে গলে যায় আর ঘন ঘন লেজ নাড়তে থাকে, সেই জাতের পোষা জীবের মত তখন আমার মনের অবস্থা। যা বলব তাই করতে রাজী গৌরী। এবার বলার মত কিছু বলতে হবে আমায়, চাইবার মত কিছু চাইতে হবে ওর কাছে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে নাকি? বলার আর চাইবার পরম লগ্নকে অনেকগুলো বছর আগে পর হয়ে আসিনি? সে দিনের সেই না-বলা কথাটি কি আর একবার খুঁজে পাওয়া সহজ? খুঁজে পেলেও আজকের এই পোড়-খাওয়া ফক্কড়ের মুখ দিয়ে সহজে কি বেরোবে সেই ভাষা? সব চেয়ে বড় কথা, সে কথা শোনবার মত কান কি এখনও বেঁচে আছে গৌরীর।

বেশ মিষ্টি মুখে একটি ঝামটা দিয়ে উঠল গৌরী— না, আর পারি না বাপু তোমার সঙ্গে। মহাপুরুষের সঙ্গে পথ চলতে হলে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে মরতে হবে দেখছি। আমার মুখের দিকে চেয়ে সিগারেট ফুঁকে সময়টুকু কাটিয়ে দিলেই কি চলবে? এখান থেকে অন্ততঃ একটা জলের জায়গা জোগাড় করে নাও না। সারাটা পথ দুটো প্রাণী কি এক ঢোক জলও মুখে দোব না?"

এবার সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠলাম, বললাম—"টাকা দাও।"

হেসে গড়িয়ে পড়ল গৌরী, "টাকা কি আমার কাছে নাকি?"

আরে, তাও তো বটে! থলেটা যে এখনও বাঁধা রয়েছে আমার কোমরে! তাড়াতাড়ি সেটাকে কোমর থেকে খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। ধরলে গৌরী থলেটা, জিজ্ঞাসা করলে, "কত দোব?"

"দাও তোমার যা খুশি।"

কয়েকখানা নোট বার করে দিলে আমার হাতে। টিকিট দু'খানা বাঁধা আছে আমার চাদরের খুঁটে। টিকিটও বদলে আনতে হবে তো!

গৌহাটির টিকিটকে কলকাতার টিকিট বানাতে দু'চারটে ছোট-খাটো মিথ্যে কথা বলতে হ'ল। চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাতে একটা কেবিনের মধ্যে স্থান জোটে, তার জন্যে চাঁদপুরে তার করবার আলাদা দাম দিলাম। তারপর একটা কুঁজোর সন্ধান করলাম। কুঁজো পাওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং কিনলাম একটা মস্ত বড় এলুমিনিয়ামের কেটলি আর একটি এলুমিনিয়ামের গেলাস স্টেশনের সামনের দোকান থেকে। এক হাঁড়ি মিষ্টিও নিলাম। দোকানদার হাঁড়ির গলায় দড়ি বেঁধে দিলে।

তখন এক হাতে হাঁড়ি ঝুলিয়ে আর এক হাতে জল-ভরতি চকচকে কেটলি নিয়ে দর্শন দিলাম গৌরীকে। গৌরীর পাশে তখন বসে আছে আর একটি বউ। দূর থেকে আমাকে দেখে হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ল গৌরী। আর একটু কাছাকাছি পৌঁছে শুনতে পেলাম:

"দেখ না ভাই, কি রকম সঙ! এই মাত্র একরাশি জিনিসপত্র হারিয়ে এল চন্দ্রনাথ স্টেশনে, তার জন্যে দুঃখ আছে নাকি মনে একটু? আবার কোথা থেকে জোটালে ঐ কেটলিটা! কি গো, ও কেটলিটা আবার পেলে কোথা থেকে?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম, "কিনলাম এখানে।"

উঠে এগিয়ে এসে হাঁড়ি আর কেটলি ধরলে গৌরী।

বললাম, "আর বেশি দেরি নেই গাড়ির।"

গৌরী বললে, "তবে আর এখানে এগুলো খুলে কাজ নেই। একেবারে গাড়িতে উঠেই যা হয় করা যাবে।"

গৌরী আবার ফিরে গেল বেঞ্চিতে। কেটলি হাঁড়ি পাশে রেখে গল্প করতে বসল বৌটির সঙ্গে। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি পায়চারি করতে লাগলাম সামনের প্লাটফরমে।

চাঁদপুরের গাড়িতে উঠে দেখলাম, একজন বুড়ো সাহেব আর তার মেমসাহেব শুয়ে আছেন দু'ধারের দু'খানা বেঞ্চিতে। রঙ দেখে মনে হ'ল, সাহেবের বাড়ি এ দেশেই এবং রেলেই চাকরি করেন তিনি। আমরা উঠতে সাহেব নিজের বিছানা গুটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন তাঁর মেমের পাশে। আধ হাত লম্বা একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে তাঁর নিজস্ব ভাষায় বক বক করতে লাগলেন বুড়ীর সঙ্গে।

গাড়িতে উঠে গৌরী আবার বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। যেন

একেবারে ভুলেই গেল আমার কথা। হাস্যপরিহাসে উচ্ছল যে মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে এইমাত্র উঠলাম গাড়িতে, এ যেন সে নয়। এ একটি মূর্তিমতী হতাশা। ঠিক জানি না, মরবার সময় মানুষের মনের অবস্থা কি রকম হয়। জানা-চেনা এই দুনিয়াটার ওপর হয়ত কারও টান না থাকতে পারে, কিন্তু এটাকে ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা আর একটা জগতে একলা পাড়ি দেবার সময় আতঙ্কে আর হতাশায় কিভাবে মুষড়ে পড়ে মানুষ, তার স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে ওর চোখেমুখে। একটা জীবন্ত বিভীষিকা, সর্বস্ব পিছনে ফেলে নিঃসঙ্গ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে এক হতভাগিনী। সামনে ধূ-ধূ করছে আদিগন্ত মরুভূমি। ছায়া নেই, আশ্রয় নেই, সাহস সান্ত্বনা পাবার প্রত্যাশা করা নির্লজ্জ বাতুলতা।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ির ভেতরে নজর ফিরিয়ে আনলে গৌরী। নত চোখে বললে, "হাতে-মুখে জল দিয়ে এবার কিছু মুখে দাও।"

তথাস্তু। এতটুকু তাগিদ ছিল না কিছু মুখে দেবার, তবু এক গেলাস জল নিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মুখে-হাতে দিলাম। তারপর এক গেলাস জল ওর হাতে দিয়ে বললাম—"তুমিও ধুয়ে ফেল হাত-মুখ।"

গেলাসটা নিলে আমার হাত থেকে। জানালায় মুখ বাড়িয়ে জলটা থাবড়ালে মুখে মাথায়! ঘুরে বসে গেলাসটা রেখে বেনারসীর আঁচলে চোখ-মুখ মুছতে লাগল। মোছা তার শেষ হয় না, আঁচল আর নামাতে পারে না চোখের ওপর থেকে। অনেকক্ষণ পরে যদিও বা নামালো আঁচল, কিন্তু মুখ আর তুলতে পারে না। নত চোখে কম্পিত হাতে হাঁড়ির ঢাকা খুলতে গেল।

হাত চেপে ধরলাম। বললাম—"থাক এখন ওটা গৌরী। খিদের জ্বালায় এখনই আমরা কেউ মরে যাব না।"

হাত সরিয়ে নিয়ে রক্তবর্ণ ফোলা চক্ষু দু'টি তুলে একবার ও তাকালে আমার দিকে। তারপর আবার গাড়ির বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল। আরও অনেকক্ষণ পরে বুড়ো-বুড়ী দু'জনেরই নাক ডাকতে লাগল। তখন গৌরীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—"ভাগ করে নাও গৌরী, ভাগ করে নাও আমার সঙ্গে তোমার ব্যথার বোঝা। আমারও কেউ নেই, কিছু নেই এই দুনিয়ায়। তবু বেশ স্বচ্ছন্দে বেঁচে আছি এতদিন। অনেক বড় পৃথিবীটা, অনেক আলো অনেক বাতাসের সঙ্গে মিশে আছে অনেক দুঃখ অনেক বেদনা এখানে। তার তুলনায় তোমার-আমার দু'জনের দুঃখ বেদনা কতটুকু?"

বাইরের দিকেই চেয়ে গৌরী ফিস্ ফিস্ করে বললে—"কিন্তু আজ যে তোমায় দেবার মত কিছুই নেই আমার। সর্বস্ব খুইয়ে এলাম যে, এখন তোমায় কি দিয়ে

সন্তুষ্ট করব আমি ?"

খুব জোর দিযে বললাম—"আছে গৌরী, নিশ্চয়ই আছে। এমন বহুমূল্য কিছু এখনও আছে তোমার কাছে, যা পেলে আমার সব পাওযার বড পাওয়া হবে।"

চোখ খুলে আশ্চর্য হযে চেয়ে রইল গৌরী আমার মুখের দিকে।

ওর চোখের ওপর চোখ রেখে খুব চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম—"দিতে পারবে তুমি ? দেবে আমায তুমি সে জিনিস গৌরী ? শুধু ভক্তি ভক্তি আর ভক্তি। ওই শুকনো জিনিস চিবিযে চিবিযে আমার গলা শুকিযে কাঠ হযে গেছে। ভয়-ভক্তি-ভালবাসা ও-সব এক জাতের জিনিস। ওতে আর আমার লোভ নেই। অন্য কিছু দাও তুমি আমায গৌরী, যা রক্ত মাংসে গড়া মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায় না কিছুতে।"

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে গৌরী—"কি সে জিনিস। কি চাও তুমি আমার কাছে ব্রহ্মচারী ?"

"অতি তুচ্ছ জিনিস গৌরী, তুচ্ছাতিতুচ্ছ তার নাম। প্রেম নয, ভালবাসা নয, রক্তমাংসের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই তার। কোনও কিছুর বদলেই কেনা যায না সে বস্তু। এই দুনিযায দুর্ভাগা দুর্ভাগীদের বুকের মধ্যে আছে সেই অমূল্য সম্পদ লুকানো। ভাগ্যবানদের ভাণ্ডারে মেলে না সে বস্তু।"

জানালার বাইরে ছিল আমাদের দু'জনের হাত। গৌরী আমার হাতখানা তার মুঠির মধ্যে চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল—"বল ব্রহ্মচারী, বল সে জিনিসের নাম ? দেবো, নিশ্চয়ই দেবো আমি, দেবো তোমায যা তুমি চাইবে আমার কাছে।"

"দাও তাহলে, দাও তোমার বিশ্বাসটুকু আমায। এই দুনিযায তুমি যে একা নও, তোমার ব্যথা বেদনার ভাগ নেবার জন্যে আর এক হতভাগাও যে রয়েছে তোমার পাশে, এই বিশ্বাসটুকু শুধু কর তুমি আমার ওপর। এর বেশি আর এতটুকু কিছু আমার দাবি নেই তোমার কাছে।"

গৌরী আরও জোরে চেপে ধরলে আমার হাতখানা তার মুঠির মধ্যে।

আকাশের আলো কমে আসছে। দূর গ্রামের গাছপালার মাথার ওপর আঁধার এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বাসায় ফিরে চলেছে পাখীরা।

সন্ধিক্ষণ।

দিবা-রাত্রির মহাসন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা হ'ল কি আমার ? সন্ধান পেলাম কি আর একটি প্রাণের ? গৌরী কি আমায় সত্যিই বিশ্বাস করতে পারলে ?

আঁধার ঘনিয়ে উঠছে, আঁধারের মধ্যে ছুটে চলেছে গাড়ি। ঐ আঁধারের মধ্যে

লুকিয়ে আছে আমার প্রশ্নের উত্তর।

সহজ নয়, রক্ত-মাংসে-গড়া প্রতিমাকে তুষ্ট করা সোজা নয়। রক্ত মাংসের সঙ্গে মিশে থাকে সন্দেহ, স্বার্থপরতা, ঘৃণা আর ক্ষুধা। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোহাই দিয়ে সে ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। মৃন্ময়ী প্রতিমার ক্ষুধা নেই, নিবেদিত নৈবেদ্যের সবটুকু ফিরে পাওয়া যায়, কিন্তু রক্ত-মাংসে গড়া প্রতিমার ক্ষুধা আছে। সে ক্ষুধাকে কতক্ষণ বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে তুষ্ট রাখা যাবে?

মানুষের অন্তঃপুরে অন্তঃকরণ নামে একটি রহস্যময় স্থান আছে, স্টীমারের অন্দরমহলে আছে তেমনি ছোট ছোট কেবিন। ছোট্ট একটি খাঁচার মধ্যে নিরালায় দু'টি মন বাঁধা থাকে, থরথর করে কাঁপতে থাকে চলন্ত স্টীমার। তার অন্দরমহলের অভ্যন্তরে কাঁপতে থাকে দুটি বুক। সেই কাঁপুনিতে হয়ত এক জোড়া বুকের কপাট খুলে যেতেও পারে। যত্রতত্র বুকের কপাট খোলে না, একটি মনের সঙ্গে অপর একটি মনের শুভদৃষ্টি হবার শুভলগ্ন সব সময় সর্বত্র আবির্ভূত হয় না। বিশাল নদীর বুকে ধক ধক শব্দের তালে তালে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চলে স্টীমার। এখন কারো অন্দরমহলের ছোট্ট কেবিনের মধ্যে হয়ত দু'টি অন্তঃকরণ জানতেও পারে দু'জনের অন্তঃপুরের রহস্য।

কেবিনের দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গৌরী। এক পা দরজার ভেতরে দিয়েও আবার টেনে নিলে, যেন ভেতর থেকে কে ওকে বাধা দিলে ঢুকতে। এক হাতে টিফিন [illegible] আর এক হাতে জলের কেটলি নিয়ে আমাকেও থামতে হ'ল ওর পিছনে।

বললাম—"কি হ'ল আবার থামলে যে?"

মুখ ফিরিয়ে কেমন অসহায়ভাবে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল গৌরী। নিমেষের মধ্যে বুঝতে পারলাম ওর চোখের ভাষা। বরফের মত ঠাণ্ডা শাণিত একখানা ছুরির ফলার অগ্রভাগ ঠেকল আমার পাঁজরায়। একটুকু অসাবধান হলেই ফলাখানা সম্পূর্ণ ঢুকে যাবে আমার বুকের মধ্যে।

হেসে ফেললাম হো হো করে। বললাম—"এবার তোমার মাথাটাই না বিগড়ে যায়। ছেলেমানুষ বুদ্ধি তো, এটুকু আর মাথায় আসছে না যে দরজাটা বন্ধ না করলেই চলবে। আমাদের কাছে কিছু নেই যা পেতে বাইরে বসা যাবে। ভেতরে চল, জল টল খেয়ে বাইরে এসে, খাবার ঘর থেকে দু'খানা চেয়ার টেনে বসে, নদী দেখতে দেখতে আরামে খাওয়া যাবে।"

একটু যেন লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। তাড়াতাড়ি কেবিনের মধ্যে ঢুকে আমার

হাত থেকে মিষ্টির হাঁড়িটা নিলে। জলের কেটলিটা কেবিনের দরজার ওপাশে নামিয়ে রেখে বললাম—"দাও এবার কিছু পয়সা, চায়ের কথা বলে আসি।"

টাকার থলিটা যে ওর জামার মধ্যে রয়েছে সে কথা ভুলে বসে আছে। হাঁ করে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বললাম—"নির্ঘাত গোলমাল হয়েছে তোমার মাথায়, থলিটা যে জামার মধ্যে রেখেছ, তাও মনে পড়ছে না?"

এবার অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল গৌরী। তাড়াতাড়ি জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে থলিটা টেনে বার করলে।

"কত দোব?"

"যা হয় দাও, চা আনাই আর অন্য কিছু যদি পাওয়া যায়। সিগারেটও নেই।"

একখানা নোট বার করে দিলে আমার হাতে। ছুটলাম স্টীমারের দোকানে। যে কোনও উপায়ে ওর চোখের আড়াল হতে পারলে বাঁচি। আলোকোজ্জ্বল ছোট্ট কেবিনটার মধ্যে দু'পাশে দু'টি বিছানা ধপধপে সাদা চাদর দিয়ে মোড়া। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরের যেটুকু নজরে পড়েছিল তাই যথেষ্ট। কি দুর্নিবার আকর্ষণ সেই ছোট ঘরটির! কি অপরিমেয় প্রলোভন সেই বিছানার! কি ভয়ংকর অসহ্য শীতলতা গৌরীর চোখের দৃষ্টির! বিশ্বাস আমায় করেছে গৌরী। এতটুকু ভেজাল নেই সে বিশ্বাসে। বিশ্বাস করেছে সে যে, আমি একটা রক্ত-মাংসে-গড়া জীবন্ত মানুষ। জীবন্ত মানুষের প্রাপ্য সম্মানটুকু সে আমায় দিয়েছে।

সেকেণ্ড ক্লাসের গণ্ডির বাইরে দরাজ তৃতীয় শ্রেণীর এক কোণায় তৃতীয় শ্রেণীর চায়ের দোকান। চা-পান-বিড়ি-সিগারেট, মুড়ি মিছরি, খাবার-দই মিষ্টি সব কিছু পাওয়া যায়। আগে এক প্যাকেট সিগারেট নিলাম। একটা ধরিয়ে কষে গোটা কতক টান দিতে যক্ষডের রুক্ষ মগজ গরম হয়ে উঠল। তখন এক কাপ চা নিয়ে বসে পড়লাম একখানা টিনের চেয়ারে। প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে শোনা গেল স্টীমারের বাঁশির কান ফাটা চিৎকার। অতবড় স্টিমারখানার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। যাত্রীদের মধ্যে কলহ কচকচি বেশ থিতিয়ে এল। দূর থেকে দ্রুততালে ঝপ ঝপ আওয়াজ আসতে লাগল। ক্রমাগত পিছিয়ে যেতে লাগল কতকগুলি বাতির মালা। চাঁদপুরের মাটি আর নবমীর চাঁদ একদৃষ্টে চেয়ে রইল স্টীমারখানির দিকে।

আর এক কাপ চা নিলাম। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ আরাম করে বসলাম। অন্ধকার নদীর বুকে ধক ধক আওয়াজ তুলে ছুটে চলল স্টীমার। কোথায় চলল? কোথায় চলেছি আমি? কোথায় শেষ হবে এ যাত্রার?

বহুদিন আগে।

কতদিন আগে তার সঠিক হিসেব নিজেও স্মরণ করতে পারি না এখন। মনে হয়, যেন এ জন্মের আগের জন্মে ঘটেছিল ঘটনাটা। একদা এই রকম চাঁদপুর থেকে স্টীমার ছেড়েছিল একখানা। একটি চৌদ্দ পনেরো বছরের ছেলে চলেছিল সেই স্টীমারে। দাদার সঙ্গে চলেছিল ছেলেটি কলকাতায়। ভূমিষ্ঠ হয়ে যে গ্রামখানির আলো বাতাসে তার চোদ্দটা বছর কেটে গেল, সে আলো বাতাসে আর কুলালো না! বিশাল বিশ্বের অনন্ত আকাশ তখন হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়েছে ছেলেটিকে। আপন সন্তানকে কোলে আর ধরে রাখতে পারলে না গ্রাম। কাঁদতে কাঁদতে ছেড়ে দিতে হ'ল।

সেই সে যাত্রার শুরু।

স্টিমারের চায়ের স্টলের সামনে টিনের চেয়ারে দাদার পাশে বসে চা খেয়েছিলাম। জীবনের সেই প্রথম চা-পান। মিষ্টি-তেতো গরম জল গলা দিয়ে নামছিল আর অকারণ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলাম। বাঁধন ছেঁড়ার ছন্নছাড়া ছন্দে তখন নাচছে বুকের রক্ত, চোখের সামনে জ্বলছে রামধনু রঙের ফুলঝুরি। অজানা অচেনা দুনিয়ার দুন্দুভি-নিনাদ সেই প্রথম শুনেছিলাম কানে। তখন নিজের কাছে নিজেও ছিলাম অজানা অচেনা। সেই না চেনা নিজেকে নিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজও তার সমাপ্তি হ'ল না। এখনও পৌঁছাতে পারলাম না সঠিক ঠিকানায়। এখনও শুধু ঘুরে মরছি।

কিন্তু সেদিনের সেই অকারণ পুলক কবে অন্তর্ধান করেছে। তার বদলে এখন অঝোরে বর্ষণ হচ্ছে মাথার ওপরে—অকারণ দুঃখ, লাঞ্ছনা আর অপমান। পাশ কাটিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি নিজেকে নিয়ে। বেঁচে থাকার দায়িত্বটুকুকে ফাঁকি দিয়ে টিকে থাকার সাধনা চলেছে এখন। বড় বেশি করে চিনে ফেলেছি নিজেকে, বড় নির্মমভাবে নিজেকে নিজে বুঝে ফেলেছি।

এই যে তেতো-মিষ্টি গরম জল গলা দিয়ে নামছে, এ তেতোও লাগছে না, মিষ্টি তো নয়ই। আর গরম? গরম হবার মত আর কোনও কিছুই এখন জোটে না জীবনে। শরীরের রক্ত শীতল হিম হয়ে জমে বসে আছে অনেক আগে।

একদা এই চাঁদপুর থেকে যে যাত্রায় শুরু হয়েছিল, তার চরম পরিণতি ঘটেছে একটি পোড় খাওয়া পাকা ঝানু ফক্কড়-জীবনে। গৌরী ভুল করলে, অনর্থক ভয় পেলে, ফক্কড় আর যাই করুক, ভুলেও কাঁধ পেতে দায়িত্ব নেবে না কিছুর! সর্বরকমে দায়িত্বশূন্য জীবনই ফক্কড়-জীবন। জীবন একে কিছুতেই বলা চলে না

—বলা উচিত জীবন্ত সমাধি।

একে একে অনেকে এসে দাঁড়ালো সামনে। সারা জীবনটা গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেলাম, শোনালাম নিজেকেই। অবিরাম আত্মবঞ্চনার একটি সকরুণ ইতিহাস। জীবনের আলো হাতের মুঠোয় ধরা দিতে সেধে এসেছে বারবার, সভয়ে হাত টেনে নিয়েছি হাতে আঁচ লাগবার ভয়ে। তারপর না পাওয়ার পরম তৃপ্তিতে চেখে চেখে লেহন করেছি বঞ্চিতের ব্যথাটুকু। এই-ই ঘটেছে জীবনে, এই-ই ঘটেছে বারবার। দাবি করার সাহসের অভাবে চাবি হাতে পেয়েও মণি-কোঠার দরজা খোলা হ'ল না আমার।

আজও দরজার বাইরে থেকেই ফিরে আসতে হ'ল। ফিরে এসে শুধু কাপের পর কাপ তেতো মিষ্টি গরম জল গিলছি আর ধোঁয়া ছাড়ছি। অথচ কি অকল্পনীয় অস্বাভাবিক একটা কিছু প্রত্যাশা করেছে গৌরী আমার কাছ থেকে। মরা মানুষের কাছ থেকে সে জীবনের ডাক শোনার ভরসা পেয়েছে। বহুদিন পরে ফক্কডের জমাট রক্তে সামান্য দোলা লাগল। তাহলে এখনও আমাকে মানুষ বলে চেনা যায়? এই শতধা-বিদীর্ণ চর্ম-ঢাকা যে 'আমি'টি এখনও চলে ফিরে বেড়াচ্ছে তাকে অনর্থক অযথা সম্মান দিয়েছে গৌরী। শুধু এই জন্যেই বাকী জীবনটুকু বিনামূল্যে বিক্রি করে দিতে পারি আমি ওর পায়ে।

হঠাৎ মনে পড়ে আর একজনের কথা।

প্রায়-শেষ-হয়ে আসা উপন্যাসখানির অনেকগুলো পাতা তাড়াতাড়ি উল্টে গেলাম। পিছন দিকে হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে খুঁজে বার করতে হবে। সেও যে দিয়েছিল আমায়, শুধু সম্মান নয়, আরও অনেক কিছু সে উজাড় করে দিয়েছিল আমার নামে। মানুষের যা প্রাপ্য, তার সবটুকুই আমি পেয়েছি তার কাছ থেকে। সে হতভাগীর ভুলের পূজা ব্যর্থ হয়ে গেল, ভাগ্যের পরিহাসে একজনের নামে নিবেদিত নৈবেদ্য আর একজন চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল। আজও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সেই ব্যর্থ পূজার ফল বুকে নিয়ে। আজও সে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে যে, একদিন তার মেয়ের জন্মদাতা ফিরে আসবেই তার কাছে।

যদি তাই হয়? আর একবার যদি দাঁত বার করে হাসে তার নিষ্ঠুর নিয়তি? যদি কোনও কালে সে জানতে পারে তার মেয়ের বাপের আসল পরিচয়? যার ছবি বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে সে বেঁচে আছে, সেই মানুষটি তার মেয়ের জন্মদাতা নয়? সেই মর্মান্তিক সত্যটুকু জানবার আগেই যেন তার মৃত্যু হয়। যাবার বেলা সে যেন তার একমাত্র অবলম্বন মিথ্যেটুকুকেই আঁকড়ে ধরে। পার হয়ে যেতে পারে।

ভুল-ভ্রান্তি, মিথ্যে-নকল আর জাল নিয়ে কারবার। সারা জীবনে ঐসব জঞ্জাল জমিয়ে জমিয়ে এক বিরাট অট্টালিকা গড়ে তুলেছি হাওয়ার ওপর। দায়-দায়িত্বকে এড়িয়ে চলার হীন প্রবৃত্তি, নিজের সঙ্গে ছল, চাতুরী আর জুয়াচুরি, এই সম্বল করেই কাটিয়ে দিলাম জীবনটা। জীবনদেবতা অকৃপণ হস্তে ঢেলে দিয়েছেন যা-কিছু কামনার ধন, সোনার কাঠি হাতের মুঠোয় পেয়েছি। নিতে পারিনি, ধরে রাখতে পারিনি হাতে। নিজেই নিজের সব চেয়ে বড় শত্রু, এর চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি আছে?

সজোরে একটা নাড়া দিলাম মাথাটায়। নাঃ, আর কোনও লোভেই ঠকাব না নিজেকে। যা আমার প্রাপ্য, তার ষোল আনা সুদে-আসলে আদায় করে নিয়ে তবে ছাড়ব।

গেঞ্জি পরা তোয়ালে কাঁধে ঝাড়ুদার এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

"হুজুর—আপকো সেলাম দিয়া মাঙ্গা।"

চমকে উঠলাম। বেশ একটু লজ্জিত হলাম। গরদের জোড় পরা উঁচু ক্লাসের যাত্রী একজন তৃতীয় শ্রেণীর চায়ের দোকানের সামনে টিনের চেয়ারে বসে এক পাটার ওপর চা খাচ্ছে আর সিগারেট ফুঁকছে। দোকানের লোকেরা আর অন্য সব যাত্রীরা হাঁ করে চেয়ে দেখছে চুল দাড়িওয়ালা আশ্চর্য জীবটিকে। ছি ছি ছি। এতটা বেহুঁশ কখনও হয় মানুষ! গৌরী এখনও জল মুখে দেয়নি। নাঃ, সত্যিই আমি মানুষ নই।

সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছিল দোকানে। এক ঠোঙা নিলাম। এক কেটলি চা আর দু'জোড়া কাপ ডিশ পাঠাতে বলে ছুটলাম ঠোঙা হাতে কেবিনের দিকে। যাক্, সিঙ্গাড়াগুলো যে পাওয়া গেল তাই রক্ষে। বলব—এগুলো ভাজিয়ে আনতে এতটা দেরি হয়ে গেল।

কেবিনের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। দরজা বন্ধ, কেবিনের মধ্যে কার সঙ্গে কথা বলছে গৌরী। কোন্ আপদ এসে জুটল আবার এর মধ্যে?

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলাম।

"আপনাকে নিয়ে গোসাঁই যখন স্টীমারে উঠছিল, তখন আমি দাঁড়িয়েছিলাম ওপরে। তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনারা যে ঘর পেয়েছেন তা তো—"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে গৌরী—"তোমার আপনার লোকদের কাছ থেকে তুমি পালাতে গেলে কেন?"

গোসাঁই আমাকে পালাতে বলেছিল। যখন গোসাঁই নিয়ে আমি আমাদের বাড়িতে যাচ্ছিলাম, তখন পথে আমাকে বলেছিল ওদের কাছ থেকে পালাতে।

আবার যখন ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাই, তখনও একবার বলেছিল ওদের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে। চট্টেশ্বরীর দরজার পাশে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল গোসাঁই। কিন্তু তার আগেই আমি পালিয়ে এসেছিলাম গোসাঁইয়ের কাছে। রাত থাকতেই আমি পালাই! ভোর বেলা গোসাঁইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম যখন তখন আর গোসাঁই আমায় চিনতে পারলে না। এই ধুতি আর এই চাদর হাতে দিয়ে দূর করে দিলে। তারপর আমায় পুলিশে ধরলে—"

রাগে ফেটে পড়ল গৌরী—"কেন তোমায় দূর করে দেবে? দূর করে দিলে আর তুমি অমনি চলে গেলে? কেন গেলে? কেন ছেড়ে দিলে তাকে? তাড়িয়ে দিলেই অমনি চলে যেতে হবে? ওর যা খুশি তাই করবে কেন? কি মনে করে ও আমাদের? আমরা কি মাটির পুতুল যে, ওর খেলা শেষ হলেই ও আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে? কেন তোমরা ছেড়ে দাও ওকে? কেন ওর এত বড় স্পর্ধা?"

অপর পক্ষ ভীতিজড়িত কণ্ঠে বললে—"তা কি করে জানব ঠাকরুন? ওনারা গোসাঁই মোহান্ত মহাপুরুষ। ওনাদের মনের কথা আমরা ছোটলোক জানব কেমন করে?"

আরও তেতে উঠল গৌরীর গলার স্বর।

"ওঃ—ভারি আমার গোসাঁই মহাপুরুষ রে! সাধু হয়ে শুধু ঐটুকুই শিখেছেন! আর যখন যার খুশি সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছেন। থাকবার মধ্যে আছে সর্বনেশে চক্ষু দু'টি। যে হতভাগী পড়বে ঐ সর্বনেশে চোখের দৃষ্টিতে তাকেই জ্বলতে হবে সারা জীবন। কোনও বাদ-বিচার নেই, তোমার মত মেয়েকেও ও বাদ দেয় না! পথের কাঙালিনীর ওপরও ওর নজর পড়ে! এতদূর নেমে গেছে সে! কারও সর্বনাশ করতেই ওর আটকায় না। কিছুতেই ওর অরুচি নেই এখন। কাশীতে সকলে ওকে ভয় করত যমের মত। সবাই জানত, ওর মত বশীকরণ করবার ক্ষমতা আর কারও নেই। সেই লক্ষ্মীছাড়া ক্ষমতাটুকু নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছেন সকলের বুকে। যাক্, তোমার বরাত ভাল যে, আবার তুমি ওকে ধরতে পেরেছ। কিছুতেই আর ছাড়বে না, যেভাবে হোক ওকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর যেন ও কাউকে ঠকাতে না পারে, আর কোনও হতভাগীর সর্বনাশ না করতে পারে ঐ চোখ দিয়ে!"

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল। হচ্ছে কি? মাথাটা সত্যই খারাপ হয়ে গেল নাকি গৌরীর? উপোসে আর দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে গেছে একেবারে!

কিন্তু ও আপদ আবার জুটল কোথা থেকে?

দরজায় ঘা দিলাম।

"দরজা খোল গৌরী। হাত পুড়ে গেল এধারে।"

খুলে গেল দরজা। হাসিতে মুখখানি বিকৃত করে তরল কণ্ঠে বলে উঠল গৌরী—"তবু যা হক, এতক্ষণে মনে পড়ল দাসীর কথা।"

থতমত খেয়ে বললাম, "এই সিঙ্গাড়াগুলো ভাজাতে একটু—"

"না না, একটুও দেরি হয়নি। দেরি হয়েছে বলে কি মরে গেছি নাকি আমি?"

ঠোঙাটা নিলে আমার হাত থেকে। তারপর চোখ দু'টিতে একটা ভারি বিশ্রী সংকেত ফুটিয়ে আহ্বান করলে আমাকে।

"এস, ভেতরে এস। দেখবে এস কে এসেছে তোমার কাছে।"

যেন একটা চড় খেলাম গালে। ওর চোখে আর গলার সুরে যে ইঙ্গিতটুকু প্রকাশ পেল, তাতে সর্বশরীর রি রি করে জ্বলে উঠল আমার। ভাবলে কি ও আমাকে?

কেবিনের মধ্যে কাঠ হয়ে দাড়িয়ে আছে সেই স্ত্রীলোকটি। বিশ্বের ভয় তার দুই চোখে। আরও রুক্ষ আরও করুণ হয়ে উঠেছে তার মূর্তি।

তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম—"আবার এখানে এসে জুটলে কোথা থেকে?"

জবাব দিলে গৌরী—"তোমায় খুঁজতে খুঁজতে এল গো। টান আছে বলেই ধরতে পারলে শেষ পর্যন্ত।"

আগুন জ্বলে উঠল আমার মাথার মধ্যে। দাঁতে দাঁত চেপে যতদূর সম্ভব চাপা গলায় তাকেই হুকুম করলাম—"বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।"

এবার তাকে আড়াল করে দাঁড়াল গৌরী।

"ইস, অত রাগ কেন? তুমি যে একজন পাকা ব্রহ্মচারী, তা কি আর আমি জানি না। ও যাবে না। ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসবার পরামর্শ দিতে গিয়েছিলে যখন, তখন এ রাগ ছিল কোথায় তোমার? কেন যাবে? কোথায় যাবে ও এখন? লজ্জা করে না তোমার ওকে তাড়িয়ে দিতে? কার জন্যে ও ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে?"

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। ব্যঙ্গ করছে না তো আমাকে। না তা নয়, হিংস্র উল্লাস নাচছে ওর চোখে। এবার বেশ ধীরে সুস্থে ওজন করে বলতে লাগল গৌরী, "এই খেলা খেলবার জন্যেই তো তুমি সাধু হয়েছ। সুযোগ সুবিধে পেলে কোনও কিছুতেই তোমার অরুচি নেই। কোনও মেয়ের সর্বনাশ করতে যাবার সময় মনে থাকে না যে, তার ভার বইতে হবে। সবাইকে ফাঁকি

দিয়ে পালানো যায় না ব্রহ্মচারী, এবার আর কিছুতেই তা হতে দোব না আমি। এ বেচারা একটা গাঁয়ের মেয়ে, ওদের বোষ্টমদের ঘরে চিরকাল শান্তিতে কাটাতো আর ভিক্ষে করে খেতো। কেন তুমি ওর সর্বনাশ করতে গেলে? কেন তোমার বিদ্যে ফলাতে গেলে ওর ওপর? তোমার ঐ পোড়া চোখের দৃষ্টিতে যে পড়বে, তারই তুমি মাথা খাবে কেন? ওকে দেখেও তোমার লোভ হ'ল? ছিঃ!"

গৌরীর পিছন থেকে কি যেন বলতে গেল স্ত্রীলোকটি। এক দাবড়ি দিয়ে তাকে থামালে গৌরী। এক নিঃশ্বাসে বলে গেল আমায়, "ও আর আমি দু'জনে থাকব কেবিনের মধ্যে। তুমি বাইরে থাকবে। ওর টিকিট বদলে নিলেই চলবে।"

তারপর হঠাৎ ওর কণ্ঠে উথলে উঠল দরদ আর মিনতি।

"ওকে আর দূর করে দিও না ব্রহ্মচারী। আর পাপে ডুবিও না নিজেকে। নিজের কথাটাও একটু ভাবো। এভাবে মেয়েদের পথে বসিয়ে নিজে সাধু সেজে চিরকাল মজায় কাটিয়ে গিয়ে পরকালে কি জবাব দেবে তুমি? এতটুকু পরকালের ভয় হবে না তোমার?"

কাপ ডিশ কেটলি হাতে স্টলের ছোকরা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাত থেকে নিলাম সেগুলো। তারপর অতি কষ্টে সামলে ফেললাম নিজেকে। একটু বোকা বোকা হাসি ফুটিয়ে তুললাম মুখে।

"বেশ তো, থাকো না তোমরা দু'টিতে কেবিনের মধ্যে। তোমার তো একজন সঙ্গী হ'ল। এখন ধরো এগুলো, চা টা খাও তোমরা। আমি বরং স্টলে বসেই কিছু খেয়ে নি।"

সামান্য একটু সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল গৌরী। বোধ হয় ঠাওরাবার চেষ্টা করলে আমার মনের মতলবটা। কিংবা একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল, তার সব ক'টা বিষাক্ত শর ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে। তবু আর একবার শেষ চেষ্টা করলে আমার মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করবার।

"কোথায় যে তুমি নেমে গেছ ব্রহ্মচারী তা তুমি নিজেও জান না। ছি ছি ছি, কার স্বপ্ন বুকে করে আমি কাটিয়েছি এতদিন।"

ওর বুক খালি করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চায়ের কেটলি, কাপ, ডিশ নামিয়ে দিয়ে কেবিন থেকে হাসি-মুখে বেরিয়ে এলাম।

স্টীমারের রেলিং ধরে দাড়িয়ে আছি।

রাত কত হ'ল?

কাল ঠিক এমন সময় নির্জন মাঠের মধ্যে খোয়া-ওঠা রাস্তার ওপর দিয়ে

একজনের হাত ধরে হাঁটছিলাম। ঐ চাঁদ তখন পশ্চিম দিকে নেমে যাচ্ছিল।

আর আজ?

ঢং ঢং টিং টিং নানা জাতের আওয়াজ উঠল ইঞ্জিন ঘরে। স্টিমারের বাঁশি থেমে থেমে ডাক দিচ্ছে কাকে!

একখানা বড় নৌকা এসে লেগেছে স্টিমারের গায়ে। মাল উঠল, স্টিমার থেকে কয়েকটি মেয়েপুরুষ নেমে গেল নৌকায়।

তাদের পিছন পিছন আমিও।

অন্ধকারের বুকে ভেসে যাচ্ছে তরণী। আশা-আনন্দে-গড়া মিথ্যা মরীচিকা ভেসে যায় ঐ আলোর তরণীতে।

নৌকার ওপর বসে স্পষ্ট দেখা গেল পিছন দিকে বন্ধ কেবিনগুলোর দরজা।

বন্ধ দরজার বাইরে আমার স্থান।

নিবিড় অন্ধকার।

ঐ অন্ধকারের মাঝে ধরণীর বুকে নেমে যেতে হবে নৌকা থেকে।

ফক্কড়-তন্ত্রের সব চেয়ে কড়া অনুশাসন, ফক্কড় কখনও ঝপ্পড় বাঁধে না।

ঝপ্পড় বেঁধে তার তলায় মাথা গুঁজে থাকলে সে আর তখন ফক্কড় থাকে না।

নৌকা এসে ঠেকল মাটিতে।

মাটিতে পা দিলে ফক্কড়।

চির-বশীভূতা জননী মাটির ধরণী। ঘৃণা-সন্দেহ করে না কখনও ফক্কড়কে। মাটির সন্তান ফক্কড়। মাটির বুকে ঘুরে বেড়ায় চিরকাল। ঘোরা শেষ হলে মাটির বুকেই লুটিয়ে পড়ে একদিন।

কলিতীর্থ কালীঘাট

জননী

প্রভাবতী দেবীর শ্রীশ্রীচরণকমলে

আশা তৃষ্ণা জুগুপ্সাভয়বিশদঘৃণামানলজ্জাভিষঙ্গাঃ।
ব্রহ্মাগ্নাবষ্টমুদ্রাঃ পরসুকৃতিজনঃ পচ্যমানঃ সমন্তাৎ॥
নিত্যং সংখাদয়েত্তানবহিতমনসা দিব্যভাবানুরাগী।
যেহসৌ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে পশুগণ বিমুখোরুদ্রতুল্যো মহাত্মা॥

আশা তৃষ্ণা গ্লানি ভয় ঘৃণা মান লজ্জা এবং আক্রোশ এই অষ্টমুদ্রাকে
ব্রহ্মজ্ঞান অগ্নিতে অতি সাবধানে পাক করে যিনি ভক্ষণ করেন—সেই
দিব্যভাবাপন্ন মহাসাধকই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড মধ্যে পশুপাশবিমুক্ত সাক্ষাৎ রুদ্রসম মহাত্মা

সবই গরল।

সবই গরল।

সবই গরল।

ঘুরছে। ঘুরে ঘুরে এগিয়ে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার ঘুরে আসছে। গরল নয়, কিন্তু সুধাও নয়, ছাগশিশুর কণ্ঠে অন্তিম আকৃতি।

এ গলি ও গলি সে গলি নয়, একই গলি। ইট-বাঁধানো অন্ধকার গলিটা সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পড়ে আছে। দিনের আলো যায় না, রোদও পৌঁছয় না, আকাশের ছোঁয়া লাগে না।

মহামায়া কালী ভগবতী, ও সবই ত এক। একটা গলিকেই ভাগ ভাগ করে তিন নামে ডাকা হয়। দুপাশের একতলা দোতলা তেতলা বাড়ীর দরজা জানালা সব বন্ধ। গলির প্যাঁচের মুখে মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক একটা এক-চোখো দৈত্য। মুখ উঁচু করে দেখলে দেখা যায়, সেই একটা চোখ, যে চোখে আলো নেই, আগুন নেই, আছে শুধু একটা ফ্যাকাশে দীপ্তি। কোনই লাভ হয় না তাতে, গলিগর্ভের আঁধার ঘোচে না একটুও। তাই কেঁদে মরে একটা সুর প্রতি রাতে, সেই গলির মধ্যে।

“দেবার মত অবিরত আছে শুধু নয়নজল।
জানাই তোরে ওমা শ্যামা আর যা আছে সবই গরল॥”

ওরা সব ঐদিকেতেই থাকে।

ওরা হল তীর্থবাসীর দল।

ওরা তাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শোনে, “আব যা আছে সবই গবল।”

তীর্থবাসীরা ঘুমায়, ঘুমায় তাদের মা কালীও।

সারাদিনের হৈ-হুল্লোড় খেয়োখেয়ি খেচাখেচি, না-ধোয়া শালপাতার ঠোঙায় পিণ্ডি-চটকানো কাঁচাগোল্লার ভোগ খাওয়া, সে কাঁচাগোল্লার ছানা ক্ষীর যে কোন জীবের দুধ থেকে বানানো তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী মা নিজেও জানেন না। তবু সে ভোগ খেতে হয় মাকে। ভোর থেকে রাত দশটা এগারটা বারটা পর্যন্ত সমানে চেখে যেতে হয় সেই পিণ্ডি-চটকানো সন্দেশ। নয়ত ওরা যে ঘুমোতে যাবে খালি পেটে।

ওরা যে ঐদিকেতেই থাকে।

ওরা যে তীর্থবাসীর দল।

ওরা যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শোনে,

"দেবার মত অবিরত আছে শুধু নয়নজল।
জানাই তোরে ওমা শ্যামা আর যা আছে সবই গরল॥"

জড়িয়ে জড়িয়ে গাইছে। গাইছে, আর ঘুরে বেড়াচ্ছে গলিতে গলিতে। দুপাশের বাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ, বন্ধ দরজা জানালার ওধারে যারা ঘুমিয়ে আছে, তারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বলে দিতে পারে, কে গাইছে ও গান। শুধু বলতে পারে না, কেন ও ওভাবে গান গেয়ে বেড়ায় সারা রাত। সারা রাত, মানে কালীর যখন রাত হয়, তখন। কালীর রাত হয় মহানিশা-অতিমহানিশায়। কালীর রাত হয় অনেক দেরীতে—

"দিবা চার্দ্ধপ্রহরিকা চাস্তন্তে পরমেশ্বরী।
ঋতুদণ্ডাত্মিকা তস্মাদ্ রাত্রিরুক্তা মনীষীভিঃ॥"

রাতের প্রথম আধ প্রহর আর শেষ আধ প্রহর রাতই নয়, দিবা। প্রথম আধ প্রহর পর, ছ দণ্ড হল রাত্রি। তারপরেও দশ দণ্ড হল, নিশা আর মহানিশা। নিশা মহানিশাকে বলে সর্বদা। তাতে সর্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়।

"সর্ব্বদা চ সমাখ্যাতা সর্ব্বসাধন কর্ম্মণি"

আধ প্রহর হল, দেড় ঘণ্টা, তারপর ছ দণ্ড হল, আরও দু ঘণ্টা চব্বিশ মিনিট। অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে অন্তত চার ঘণ্টা পার হয়ে গেলে তবে নিশা মহানিশা শুরু হয়। রাতের শেষ প্রহরের আগেই শেষ হয়ে যায় মা কালীর রাত। তাই মাঝ রাতেই শুনতে পাওয়া যায় সেই গান। এ গলি ও গলি সে গলি দিয়ে এগিয়ে আসে। সবাই জানে কে আসছে ও গান গাইতে গাইতে, সকলেই চেনে তাকে, সকলেই ওকে এড়িয়ে চলতে চায়। তাই মহানিশা ছাড়া ও মুখ দেখায় না কাউকে। কারণ মহানিশায় ওর মুখ-দর্শনের জন্যে কেউ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে না।

"জানাই তোরে ওমা শ্যামা
আর যা আছে সবই গরল॥"

দাঁড়িয়েছে এবার।

কালীর সামনে দক্ষিণ দিকের গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছে। গেট বন্ধ, ভেতরের নেপালী চৌকিদাররা চেনে ওকে। সবাই ওকে চেনে, কিন্তু ওর কাছে ঘেঁষতে

চায় না। ভেতরের চৌকিদাররা আরও ভেতর দিকে সরে যায়। ও দাঁড়িয়ে, লোহার গেটের ফাঁকে যতটা সম্ভব মুখটা গুঁজে দিয়ে বার বার শোনাতে থাকে,

"জানাই তোরে ওমা শ্যামা আর যা আছে সবই গরল।
দেবার মত অবিরত আছে শুধু নয়নজল॥"

তারপর ও আর ওর নয়নজল দূরে সরে যেতে থাকে। মায়ের বাড়ীর পুবে, কুণ্ডের ধারে আর একবার শোনা যায় ওর গলা, হালদার পাড়া লেনের ভেতর থেকে আবার শোনা যায়। ক্রমে মিলিয়ে যায় সেই কান্না। আর তখন কংসারি হালদার মশায় চুপি চুপি উঠে পড়েন তাঁর বিছানা ছেড়ে। এতটুকু শব্দ না করে চোরের মত পা টিপে টিপে নেমে আসেন নীচে। একটিও আলো জ্বালেন না, একজনকেও ঘুম থেকে ওঠান না, সোজা গিয়ে ঢোকেন কলঘরে। মিনিট পনেরোর মধ্যে হাত মুখ ধুয়ে নিঃশব্দে সদর দরজা খোলেন। সেখানে অন্ধকারে জামা পরে জুতো পায়ে দিয়ে রাস্তার দিকের দরজা খুলে বাইরেব রকে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর সদর ঘরের বাইরের দিকের দরজায় তালা দিয়ে নেমে পড়েন ইট-বাঁধানো গলিতে। রইল বাড়ীসুদ্ধ মানুষ ঘুমিয়ে। যখন ওঠে উঠবে, উঠে বেরিয়ে আসতে হয় কাউকে পথে, ত বেরবে সদর দরজা দিয়ে। সদর দরজা ত আর তিনি বন্ধ করে যাচ্ছেন না, বন্ধ থাকছে সদর ঘরের বাইরের দিকের দরজা। আর সদর ঘরে কেউ সাত-সকালে ঢুকতেও আসবে না।

কংসারি হালদার হাঁটা শুরু করেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা, কামাই নেই তাঁর ভোর রাতে হাঁটার। কিছুতেই নয়, আকাশ ভেঙে মাথায় নামলেও নয়। এক পথ, এক রকম চলা, একই দৃশ্য দেখা, মানে মনে মনে দেখা। দিনের পর দিন, মানে রাতের পর বাত, সমানে তিনি হাঁটেন। বর্ষায় মাথায় থাকে ছাতি, শীতে থাকে মাথায় এক ফালি গরম কাপড জডানো, আর হাতে এক গাছা পাকা বাঁশের লাঠি। মাথা পর্যন্ত নয়, কোমর পর্যন্ত উঁচু লাঠি একখানা, যার মাথাটা রুপো দিয়ে বাঁধানো। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময়ই লাঠিখানা হাতে থাকে তাঁর। তা হল বৈকি, প্রায় ত্রিশ বৎসর পার হতে চলল লাঠিখানার বয়েস, ত্রিশ বৎসর ওখানা চলেছে হালদার মশায়ের সঙ্গে শেষ-রাত ভ্রমণে। আগে কংসারি হালদার মশায় লাঠিখানা বয়ে নিয়ে যেতেন, এখন লাঠিখানাই ওঁকে টেনে নিয়ে যায়। হালদার মশায়ের হাত ধরে নিয়ে যায় লাঠিখানা, এ কথা বললেও বলা চলে। রোজ স্নান করার আগে তেল হাতটা দুবার লাঠিখানার গায়ে বুলিয়ে দেন তিনি, খুব যত্ন করে আদর করে তেলটুকু ঘষে দেন তিনি লাঠিখানার গায়ে। যেন ছেলের

গায়ে তেল বুলোচ্ছেন, তা ছেলেই ত, বলা চলে লাঠিখানাকে। এমন ছেলে, যে ছেলে বাপকে হাত ধরে নিয়ে যায় অন্ধকার রাতের মহানিশা থাকতে থাকতেই। পৌঁছে দেয় সেখানে। যেখানে দিনান্তে, না, না, দিনান্তে নয় নিশান্তে একটিবার না পৌঁছলে বাপের প্রাণে প্রাণ থাকে না। তাই ছেলে নিয়ে যায় বাপের হাত ধরে সেখানে। যাকে বলে অন্ধের যষ্টি, তাই হল ঐ লাঠিখানি হালদার মশায়ের কাছে।

কিন্তু কোথায় পৌঁছে দেয় তাঁকে।

পড়ে আছে সব মড়াখেকো মড়ারা।

রোজই যেমন পড়ে থাকে।

কাদায় ধুলোয় পাঁকে, গরু ঘোড়ার গোবরে, ছেঁড়া কলাপাতা পচা শালপাতা আর রাশীকৃত ন্যাকড়ায় সমস্ত পথ ছয়লাপ। ওর মাঝখান দিয়েই অতি সাবধানে কোনও কিছু না মাড়িয়ে পথ চলতে হয়। কংসারি হালদার মশায় জানেন, খুব ভাল করে জানেন যে, পথের এই জঞ্জালগুলো সজীব। ভাঙা ভাঁড় খুরি সবার ওপর পা পড়ে হালদার মশায়ের। সেগুলো মড় মড় করে ওঠে। তিনি ও মড়-মড়ানিতে ঘাবড়ান না। কিন্তু দৈবাৎ যদি পা পড়ে কোনও ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলির ওপর তাহলে মড় মড় করে উঠবে না বটে, কিন্তু ককিয়ে কেঁদে উঠবে হয়ত কেউ। মুখখিস্তি করতে লেগে যাবে হয়ত অনেকে। হাতে পায়ে দগদগে ঘা-ওয়ালা তেলেঙ্গী-গুলো আবার নোঙরা ছুঁড়ে মারে। রাতের নোঙরাটা ওরা পাশেই রেখে দেয় কি না, ভোর হলে ওদের সঙ্গী সঙ্গিনীরা এসে সেগুলো সরিয়ে নিয়ে গঙ্গায় দিয়ে আসে। ওরা যে কারও সাহায্য না পেলে নড়তে পারে না।

হালদার মশায় বাঁশের লাঠিটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘষে পথ করে চলেন। লাঠির মুখের ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলি ঠেকলে তিনি টের পান। তখন সাবধান হয়ে পা ঘষে ঘষে পাশ কাটান।

প্রথমে গলি থেকে বেরিয়ে মায়ের দক্ষিণ দিকের গেটের বাইরের আঙিনা। আঙিনায় পড়লে নাকই বলে দেয় কোথায় পৌঁছল। গেটের ভেতর থেকে পচা রক্তের গন্ধ বাইরে পর্যন্ত ছড়ায়। ওদিকটা ঐ রক্তের গন্ধে মাত হয়ে থাকে অষ্টপ্রহর। কম ত নয়, কোটি কোটি বলি হয়ে গেছে ওখানে। ধর, সেই রাজা মানসিংহের আমল থেকে। বলি অবশ্য শুরু হয়েছে সে আমলেরও আগের আমল থেকে। কম কথা ত নয়। একেবারে জলজ্যান্ত জাগ্রত মহাপীঠ যে! বলির

বলি তস্য বলি মহাবলি পর্যন্ত হয়ে গেছে। হালদার মশায়ের নাড়ী-কাটা ইস্তক ঐ ভ্যাপসা গন্ধ উনি নাকে শুঁকছেন। নাড়ী-কাটার আগে মায়ের পেটে থাকতেও শুঁকেছেন। তাঁর বাপ, বাপের বাপ, তস্য বাপের বাপের বাপও মায়ের পেটে বসে ঐ গন্ধ শুঁকেছেন। বড় পবিত্র গন্ধ ও জিনিসের। কংসারি হালদার এসে দাঁড়ালেন গেটের সামনে, বন্ধ গেটের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে ঠিক দেড় মিনিট বিড়বিড় করে কি বললেন। তারপর চললেন লাঠি ঠক ঠক করে। ঘুরলেন ডান দিকে, কয়েক পা এগিয়েই নামলেন নহবতখানার সামনে। সব ঠিকঠাক হয় রোজ, ভুল হবার জো কি! কম ত নয়, নাড়ী-কাটার পরদিন থেকে ঠিক না হলেও, অন্নপ্রাশনের পরদিন থেকে ঠিক এই পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন হালদার মশায়। কাজেই ভুল হবার জো কোথায়।

অন্নপ্রাশনের পরে অবশ্য বেশ কিছুকাল কারও কোলে চেপে ঘুরেছেন এ সব জায়গায়। এখন ঘুরছেন লাঠির ঘাড়ে চেপে। কাজেই অসুবিধের কিছু নেই। মুখস্থ, সবই মুখস্থ। আগাগোড়া সারা জীবনটাই একদম মুখস্থ কণ্ঠস্থ ঠোটস্থ হয়ে আছে হালদার মশায়ের। কাজেই ভুল হবে কি করে।

কিন্তু আরও বেশী সাবধান হতে হয়।

নহবতখানার সামনের পাথরের টালি-বাঁধান রাস্তাটার সবটুকু রাতের শয্যা কি না। মোটে ফাঁক থাকে না এতটুকু। তবে ওরা সবাই জানে কখন হালদার মশায় ওই পথ ব্যবহার করেন। লাঠির শব্দ উঠলেই একটু নড়েচড়ে সরে, কোনও রকমে এক ফালি পথ করে দেয় ওরা।

হালদার মশায় এগিয়ে চলেন। এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তাটা পার হন। তারপর ঢোকেন মায়ের ঘাটে যাবার পথে। সোজা এগিয়ে চলেন গঙ্গার ঘাটে।

গঙ্গা।

মরে গেছে। তা যাক, তবু গঙ্গা। এক সময় ত বেঁচে ছিল। যখন বেঁচে ছিল, তখন অনেক মড়ার নাভি আর অস্থি বয়েছে। এখন নিজেই গেল মরে। তা যাক, উদ্ধার হয়ে গেলেন মা গঙ্গা নিজেই। এতকাল সবাইকে উদ্ধার করতেন, এবার নিজে উদ্ধার হয়ে গেলেন। ভালই হল।

কাজেই কেওড়াতলার ঘাটটিও এবার গেল। হালদার মশায় মনে মনে হাসেন। কংসারি হালদার মশায়ের পিতা, দৈত্যারি হালদার মশায়ের তিন দিন কাটে গঙ্গার তটে। তাঁকে অন্তর্জলি করা হয়েছিল। মানে তিনি 'অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে অর্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে' অবস্থায় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেছিলেন। কংসারি

হালদার মশায় মনে মনে হাসতে লাগলেন। এখন যদি ঐরকম ভাবে মরবার সাধ হয় কারও, তাহলে তার অর্ধ অঙ্গ পুঁততে হবে মাটির মধ্যে। গঙ্গা ত শুকনো খটখট করছে। এক বিন্দু জল নেই কোথাও। এমন কি পচা পাঁক পর্যন্ত নেই।

খান দুই নৌকা সেই শুকনো ডাঙায় পড়ে আছে। মাড়িয়ে পার হতে হয়। ওপারের মাচায় একটা পয়সা দিতে হয়, পারানি। নয়ত অন্য যেখান দিয়ে মর্জি হয় হেঁটে পার হও। এক পয়সাও কেউ চাইবে না, পায়ে এতটুকু কাদাও লাগবে না।

পায়ে কাদা না লাগুক কিন্তু খেয়ার কড়ি ফাঁকি দিতে নেই। হালদার মশায় তা দেনও না কোনও দিন। লাঠি ঠুকে ঠুকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান। লাঠির মুখ দিয়ে ঠাওর করে দেখে নেন নৌকার কোণটা। তারপর ঠুক ঠুক করে নৌকা দুখানার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ান মাচার সামনে। পয়সাটা ঠিকই থাকে রোজ, ঠিক জায়গায়। বার করে মাচায় ছুঁড়ে ফেলতে একটুও সময় নষ্ট হয় না ওঁর। সময় নষ্ট হয় বর্ষাকালে, যখন একটু আধটু জল থাকে খালে, ভক্তি করে যাকে বলা হয়, আদি গঙ্গা। আদি গঙ্গায় জল থাকলে নৌকা দুখানা টলমল করে, তখন পা ঠিক রেখে পেরিয়ে আসতে একটু কষ্ট হয়, একটু সময়ও নষ্ট হয়।

তারপর এ গলি দিয়ে ও গলিতে গিয়ে পড়েন। বাঁ দিকে ঘুরে অল্প একটু হেঁটে ঠিক জায়গায় পৌছন। একটা ছোট জানালার গায়ে লাঠিটা ঠোকেন দু'তিন বার। জানালাটা অনেক উঁচুতে, প্রায় হালদার মশায়ের মাথা ছাড়িয়ে। তাই লাঠির নীচের দিকটা ধরে মাথার দিক দিয়ে ঘা দেন জানালায়। রোজই দেন।

জানালাটার ভেতর থেকে সাড়া আসে, "কে?"

"আমি।" হালদার মশায় বলেন শুধু, "আমি।" ব্যস, যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হল।

মিনিট দুয়েক আর কোনও সাড়াশব্দ নেই, এ পক্ষেও না ও পক্ষেও না। তারপর ডানধারের এক হাত চওড়া গলির মুখে দেখা দেয় একটা আলো। একজন বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় হালদার মশায়ের পাশে। তাঁর হাত ধরে বলে, "এস।"

হাত ধরে 'এস' না বললে হালদার মশায় নড়েন না একটুও। এমন কি নিঃশ্বেস পর্যন্ত ফেলেন না তিনি। এই হাত ধরা আর 'এস' বলার অপেক্ষায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

আর একবার শোনা যায় 'এস'। এই 'এস'টির সুরই অন্যরকম। এই দুটি অক্ষরের ছোট্ট শব্দটি শোনা যায়, যখন ঐ বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন হালদার

মশায়। তখন কিন্তু কেউ হাত ধরে না তাঁর। তখন লাঠি ঠক ঠক করেও চলতে হয় না তাঁকে। সেই সাত-সকালে যারা রাস্তার কলে জল নেবার জন্য বেরয়, তারা তাকে লাঠিখানা বগলে গুঁজে হনহন করে রাস্তা পার হতে দেখে ধারণাই করতে পারে না যে, আকাশে আঁধার থাকলে এই মানুষটিও আঁধার দেখে জগৎ। সন্ধ্যা পার হবার আগেই এঁর দুই চোখে এমন আঁধার ঘনিয়ে ওঠে যে, ইনি ওঁর ঐ লাঠির চোখ দিয়ে ছাড়া নিজের চোখে কিছুই দেখতে পান না।

নিশি পোহায়।

মিছরি মশাযরা গিয়ে মায়ের দরজার তালা খোলেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে মায়ের সাজসজ্জা করে দেন। ফলমূল দিয়ে আমান্ন নৈবেদ্য সাজান। পৌঁছে যান তখন ভট্‌চায মশায়ও। মায়েব নিত্যপূজা শুরু হয়।

সবই হাত চালিয়ে করতে হয় তখন। শান্তিতে ধীরে সুস্থে যে একটু স্নান করবেন বা জলটল খাবেন মা, তার ফুরসত কোথায়। সবাই এসে পৌঁছে গেছে কিনা ইতিমধ্যে। প্রতিটি মিনিটের মূল্য আছে। মিনিট জুড়ে জুড়ে হয় ঘণ্টা, ঘণ্টা জুড়তে জুড়তে হয় দিন। দিনটা আবার কিনে ফেলেছে একজন। নগদ টাকা দিয়ে কিনেছে। দয়াময়ী মা যদি মুখ তুলে চান, তবে কী-ই না হতে পারে। না হতে পারে কি? পাঁচশো টাকা দিয়ে পালা কিনলে, পাঁচ পাচে পঁচিশ হাজারই বা হতে কতক্ষণ।

অবশ্য হয় না তা কিছুতেই, হবার জো আছে নাকি কিছু হাভহাবাতের জ্বালায়। ঐ যে আদুড় গায়ে, কোমরে গামছা বেঁধে, গলায় এক গোছা পৈতে ঝুলিয়ে, কপালে ইয়া বড সিঁদুরের গুল লাগিযে, পোড়া কয়লার বর্ণ, গুচ্ছের পাকানো মূর্তি এসে ঢুকেছে মায়েব বাড়িতে, ঐ যে মাথার ওপর উঁচু করে ধরে রয়েছে সকলে ছোট ছোট চুপড়ি। ঐ যে ওধারে নাটমন্দিরে উঠে সব বসছে আসন বিছিয়ে, রক্ত-বস্ত্র পরা, গলায় মাথায় কোমরে হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের বিচি বাঁধা, লম্বা চুলো সাধক-পুঙ্গবের দল, যাদের অসাধ্য কর্ম কিছুই নেই এই দুনিয়ায়। মারণ উচ্চাটন বশীকরণ স্তম্ভন থেকে শুরু করে, রেসের ঘোড়ার নম্বর পর্যন্ত বলে দিতে পারে যারা মক্কেলকে। শুধু পারে না, নিজেদের অবস্থাটা একটু ফিরিয়ে রোজ মায়ের বাড়ি এসে তীর্থের কাকের মত মুখিয়ে বসে থাকার হাত থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে। এই সব এতগুলো হন্যে হাঙরের হাঁ করা গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যদি কিছু পড়ে মায়ের হাতে পায়ে গায়ে, তা কুড়িয়ে আর

কতই বা হয়। যা হয়, তা দিয়ে পালার খরচও ওঠে না। অনর্থক দিকদারি ভোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই পালাদার মশায়রা বেচে দেন পালা। যা মরগে যা, যা তোদের কপালে মা দেয়, কুড়ো গিয়ে। মায়ের সেবা পুজোর এতটুকু অঙ্গহানি না হয়, এই দেখাই হল আমাদের কাজ। ব্যস, এইটুকু যতদিন মা করাবেন, ততদিন করব। কে যাচ্ছে, মায়ের দরজার পয়সা কুড়োতে, যা নগদ পাওয়া যায় তাই ভাল। মায়ের সেবা পুজোয় লাগে বড় জোর একশ শোয়াশো টাকা, ওর ওপর যা মেলে তাই যথা লাভ।

তা পালা বেচে দিলেও নজর রাখতে হয় সব দিকে ওঁদেরই। আসলে ওঁরাই হলেন মায়ের সেবায়েত। ওঁরা ত ভুলতে পারেন না, ঐ হৈ হট্টগোল হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি খেয়োখেয়ির মাঝে মা কাউকেই চেনন না, জানেন না, কারও কথাই কানে তোলেন না। চেনেন শুধু নিজের সেবকদের, চৌদ্দ পুরুষে যারা মার নোকর, মা শুধু তাদেরই চেনেন জানেন। হঠাৎ কোনও কিছুর দরকার যদি হয় মায়ের, তাই যতক্ষণ মন্দিরের দরজা খোলা থাকে, নোকর বংশের কেউ না কেউ ঠিক হাজির আছেন মাযের বাড়িতে। ওঁরা মাকে স্পর্শ কবেন না সহজে, সে কাজ ঐ মিছরিদের। ওঁরা মাযেব পূজো কবেন না, সে কাজ ভট্চাযদেব। ওঁবা মায়ের ভোগ রাঁধেন না, তার জন্য লোক নিযুক্ত করে রেখেছেন, যারা রাত দশটা পর্যন্ত উপোস করে থাকবে। ওঁরা সত্যি কিচ্ছু করেন না, ওঁরা করান। আব যদি দৈবেসৈবে নিজেদের কোনও যজমান আসে মায়ের বাড়ী, এসে অন্য কোনও ঘড়েলের গ্রাসে না পড়ে খুঁজে বার করে ওঁদের, তখন সসম্মানে নিজেদের যজমানকে নিয়ে গিয়ে ঢোকেন মায়ের ঘরে। পূজা করান, অঞ্জলি দেওয়ান, মায়েব আশীর্বাদী হাতে দিয়ে যজমানকে বার করে নিয়ে আসেন মায়ের বাড়ী থেকে। যজমান মায়ের হাতে পায়ে কি দিল, না দিল, ফিরেও তাকান না সে দিকে। মায়ের বাড়ীর বাইরে এসে যজমান যদি কিছু প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে তবে তাই যথেষ্ট। ওঁরা যে মায়ের খাস সেবাযেত। ওঁরা কি ফেউ ফেউ করতে যাবেন না কি লোকের পেছনে!

ফেউরাও ততক্ষণে তৈরী হয়ে গেছে ফেউ ফেউ করার জন্যে।

ভেতরে এরা, বাইরে ওরা। সেই ন্যাকড়া-কানি-জড়ানো সজীব হাড়মাংসগুলো হন্যে হয়ে উঠেছে বাইরে! পুবে কালী টেম্পল রোডের শুরু থেকে রাস্তার দুপাশ জুড়ে থিকথিক করছে ওরাই। গড়াচ্ছে, কাতরাচ্ছে, কেঁদে কেঁদে লোকের নজর ফেরাবার মর্মান্তিক চেষ্টা করছে, রাস্তার পাশে পড়ে। যারা চলতে পারে, হাঁটতে পারে, তারা দৌড়চ্ছে মানুষের পিছু পিছু। ওদের আবার সীমানা ভাগ করা

আছে। যারা ঐ কালী টেম্পল রোডে পাহারা দেয়, তারা ছুটতে ছুটতে আসে হালদার পাড়া লেনের মুখ অবধি। আবার এধারের যাত্রী যারা ওধারে ফিরে যায়, তাদের পিছনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পৌঁছয় সদানন্দ রোডের মোড়ে। হালদার পাড়া লেনের মুখ থেকে আরম্ভ করে এক দলের চৌহদ্দি। ওরা ওদের শিকার ধরে, মায়ের বাড়ীর পুবদিকের কুণ্ডের পাড়ে আর উত্তর দিকটার সারা রাস্তাটায়। আবার কালীঘাট রোড হল আর একদলের সীমানা। তারা আবার নহবতখানার সামনের পথটুকুতে কিছুতে ঘেঁষতে পারে না। গঙ্গার ঘাটের রাস্তাগুলোয় যারা থাকে, তারা এদের কাউকে ওদিকে দেখলেই কামড়ে খেতে আসে। নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ভাগযোগ করে নিয়েছে। কাজেই বড় একটা কামড়াকামড়ি হয় না ওদের মধ্যে।

কিন্তু এদের মধ্যে তাও হয়।

কারণ এরা কোনও নিয়ম মেনে চলে না। ঘুরছে, হরদম টহল দিচ্ছে। হন্যে পশুর দৃষ্টি এদের চোখে, ঠিক চিনে ফেলছে প্রকৃত শিকার কোনটি। আর অমনি পাঁচজনে চিলের মত ছোঁ মেরে গিয়ে পড়ছে শিকারের ঘাড়ে। এদের সীমানারও সীমা পরিসীমা নেই। সেই ওধারে পোলের মুখে যেখানে কালীঘাট রোডের আরম্ভ, সেখানেও এরা আছে, কালীঘাট ট্রাম ডিপোতেও আছে, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটে আছে, ঘাটে ঘাটে আছে। কোথায় নেই এদের সজাগ শ্যেন দৃষ্টি। কোথায় না শুনতে পাওয়া যায় এদের করুণ কুণ্ঠিত মিনতি, "এই যে, দর্শন করবেন না কি। আসুন না এধারে, বেশ ভাল ব্যবস্থা রয়েছে।" কিংবা, "ডালা টালা কিছু নেবেন না কি মা। আসুন না এধারে, ভালভাবে দর্শন করিয়ে দিচ্ছি।" আবার ওরই মধ্যে যারা একটু বেশী চালাক, তারা দাঁত বার করেই এগিয়ে আসে, যেন কতদিনের চেনা-পরিচয়, "আসুন বাবু আসুন। সেই যে গতবার, আমিই আপনার কাজকর্ম করে দিলাম।" শিকার যদি সত্যিই শিকার না হয়, তাহলে গম্ভীরভাবে ওদের দিকে না তাকিয়েই এগিয়ে চলে যায়। দূরে দাঁড়িয়ে একটি কথা বললেই আর রক্ষে নেই। লেগে গেল খেয়োখেয়ি, কে ছিনিয়ে নেবে শিকারটি, তার জন্যে করতে না পারে এরা, হেন কর্ম নেই। মুহূর্তের মধ্যে গালমন্দ, এমন কি, হাতাহাতিও লেগে যেতে পারে।

এরাই হল ডালাধরা। ডালা ধরাই এদের পেশা। কলিতীর্থের এরাই হল কাক।

ওরা সব ঐদিকেতেই থাকে।

ওরা হল তীর্থবাসীর দল।

ওরা মায়ের এমন সন্তান যে, ওদের সম্বল শুধু নয়নজল।

মায়ের বাড়ী জেগে উঠল।

হয়ে গেল নিত্যসেবা, আমায় নৈবেদ্য বেরিয়ে গেল মন্দির থেকে। এবার শুধু ডালা ধরা, ডালা ধরা আর ডালা ধরা। রুখে উঠেছে সকলেই, যা জনা দশ বিশ যাত্রী এসেছে, তাদের চোখে ধাঁধা লাগাতে হবে। ভিড দেখাতে হবে, ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করতে হবে, করাতে হবে। মায়ের ঘরে ঢুকে মায়ের পাদস্পর্শ করে আসাটা যে একটা যা তা কাজ নয়, সেটুকু সদা সর্বক্ষণ ফলাও করে দেখাতে হবে সকলকে। নয়ত যে বিলকুল মাটি হয়ে যাবে। সুডসুড করে যদি মানুষে মায়ের সামনে যাওয়া আসা করতে পায়, যদি লোকের একবার ধারণা হয়ে যায় যে, মায়ের সামনে গিয়ে পৌছনটা যমের সামনে গিয়ে পৌছনর মত একটা কঠিন কর্ম নয়, তাহলে আর ওদের পরোয়া করবে কে। তাই ওরা নিজেরাই নিজেদের ঠেলে, গুঁতোয়, চোখ রাঙায়। অযথা চেঁচায়, ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর অনবরত চুপড়ি নিয়ে মায়ের ঘরে ঢোকে, বেরয়। এই ওদের কর্তব্য, এইটুকুই ওদের কারবারের কারসাজি।

ঝন ঝন ঝনাৎ, শিকল আছড়াচ্ছে কেউ দরজার গায়ে। "বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস", চিৎকার করছে দরজার মুখ জুড়ে দাঁড়িয়ে। কে বেরিয়ে আসবে, বেরিয়ে আসবার মত আছে না কি কেউ, মায়ের সামনে। যারা আছে, তারা কিছুতে বেরবে না। তাদের দায় হল, মায়ের সামনের সামান্য স্থানটুকু দখল করে থাকা, আর মায়ের হাতে পায়ে যা কিছু পডবে, তা চোখের পলক ফেলার আগেই তুলে নিয়ে ট্যাঁকে গোঁজা। ওদের বংশাবলীই মায়ের অঙ্গসজ্জা করে, মায়ের নৈবেদ্য সাজায়, মাকে পাহারা দেয়। ওরাই ছুঁতে পারে মাকে। তাই ওদের যে গুষ্টির যেদিন পালা পডে, সেদিন সেই গুষ্টির যে যেখানে আছে মাকে ছেঁকাপেঁকা করে ঘিরে থাকে। ওরা বেরিযে আসবে কি রকম? যখনই উঁকি দাও মায়ের মন্দিরের মধ্যে, দেখবে একদল মানুষে ছিনে জোঁকের মত লেগে রয়েছে মায়ের গায়ে।

সুতরাং ভিড় ভিড় আর ভিড। বাইরে ভিড়, ভেতরে ভিড়, উঠোনে ভিড, নাটমন্দিরে ভিড। পাঁঠা-কাটার ওধারে ভিড। নানা জাতের ভিড়। কত রকমের কত মতলব নিয়েই যে মায়ের বাডী জেগে রয়েছে সদা সর্বক্ষণ, তা বোঝার সাধ্য মায়ের বাপেরও নেই।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই কারোরই।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়, দুপুর গড়িয়ে বিকেলের পিছু ধরে। মায়ের মন্দির বন্ধ হবার উপক্রম হয় তখন। মা এবার ভোগ খাবেন।

সবাই ফিরে চলে, যে যার মাথা গোঁজার স্থানে। মনে মনে হিসেব করে চলে, এ ট্যাকে ও ট্যাকে গোঁজা আছে কত। হিসেব করে মনে মনে, আর রেগে কাঁই হয়। ধুত্তোর ডালা ধরার মুখে মুড়ো জ্বেলে দিতে হয়। শালার সাত-সকাল থেকে মায়ের বাড়ী চেটে মোটে নগণ্ডা পয়সা! নিকুচি করেছে মায়ের।

ফিনকিও ফিরে যায় রোজ, একদম খালি আঁচল নিয়ে। আঁচলের কোনও কোণে তাকে গিঁট দিতে হয় না বড একটা কোনও দিন। কারণ ফিনকি আর ফ্রক পরে না, তাই যাত্রীর জামা কাপড ধরে টানাটানি করতেও পারে না। "কুমারীকে কিছু দিন," এ কথাটা বলতেই কেমন যেন তার মুখে বাধে। ফিনকি শুধু দাঁড়িয়ে থাকে মন্দির ঠেস দিয়ে, হয় পুলের নীচে নয় ষষ্ঠীতলার ওধারে। তাও কারও নজরে পড়লেই তাডা লাগায়। মায়ের বাড়ীর মধ্যে ও সমস্ত আজকাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কি না।

কিন্তু মায়ের বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে কাউকে তাডা করা—মা গো—। ঐ কুটে কাঙালীগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়নো, ভাবলেই ফিনকির মাথা ঘুরে যায়। তাই সে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মন্দিরের গায়ে ঠেস দিয়ে, আর দাঁত দিয়ে নখ ছেঁড়ে। আবার নজরও রাখতে হয় চারিদিকে, কে যে কখন গায়ে হাত দিয়ে বসবে, তার ঠিক নেই। গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে আসবে হয়ত কেউ, কেউবা তাডাতে এসেও আগে খপ করে গায়ে হাত দেবে। মোটের ওপর গায়ে হাত তার পডবেই। এমন কি ঐ হাফপ্যাণ্ট পরা পুঁচকে ছোঁডাটা, ঐ যে পেঁচো, চায়ের পেয়ালা ধোবার কাজ করছে চায়ের দোকানে, ও ছোঁড়ার সাহসও কম নয়। মনিবকে লুকিয়ে তিন দিন তিন ভাঁড চা খাইয়েছিল ফিনকিকে। বলেছিল, "আসিস একটু সবদিকে নজর রেখে, চা খেয়ে যাস।" তা ফিনকি কি করে জানবে যে, অতখানি সাহস ওর। চায়ের ভাঁড়টা হাতে দিয়েই খপ করে একেবারে—। থু থু, সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড়টাই ছুঁড়ে মেরে দিলে ফিনকি, ছোঁড়ার বুকে। তারপর দৌড়, দৌড়ে গিয়ে মিশে গেল ভিড়ের সঙ্গে। ঢুকে গেল মায়ের বাড়ীর ভেতরে, ঢুকে মন্দিরের পেছনে চরণামৃত নেবার নর্দমার পাশে মন্দিরের গায়ে মুখ রগড়াতে লাগল। রাগে নয়, দুঃখে নয়, অভিমানেও নয়, এমনি। এমনি অনেকক্ষণ মুখ রগড়াতে লাগল সে। অনেকেই দেখল, কেউই কিন্তু দেখল না, ফ্রক পরা অন্ত

সকলে দেখেও দেখল না। কিন্তু একজন দেখল, পেছন থেকে সে বলে উঠল, "ওরে, ও মায়ী, আয় ত মা এদিকে। এই দেখ মা, ফিরে দেখ, ইনি তোকে কি দিচ্ছেন দেখ।"

ঝট করে ফিরে দাঁড়াল ফিনকি, চিনতে পারল। ভয়ে তার বুক টিপটিপ করতে লাগল। সামনে স্বয়ং হালদার মশায়।

কিন্তু না, হালদার মশায় তাড়াতে আসেন নি তাকে। তিনি তার পাশের ভুঁড়িওয়ালা মাড়োয়াড়িকে কি বললেন। আর অমনি সে নগদ চকচকে একটা টাকা দিলে ফিনকির হাতে। টাকাটা হাতে দিয়ে আবার ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। হালদার মশায় বললেন, "যা এবার পালা, আর কাঁদতে হবে না মন্দিরের গায়ে মুখ ঘষে," বলে মাড়োয়াড়িকে নিয়ে ওধারে চলে গেলেন।

কিন্তু সে ওই এক দিনই। রোজ কি আর মা দয়া করে। তাই রোজ ফিনকি ফিরে যায় খালি আঁচল নিয়ে। আঁচলের কোণে তার গিঁট পড়ে না কোনও দিন।

ফিনকির দাদা ফণা।

ফণা খেলে বেস। তাই তার বিস নেই, আছে শুধু কুলো পানা চক্কর। বলে, "জানলি ফিনকি, এবারে ঝেড়ে ধরব পাঁচ সিকের ট্রিপিল টোট। এবার দেখে নিস তুই, মার কাকে বলে। এ বাব্বা একটিবার হাতে আসে, বলস সাহেবের আঁস্তাবল—হুঁ হুঁ।"

আস্তাবলের মুখে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে ফণা হুঁ হুঁ পযন্ত এগোয়। তারপর বন্ধ করে বলা। মাথা নিচু করে এক গরাস ভাত মুখে ঢোকায়। বোধ হয় চিন্তা করতে থাকে, বল্‌স্ সাহেবের নামটা করাও সমীচীন হয়েছে কি না। দেওয়ালেরও কান আছে ত, যদিও ছিটে বেড়ার কান আছে কি না, তা ঠিক ফণা জানে না এখনও।

ঠিক চার হাত লম্বা আড়াই হাত চওড়া বারান্দাটুকু, এধারে ছিটে বেড়া ওধারে ছিটে বেড়া। মেঝেটা সিমেণ্টের, যাকে বলে পাকা মেঝে। বারান্দার পেছনে ঘর, ঘরের মেঝেও পাকা। তবে দেওয়াল চাল সমস্ত টিনের। ঘরখানি ঠিক চার হাত লম্বা, একদম বারান্দার সঙ্গে সমান। কিন্তু চওড়াটা অন্ততঃ হাত সাতেক হবে। মানে ভেতরদিকে অনেকটা চলে গেছে। এই এক মাপের পাঁচখানা ঘর এক চালের নীচে, সামনের বারান্দাটা তাই চার চার হাত ভাগ করা হয়েছে ছিটে বেড়া দিয়ে। ঐখানেই খাওয়া, ঐখানেই রান্না, ঐখানেই বসা দাঁড়ানো সমস্ত। সমস্ত বারান্দাটায় সারি সারি এ বেড়ার ও বেড়ার পাশে পাঁচটা উনুন জ্বলে রোজ। পাঁচ রকমের রান্না হয়। পাঁচখানা ঘরে পাঁচ রকমের

সলাপরামর্শ চলে। ঐ মায়ের বাড়ীর কথাই হয় প্রায়। যা দিন কাল পড়ল। সকলেই এসম্বন্ধে একমত যে, যা দিনকাল পড়ল তাতে আর মায়ের বাড়ী চেটে কিছুতেই দিন চলে না।

ফণা ফিনকির মা কিন্তু বলেন অন্য রকম। ছেলে মেয়ের সামনে এনামেলের কানা-উঁচু থালায় ভাত, তা শুধু ভাতই তাকে বলা চলে, ভাত আর তার সঙ্গে একটু টকের ডাল ধরে দিয়ে তিনি খুবই ফিস ফিস করে বলেন, "ফণা, আর ত চলে না বাবা। না হয় আমায় ছেড়ে দে, কারও বাড়ীতে রান্নার কাজ যদি একটি যোগাড় হয় দেখি।"

ছেলে মেয়ে দুজনেরই মুখে হাত তোলা হয় বন্ধ। ফণা কিছু বলার আগেই ফিনকি খু-উ-ব চাপা গলায় গর্জন করে ওঠে, "ফের ও কথা বললে আমি লরীর তলায় লাফিয়ে পড়ব।"

ফণা প্রায় চুপি চুপি মিনতি করে মা বোনকে।

"ফিনকি, তুইও আর বের হোসনি ঘর থেকে। খবরদার এক পা দিবিনি পথে। দেখি শালার কি করতে পারি। সন্ধ্যের পর একটা কিছু ফেরি টেরির কাজই জোটাতে হবে এবার।"

ফিনকি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "সেই ভাল দাদা, খু-উ-ব ভাল হবে তাতে। আমিও যাব তোমার সঙ্গে, ফেরি করে বেড়াব।"

ফণা হেসে ফেলে। বলে, "ধুৎ—গরু কোথাকার।"

ফিনকি তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বলে, "না দাদা, কিছুতেই আমি থাকতে পারব না এই ঘরে। দুদিন বন্ধ থাকলে ঠিক দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। দেখ তুমি, এই তোমায় বলে রাখছি—"

ফণার আর শোনার অবসর হয় না। তাড়াতাড়ি একটা কুলকুচো করে সে ছোটে রাস্তায়। খাল পেরিয়ে চেতলার বাজারে তাকে পৌঁছতে হবে এখনই। সে গেলে তবে তার মনিব পরাণকেষ্ট গুঁই আড়ত থেকে উঠে বাড়ী যাবেন ভাত খেতে। আসা যাওয়া খাওয়ার জন্যে ফণা ছুটি পায় মাত্র একঘণ্টা, বেলা দুটো থেকে তিনটে। তিনটের পর পরাণকেষ্ট গুঁই ভাত খেতে বাড়ী যান। তিনটের একটু দেরী হলেই রেগে টং হন তিনি। তাই ফণা দৌড়য়।

ফণার মা ছেলেকে ডালা ধরতে দেননি মায়ের বাড়ীতে। যে সংসারে তিনি বধূরূপে এসে দুধে-আলতার পাথরে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেটা ডালা ধরার সংসার ছিল না। কি করে যে কি হয়ে গেল, কিসের থেকে কেমন করে যে তাঁকে এই মরা খালের ধারে এসে টিনের খাঁচায় ঢুকতে হল, কবে থেকে ফণা ফিনকির

বাবা ডালা হাতে নিয়ে মায়ের বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াল, সবই তিনি চোখ বুজলেই দেখতে পান। স্পষ্ট দেখতে পান তিনি, কেমন করে সেই কাঁচা হলুদ রঙের নরম শরীরটা পাকিয়ে তেউড়ে পোড়াকাঠ হয়ে গেল। বিড়ি থেকে গাঁজা, তারপর আফিম থেকে চণ্ডুতে গিয়ে উঠল নেশার দৌড়। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা হবার প্রত্যাশার আগুন জ্বলে উঠত দুই চোখে, সর্বদেহে শিকারীর বন্য হিংস্রতা জেগে উঠত, ছুটে বেরিয়ে যেত বাড়ী থেকে কোমরে গামছা বেঁধে ডালা হাতে নিয়ে। তারপর ফিরত যখন খালি হাতে খালি পেটে সেই দুপুর গড়িয়ে যাবার পর, তখন একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়ে ফিরে আসত মানুষটি। দিনের পর দিন প্রত্যাশা আর হতাশার জোয়ার ভাঁটা, সেই জোয়ার ভাঁটার টানে সব শুকিয়ে গেল। শেষে নেশা, নেশাব ওপর আরও নেশা, অভাবের নেশা, বাঁচার নেশা, সব রকমের নেশাতেও যখন কুলোল না তখন পেয়ে বসল মরণের নেশা। ঐ ডালা ধরার নেশায় মানুষকে যে কোথায় নিয়ে নামাতে পারে তার নাড়ীনক্ষত্র সবটুকু মর্মে মর্মে জানেন যে ফণা ফিনকির মা। তাই তিনি ছেলেকে কিছুতে ডালা ধরতে দেননি। বহু চেষ্টা বহু তদবির ধরাধরির ফলে, ফণা শেষ পর্যন্ত জুটিয়েছে ঐ কাজ, পরাণকেষ্টর আড়তে। পরাণকেষ্ট লোকটি ধার্মিক জুতের। কাজে নিয়েই দিন আট আনা দিতে আরম্ভ করেন। শেষে যখন বুঝতে পারেন যে সুবিধে পেলেও ফণা চুরি করে না তখন একেবারে ত্রিশ টাকা মাস মাইনে করে দিয়েছেন।

কিন্তু ত্রিশ টাকার সাড়ে সাত টাকাই চলে যায় ঘর ভাড়ায়। আর বাকী থাকে কত? যা থাকে তা দিয়ে মা বোন নিয়ে ফণা চালায় কি করে!

কি করে যে চলে তা ফণা ভাবতে চায় না। চলে, যে ভাবেই হোক চলে, তিনটে মানুষের পেট চলছেই ত ত্রিশ টাকা থেকে সাড়ে সাত টাকা ছেঁটে ফেলে। চালান ফণা ফিনকির মা। তিনিই জানেন, কেমন করে সংসার চালান তিনি।

আর জানে ফণার বোন ফিনকি। এতদিন ঠিক জানত না, এখন সবে একটু একটু জানতে আরম্ভ করেছে।

তখন কুমারী হওয়ার নেশা ছিল।

লুকিয়ে যেত খেলার সাথীদের সঙ্গে মায়ের বাড়ী। হৈ হৈ হুড়োহুড়ি লাফালাফি করে বেড়াত ঐ মায়ের বাড়ীতেই ছোট্ট ইজের আর ছোট্ট ফ্রক পরা এক মাথা কোঁকড়া চুলসুদ্ধ এক ফোঁটা মেয়েটা। দরকার পড়লে হালদার মশায়রা হুকুম দিতেন, "ধর, ধরে আন সব কটাকে।" ধরে এনে সার বেঁধে বসিয়ে সকলের

পা ধোয়ানো হত আগে, তারপর হাতে হাতে মিষ্টি দেওয়া হত, তারপর চার আনা বা আট আনা নগদ পয়সা। অনেকবার তেলের বোতল সিন্দুর আলতা এমন কি ছোট্ট ডুরে শাড়ী পর্যন্ত পেয়ে যেত। বাড়ীতে আনলে মা রাগ করত, "কেন আনলি এ সব ?"

"বা রে আমি কি চাইতে গেছি নাকি ?"

"না চেয়েছিস বেশ, কিন্তু খবরদার আর যাবি না মায়ের বাড়ী।"

"হুঁ, কেন, সবাই ত যায়, খেলতে—"

মা গর্জে উঠত, "চুপ মুখপুড়ি, লজ্জা করে না ভিক্ষে করতে।"

ফিনকি চুপই করে যেত। ঠিক বুঝতে পারত না ভিক্ষেটা আবার করা হল কোথায়। কিন্তু বাপ বাড়ী ফিরে লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েকে বলতেন, "যাবি, নিশ্চয়ই যাবি। রোজ যাবি। কেন যাবি নে, বামুনের মেয়ে তুই, লোকে কুমারী করবে তীর্থস্থানে। এতে লজ্জার কি আছে।"

তাই ফিনকি ফের যেত। মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে একবার বেরতে পারলেই, সিধে মায়ের বাড়ী। যেদিন যা হাতে পেত, নিয়ে আসত বাড়ীতে। বকুনি খেত মায়ের কাছে, তবু এনে মার হাতেই সব তুলে দিত।

আবার এর মধ্যে তার বাবাও দু একবার দু একজন যাত্রীকে ধরে তাকেই কুমারী করালেন। পা ধোয়ানো, আলতা পরানো, জল খাওয়ানো, দক্ষিণা দিয়ে প্রণাম করানো। ভয়ানক ভাল লাগত তখন এ সমস্ত ফিনকির। কেমন একটা নেশা ছিল ঠাকুর হাওয়ায়। আবার রেষারেষিও ছিল আর পাঁচটা তার মত কুমারীর সঙ্গে। কে কতবার কুমারী হল, কে কি পেল না পেল, এ নিয়ে রেষারেষি ছিল। দশ বারজন জমত তারা মায়ের বাড়ীতে। তার মধ্যে একজনকে কুমারী হওয়ার জন্যে ডাকলে অন্য সবাই কেমন যেন মনমরা হয়ে যেত। তখন যেত ক্ষেপে, যাকে ডাকা হল তার ওপর।

"আহা! আধিক্যেতা দেখ না ধুমসীর।"

"যেন উনিই কত সুন্দরী।"

"তবু যদি না বোঁচা নাক হত।"

"হেংলীর হদ্দ। দেখলি না, জামা ধরে টানাটানি করছিল।"

দেখতে দেখতে দিন পালটাল। কুমারী যে কত জুটল তার ইয়ত্তা নেই। টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি কামড়াকামড়ি। আর সে কি খেড়ে খেড়ে কুমারী সব। ফিনকিরা মোটে পাত্তাই পেত না তাদের সঙ্গে। যাত্রীর কাঁধে হাত দিয়ে কুমারী হওয়ার জন্যে তারা বেরিয়ে যেতে লাগল মায়ের বাড়ী থেকে। অনেকের আবার

রোগ হল কি সব, হাতে মুখে গায়ে।

তারপর ফিনকিও বুঝতে শুরু করলে সব কিছু।

মা তাকে ফ্রক পরতে আর দিতে চায় না। সেও ফ্রক পরে বেড়াতে পারে না। দাদা শাড়ী এনে দিলে।

দু একবার দু একজন, আর ঐ ডালাওয়ালাদের ঝি দু একটা, যারা যাত্রীর হাতে জল ঢেলে দেয়, তারা তাকে ডেকেও ছিল মায়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুমারী হওয়ার জন্যে। ফিনকি ছুটে বাড়ী পৌছে বসে পড়েছিল মার গা ঘেঁষে। সহজে আর বেরতে চাইত না ঘর থেকে।

কিন্তু নেশা আছে মায়ের বাড়ীর।

ফুল বেলপাতা পচা গন্ধ, মানুষের ভিড়, আর কয়েক আনা কাঁচা পয়সার নেশা আছে। তবে সাবধানে থাকতে হয়, ঘাপটি মেরে থাকতে হয়। নয়ত সুযোগ পেলেই গায়ে হাত পড়বে। হয় তাড়াবার জন্যে মায়ের বাড়ী থেকে, নয়ত একটু আদর করার লোভে। মোটের ওপর গায়ে হাত পডবেই।

তবু যেতে হবে।

কিন্তু এখন আর নেশায় নয়, পেশায়। এখন আর ধমকানি দেয় না মা, কিছু আনলে হাত পেতে নেয়, কিন্তু কাঁদে। অনবরত কাঁদে, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। ফিনকির কাছে ধরা পড়বার ভয়ে ভেতরে ভেতরে কাঁদে মা। ফিনকি কিন্তু ধরতে পারে ঠিক।

সেদিন ত সে স্পষ্ট বলেই ফেললে, "মা, এ পয়সা খারাপ পয়সা নয়। এমনি লোকে দেয়। সাধতেও যাই না আমি।"

মা শুধু চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ মেয়ের দিকে। বোবা পাঁঠা যেমন চোখে হাঁড়িকাঠের দিকে চেয়ে থাকে। ফিনকি আর চাইতে পারলে না মার চোখের পানে।

অনেকক্ষণ পর মা বললেন, "তুই আর বেরসনি ফিনকি। আর তুই দেখাস-নি ও মুখ কাউকে। আয়, তোতে আমাতে বিষ খাই।"

"বিষ!"

মানে মরতে হবে। কেন? কিসের জন্যে? কি অন্যায়টা করেছে তারা যে বিষ খেয়ে মরতে যাবে? কেন?

ফুঁসিয়ে ওঠে ফিনকি ভেতরে ভেতরে। কেন? কেন? কেন? কিসের জন্যে মরতে যাবে সে? আর তার মা-ই বা অনর্থক অত কাঁদবে কেন? কার কাছে কাঁদছে? কে শুনছে কান্না? কেঁদে, কান্না লুকিয়ে কেঁদে, কার মন গলাতে চায় মা?

রুক্ষ চুলগুলোয় একটা ঝাঁকি দিয়ে ফিনকি উঠে যায় খালের ধারে। মরা খালটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে আঁস্তাকুড়ের পাশে। আঙুল মটকাতে থাকে, দাঁত দিয়ে নখ ছিঁড়তে থাকে। তার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় সামনের ঐ মরা খালটার মত। তবু ফিনকি একটা প্রশ্নেরও জবাব খুঁজে পায় না।

তারপর এক সময়ে ভাবতে শুরু করে কোথা গেল তার বাবা। কেন গেল? কবে ফিরবে?

কংসারি হালদার মশায় মায়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন মন্দিরে জল ঢালা হয়ে গেলে পর। তার মানে সেই বেলা চারটে। অনর্থক বসে দাঁড়িয়ে থাকেন মায়ের বাড়ীতে, এমনি ঘুরে বেড়ান চারিদিকে। বড় একটা কথাবার্তাও বলেন না কারও সঙ্গে, আলাপ পরিচয়ের নেইও কিছু। নিত্যকার ব্যাপার, নূতনত্ব কোথাও কিছু নেই। কয়েকটা ছোটখাট ঝগড়া, যাত্রী নিয়ে দু একবার টানাটানি, হয়ত বা একজনের গাঁট কাটা গেল। ব্যস, এর বেশী আর কিছু নয়। নূতন লোকের মুখ দেখা যায় না মায়ের বাড়ীতে। যারা আসে তারাই ঘুরে ঘুরে আসে বারবার। বছরে একবার অন্ততঃ তারা আসেই মায়ের চরণ স্পর্শ করতে। অন্য যারা আসে, তাদের আসা না আসা দুই-ই সমান। পাঁচ সিকের বিয়ে, সোয়া পাঁচ আনার মুখে ভাত, আর আড়াই টাকায় উপনয়ন। সবই ফুরনের ব্যাপার। দায় সারতে আসে সবাই আজকাল মায়ের বাড়ী, আর হালখাতা করাতে আসে বছরের প্রথম দিনটিতে। শ্রীশ্রীকালী মাতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ কারবার কর্ম করবার বাসনায় গণেশ একটি কিনে খাতা বগলে করে আসে। ব্যবসা করতে গেলেই পাঁচ রকমের পাঁচটা গোলমেলে কাজ করতে হয়। আখেরে মা যেন সামালটুকু দেন। এই জন্যেই মাকে জামিন দাঁড় করানো। এই জন্যেই আসে সকলে।

কিন্তু আগে, হালদার মশায়ের বয়সকালে, ঠিক এমনটা ছিল না। খা খা, খাই খাই, দেহি দেহি সত্যিই যেন ছিল না এত। এমন যাত্রী অনেকে আসত তখন, যারা এসেই কিছু চেয়ে বসত না মার কাছে। এমনি দর্শন করতে আসত, আনন্দ করতে আসত, একটু শান্তি পাবার আশায় আসত সবাই। সে সব যাত্রী নামলেই মায়ের বাড়ীর হাওয়াই যেত বদলে। আজকালও লোকে দান-ধ্যান করে মায়ের বাড়ীতে, কিন্তু সে একেবারে ষোল আনা পুণ্যার্জনের জন্যে দান-ধ্যান করা তীর্থ-স্থানে। কিন্তু আগের তারা দানও করত না। তারা শুধু খরচ করে যেত দু হাতে মায়ের বাড়ীতে। সব খরচই মায়ের বাড়ীর খরচ, ও সবই মায়ের

পূজা দেওয়া। এই রকমই যেন ছিল তাদের ধারণা। নাও লাগাও দশ ধামা, টাকা কড়ি ছড়াও মায়ের মন্দিরের বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতে। "হাঁ, কতজন ব্রাহ্মণ আছেন হালদাব মশায়? ও, আচ্ছা, সকলকে ষোল আনা করে দক্ষিণা আর একখানি করে চণ্ডী দিতে চাই, ব্যবস্থা করুন হালদার মশায়। একটু কষ্ট করে দেখুন না, একশ আটটি কুমারী আব একশ আটটি সধবা যোগাড করা যায কি না। হাঁ হাঁ, বস্ত্র দক্ষিণা ত বটেই, শাঁখা সিঁদুর আর মিষ্টি এক সরাও অমনি দিতে হবে। আব এই নিন, আজকেব মাযের ভোগরাগের যাবতীয় খরচা এই একশ এক।"

এ সমস্ত ত ছিলই তখন মানুষের সখ, তাব ওপর অন্য সখও যে ছিল না, তা নয়। "ব্যবস্থা করুন, বাড়ীর ব্যবস্থা করুন, সন্ধ্যেব পর একটু ইয়ে মানে, বুঝলেন না, মায়েব স্থানে একটু আমোদ আহ্লাদ না করে ফিরব কেন। আপনাবা যখন রয়েছেন মাকে নিযে, আপনাদেব একট আমোদ স্ফূর্তি না কবিযে গেলে মা কি তুষ্ট হবেন হালদাব মশায়। আজ্ঞে হ্যাঁ, যাঁরা প্রবীণ, যাঁবা মান্যগণ্য, সকলকে বলা চাই বইকি।"

অর্থাৎ বাতে ভাল কবে আলো জ্বলত কোনও বাড়ীব ঢালাও বৈঠকখানায়. ঘুঙুর তবলা সাবেঙ্গীর সঙ্গে তাল ঠুকে চেঁচাত সবাই। সবই হত, কিন্তু সেও ঐ মায়ের সন্তুষ্টিব জন্যে। মাযের দামাল ছেলের কেউ এলে তবে হত। লজ্জাব কি আছে, মাযের কাছে আবার লুকোচুবির আছে কি। হুঁ, যত সব—

কংসাবি হালদার মশায হাঁড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভাবতে থাকেন যে, তখনকার পাঁঠাগুলোও ঠিক এখনকার এই পাঁঠাব মত এমন মরণাপন্ন পাঁঠা ছিল না। এখনকার পাঁঠাকে হাঁড়িকাঠে ফেললে যে জাতেব বীভৎস চেঁচান চেঁচিয়ে মরে তখনকার পাঁঠাব চেঁচানি এতটা কদর্য ছিল না। এগুলোব কাতরানি, বাঁচাব জন্যে আকুলি-বিকুলি, দেখলে দয়া হয় না, মন খাবাপ হয না। শুধু রাগ হয়। মনে হয় এদের বেঁচে থাকার দায় থেকে এগুলোকে নিষ্কৃতি দেওয়াটাই সব থেকে বড কাজ।

কংসারি হালদার মশায় কোঁচাব খুঁট গাযে জড়িযে মাযেব বাড়ীব চারিদিকে হাঁটেন। হাঁটেন আর মনে মনে মিলিয়ে দেখেন। না, সবই ঠিক চলছে। কোথাও বদলায়নি কিছু। তবে হালদার মশাযদের যজমানরা আর নেই। ডালা-ধরাদের যজমান যথেষ্ট। সোয়া পাঁচ আনা, পাঁচ সিকে বড জোব পাঁচ টাকা খবচা করার মত বুকের পাটা নিয়ে আসে সকলে মায়ের বাড়ী। আনন্দ স্ফূর্তিও করে না, তা নয়। তবে তাও সারে ঐ আট আনা এক টাকার মধ্যে। ডালাধরাই সে ব্যবস্থা করে দেয় ঐ ওধারে খালধারে ছোট ছোট টিনের খুপরিতে। যেমন

পুজো তেমনি সব দক্ষিণে। ভালই হয়েছে, হালদার মশায়দের বংশধরেরা উকিল ডাক্তার হয়ে মায়ের বাড়ীর দিকে পেছন ফিরেছে। অনেকে তো চাকরি নিয়ে চলেই গেছে বিদেশে। ভালই হয়েছে। উঞ্ছবৃত্তির হাত থেকে উদ্ধার হয়ে বেঁচেছে।

মিছরি বংশও তাই করছে। মিশ্র থেকে মিশরি, মিশরি থেকে একেবারে মিছরি হয়ে গেছে বেচারারা। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ওরা, মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করবার অধিকার নিয়ে ওদের পূর্বপুরুষ মায়ের সেবায় লাগেন। উচ্চস্তরের সাধক না হলে সে অধিকার পেলেন কি করে তিনি। কিন্তু তাবপর, বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে পৌঁছল। সাধনা শুধু দাঁড়িয়েছে এখন ট্যাঁকের। এবার ট্যাঁকও শুকিয়ে শ্মশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কবছে যে ছেলেপুলেদের লেখা পড়া শিখিয়ে অন্য রুজি রোজগারের ধান্দায় পাঠাচ্ছে। বেশ করছে, কি হবে এই হতচ্ছাড়াদের সঙ্গে খেয়োখেয়ি করে। তাতে পোষায় কি কারও। শুধু শুধু জাত ভিখারী হয়ে জীবন কাটানো। সব শুখিয়ে গেছে, যাচ্ছে, আরও যাবে। একেবাবে ঐ মরা খালটার মত মরে যাবে। ঐ আদিগঙ্গার মত। আদিগঙ্গায় লোকে আগে আদ্যশ্রাদ্ধ কবত। এখন আদিগঙ্গারই আদ্যশ্রাদ্ধ হয়ে গেল। হালদার মশায়েব চোখের সামনে দেখতে দেখতে এমনটা হয়ে গেল। বেশ হল।

কিন্তু এবার তাড়াতাড়ি করতে হয়। সন্ধ্যার আগেই বসতে হবে ভাতেব থালাব সামনে হালদার মশায়কে। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাবে তাঁর পৃথিবী আঁধার হয়ে। তাব আগেই শেষ করা চাই দিনের কাজ। দিনের কাজ মানে ঐ একবার ভাতের থালার সামনে বসা। আঃ এটুকুর হাত থেকে যদি নিস্কৃতি পাওয়া যেত।

হালদার মশায় ফিরে গেলেন বাড়ীতে। নিজের বাড়ীতে ফিরে গেলেন তিনি। বাড়ীব মানুষরা তাঁব নিজের মানুষ, ছেলে বউ নাতি নাতনী সব তাঁর নিজের। লোকে বলে কংসারি হালদার মশায়ের বাড়ী, এখনও তাই বলে। লোকে যেমন বলে কংসারি হালদার মশায়ের পালা। পালা কিন্তু সত্যিই তাঁর নয়, যে করে তার। যে কিনে নেয় তারই পালা। তিনি শুধু মায়ের ভোগটা পুজোটা চালান। কেউ যদি পালা নাও কেনে তবু তিনি চালাবেন। কি করে চালাবেন তা শুধু মা জানবে আর তিনি জানবেন, আর কেউ জানবে না।

ছেলেরা বড বড চাকরি করে সবাই। বৌমায়েরা সব ভাল বংশের মেয়ে। তাঁরা মায়ের বাড়ীর মহাপ্রসাদ নিয়ে মাথায় ঠেকান। তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও ও সব ছুঁতে দেন না। বলেন, "ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে একধারে সরিয়ে রাখ

ও সমস্ত, কাল ঝি এসে গঙ্গায় দিয়ে আসবে।" পচা খালের জল দিয়ে রান্না হয় কি না। কে বলতে পারে, কি রোগের বীজ এসে ঢুকবে বাড়ীতে ঐ মহাপ্রসাদের সঙ্গে।

মাংস, তাও কালীবাড়ীর বলির মাংস অচল। বৌমায়েরা জানেন, ও সব পাঁঠার হেন রোগ নেই যা নেই। তার চেয়ে বাজার থেকে ছাপ দেওয়া খাসির মাংস এনে খাও। নয়ত, যা সব থেকে ভাল ব্যবস্থা, তা হচ্ছে ছুটিছাটার দিন সিনেমা-টিনেমা দেখে ভাল হোটেল থেকে মাংস খেয়ে বাড়ী ফেরা। রোগ হওয়ার ভয় নেই, হাঙ্গামাও নেই কিছু। তাই বাড়ীতে মাংসটা হয়ই না বড একটা। যে ছেলে যে দিন তার বউ ছেলে নিয়ে বেড়াতে যায়, সে ভাল হোটেল থেকে ভাল মাংস খাইয়ে আনে তাদের।

হালদার মশায় খেতে বসেন। বাড়ীর সকলের খাওয়া দাওয়া ঘণ্টা পাঁচ ছয় আগেই চুকে গেছে। বিকেলের চা জলখাবার খাওয়াও শেষ। হালদার মশায় খেতে বসেন। তাঁর ছেলেরা বৌমায়েরা খুবই কড়া নজর রাখেন তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ওপর। বামুনের ওপর হুকুম দেওয়া আছে, "খবরদার, তিনটের পর থেকেই উনুন ধরিয়ে জল চাপিয়ে বসে থাকবে ঠাকুর। আতপ কটি একেবারে বেশ করে ধুয়ে সামনে নিয়ে বসে থাকবে। আর নজর রাখবে, বাবা আসছেন দেখলেই দেবে ফুটন্ত জলের মধ্যে চাল ফেলে। পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে। খবরদার, কিছুতেই যেন ঠাণ্ডা না হয়ে যায়। খুব সাবধান।"

খুব সাবধানের গরম আতপ চালের ভাত, একটু ঘি আর ঐ ভাতের মধ্যে যা সিদ্ধ হয় তাই, খুব সাবধানেই তাঁর সামনে নামিয়ে দেওয়া হয়। হালদার মশায় খান।

দুধ খান তিনি রাত্রে, ওটা তাঁর ঘরে চাপা দেওয়া থাকে। গরম থাকে না, তা না থাকুক, হালদার মশায়ের ঠাণ্ডা দুধ খেতে কষ্ট হয় না। রাতে ঐ দুধটুকুই খান তিনি, আর কিছু নয়।

কারণ এক সময় উনি খুবই খেয়েছেন। খেতেও পারতেন খুব। লোকে বলে, আস্ত একটা পাঁঠা নাকি খেতে পারতেন উনি। নিজেও খেতেন যেমন, খাওয়াতেনও তেমনি লোককে। হালদার বাড়ীতে নাকি রোজই যজ্ঞি লেগে থাকত। দৈত্যারি হালদার মশায়ের আমলে প্রতিটি পালায় তিনি কালীঘাট সুদ্ধ মানুষকে প্রসাদ নেওয়ার নেমতন্ন করতেন। কেউ না গেলে রাগ করতেন, ঝগড়া করতেন, এমন কি মারও দিতেন। ছেলে কংসারি যদিও অতটা পারতেন না, তবু হেন দিন নেই যে দশ বিশ জনকে সাথে নিয়ে বাড়ী ঢোকেননি তিনি খাওয়ার সময়। খুঁজে পেতে ধরে আনতেন। "আরে বাবা, কালীঘাটে এসেছ কি

হোটেলে খাবার জন্যে ? এস আমার সঙ্গে, যা হয় দু মুঠো মুখে দিয়ে যাও। মায়ের অন্নছত্র খোলাই আছে। আরে বাব্বা, হালদার গুষ্টি থাকতে মায়ের স্থানে কেউ উপোস করে থাকবে নাকি ?"

মায়ের স্থানে কেউ উপোস করে থাকতে পারে না।

হালদাররা থাকতে মায়ের স্থানে এসে কেউ যেন উপোস করে না ফিরে যায়।

এতে মায়ের অপমান, কেউ উপোস করে থাকলে মায়ের স্থানে, মাও উপোসী থাকবে যে। সুতরাং মাকে খাওয়াতে গেলে হালদারদের ওদিকেও নজর রাখতে হবে। সেই জন্যেই হালদাররা কালীঘাটের হালদার।

এই সমস্তই হালদার গুষ্টির ছেলেরা জানত। তাদের বৌয়েরা তাই হাঁড়ি ঠেলাটাকে হাঁড়িঠেলা বলে মনে করত না। সব বাড়ীতেই মায়ের ভোগ হত। যা রান্না হত, সবই বাড়ীর গিন্নী মনে মনে মাকে নিবেদন করে দিতেন। কিংবা দুটি মহাপ্রসাদ নিয়ে এসে ছিটিয়ে মিশিয়ে দিতেন বাড়ীতে রান্না ভাত তরকারির সঙ্গে। ব্যস, খাও এবার মায়ের প্রসাদ। সবাই খাও, কর্তারা ছেলেরা যাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ঢুকবে তারা ত খাবেই। কিছুতেই কম হবে নাকি মায়ের প্রসাদ। সেটি হবার জো নেই হালদার বাড়ীতে। কারণ কালীঘাটের হালদার বাড়ীতে লোকে খাবেই।

এই ছিল দস্তুর। এইটুকুই ছিল হালদারদের অভিমান। মানে এরই নাম ছিল মায়ের সেবা চালানো। কেউ মায়ের বাড়ী এসে উপোসী থেকে ফিরে না যায়, সর্বনাশ, তাহলে মাও উপোসী থাকবেন যে।

কিন্তু সব শুকিয়ে গেছে। ঐ আদিগঙ্গাটার মত সব শুকিয়ে গেছে। এমন কি মায়ের বাড়ীতে যে পাঁঠা এখন চেঁচায়, তার চেঁচানিটা পর্যন্ত বিষিয়ে একেবারে এমন জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ওটা উঠিয়ে দিলেও মন্দ হয় না।

হালদার মশায় আতপ চালের ভাতে-ভাত মুখে তোলেন। কিন্তু গিলতে পারেন না সহজে। কেমন যেন গলার কাছে সব আটকে যায়।

আটকে যায় আরও অনেক কিছু সেই সঙ্গে। ভাবতে গিয়ে ভাবনাও যায় আটকে। রেষারেষি করে পাল্লা দিয়ে পালা চালানো যেমন আটকে গেছে। কোন হালদার কতগুলো মানুষকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেছে খাওয়ার জন্যে, এ আলোচনা যেমন আটকে গেছে হঠাৎ একদিন। কোন হালদার কবে কাকে সোজা হুকুম দিয়েছে, "নাও ঠাকুর, এখানেই থেকে যাও, মায়ের দরজায় দুমুঠো জুটবেই, মা কাউকে উপোসী রাখেন না।" এ সমস্ত হিসেব নিকেশ করাও যেমন একেবারে উঠে গেছে কালীঘাটের কালীর ত্রিসীমানা থেকে। কংসারি হালদার মশায়

খাওয়ার পরে অন্ধকার ঘরে আস্তে আস্তে হাঁটেন আর ভাবেন। ভাবতে গিয়ে তাঁর ভাবনাও যায় আটকে। সবই আটকে যায়।

তার মানে—!

হালদার মশায় থমকে দাঁড়ান ঘরের মাঝখানে। দাঁড়িয়ে আবার নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করেন, তার মানে?

উত্তরটা খুঁজে পান। হাঁ হাঁ, ঠিকই ত! একেবারে ঠিক। এতগুলো লোকের এ ভাবে আজ ভিখিরী হয়ে যাবার জন্যে কে দায়ী? কারা দায়ী?

দায়ী হালদাররা, তাঁদের পূর্বপুরুষেরাই দায়ী এতবড় সর্বনাশটা হওয়ার দরুন! হালদার বাড়ীর ভাত দুবেলা দুমুঠো খাও, আর যা পার, মায়ের বাড়ী চেটে যা পাও নিয়ে দেশে পাঠাও। তোমাদের মাগ ছেলে বাঁচুক। নয়ত তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানরা করবে কি।

এ আশ্বাস কারা দিয়েছিল এই হাবাতে গুষ্টির পূর্বপুরুষদের? হালদাররা, মায়ের খাস সেবায়েতরা, যারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করত মা কাউকে উপোসী রাখেন না। তাই তখন, সেই দৈত্যারি হালদার মশাযের ঠাকুরদাব আমলের আগের আমল থেকে কালীঘাটে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে কেউ ফিবে যাননি। তাই তখন, সেই সব মহা অভিমানী হালদারদের মধ্যে রেষারেষি ছিল, কে কটা মানুষকে বসাতে পারল কালীঘাটে, তাই নিয়ে। তাই তখন হালদার বাড়ীর অন্নছত্র হরদম থাকত খোলা। আর মায়ের মুখটাও দিনরাত অমন আঁধার হয়ে থাকত না।

আরও আছে, অনেক হিসেবের গরমিল আছে, যা তখনকার হালদার মশায়রা করে গেছেন। ·স্রেফ এই গর্বেই তাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন যে, তাঁরা মায়ের সেবায়েত। এই দেমাকেই যাকে যা খুশি হুকুম দিয়ে বসতেন মায়ের নামে। এখন তাঁদের বংশধরেরা দায়িত্ব এড়াবার জন্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

কিংবা হয়ত কারও মনেই হয় না একবার পূর্বপুরুষদের কথা।

যেমন কংসারি হালদার মশায় নিজেই নিজে স্মরণ করতে ভয় পান, কতগুলো মানুষকে তিনি খামকা ভরসা দিয়ে ধরে রেখেছেন মায়ের বাড়ীর মাটি চেটে খাবার জন্যে। ভাগ্যে তারাও ভুলে গেছে তাঁর কথা। নয়ত—

নয়ত, হালদার মশায় দিনের আলোতেও পেঁচার মত মুখ লুকিয়ে থাকতেন। তাছাড়া আর কি উপায় ছিল তাঁর।

তাঁর বাড়ীতে, তিনি বেঁচে থাকতে, যদি কেউ এসে দাঁড়ায় দুপুরবেলা দুটি প্রসাদের জন্যে, কি করতে পারেন তিনি? বৌমায়েদের সে কথা বলতে যাবেন

না কি তিনি!

হা হা হা হা, হালদার মশায় নিঃশব্দে হা হা হা হা হাসতে লাগলেন অনেকক্ষণ। বললে যে কি ফল দাঁড়াবে তাই ভেবে হাসতে লাগলেন মনে মনে। মনে মনে অট্টহাস্য হাসতে লাগলেন। যেমন একদা মায়ের নাটমন্দির ফাটিয়ে হাসতেন তাঁরা হাসার মত একটা কিছু ঘটলে।

তখন হাসার মত সহজে কিছু ঘটত না, তাই লোকে হাসতে জানত। এখন হাসার মত ব্যাপার আকছার এত ঘটছে যে লোকে হাসতেই ভুলে গেছে। শুধু কান্না, কান্নায় কান্নায় এমন ভরে গেছে দুনিয়াটা যে মায়ের মন্দিরের চূড়ো ছাড়িয়ে উঠেছে কান্নার পাহাড়।

সে হল ঐ বলির পশুর কান্না। ও কান্না শুনে হালদার মশায়ের প্রাণ কাঁপে না।

তেমন তেমন দিনে মেয়েমানুষ-পুলিস আসে মায়ের বাড়ীতে। খাকী পরে আসে না, সাদা কোট প্যাণ্ট পরে আসে। যেমন ঐ রাস্তার সার্জেণ্টদের পোশাক। নাটমন্দির থেকে মায়ের মন্দির পর্যন্ত পড়ে একখানা ছোট্ট হাত চারেক লম্বা কাঠের সাঁকো। মেয়ে পুলিসরা সেই সাঁকোর উপর জটলা করে। মেয়েযাত্রীদের সে সব দিনে মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। নাটমন্দির থেকে সেই কাঠের সাঁকো দিয়ে মায়ের সামনের দরজার সামনে এসে মেয়েরা দর্শন করে যায়। সে সব দিনে মায়ের বাড়ীতে ঢোকার বেরবার পথও মেয়ে পুরুষের জন্যে আলাদা আলাদা। তাই মেয়ে-পুলিস আসে মেয়েদের রক্ষা করার জন্যে। কাজেই মা কালীর আর কাউকে রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে না। কাজেই হালদার মশায়রা সে সময় বিশেষ দিনে পরম নিশ্চিন্ত থাকেন।

কিন্তু কপালে দুর্বিপাক থাকলে বখেড়া বাধতে কতক্ষণ। বলা নেই, কওয়া নেই, একটু খবর পর্যন্ত দেওয়া নেই, হঠাৎ দুম করে এসে উপস্থিত হল জলজ্যান্ত দুর্বিপাক। সেই সদানন্দ রোডের ওখানে গাড়ী রাখতে হয়েছে, পুলিসে একখানি গাড়ীও এধারে আসতে দিচ্ছে না। তা তাই সই, হেঁটে এসেছে সকলে এতটা পথ, গাড়ী ওখানে রেখে! কেন, এ সমস্ত হাঙ্গামার দরকারই হত না যদি একটু সংবাদ দিয়ে আসা হত। থানায় বলে ব্যবস্থা করে হালদার মশায় ঐ গাড়ী এখানে আনাতেন। মায়ের বাড়ীর পাশেই আসত গাড়ী, যেমন অন্য দিনে আসে। খামকা এই কষ্ট করা।

হালদার মশায় গজগজ করতে লাগলেন।

যজমানরা কিন্তু মহাখুশী। এই ভিড়ে হালদার মশায়কে খুঁজে বার করতে পেরেছেন তাঁরা, এতেই যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছেন। গিন্নীটি অর্থাৎ এখনও যিনি খোদ রাণীমা, তিনি প্রণাম করালেন সকলকে রাস্তার ওপরেই।

"নাও নাও, কর সকলে প্রণাম কর ঠাকুরমশাইকে। তীর্থগুরু আমাদের বংশের, আমাদের সাতপুরুষের ভালমন্দের জন্যে এঁরাই দায়ী। ঠাকুরমশাই, এই এইটি হল বৌমা, হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল মায়ের ইচ্ছেয়। আপনাকে খবর দেওয়ার সময় পেলাম না। তাই বিয়ের পরই ছুটে আসছি মায়ের স্থানে। মায়ের সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে মায়ের প্রসাদী সিঁদুর দেবেন এর কপালে, মায়ের পায়ে ছোঁয়ানো মোহর বেঁধে দেবেন আঁচলে, যেমন আপনার বাবা আমার কপালে সিঁদুর দিয়ে আঁচলে মায়ের প্রসাদী বেঁধে দিয়েছিলেন। তারপর বৌ নিয়ে ঘরে ফিরব। সেই প্রসাদী মোহর, বৌ লক্ষ্মীর চুপড়িতে নিজে হাতে তুলবে, তবে এ বংশের বৌ-গিরি করা আরম্ভ হবে। জানলে বৌমা, এখন ইনি যা করাবেন সেইটুকুই আসল ব্যাপার। এই নিন ঠাকুরমশাই, বৌ এনে খাড়া করে দিলুম আপনার কাছে। যা যা করবার করুন এবার। আমার দায়িত্ব এতদিনে শেষ হল।"

কংসারি হালদার একটা ঢোক গিললেন জোর করে। মুখ তুলে একবার চেয়ে দেখলেন মায়ের মন্দিরের চূড়োটা। নীচে নজর নামাতেই দেখতে পেলেন, ঘিরে দাঁড়িয়েছে সকলে। জ্বলছে সকলের খোন্দলে-বসা চোখগুলো, গলা উঁচু করে ডিঙি মেরে দেখছে অনেকে। হাড়-হ্যাংলার ঝাড় সব, ভাবছে মারলে আজ মজা কংসারি হালদারই। কপাল বুঝি ফিরে গেল ব্যাটা বুড়ো শকুনের।

যজমানদের শকুনের চাউনি থেকে বাঁচবার জন্যে হালদার মশায় তাড়াতাড়ি সরাতে চাইলেন সেখান থেকে। হালদার পাড়া লেনের মুখেই একখানা বাড়ীর দোতলা ঘরে তিনি যাত্রী তোলেন। ও বাড়ীর মালিক তাঁর মান রাখতে দরকার হলে খুলে দেয় ঘরখানা এক আধ ঘণ্টার জন্যে। সেই ঘরেই নিয়ে যেতে চাইলেন সকলকে। কিন্তু ওঁরা একেবারেই ধুলো পায়েই দর্শন করলেন মাকে। তাই নাকি করা নিয়ম ওঁদের বংশের। মায়ের স্থানে এসে আগে মায়ের চরণ স্পর্শ করে তবে অন্য কাজ।

কিন্তু চরণ দর্শন, চরণ স্পর্শ। তাই ত!

হালদার মশায়ের ঘাড়ের শিরগুলো একটু টানটান হয়ে উঠল। অন্য সকলে চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। অর্থাৎ দেখতে চায়, কেমন করে কংসারি হালদার তার বড়লোক যজমানকে এমন দিনে মায়ের চরণ স্পর্শ করাবে।

মেয়েদের যে ঢুকতেই দেয় না মন্দিরের মধ্যে। তাই ত!

আর একবার মায়ের মন্দিরের চূড়োর দিকে তাকালেন হালদার মশায়। তার-

পর বললেন, "বেশ, তবে তাই হক। চল, এগিয়ে চল সকলে। হাঁ, ঠিক আমার পেছনে এস। সাবধানে এস। সাবধানে এস, এত গয়নাগাঁটি সুদ্ধ বৌরাণীকে আজকের দিনে না আনলেই ভাল হত মা। আচ্ছা, যা করেন মা, এস তোমরা।"

হালদার মশায় পৌঁছলেন সকলকে নিয়ে উত্তর-পুব কোণের দরজাটায়। তিনি ভাল করেই জানতেন, সে দরজায় মেয়েদের যাওয়া আসা নিষেধ। শুধু পুরুষরা যাবে আসবে সে দরজা দিয়ে। মেয়েরা যাওয়া আসা করছে পুব দিকের মাঝের দরজা দিয়ে, ওখানে মেয়ে পুলিস পাহারা দিচ্ছে। হালদার মশায় ওঁদের ওখানে দাঁড় করিয়ে ছুটলেন ব্যবস্থা করতে।

ব্যবস্থা হতে মিনিট পাঁচেকও লাগল না। হালদার মশায়ের আর এক সম্ভ্রান্ত যজমান, পুলিসের একজন হোমরাচোমরা কর্তা, সঙ্গে এসে কোণের দরজা দিয়ে মেয়েদের ঢোকার হুকুম দিলেন এবং নিজে এগিয়ে গিয়ে ভোগ রান্নার রান্নাঘরের সামনে দিয়ে সকলকে উঠিয়ে দিলেন পুলের ওপর। মন্দিরের মধ্যে যারা ঢুকেছে তারা বেরলেই যাতে হালদার মশায় ঢুকতে পারেন তাঁর যজমানদের নিয়ে, সে ব্যবস্থা করে গেলেন। নিজেদের বানানো ব্যবস্থা নিজেরা ভাঙবার ব্যবস্থা করলেন। হালদার মশায় দেখাবেনই তাঁর যজমানদের যে, কংসারি হালদার এখনও বেঁচে রয়েছে। কংসারি হালদার বেঁচে থাকতে তাঁর যজমান মায়ের চরণ স্পর্শ করতে পারবে না! আচ্ছা, এবার দেখুক সকলে চোখ মেলে কংসারি হালদার কি পারে না পারে।

হালদার মশায় গলা থেকে কোঁচার খুঁট নামিয়ে কোমরে বেঁধে নিলেন শক্ত করে। ডান দিকে তাকালেন একবার। বাঁশ বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে মানুষ-গুলোকে মন্দিরের বারান্দায়। দম প্রায় আটকে এসেছে সকলের, চোখগুলো ফেটে বেরিয়ে আসার মত হয়েছে চাপের চোটে। মন্দিরের ভেতর যাবার দরজাটা পরিষ্কার, ভেতরে ঢোকানো হয়েছে মানুষ। যা ঢোকা উচিত, তার অন্ততঃ তিন গুণ বেশী ঢোকানো হয়েছে। এখন তারা বেরলেই হয়। একেবারে দরজার মুখে দাঁড় করালেন সকলকে হালদার মশায়।

ঝন ঝন ঝনাৎ, শিকল আছড়াতে লাগল দরজার গায়ে লালপাগড়ি-ওয়ালা। "বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস, বাহার আ-যাও।"

আরম্ভ হল বেরনো। দরজার এক ধারে সরিয়ে দাঁড় করালেন হালদার মশায় যজমানদের। নতুন বৌ, তার শাশুড়ী স্বামী আর দুটি মেয়ে, একজন বিবাহিতা, একটি বোধ হয় বিধবা। হালদার মশায় ভাল করে তাদের বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া-টেওয়া কিছুই আর হবার জো নেই, টপ করে

একবার চরণ স্পর্শ করে ফিরে আসা, ব্যস। হালদার মশায় পরে এসে পুজো করে যাবেন।

তারা বুঝলে বোধ হয়। নতুন বৌটির স্বামী সভয়ে বললেন তাঁর মাকে, "তাহলে না হয় আজ ভেতরে নাই বা যাওয়া হল—"

তাঁর কথাটা শেষও হল না, পেছনের ওঁরা সকলে আচমকা মন্দিরের দরজা পার হয়ে গেলেন।

হালদার মশায় দু'হাতে ধরলেন বৌটির আর তার শাশুড়ীর কব্জি দুখানা। মুহূর্তের মধ্যে সিঁড়ি কটা দিয়ে নামিয়ে লোহার বেড়া পার করালেন মায়ের পেছনের ছোট্ট দরজা দিয়ে। তারপরই নীচু হতে হবে। গুঁড়ি মেরে বাঁশের নীচে দিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে মায়ের সামনে। সেটুকুও করালেন। দাঁড় করিয়ে দিলেন নতুন বৌ আর তার শাশুড়ীকে মায়ের সামনে। মিছরিদের তিন চারটি জোয়ান ছেলে রয়েছে মায়ের সামনে। হালদার মশায়কে দেখে আর তাঁর যজমানদের দেখে তারা চক্ষের নিমেষে অবস্থাটা বুঝে ফেললে। এমন দিনে সাধ্য আছে কার, সাহসই বা হত কার, মেয়েদের মন্দিরের মধ্যে ঢোকাবার।

কিন্তু হালদার মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা প্রমাদ গণল। এই বয়সে ভয়ানক সাহস করেছেন তিনি, নিজে একেবারে হলদে হয়ে গেছেন ওদের ভেতরে আনতেই। কেমন যেন মুখের অবস্থাটা হয়ে উঠেছে হালদার মশায়ের। এখন মন্দির থেকে বার করা যায় কি করে, এঁদের।

মিছরিরা চোখে চোখে কথা কয়। চক্ষের নিমিষে মায়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে দিলে বৌটির আর তার শাশুড়ীর। মায়ের কপাল থেকে সিঁদুর নিয়ে লেপটে দিলে বৌটির কপালে। কি একটা দিতে গেল বৌটি মায়ের পায়ে, সেটাও মায়ের খাঁড়া-ধরা-হাতে ঠেকিয়ে ধরিয়ে দিলে বৌটির হাতে। পরমুহূর্তেই ওদের ঘাড় ধরে মাথা নীচু করিয়ে বাঁশ পার করে দিলে। দুজন মিছরি প্রাণপণে লড়তে লাগল সিঁড়ি কটা উঠিয়ে দরজা পার করে দেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত হল তাদের জয়, দরজার বাইরে ছিটকে এসে পড়লেন হালদার মশায়, তখনও তিনি বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছেন শাশুড়ী বৌয়ের কব্জি দুখানা।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে লাগল মিনিট দুয়েক সময়। বৌটির কথা বলারও সামর্থ্য নেই তখন, তার শাশুড়ী শুধু বলতে পারলেন, "ওরা কোথা গেল, ওরা যে—"

তাঁর কথাটা আর শেষ হল না।

হালদার মশায় টলে পড়লেন তাঁদের গায়ের ওপর।

ভয়ঙ্কর কাণ্ড একটা ঘটতে গিয়েও ঘটতে পেল না। টনক নড়ে উঠল সকলের। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল হালদার গুষ্টির যে যেখানে ছিল সবাই। ঘিরে দাঁড়াল পুলিস। তারপর কে কখন কি ভাবে যে ওঁদের সকলকে মায়ের বাড়ির বাইরে এনে ফেললে তা হালদার মশায় জানতেও পারলেন না।

হালদার পাড়া লেনের মুখের সেই দোতলা ঘরেই ওঁদের তুলে দিয়ে সবাই চলে গেল। সেদিন তখন সময় নষ্ট করার মত সময় নেই কারও। সুতরাং যে যতটুকু করতে পারল তাই যথেষ্ট।

হালদার মশায়ও সামলে উঠেছেন ততক্ষণে। মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন তিনি। এ ভাবে যে তাঁর মাথাটা তাঁর সঙ্গে হঠাৎ নিমকহারামি করে বসবে, তা তিনি বুঝতে পারেননি। যজমানরাও ভয়ানক মনমরা হয়ে গেছে। এমন দিনে মন্দিরের মধ্যে যাওয়ার জন্যে আবদার করাটা সত্যিই ঠিক হয়নি।

তবু চরণ স্পর্শ করা হয়েছে ঠিক। মায়ের কপালের সিঁদুর নতুন বৌয়ের কপালময় লেপে রয়েছে। বৌটি তখনও মুঠির মধ্যে ধরে আছে মায়ের খাঁড়া-ধরা-হাতে ছোঁয়ানো সোনার মোহরটি। সুতরাং সবই ঠিকঠাক হয়ে গেছে। হালদার মশায় চেয়ে দেখলেন যজমানদের দিকে। দামী কাপড় জামাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ওঁরা পরম তৃপ্ত। তৃপ্তির আলোয় জ্বলছে ওঁদের মুখ চোখ। গিন্নী বারবার বলছেন, "দেখ বৌমা, ভাল করে চিনে নাও। এঁরা আমাদের তীর্থগুরু। তোমার শ্বশুর বংশের ভালমন্দের জন্যে এঁরাই দায়ী। ইনি না থাকলে আর কার সাধ্য ছিল বল আজকের দিনে আমাদের মায়ের চরণ স্পর্শ করাবার। আর কে পারত এ কাজ—"

বৌমাটি তখন মাথা নীচু করে এক হাতে দেখে নিচ্ছে তার কানের মাথার গলার গয়নাগাঁটিগুলো। হঠাৎ একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল: আর্তনাদ ঠিক নয়, কেমন যেন একটা বোবা গোঙানি।

চমকে উঠল সকলে। ঘিরে দাঁড়াল বৌটিকে। পরমুহূর্তেই হালদার মশায় লাফিয়ে উঠলেন আবার।

"কি হল! কি গেছে?"

গেছে একটি মহামূল্য হার বৌয়ের গলা থেকে। তাতে সোনা যা আছে তার জন্যে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু আছে একখানি লকেট সেই হারের সঙ্গে। লকেটখানির মূল্য অপরিসীম। সেখানা হারালে কিছুতেই চলবে না। সেই লকেটের মধ্যে আছে এমন জিনিস, যা এই বংশের প্রথম বৌকে, আগাগোড়া গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হয় শ্বশুরবাড়ীতে পা দিয়েই। তারপর তার ছেলের বৌ

এলে তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি। নয়ত ভয়ানক একটা কিছু অমঙ্গল ঘটবেই বংশে।

হালদার মশায় আর শুনলেন না লকেটের গুণব্যাখ্যান। যাই থাক সেই লকেটে, লকেট কিন্তু পাওয়া চাই।

তিনি ছুটলেন আবার। তরতর করে নামতে লাগলেন সি ডি দিয়ে। ওঁরা বাধা দেবার ফুরসতই পেলেন না। বাধা দেবার মত অবস্থাও ছিল না তখন ওঁদের, এতটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন সকলে লকেট হাবিয়ে। সকলে নেমে গেলেন রাস্তায় হালদার মশায়ের পিছু পিছু।

আবার সেই পুলিসের কর্তাকে ধবলেন গিয়ে হালদার মশায়। জড হল হালদার গুষ্টির কর্তা ব্যক্তিরা। কি করা প্রয়োজন ঠিক হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। বন্ধ কর মায়ের বাড়ির সব কটা দরজা। চোথা চোথা পুলিসের লোক দাঁড়াক সব দরজায়। দেখে দেখে লোক ছাড়ুক। সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে ছাডবে না কিছুতে। এমন কি তেমন কোনও মেয়ে দেখলেও তাকে খানাতল্লাশ না করে ছাডবে না। হারটা ছিঁডেই নেওয়া হয়েছে গলা থেকে। দাগও দেখা গেল গলায়। ছিঁডে না নিলে ও হার নেওয়াই যাবে না। হারটা পডতেই পারে না বৌয়ের মাথা গলে। খোলবার বন্ধ করবার ব্যবস্থাও ছিল না হারে।

সুতরাং বাজাও বাঁশী। এখনও যদি চোর ভেতরে থাকে ত আটকা পডবেই। বাজাও বাঁশী।

পুলিসের বাঁশী বাজতে শুরু হল। একটা বাজতেই বেজে উঠল একশটা। বন্ধ হল মায়ের বাড়ির সব কটা দরজা। দেখে দেখে লোক ছাডা আরম্ভ হল। ছুঁদে পুলিস অফিসার কয়েকজন ঢুকলেন ওঁদের নিয়ে মায়ের বাডীতে।

অসম্ভব। এ একেবারে অসম্ভব আশা। সৃষ্টি সুদ্ধ মানুষ জমেছে মায়ের বাডীর মধ্যে। এর ভেতর থেকে চোর খুঁজে বার করার আশা করা পাগলামি ছাডা আর কিছুই নয়। মাথায় হাত দিয়ে বসে পডলেন হালদার মশায়ের যজমান গিন্নী মায়েরা উঠোনে।

গর্জন করতে লাগল পুলিসের চোঙা।

"আপনারা ব্যস্ত হবেন না। দয়া করে একে একে বেরিয়ে যাবেন মায়ের বাডী থেকে। আপনারা যদি ব্যস্ত না হন আর একটু সাহায্য করেন তাহলে একজন দুর্দান্ত চোরকে এখনই আমরা ধরতে পারব। সে আছে এখন এখানেই, আপনারা দয়া করে বিরক্ত হবেন না। আপনাদের এই কষ্টটুকু দিতে হচ্ছে বলে আমরা লজ্জিত। কিন্তু আজকের দিনের যে বদমাশ মায়ের বাড়ির মধ্যে মেয়েদের গা

থেকে গহনা ছিনিয়ে নিয়েছে তাকে ধরা চাই। সুতরাং দয়া করে আপনারা একে একে শান্তভাবে বেরিয়ে যান। পুলিস ভাল লোককে আটকাবে না, ভাল লোককে অনর্থক কষ্ট দেবে না। আপনারা সাহায্য করুন।"

বার বার বলা হতে লাগল এক কথা চোঙায়। মায়ের বাড়ির ভেতরে বাইরে গণ্ডা গণ্ডা চোঙা খাটিয়েছে পুলিস। আকাশ বাতাস থরথর করে কাঁপতে লাগল পুলিসের গর্জনে।

বৃথা আশা।

আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। এক এক মিনিট যেন এক এক ঘণ্টা মনে হতে লাগল হালদার মশায়ের। তিনি দুমদুম করে মায়ের মন্দিরের গায়ে মাথা কোটা শুরু করলেন।

আচম্বিতে হৈ হৈ ধর ধর মার মার রোল উঠল মন্দিরের ওধার থেকে। তীর-বেগে একটা ছোঁড়া ছুটে এল মন্দিরের পশ্চিম দিকের বারান্দার ওপর দিয়ে। চরণামৃত নেওয়ার নর্দমার ওপর পর্যন্ত এসেই রেলিং টপকে ঝাঁপ দিলে নীচে। নামল একেবারে ফিনকির গায়ের ওপর। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফিনকি। পরমুহূর্তেই তা[illegible] কি যেন একটা সড়াৎ করে নেমে গেল তার পিঠ বেয়ে জামার নীচে দিয়ে। ঠাণ্ডা কি একটা জিনিস সোজা হয়ে উঠতেই সে পারল না কিছুক্ষণ। তার ওপর দিয়ে মানুষ ছুটতে লাগল।

মাথা তুলে সোজা হয়ে যখন দাঁড়াতে পারল ফিনকি, তখন তার মুখ ফুলে গেছে। কানে আসছে ভয়ানক গোলমাল, মার মার শব্দ আর একটা মর্মন্তুদ আর্তনাদ উঠছে ওধারে। কি হয়েছে, কে ধরা পড়েছে, তা জানবারও উপায় নেই। কার সাধ্য এগোয় ওদিকে।

কিন্তু নামল কি একটা পিঠ বেয়ে যেন।

ফিনকি সরে গিয়ে দাঁড়াল মন্দির ঘেঁষে। হাত ঘুরিয়ে বহু চেষ্টায় টিপে ধরলে সেটাকে জামার ওপর থেকে। পেছন দিকে কোমরের কাছে আটকে রয়েছে। তারপর টেনে বার করলে সেটা। সঙ্গে সঙ্গে তার দুই চোখ কপালে উঠে গেল। হাতের মুঠিতে চেপে ধরে কোনও রকমে সে এগুতে লাগল সামনের দিকে মন্দিরের গা ঘেঁষে।

ততক্ষণে পুলিস ভিড় হটাতে আরম্ভ করছে।

"চলে যান, আপনারা অনর্থক ভিড় করবেন না, একে একে বেরিয়ে যান মায়ের বাড়ি থেকে।"

এর ওর তার পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছলে ফিনকি এগিয়ে গেল। ঐ যে, তোলা

হয়েছে চোরকে পুলের ওপর।

আরে, এ যে ধনা।

ইস, কি অবস্থা হয়েছে ওর চোখ মুখের।

ফিনকি আরও এগিয়ে গেল।

ঐ ত হালদার মশায় না। মাথা খুঁড়ছেন কেন উনি ওভাবে।

স্পষ্ট শুনতে পেল ফিনকি হালদার মশায় বলছেন, "দে বাবা ধনু, বলে দে তুই, কোথায় ফেলেছিস সেটা। ও হারে যতটা সোনা আছে তার দাম তোকে আমি এখুনই দিচ্ছি। আমার মুখটা রাখ বাবা—"

কে একজন হুংকার দিয়ে উঠল, "থামুন আপনি, থামুন। দেখছি আমরা ও বলে কি না।"

তারপর উঠল আবার একটা বুক-মোচড়ানো চিৎকার। যেন কার ঘাড় মুচড়ে দেওয়া হল।

আবার একজন গর্জে উঠল, "তা হলে পালাচ্ছিলে কেন তুমি?"

কি যেন বলতে গেল ধনু, বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। আবার ককিয়ে কেঁদে উঠল।

হালদার মশায় মুখ তুললেন। তাঁর কপাল ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরছে।

ফিনকি আর ঠিক থাকতে পারলে না। নীচে থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, "হালদার মশায়, পেয়েছি আমি, পেয়েছি সেটা, এই দেখুন।"

সমস্ত লোকের নজর গিয়ে পড়ল তার দিকে। পুলের নীচে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া-খোঁড়া ময়লা কাপড় পরা মেয়েটা ডান হাত তুলে চেঁচাচ্ছে। তার হাতে ঝুলছে সেই হার, চকচক করছে হার ছড়া। সেই লকেটটিও দুলছে হারের তলায়।

এক দিনের জন্যে রাণী হয়ে গেল ফিনকি।

একটি মাত্র প্রশ্নের জবাব দিতে হল ওকে।

"কোথায় পেলে তুমি মা হার ছড়া?"

"কুড়িয়ে পেলাম মায়ের চরণামৃত নেওয়ার নর্দমায়।" একটা ছোট্ট ঢোঁক গিলে ফিনকি বললে।

ব্যস—আর একটি কথাও কেউ জিজ্ঞাসা করলে না ওকে। হতদরিদ্র মেয়েটাকে মাথায় তুলে নাচতে লাগল সকলে। তৎক্ষণাৎ নতুন শাড়ী সায়া জামা পরানো হল, নগদ পঁচিশ টাকা দিয়ে প্রণাম করল কুমারীকে নতুন বৌটি। তার শাশুড়ী দিলেন নিজের কড়ে আঙুল থেকে আংটি খুলে ওর আঙুলে পরিয়ে।

আংটিটি চলচল করতে লাগল। আরও পঞ্চাশজন যাত্রী টাকা পয়সা ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ওর পায়ের কাছে। নাটমন্দিরে ওকে দাঁড করিয়ে প্রণাম করা শুরু হয়ে গেল।

হালদার মশাই একটিবারের জন্যে নডলেন না ওর পাশ থেকে। তাঁর যজমানরা তাঁকে ওখানে প্রণাম করেই বিদেয় নিলে। এতবড একটা ঘটনা ঘটার দরুণই বোধ হয় তাঁর দুই ছেলে এসে উপস্থিত হল মায়ের বাড়িতে। বাপ মারা যাচ্ছে শুনেই বোধ হয় ছুটে এসেছিল তারা। কাজেই যজমানদের তারাই বিদেয় দিলে। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। হালদার মশায় যা কিছু পেলেন, তা তারাই নিয়ে গেল বাড়ীতে। হালদার মশায় কিছুতেই সে সময় বাড়ী যেতে রাজী হলেন না। এমন কি নাকে মুখে একটু জলও দিলেন না তিনি। ঠায় বসে রইলেন মেয়েটার পাশে।

তারপর এক সময় টাকা পয়সা সব কুড়িয়ে মেয়েটার আঁচলে বেঁধে দিয়ে বললেন, "চল ত মা, এবার তোর বাড়ীতে পৌছে দি তোকে।"

বেশ ঘাবড়িয়ে গেল ফিনকি। কেন, তাকে আবার পৌছে দিতে যাবেন কেন হালদার মশাই। সে ত একলাই বেশ যেতে পারবে। আর সেই হতচ্ছাড়া বাড়ীতে নিয়েই বা সে যাবে কি করে হালদার মশায়কে।

কিন্তু কোনও আপত্তিই খাটল না। একটু যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে, যেন একটু কেমন টলতে টলতে ফিনকির হাত ধরে হালদার মশায় বেরিয়ে গেলেন নহবতখানার নীচের গেট দিয়ে। সবাই চেয়ে রইল, অনেকে আবার চেয়েও দেখলে না। হালদার মশায় কিন্তু কারও দিকে তাকালেন না। ফিনকি শুধু এ-ভাবে সেজেগুজে সকলের চোখের সামনে দিয়ে হালদার মশায়ের হাত ধরে বেরিয়ে যেতে লজ্জায় মরে যেতে লাগল। মাথা নীচু করে সে বের সেদিন মায়ের বাড়ী থেকে। তবে রাণীর মত বেরিয়ে গেল, কিন্তু মুখখানি নুইয়ে।

মুখ আর তুলতেই পারল না ফিনকি বেশ কয়েকটা দিন। হেন মানুষ নেই যে তারপর সেধে ওদের বাড়ীতে এসে দুকথা শুনিয়ে গেল না ওকে আর ওর মাকে।

"এমন হাবা মেয়ে মা তোমার, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে।"

"কপাল মা, সবই তোমার ঐ পোড়া কপালের লেখন। ঐ সোনাটুকু দিয়েই পার করেত পারতে ঐ আপদকে।"

"মেয়েরও কপাল মা, বলে কপালে নেইক ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি।"

"তা নয় গো তা নয়। হাড় বিচ্ছু মেয়ে বাবা, হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি। যখন

দেখলে ওর ঐ ধনাকে মেরে তুলো ধুনে দিচ্ছে তখন আর থাকতে পারলে না।"

"ও বাছা, ও সব আমরা বুঝি। বুঝলে, সবই আমরা বুঝি। ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে হবে ত।"

সকলের সমস্ত রকম মতামত ঘরের ভেতর মুখ লুকিয়ে বসে শোনে ফিনকি। তার মা দাঁতে দাঁত দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন পাকা মেঝের দিকে চেয়ে। রাতে যখন বাড়ি ফেরে ফণা, তখন তাকে মা বলেন, "হ্যাঁ রে বাবা, আর কোথাও কি একটু মাথা গুঁজে থাকার ঠাঁই জোটে না কিছুতে।" বোন ফিনকি দাদা ফণাকে খুব লুকিয়ে বলে, "দাদা আমাদের নিয়ে চল কোথাও, আর যে পারি না আমি এখানে এভাবে মরতে।" নিরুপায় দাদা দাঁতে দাঁত ঘষে আর গর্জায়, "শালা শালীরা আমার সামনে কিছু বলতে আসে না কেন কোনও দিন। টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব কামড়ে।" কিন্তু কামড়াকামড়ি সত্যিই করতে যাবে না ফণা। কারণ ওরা তিনজন মরমে মরে আছে যে। আজ যদি ফণার বাবা থাকত, অন্ততঃ কোথায় সে লুকিয়ে আছে এটুকুও যদি জানতে পারত ওরা, তাহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারত ফণা। মুখ লুকিয়ে থাকতে হত না ওর মাকে। আর বোনটাকেও ওভাবে কেউ বেইজ্জত করতে পারত না। সাহসই করত না কেউ ওদের মুখের ওপর কথা বলতে। ঐ একটি মাত্র দগদগে ঘা আছে যেখানে কেউ ছুঁলে যন্ত্রণায় শিউরে ওঠে ছেলে মেয়ে মা তিনজনেই। তাই ওরা মুখ বুজে সহ্য করে সব, অনবরত চেষ্টা করে যাতে ঐ কথাটা উঠে না পড়ে কোনও মতে। আর মানুষেও ঠিক ঐ দগদগে ঘা-খানার ওপরেই চিমটি কাটে।

ফণা ফিনকির বাবা পালিয়ে গেছে।

ওদের বাবা লুকিয়ে আছে কোথাও।

কেন লুকিয়ে আছে, কি এমন করেছে যে লুকিয়ে আছে সে? লুকিয়ে থাকবে আর কতকাল? কোথায় লুকিয়ে আছে?

ছেলে মেয়ে দুজনের মনেই এ জাতের অনেক প্রশ্ন অনেকবার মাথা তুলে উঁকি মারে। কিন্তু কিছুই জানার উপায় নেই সঠিক। নানা জনে নানা কথা বলে। কেউ বলে চুরি করে গা ঢাকা দিয়েছে ধরা পড়বার ভয়ে। কিন্তু কবে সে বার কি চুরি করেছে তা কেউ বলতে পারে না। কেউ বলে সাধু হয়ে চলে গেছে তপস্যা করতে। কিন্তু কোথায় গেছে তপস্যা করতে তাও কেউ বলতে পারে না। আবার এমন কথাও অনেকে বলতে ছাড়ে না যে লোকটা পালিয়েছে নিজের ঐ বৌয়ের জ্বালায়। তারপর সব এমন কথা বলে যা ফণা ফিনকির শুনলেও পাপ হয়।

তাদের মা, হাড-চামড়া-সার মা তাদের, শতছিন্ন একখানা কয়লার মত কালো শাড়ী আর হাতে দুগাছি শাঁখা পরা জনম দুঃখিনী তাদের জননীকে কেউ কিছু বলছে মনে হলেই, তারা পালায় সেখান থেকে। ঝগড়াঝাঁটি বাদ প্রতিবাদ করার, এমন কি মুখ তুলে টুঁ শব্দটি করারও আর সামর্থ্য থাকে না ছেলে মেয়ের। ঘরে ফিরে মাকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয় না কোন কথা।

বাবা কেন গেল, কোথায় গেল, কবে ফিরবে এ প্রশ্নগুলো জানতে চাইলেও যে বোবা মা কি ভাবে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরেন এটুকু ওরা চাক্ষুষ দেখে কি না। কাজেই বোবা হয়ে থাকে।

বোবার নাকি শত্রু থাকতে নেই।

ওরা ভাই বোন কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝেছে যে বোবার শত্রু সবাই। মুখ ছোটাতে পারলে অনেক আপদ বালাই দূরে ঠেকিয়ে রাখা যায়। বোবা হয়ে থাকলে আপদ বালাই হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে ঘাড়ে। জানে যে বোবারা বড় জোর দাঁত খিঁচুবে, মুখের জোরে ভূতও আর ভাগাতে পারবে না।

কিন্তু দাঁত খিঁচিয়েই সেদিন এক ভূতকে তাড়িয়ে ছাড়লে ফিনকি। হ্যাঁ, শুধু দাঁত খিঁচিয়েই তাড়ালে তাকে, বরং বলা চলে দাঁতও খিঁচুতে হল না তাকে তাড়াতে। চোখ বাঁকা করে চাইতেই সুড়সুড় করে সরে পড়ল সে। আর মুখখানাকে এমন করে গেল যে সে মুখ মনে পড়লেই হাসির ঠেলায় দম ফেটে মরবার দশা হয় ফিনকির। পাকা চোরেরাই ও রকম কাঁচুমাচু করতে পারে মুখের অবস্থা, আর সেই জন্যেই অত মার খেয়ে মরে।

সে দিন সকাল হবার আগে থেকে টিপ টিপে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। সারাটা দিন ফিনকি আটকে রইল ঘরে। বিকেলের দিকে জলটা একটু ধরল, চিকচিকে রোদ দেখা দিল একটু। ঘরে নেই এক ফোঁটা কেরোসিন, কাজেই একটিবার বেরতে হল ফিনকিকে বোতলটা হাতে করে। মা বললেন, "যাবি আর আসবি, বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়ে একটা কিছু বাধিয়ে বসিস না যেন এ সময়।" ফিনকি ছুটল, এক রকম ছুটেই বেরল বাড়ি থেকে। কিন্তু আর ছোটা সম্ভব নয়, গলিতে একহাঁটু কাদা। কাজেই পা টিপে টিপে কাদা বাঁচিয়ে সে এগতে লাগল। গলি থেকে রাস্তায় উঠতেই একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল সে। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "একবারটি সোনার কাতিকের ঘাটে যাবি সন্ধ্যেবেলা. একটু কথা আছে।" বলেই হনহন করে সোজা চলে গেল।

এমন হকচকিয়ে উঠেছিল ফিনকি যে প্রথমে বুঝতেই পারেনি মানুষটা কে। অনেকটা এগিয়ে গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে চাইলে সে ফিনকির দিকে। তখন ফিনকি চিনতে পারলে। ওবে মুখপোড়া হনুমান এতখানি সাহস তোর! আচ্ছা দাঁড়া।

তেল নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিনকি ফিরে গেল ঘরে। তারপর ভাবতে বসল। আচ্ছা কি কথা আছে ওর! ফিনকির সঙ্গে ওর কি এমন কথা থাকতে পারে। আর অমন করে লুকিয়েই বা ও বলে গেল কেন ফিনকিকে সোনার কার্তিকের ঘাটে যাবার জন্যে? যা বলবার তা ওখানে বলে গেলেই ত পারত, সে কথা শোনবার জন্যে সোনার কার্তিকের ঘাটে যেতে হবে কেন?

নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে ভেতরে। পাকা চোর ত ওটা, চোরের মন পুঁই আদাড়ে। হয়ত কোনও বদ মতলব থাকতে পারে ওর পেটে। কিন্তু সে সব মতলব থাকলেই বা করবে কি ও ফিনকির! ওঃ, ভারি আমার নবাব রে, ওঁর ডাকে অমনি আমি ছুটলুম আর কি ঘাটে।

এই পর্যন্ত মনে মনে ভেবে ফিনকি নবাবটিকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে চাইলে মন থেকে। তারপর ঘর ঝাঁট দিলে, কেরোসিন পুরলে বাতিতে, ঘরের মেঝেয় মায়ের আর তার বিছানাটা পেতে ফেললে। দাদার ধুতিখানা কুঁচিয়ে রাখলে তার তক্তপোশের ধারে, কাজ থেকে ফিরে আড়তের কাপড় ছেড়ে ফেলে দাদা। তারপর আর কোনও কাজ খুঁজে না পেয়ে নিজের জট-পাকানো চুলগুলো নিয়ে একটা দাড়াভাঙা চিরুনি দিয়ে টানাটানি করতে বসল। তখন আবার নতুন করে মনে পড়ে গেল সেই চোয়াড় ভূতটির কথা।

আচ্ছা কি এমন কথা আছে ওর।

যদি যায়ই ফিনকি সেই ঘাটে, তাহলে কিই বা করতে পারে সে ফিনকির। ওঃ, অমনি করলেই হল কিছু। দাঁত নেই ফিনকির, এক কামড়ে এক খাবলা মাংস তুলে নেবে না ওর গা থেকে। মার খেয়ে মরেই যেত সেদিন, ভাগ্যে ফিনকির দয়া হল। হ্যাঁ, দয়াই ত, দয়া করেই ত সে ফেরত দিলে হারটা। দয়া নয় ত কি? চুপচাপ থেকে সব ঠাণ্ডা হলে যদি সে ওটা বাড়ি নিয়ে আসত ত কি হত? মার খেতে খেতে বাছাধনকে সেদিন ঐ মায়ের বাড়িতেই চোখ ওলটাতে হত। আবার সাহস দেখাতে এসেছে ফিনকির কাছে, মড়া খেকো যম কোথাকার।

কিন্তু যদি ফিনকি যায় ত সে বলবে কি ওকে!

চেনা নেই জানা নেই, জীবনে কখনও ওর সঙ্গে ফিনকি কথা বলেনি। কে এক ধনা না ধনা। দেখেছে অনেকবার ওকে মায়ের বাড়িতে, এধারে ওধারে।

সবাই ওর নাম জানে, সবাই জানে যে ও হল কে এক তালাধরার ছেলে, এই কালী-ঘাটেই থাকে। পকেট মারতে গিয়ে প্রায়ই মারধোর খায়, মারধোর দিয়েই ছেড়ে দেয় ওকে সকলে। তাই সবাই ওর নাম জানে। সেই ধনার এমন কি কথা থাকতে পারে ফিনকির সঙ্গে! কি বলবে সে ফিনকিকে যদি ফিনকি যায় এখন ঘাটে?

নচ্ছারের বেহদ্দ বাঁদরটা। ওর জন্যেই এত কথা এখন শুনতে হয় ফিনকিকে। লোকে মনে করে যেন কতকালের ভাব ওর সঙ্গে ফিনকির। লোকে বাড়ি বয়ে এসে মুখের ওপর বলে যায় যাচ্ছেতাই সব কথা। কেন বাঁদরটা ওর জামার মধ্যেই বা ফেলতে গেল সেদিন হারছড়াটা। আচ্ছা, ওই ধনাই যে ফেলেছিল হার ওর জামার মধ্যে তাই বা কে বললে। এমনও ত হতে পারে যে ও শুধু শুধু মার খেয়ে মরছিল। ও পকেট মারে বলেই ওকে ধরে পিটানো হচ্ছিল। আসলে যে লোক ছিঁড়ে নিয়েছিল ঐ হারটা বৌটির গলা থেকে, তাকে মোটে ধরতেই পারে নি কেউ, আর সেই লোকটাই হারছড়া ফিনকির ঘাড়ের কাছ দিয়ে জামার ভেতর ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ল।

আচ্ছা, কি হয় একবার গেলে ঘাটে এখন।

কি করতে পারে ঐ ছোড়া, ফিনকির।

ওঃ অমনি করলেই হল কিনা কিছু, ছেলেমানুষ কিনা ফিনকি এখনও।

কিন্তু যদি কেউ দেখেটেখে ফেলে।

কে দেখবে এখন? দেখবার জন্যে কে এখন হাঁ করে বসে আছে সেই ঘাটে?

আর দেখলেই বা হবে কি?

কার কথার তোয়াক্কা করে ফিনকি?

দেখুক না কে দেখবে, বলুক না কে কি বলবে। এমনই মিছিমিছি যখন এত কথা বলছে লোকে তখন যাবে ফিনকি ঘাটে। বলুক লোকে যা বলবার। লোকের কথার মুখে ফিনকি লাথি মারে এই এমনি করে।

সত্যিই পা'টা ঠুকে ফেললে ফিনকি মেঝেয়।

কিন্তু তারপর। এখন মাকে কি বলে বেরনো যায় বাড়ী থেকে? একটু পরেই ত মা সন্ধ্যে করতে বসবে আসনে।

তখন ফিনকিও দেবে এক ছুট। শুধু বলে যাবে, "ঐ যাঃ, পয়সা কটা আবার ফেলে এসেছি মুদির দোকানে।" বলেই দেবে ছুট, মা বাধা দেবার ফুরসতই পাবে না।

যথা সঙ্কল্প তথা সিদ্ধি।

পৌঁছল ফিনকি ঘাটে। একে মেঘলা দিনের সন্ধ্যে, তার ওপর কাদায় এমন পিছল হয়েছে পথঘাট যে আছাড় খেয়ে মরবার শখ না চাপলে কেউ সহজে বেরবে না ঘর ছেড়ে।

কাক পক্ষী নেই ঘাটে। বেশ একটু কোল-আঁধারে গোছের হয়ে উঠেছে। ফিনকির মনে হল, এতক্ষণ পরে তার খেয়াল হল কথাটা, যে এসে হয়ত সে ভাল কাজ করে নি। গেল কোথায় ছোঁড়াটা।

মানে ফিনকি এ কথাটা একরকম ধরেই নিয়েছিল যে সে থাকবেই ঘাটে। এসেই ফিনকি তার দেখা পাবে। কিন্তু একি! কেউ নেই ত কোথাও!

একবার ঘুরে দেখল ফিনকি সব ঘাটটা। না কেউ নেই কোথাও। গোটা কতক কুকুর শুধু পড়ে রয়েছে এক কোণে কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে। আর একেবারে ভেতর দিকে বৃষ্টির ছাট যাতে না লাগে গায়ে এমন এক কোণে কে একটা ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে।

তখন আর করবে কি ফিনকি, দেরী করার উপায় নেই তার। কাজেই ফিরল। গোটা কতক সিঁড়ি নেমে মায়ের ঘাটে উঠতে যাবে এমন সময় ঠিক পেছনে শুনতে পেলে, "এই, ফিরে যাচ্ছিস যে?"

ফিনকি ঘুরে দাঁড়াল টপ করে।

আরে আবার দাঁত বার করে হাসছে যে!

দুই চোখে আগুনের ফিনকি ছুটল ফিনকির। মুখটা একদম ফাঁকই হল না তার। দাঁতের ভেতর থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, "ডেকেছ কেন?" আর একজনের দাঁতও বন্ধ হল তৎক্ষণাৎ। খাবি খাবার মত একবার হাঁ করলে সে, বোধ হয় কিছুই বলতে চাইলে, পারলে না।

আবার ফিনকি সেই সুরে সেই রকম ভাবে ওর চোখের দিকে চেয়ে বললে, "কই বল না, কি বলবে।"

জবাব হল শুধু খানিকটা তোতলামি—"এ এ এ এই তা তা এই মা মা মানে—"

ধমকে উঠল ফিনকি, "বল না ভাল করে, কি বলতে চাও।"

তোতলামি বন্ধ হল। শুধু সে জুলজুল করে চেয়ে রইল ফিনকির চোখের দিকে। নিজের হাত দুটো নিয়ে যে কি করবে ঠিকই করতে পারছে না যেন। অনবরত দুহাত মোচড়াতে লাগল।

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল ফিনকির, অবস্থা দেখে। হাসি চেপে গলার সুরটা বেশ নরম করে বললে, "ছিঃ, চুরি কর কেন? অত মার খাও তবু লজ্জা করে না তোমার?"

এতক্ষণ পরে আজওয়াজ ফুটল গলায়। কেমন যেন কান্নার মত শোনাল কথা কটা, "চুরি আর আমি করব না, মাইরি বলছি তোকে, আর কখ্খনো আমি ও সব কাজে হাত দেব না।"

ফিনকি বললে, "তাহলে আর তোমায় ধরে কেউ ঠেঙাবেও না। কিন্তু আমায় ডেকে আনলে কেন? শীগ্‌গির বল, এক্ষুণি না গেলে মা টের পাবে।"

হঠাৎ সে নড়ে উঠল। পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কি একটা বার করলে। ঝাঁ করে ধরলে ফিনকির হাত। তারপরই তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে খালের ভেতর মিলিয়ে গেল।

ব্যাপারটা ঘটল চোখের পলক না ফেলতেই। বেশ ভেবাচাকা খেয়ে গেল ফিনকি, তারপর সে টের পেলে যে তার হাতের মুঠোয় কাগজে মোড়া কি একটা শক্ত জিনিস যেন রয়েছে।

কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই তখন। তাড়াতাড়ি ফিরে চলল ফিনকি। এমন পেছল যে তাড়াতাড়ি পা ফেলার উপায় নেই। গলিতে গ্যাস জ্বলে উঠেছে। ফিনকির সাহস হল না কোনও গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে কাগজের মোড়কটা খুলে দেখে কি হাতে গুঁজে দিয়ে গেল সে। দেরী না হয়ে যায় বাড়ী ফিরতে। আঁচলের খুঁটটা সে টিপে দেখে নিলে। কেরোসিন আনার ফেরত পয়সা কটা ঠিকই আছে আঁচলে। গিয়েই মায়ের সামনে পয়সা কটা নামিয়ে দিয়ে বলবে যে, কি ঝঞ্ঝাট করে পয়সা কটা আদায় করতে হল তাকে দোকানীর কাছ থেকে। কাল সকালে গেলে কিছুতেই আর দিত না দোকানী। ব্যস, কোনও গোলমাল হবে না।

কিন্তু কি ও দিয়ে গেল হাতে গুঁজে।

যাই হোক, সে এক সময় দেখলেই হবে। পেটের কাছে গুঁজে ফেললে ফিনকি জিনিসটাকে। তখন তার আবার মনে পড়ে গেল সেই মুখখানার অবস্থাটা। ভয়ানক হাসিও পেয়ে গেল ফিনকির। চোর না হলে কেউই ও রকম কাঁচুমাচু করতে পারে মুখ। অসম্ভব।

দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই, অন্ততঃ থাকা উচিত নয়, এইই হল কংসারি হালদার মশায়ের সুচিন্তিত অভিমত। অনেক দেখে অনেক শুনে শেষ পর্যন্ত এইই তাঁর ধারণা হয়েছে। নয়ত এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে যে দিনের পর দিন তিনি ঘরে বন্ধ হয়ে রয়েছেন, রাতের পর রাত তিনি চুপ করে চিত হয়ে শুয়ে

আছেন বিছানায় আর তাঁর লাঠিখানা ঐ কোণে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেয়াল ঠেস দিয়ে। ঠিক সময় সূর্য উঠছে, মায়ের মন্দির খুলছে, মায়ের রান্নাঘরে ভোগ চাপছে, লোকে মাকে দর্শন করতে আসছে, ডালাধরারা ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরছে মায়ের বাড়ীর ভেতরে বাইরে, টিনের কৌটো-ধরারা আর ভাঙা সরা-ধরারা রাস্তায় ঘাটে কাতরাচ্ছে, কুমারীর গর্ভধারিণীরা কুমারী হবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নাম-না-জানা জন্তু জানোয়ারের দুধ থেকে তৈরী সন্দেশচটকানো মায়ের মুখের সামনে ধরা হচ্ছে। ওধারে গঙ্গাটায় শুকনো ধুলো উড়ছে, কেওড়াতলার ধোঁয়ার গন্ধ ঘরে শুয়েও হালদার মশায় নাকে টানছেন। আর মায়ের মন্দির যখন বন্ধ হযে যাচ্ছে, সেই নিশা মহানিশায় মাযের বাড়ীর আশে পাশে রাস্তায় ঘাটে গলিত কুষ্ঠওয়ালা গোদা গড়িযে গড়িযে গিয়ে নাক কান খসে যাওয়া পক্ষাঘাতে পঙ্গু সুন্দরীর পাশে স্থান পাবার জন্যে কানা উড়েটার সঙ্গে নিঃশব্দে খামচা খামচি করছে। নামছে, সবাই নেমে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে, এক হয়ে যাচ্ছে। এতকাল পরে ছুটি পেয়ে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে হালদার মশায় একটি বড় মিষ্টি সুর শুনতে পাচ্ছেন, গুনগুন করে যেন কে গান গাইছে তাঁর কানেব কাছে। নামার গান, সব এক হয়ে মিশে গিয়ে পথের ধুলোয় সমান হওয়ার গান।

মনে মনে দিবারাত্র অষ্টপ্রহর হালদার মশায় সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছেন আগা-গোড়া জীবনটাকে। জীবনভোর কত কি খেয়েছেন পরেছেন, বা কার কাছে কতটুকু পেয়েছেন, কাকে কি দিয়েছেন, এ সমস্ত হিসেব নিকেশ তাঁব মনেও পড়ছে না। শুধু কত রকমেব কত কি দেখেছেন, কেমন কবে আগাগোড়াব সব কিছু পালটাতে পালটাতে কি রূপ ধারণ কবেছে এখন, এই সমস্ত মিলিযে মিলিয়ে দেখছেন হালদার মশায। যতই মিলিয়ে দেখছেন ততই তাঁব ধাবণা হচ্ছে, দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই, অন্ততঃ থাকা উচিত নয়।

হালদার মশায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে একবার ঘুরে এলেন আগাগোড়া কালীঘাটটা। সেই উত্তরে পোলের কাছ থেকে দক্ষিণে কেওড়াতলা পযন্ত আর পুবের সেই ট্রাম রাস্তা থেকে পশ্চিমে খাল পযন্ত। ব্যস, বলা উচিত এইটুকুই কালীঘাট। কিন্তু তাও ঠিক নয়, কালীঘাট মানে হল সেইটুকু স্থান, যেখানে থাকে তারা, যারা কালীবাড়ী আছে বলেই টিকে আছে, যাদের বাঁচা মরা নির্ভর করে মা-কালীর বাঁচা মরার ওপর। আচম্বিতে যদি এমন হয় যে মা তাঁর মন্দির সুদ্ধ রাতারাতি অন্তর্ধান করেন কালীঘাট থেকে! এমন হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়, তাহলে এতগুলো মানুষ করবে কি! রাত পোহালে যখন সবাই দেখবে যে মন্দির নেই, কিছুই নেই; একটি অতলস্পর্শ দ হাঁ করে রয়েছে ঐ জায়গায়, তখন মানুষ-

গুলোর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে! মন্দির আছে, মা-কালী আছে, তাই ওরা আছে। একটি মাত্র পেশা সকলের, পেশাটির নাম মা-কালী পেশা। মানে মা-কালীর নামে হাত পাতা পেশা। ওই পেশারই কয়েকটা ধাপ বানানো হয়েছে। যারা ডাল ধরে, যারা ঘাটে বসে পিণ্ডি দেওয়ায়, যারা নাটমন্দিরে বসে হোম, যাগ করে মাদুলি দেয়, এরা সব উঁচু ধাপের লোক। এরা মনে করে যারা রাস্তায় ঘাটে চেঁচায় আর কাতরায়—তাদের থেকে এদের পেশাটা বেশী সম্মানের পেশা। যেমন ঐ ওধারে, খালধারে টিনের খুপরির দরজায় যে জীবগুলো সেজেগুজে হা-পিত্যেশ করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারাও মনে করে যে, রাস্তায় যারা গড়াগড়ি খাচ্ছে তাদের চেয়ে ওদের পেশাটার অন্তত: কিং মর্যাদা আছে। যেমন ঘর ভাড়া করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে যে জ্যোতিষী, রাজা সম্রাট বনে গেছেন আজ, তিনি মনে করেন নাটমন্দিরে বসে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা কারবার চালায়, তারা অতি নিচু দরের প্রাণী।

হালদার মশায়ের মনে পড়ে যায় অনেককে। তিনিই একদিন যাকে দেখেছেন ছেঁড়া আসন আর কোষাকুষি বগলে নিয়ে নাটমন্দিরের কোণে বসতে, তিনিই তাকে দেখলেন তেতলা বাড়ী হাঁকিয়ে সম্রাট জ্যোতিষী বনে যেতে। যে মেয়েকে তিনিই দেখছেন সত্যপীরতলায় মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, তিনিই তাকে দেখলেন ঢাউস মোটরগাড়ী থেকে নেমে মায়ের মন্দিরে সোনার গিনি দিয়ে প্রণাম করতে। আবার উল্টোও বহুত দেখেছেন। দেশ থেকে এলেন পণ্ডিত মশাই, বাড়ী ভাড়া নিয়ে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে বসলেন মাদুলি দেবার ব্যবসা ফেঁদে, দেখতে দেখতে একেবারে ডালাধরা হয়ে গেলেন। বাসা নিলেন সেই খাল ধারেই। কিছু দিন পরে তাঁকেই দেখলেন চুপটি করে মুখ বুজে হাতে একটি ঘটি নিয়ে সামনে গামছা বিছিয়ে ঘাটের একধারে বসে থাকতে। গামছার ওপর চালে ডালে মেশানো পোয়াখানেক খুদকুঁড়ো আর কয়েকটা পয়সা পড়ে আছে। এমন মেয়েকেও তিনি চেনেন, যে মহিম হালদার স্ট্রীটের মোড়ে দোতলা বাড়ীর বাড়ী-উলি ছিল, সেই মেয়েই এখন ডালাওয়ালার দোকানে যাত্রীর হাতে জল ঢেলে দেওয়ার কাজ করছে।

অদ্ভুত ব্যাপার নয়, তাজ্জব কাণ্ড নয়, সবই সম্ভব। অসম্ভব বলতে কোনও কিছু নেই এই দুনিয়ায়। কংসারি হালদার মশায় দিবারাত্র বিছানায় শুয়ে চিন্তা করেন আর মিলিয়ে দেখেন যে দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছু থাকাটাই শুধু অসম্ভব। আর অসম্ভব কিচ্ছু নেই!

অন্ধকার ঘরে হালদার মশায় চোখ চেয়ে কান খাড়া রেখে রাত কাটান। হাঁ, ঐ ত! ঐ ত এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে, ঘুরছে গলির ভেতর, এগিয়ে আসছে মহামায়া লেন, কালী লেন, ভগবতী লেন দিয়ে। ঐ ত।

নিজের নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন হালদার মশায়। দম বন্ধ করে শুনতে লাগলেন—

"তাই মা আমি নিলাম শরণ
তোর ও দুটি রাঙা চরণ
নিলাম শরণ
এড়িয়ে গেলাম মায়ার বাঁধন
মা তোর অভয় চরণ পেয়ে।
জগত জুড়ে জাল ফেলেছিস মা
শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে।"

হালদার মশায় একটু পাশ ফেরবার চেষ্টা করলেন। চিড়িক মেরে উঠল শিরদাঁড়ার মধ্যে। সেটা সামলাবার জন্যে বেশ কিছুক্ষণ আর গানের দিকে মন দিতে পারলেন না তিনি। দম বন্ধ করে আরও কিছুক্ষণ থাকতে হল তাঁকে। না, আর তাঁকে হয়ত কখনও নিজে উঠে দাঁড়াতে হবে না বিছানা ছেড়ে। সকলে ধরাধরি করে যেদিন তাঁকে বিছানা থেকে নামিয়ে মাটিতে শোয়াবে, সেইদিনই তিনি মাটি স্পর্শ করতে পারবেন। তার আগে আর নয়।

যন্ত্রণার দমকটুকু কমতে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিল। শেষে আবার দম ফেললেন হালদার মশায়। দম ফেলে আবার কান খাড়া করলেন। অনেকটা দূর থেকে, বোধ হয় সেই হালদার পাড়া লেনের ভেতর থেকে ভেসে এল—

"পড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে
কোটি নরনারী কাঁদে মা"—

হঠাৎ কি হল হালদার মশায়ের, হু হু করে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন তিনি। বুক ঠেলে কান্নার ঢেউ তাঁর গলায় এসে আটকে যেতে লাগল। বড় আরাম বোধ হল তাঁর। অন্ধকার ঘরে একলা শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদার চেয়ে বড় বিলাসিতা যেন আর কিছুই নেই এই দুনিয়ায়। ভারী সোয়াস্তি পেলেন তিনি কাঁদতে কাঁদতে। তাঁর মনে হল, না, যতটা নিজেকে একলা বোধ করছেন ততটা একলা নন ঠিক। এই ত, এখনও একটা কিছু তাঁর সঙ্গী রয়েছে। বেশ দুজনে একসঙ্গে শুয়ে আছেন অন্ধকার ঘরে, তিনি এবং তাঁর কান্না। কান্নাটুকু ত এখনও মরে যায় নি তাঁর, কান্না ত তাঁকে ছেড়ে পালায় নি এখনও। সব গেছে, ওঠা হাঁটা চলা ফেরা দেখা

শোনা এ সমস্ত তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু কান্না এখনও তাঁকে পরিত্যাগ করে যায় নি। ইচ্ছে করলে তিনি যতক্ষণ খুশি যতবার খুশি কাঁদতে পারেন এখনও; কান্না তাঁর কিছুতে ফুরোবে না।

খুশি হলে তিনি দুনিয়া সুদ্ধ সকলের কান্নাই একা কাঁদতে পারেন, একলা ঘরে বিছানায় শুয়ে। কেউ তাঁকে বাধা দিতে আসবে না।

"পড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে
কোটি নরনারী কাঁদে
তোর মায়ার জালে মহামায়া বিশ্ব ভুবন আছে ছেয়ে।

বার বার এইটুকু মনে মনে আওড়ালেন বংসারি হালদার। আওড়াতে আওড়াতে রাগে তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবার যোগাড় হল। কান্না ভুলে গেলেন।

কি ভয়ানক মিথ্যে কথা। কি বিতিকিচ্ছি রকম অনর্থক বদনাম দেওয়া মাকে। বরং বলা উচিত—

"পড়ে মা তুই মরিস কেঁদে
কোটি নরনারীর ফাঁদে—"

কে কাঁদে! কাঁদছে কে? ওরা কাঁদছে, না মা কাঁদছে?

বহুবার দেখা একটা দৃশ্য চোখের ওপর ভেসে উঠল হালদার মশায়ের। মায়ের বাড়ীতে হাড়িকাঠে পাঁঠা ঢোকানোর দৃশ্য। চারিদিকে মানুষ দাঁড়িয়েছে, সকলে চেয়ে রয়েছে পাঁঠাটার দিকে। অনেকেই মতামত প্রকাশ করছে, "বেশ বড় যে হে, হবে ত এক কোপে? ঘাড়টা কি মোটা দেখেছ, দাও হে ঘাড়ে খানিকটা ঘি মালিশ করে দাও। আহা হা হা, করছ কি কামারের পো, সামনের ঠ্যাং দুখানা আগে মুচড়ে ভেঙে ওপর দিকে তুলে ফেল না। পায়ে জোর পেলে ওকে রাখবে কি করে? ধর ধর, এবার একজন টেনে ধর মুণ্ডটা, ভাঙল বুঝি হাড়িকাঠের খিল।"

নানা জাতের মতামত, সকলের চোখে একটা ঝাঁকালো দৃষ্টি, তার মাঝে হয়ত দু একবার পাঁঠাটা চেঁচিয়ে উঠল। ঝাঁ করে চকচকে খাঁড়াখানা উঠল আকাশের দিকে, নামল চক্ষের নিমেষে। ব্যস, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল সকলে। চারিদিকের মানুষ নড়েচড়ে উঠে যে যার পথ দেখল।

এ দৃশ্য, ঠিক এই জাতের ঘটনা অসংখ্যবার হালদার মশায় দেখেছেন মায়ের বাড়ীতে। বিছানায় শুয়ে আগাগোড়া সেই দৃশ্যটাই তিনি দেখতে পেলেন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ তাঁর চোখের ওপর ফুটে উঠল ওই ব্যাপারটার একটা নূতন দিক। এতদিন ধরে তিনি দেখেছিলেন সেই বোবা পশুগুলোর

চোখে ভয় আর একটা করুণ কাকুতি। জীবনের জন্যে আকুলি বিকুলি। কিন্তু না, ও সমস্ত কিছুই নয়। এতদিন তিনি মহাভুল করে এসেছেন, ওদের চোখে তখন যা থাকে তার নাম ঘৃণা, চতুর্দিকের মানুষগুলোর ওপর একটা ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাবই ত থাকে সেই বলির পশুর চোখে। এবং আর যা থাকে, তার নাম হচ্ছে অপমানের তীব্র জ্বালা। একলা এতগুলো মানুষের দৃষ্টির সামনে অসহায় ভাবে মরতে যে অপমানটা হয়, সেই দুর্জয় অপমানের দরুণ একটা জ্বালা থাকে সেই বলির পশুর চোখে। কাতরতা, করুণা-ভিক্ষা, মরণের ভয় এ সমস্ত কিছুই থাকে না তখন ওদের মনে প্রাণে কোথাও। অপমানের জ্বালা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

মায়ের চোখেও ঐ অসহায়তা আব অপমানের জ্বালা ছাড়া অন্য কিছু নেই। মার আবাব তিনটে চোখ। আর একটা চোখে যা রয়েছে তা হল পরিত্রাণ পাবার জন্যে ব্যাকুলতা। বছবেব পব বছব, শত শত বছব ধরে ঐ ভাবে চেয়ে রয়েছে মা, আর অসহায় ভাবে সহ্য কবছে সকলেব জুলুম। ভালবাসাব জুলুম, ভক্তির জুলুম, হ্যাংলামোর জুলুম। যার যা খুশি আনছে মাযের সামনে, যাব যা খুশি চেযে বসছে মায়ের কাছে, যার যা খুশি ঘুষ দিতে চাচ্ছে মাকে। উদয় অস্ত, অস্তেব পরেও অর্ধেক বাত পর্যন্ত সহ্য কবতে হচ্ছে এই বিড়ম্বনা অসহায় ভাবে মাকে, ছেদ নেই, ছুটি নেই, একটি দিনের তবেও পরিত্রাণ নেই। মানুষে কালীঘাট থেকে আলিপুরে যায় চিড়িয়াখানা দেখতে। সেই চিড়িয়াখানাও বিশেষ বিশেষ দিনে বন্ধ থাকে, সেই চিড়িযাখানাও উদয় থেকে অস্ত এবং অস্তেব পবেও ঘণ্টা চাব পাঁচ খোলা থাকে না কোনও দিন। অষ্টপ্রহবের ভেতব ছ' প্রহব চিড়িয়াখানার পশুকেও মানুষের চোখের দৃষ্টিব সামনে বেইজ্জত হতে হয না, যেমন হয় কালীঘাটের কালীকে। চিড়িয়াখানাব পশুব সঙ্গে মায়ের তফাত আবও অনেক রয়েছে। ওরাও বন্দী, মাও বন্দিনী, কিন্তু তফাত হচ্ছে চিড়িয়াখানার পশুকে দেখিয়ে রোজগারের আশায় এক পাল মানুষেব নোলায় দিবারাত্র নাল ঝরছে না। চিড়িয়াখানার পশুর চতুর্দিকে যে সব মানুষ থাকে তারা মনে করে ভিড যত কম হয়, মানুষজন যত না আসে, ততই মঙ্গল। পশুগুলো তবু শান্তিতে থাকতে পাবে। আর কালীঘাটের কালীকে যারা বন্দিনী করে রেখেছে, তারা অহোরাত্র আশা করছে যে আরও মানুষ আসুক, আরও ভিড বাড়ুক, আরও বেইজ্জত জালাতন হোক মা-কালী। তবেই না তাদের দুপয়সা রোজগার হবে!

কংসারি হালদার মশায় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শ্বাসটির শব্দও তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন কানে। একটু চমকেও উঠলেন, তাঁর মনে হল ঘরে যেন অন্য কেউ

রয়েছে, অন্য কেউ যেন শ্বাস ফেলল তাঁর ঘরের মধ্যে। কিন্তু না, বুঝতে পারলেন, ওটা তাঁর মনের ভুল। এখন কেউ আসবে না তাঁর ঘরে, যেমন মায়ের ঘরেও কেউ ঢোকে না এখন। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ছেঁকাপেঁকা করে ধরবে সবাই মাকে, তেমনি হালদার মশায়ের ঘরেও লোক ঢুকতে থাকবে। দেখতে আসবে সকলে হালদার মশায়কে, যার যা খুশি মতামত বলতে থাকবে। কার সইএর বৌএর বকুলফুলের গঙ্গাজলের বোনপো বৌয়ের মায়ের পায়ের তেলপড়া দিয়ে কোন রোগ সেরেছিল, আর সেই তেলপড়াটুকু এনে হালদার মশায়ের শিরদাঁড়ায় মালিশ করলেই যে তাঁর শিরদাঁড়াটা টনটনে টনকো হয়ে উঠবে চক্ষের নিমেষে, সে সমস্ত শুনতে হবে তাকে নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে। কারণ যারা তাকে দেখতে আসবে রাত পোহালেই, তারা সকলেই তাঁর আপনার জন। তাঁকে একান্ত ভালবাসে বলেই তাঁর ঘরে এসে ভিড় করছে এখন। কিন্তু আশ্চর্য, এতদিন এঁরা সব ছিলেন কোথায়? কস্মিনকালে কেউ তাঁর ছায়া মাড়িয়েছেন বলেও তো মনে পড়ে না।

হালদার মশায় ভাবেন আর হাসেন। তাঁর দশা আর মা কালীর দশা আজ সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসহায় ভাবে তাঁকে আর মা কালীকে, দুজনকেই সহ্য করতে হচ্ছে ভালবাসার জুলুম, ভক্তির জুলুম দরদ দেখানোর জুলুম। ঐ বলির পশুর চোখের চাউনি দিয়ে তিনি চেয়ে দেখবেন সকলের মুখের দিকে। সবাই ভুল করবে, মনে করবে সে চাউনিতে বুঝি রয়েছে সকলের কাছে কৃপা ভিক্ষার মৌন আবেদন। হায়, বুঝবে না কেউ, যে কি অসহ্য অপমান তিনি বোধ করবেন তাঁর বিছানার পাশে এসে কেউ দাঁড়ালে, কি রকম অসহায় ভাবে সহ্য করবেন তিনি মানুষের দরদ দেখানো। সাধ্য থাকলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি এদের আত্মীয়তার আবদারের হাত থেকে নিস্তার পেতেন।

সাধ্যে কুলোলে আরও অনেক কিছুই করতে পারতেন হালদার মশায়। কিন্তু একটি অসাধ্য সাধন করতে গিয়েই ইহজীবনের সমস্ত সাধ্য সামর্থ্যটুকু তিনি খুইয়ে বসেছেন। সেদিন সেই বড়লোক যজমানের নতুন বৌকে নিয়ে মন্দিরে ঢোকার দুঃসাহস না করলে এত তাড়াতাড়ি এ দশা হত না তাঁর। বড্ড বেশী বিশ্বাস করেছিলেন তিনি নিজেকে, বহুকালের পুরনো শরীরটার ওপর তিনি বড় বেশী নির্ভর করেছিলেন। তাঁর ভাগ্য ভাল যে মিছরিদের ছেলেরা ঠিক সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, নয়ত যজমানদের নিয়ে তিনি বেরোতেই পারতেন না মন্দির থেকে। শিরদাঁড়াটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু যজমানদের কিছু একটা হত যদি সেদিন, আর তার পরও যদি তাঁকে বেঁচে থাকতে হত, তাহলে করতেন কি তিনি সে জীবন নিয়ে। শিরদাঁড়া গেছে যাক, ঘাড় কিন্তু তাঁর সোজা

আছে। মাথা তাঁর নোয়াতে হয় নি এখনও। হালদার বংশে জন্মে আগাগোড়াটা সারাটা জীবন তিনি ষোল আনা হালদারগিরি করে গেলেন। চলে বেড়াবার সামর্থ্যটুকু যতদিন ছিল, ততদিন তিনি ঠিক হাজির হয়েছেন মায়ের বাড়ীতে। একটি দিনের জন্যেও কামাই করেন নি, শুধু জাতাশৌচ মৃতাশৌচের দিন কটি ছাড়া।

কিন্তু তারপর!

তারপর আর নেই। এইখানেই শেষ হল এ বংশের হালদারগিরি করা। দুঃখও নেই তাতে কংসারি হালদার মশায়ের। অনেক হালদার গুষ্টিই আজ নেই। মায়ের পালা চালাচ্ছে মুখুজ্যে চাটুয্যে বাড়ুয্যেরা, হালদারদের ভাগনে দৌহিত্ররা সব। আবার অনেক হালদার পুরোহিত বা মিশ্রদের পালা দিয়ে গেছেন চিরকালের জন্যে। এখন সেই সব ভটচায মিশ্ররাই পালাদার মায়ের। কাজেই দুঃখ করার কিছুই নেই হালদার মশায়ের।

কিন্তু তাঁর পালা তিনি যে দিয়েও গেলেন না কাউকে। তাঁর ছেলেরা হবে ঐ পালার মালিক। চমৎকার হবে, মায়ের বাড়ীর ছায়া যারা মাড়ায় না কখনও, যারা মায়ের মহাপ্রসাদ মুখে ছোঁয়ায় না রোগ হবার ভয়ে, তারা হবে পালাদার! ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে যারা কোট প্যাণ্ট পরে ব্রেকফাস্ট সেরে আফিসে ছোটে, যাদের বৌয়েরা মুরগির ডিম কাঁচা খেয়ে আর খাইয়ে নিজেদের আর তাঁদের ছেলে-পুলেদের শরীর ভাল রাখেন, তাঁরা হবে মায়ের পালাদার, চমৎকার। বহুবার তিনি ছেলে-বৌয়েদের আলাপ করতে শুনেছেন যে, কালীঘাটের কালীবাড়ীর আওতার এই চোদ্দপুরুষের ভিটেটাকে বেচে বা ভাড়া দিয়ে সেই বালিগঞ্জে চলে যাওয়াই উচিত।' এখানে নাকি ছেলেপুলেদের ঠিকভাবে মানুষ করা সম্ভব নয়। এখানে এই গলির ভেতর এই পচা বাড়ীতে থাকলে এ বংশের নামটাম কস্মিন-কালেও হবে না। ওদের সব গণ্যমান্য বন্ধু বান্ধবীদের এ বাড়ীতে আনতেও ওরা লজ্জা পায়। একবার ত ওরা ক্ষেপেই উঠেছিল হালদার উপাধি ত্যাগ করে নামের শেষে শর্মা লেখবার জন্যে। ওদের সেই সমস্ত সাধ আহ্লাদ এখন মিটবে। বাপের শ্রাদ্ধ হবার পরে ওরা শর্মা হবে, উঠে যাবে বালীগঞ্জের ওধারে। আরও কত কি করবে। কিন্তু হালদার বংশের হালদারত্ব, এই পালা চালানো কর্মটি কাকে দিয়ে যাবে ওরা! কে বইবে এর পর এই দায়িত্ব? ছেলেরা সোজা হিসেব করে বসে আছে, মায়ের বাড়ীর পয়সায় যখন তাদের দরকার নেই, তখন মায়ের বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধই বা তারা রাখতে যাবে কেন? একদম ন্যায্য কথা, এমন কোন আইন আছে দেশে যে মায়ের সেবায়েতকে মায়ের সেবা করতে বাধ্য করবে? সেবা-

চালাই, কারণ সেবা চালালে পেটটাও চলে যায়। পেট যখন চালাবার অন্য উপায় হয়েছে তখন কে যাচ্ছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে। অতি বড় হক কথা, ষোল আনা পাকা যুক্তি, কার সাধ্য এর ওপর কথা বলবে।

যে ছেলে বাপের বিষয়-আশায়ের পরোয়া করে না সে কেন বাপকে ভাত দিতে যাবে? মা-কালীর বিষয়-আশয় বলতে যেটুকুর মালিক এখন পালাদাররা, ওটুকুর উপর নেহাত বেল্লিক ছাড়া আর কারও লোভ থাকতেই পারে না। বংশ বাড়তে বাড়তে, ভাগ হতে হতে আর হাত বদলাতে বদলাতে শ্রীশ্রীশ্রীমতী কালীমাতা-ঠাকুরানীর নোকরদের বর্তমানে যেটুকু চাকরান অবশিষ্ট আছে, তার মায়া ছাড়তে পারা খুব বড় একটা বাহাদুরির কাজও নয়। মায়ের পালার ওপর লোভ, পালার দরদামের ওপর নির্ভর করে। যাদের সে লোভ নেই, তাদের মা আটকে রাখবে কিসের টানে?

হালদার মশায় আড়ষ্ট হয়ে ভাবতে লাগলেন, কিন্তু এই বাড়ী, এবং এই বাড়ীর যা কিছু আসবাবপত্র, ঐ ছেলেদের জন্ম থেকে খাওয়া পরা, লেখাপড়া শেখা, মানুষ হওয়া, ওদের বিয়ের যাবতীয় খরচা, ওদের বাপ মা ঠাকুরদা ঠাকুরমা এই বংশের ওপর দিকের চোদ্দ পুরুষের খেয়ে পরে টিকে থাকা—সব কিছুই চালিয়ে এসেছে ঐ কালীবাড়ী। এখন ওরা সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে চাচ্ছে ঐ কালীবাড়ীর সঙ্গে। হালদার মশায়ের মনে পড়ে গেল, একবার তিনি নিধু গোয়ালাকে আর তার তিনটে ব্যাটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে জুতোপেটা করিয়েছিলেন। কারণ তারা দুধ ছেড়ে দেওয়ার দরুন একটা গরুকে কসাইবাড়ী বেচে এসেছিল। নিধু গোয়ালাকে মনে পড়তে হালদার মশায়ের মনে পড়ে গেল যে, আগে হালদাররা গণ্ডা গণ্ডা গয়লা পুষতেন। তাদের আদিগঙ্গার ওপারে জায়গা-জমি দিয়ে ঘরবাড়ী করে বসিয়ে-ছিলেন। গরু কিনে দিয়েছিলেন, সেই গরুর দুধ তারা নিয়ে আসত মায়ের বাড়ীতে। তখন মায়ের বাড়ীর বাইরে একখানিও ভালো দোকান ছিল না। এতটুকু মিষ্টি, বাইরে থেকে কিনে আনলে, মন্দিরে ঢুকতে পেত না। মায়ের বাড়ীর ভেতর যে সমস্ত মিষ্টির দোকান ছিল, সে সব মিষ্টি তৈরী করত যারা, তারা স্নান করে উপোস করে দুধ জ্বাল দিত। বেচত যারা, তাঁরাও স্নান করে উপোস করে বসে থাকত সে সব দোকানে। তাই তখন একমাত্র কাঁচাগোল্লা ছাড়া আর কোনও প্রসাদ মিলত না মায়ের বাড়ীতে। সে সমস্ত মিষ্টিতে আবার কাশীর চিনি ছাড়া অন্য কোনও চিনি দেওয়ারও উপায় ছিল না। আর এখন দুধ কেউ জ্বালই দেয় না, বাজার থেকে ছানা ক্ষীর কিনে নানা রকম মিষ্টি তৈরী হয়। কোথায় হয়, কে করে সে সব মিষ্টি কে তার খোঁজ রাখতে যাচ্ছে। তিনশখানা

ডালার দোকানই ত গজিয়ে উঠেছে মায়ের বাড়ীর বাইরে। ডালাধরাদের সঙ্গে আবার দোকানদারদের কি সমস্ত লুকানো ব্যবস্থা আছে, টাকায় নাকি তারা তিন আনা হিসেবে দস্তুরি পায়। বাঙালী ওড়িয়া মেড়ুয়া কে না খুলে বসেছে দোকান, মায়ের বাড়ীর আশেপাশে। কত রকমের কত কারবারই না চলছে কালীঘাটের কালীমন্দির ঘিরে। সব বিক্রী হচ্ছে, ধর্ম স্থায় নীতি নিষ্ঠা সতীত্ব মনুষ্যত্ব, সব। আখেরে গুছিয়ে নেবার গরজে টোপ ফেলে বসে আছে সকলে। কাজেই কি করে তিনি বাধা দেবেন তাঁর ছেলেদের যদি তাদের গুছিয়ে নেবার গরজ না থাকে এখানে। সম্বন্ধ যখন তুলেই দিতে চায় ওরা কালীবাড়ীর সঙ্গে, তখন কেন তিনি জোর করতে যাবেন। হালদার মশায় জানেন, যেচে মান আব কেঁদে সোহাগ মেলে না কখনও। স্বতরাং দিক ওরা দুধ-ছাড়া গরুটাকে কসায়ের হাতে তুলে, তিনি বাধা দিতে যাবেন না।

কিন্তু কার হাতে এ দায়িত্ব তুলে দিয়ে শান্তিতে সরে পড়বেন তিনি।

কার হাতে?

ঘরের ভেতরটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল। জানলার কাঁচে লাল আলো এসে পড়ল। হালদার মশায় কাঁচ কখানা গুণে ফেললেন। গুণতে পেরে বেশ একটু নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। রোজই হন, কাঁচ কখানা গুণতে পারার মানে হল, চোখের দৃষ্টিটুকু যে এখনও তাঁকে ছেড়ে যায় নি তার প্রমাণ। অর্থাৎ এখনও তিনি ষোল আনা মরে যান নি। উঠতে পারেন না, নড়তে পারেন না আর সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্যন্ত চোখে কিছু দেখতে পান না। কিন্তু ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দেখতে পান। অবশ্য বাইরে বেরিয়ে ইচ্ছামত কোনও কিছুই দেখে আসতে পারেন না। তা না হোক, তাতেও দুঃখ নেই। তবু ত আলোটুকু দেখতে পান। নিবিড় আঁধার এখনও গ্রাস করতে পারে নি তাঁকে। এই জগতের সঙ্গে এখনও ষোল আনা সম্বন্ধ চুকে যায় নি তাঁর। এ কি কম কথা নাকি!

আবার হিসেব করতে লাগলেন হালদার মশায়। একঘেয়ে হিসেব, কতটুকু তিনি হারিয়েছেন, কতটুকু তাঁর হাতে আছে এখনও। অনেক কিছু এখনও হাতে আছে, দিনের আলো চোখে দেখতে পাচ্ছেন। অর্থাৎ এখনও দিন রাত হচ্ছে তাঁর জীবনে। রাতের আঁধারে একলা ঘরে শুয়ে মনের সুখে অঝোরে কাঁদতে পারছেন। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে প্রাণখোলা হাসিও হাসতে পারেন তিনি এখনও। কিন্তু হাসবার মত একটা কিছু পেলে ত হাসবেন। হাসবার মত এখন আর কি ঘটতে পারে তাঁর জীবনে।

খুঁজতে গিয়ে চমকে উঠলেন হালদার মশায়। তাই ত, কাঁদবার মতই বা এখন এমন কি ঘটতে পারে তাঁর জীবনে!

কেন কাঁদতে যাবেন তিনি।

কি উপলক্ষ নিয়ে কাঁদবেন।

কেঁদে কার মন গলাবেন?

কার কাছে কাঁদবেন তাঁর কান্না?

হঠাৎ হালদার মশায় ঘাড় ফিরিয়ে ডান দিকে চাইলেন। খাটের ডান দিকটা খালি। বাঁ দিকে একেবারে কিনারায় তিনি শুয়ে আছেন। অনেক কাল এই জায়গায় শোন তিনি, আর তাঁর ডান দিকটা খালি পড়ে থাকে। আগে ঐ খালি জায়গাটায়, মানে দেওয়ালের দিকে তিনি শুতেন আর এধারটায়, মানে এখন যেখানে তিনি শুয়ে আছেন, এই জায়গাটায় আর একজন শুত। কিন্তু সে অনেক কাল আগে।

ধীরে ধীরে হালদার মশায় সেই অনেক কাল আগের কালে ফিরে যেতে লাগলেন। পিছিয়ে গেলেন অনেকটা পিছুতে। ভুলে গেলেন তাঁর পঙ্গুত্ব, বা... আঁধার দিনের আলো সব উবে গেল তাঁর মন থেকে। মায়ের পালা কার ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়বেন তিনি, সে প্রশ্নও ঘুলিয়ে গেল। হাসি কান্না সুখ দুঃখের নাগাল ছাড়িয়ে ডুবে গেলেন হালদার মশায় বহুকাল আগে ফুরিয়ে যাওয়া একটা স্বপ্নের মধ্যে। অনেকদিন উৎকট রকম জেগে থাকার পর যেন তিনি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন হঠাৎ।

তিনি দেখতে লাগলেন—ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, ইয়া গোঁফ আর ঘাড় পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ানো চুল এক কংসারি হালদারকে। দেখলেন, আর একজনকে। নাকের নথটি পর্যন্ত দেখতে পেলেন। তারপর স্পষ্ট দেখতে লাগলেন, সেই ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না।

তারপর শুনতে লাগলেন। কংসারি হালদার জিজ্ঞাসা করছেন গাঢ় স্বরে, "কাঁদছ কেন?"

তার উত্তর আরও ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না।

"কি মুশকিল, কাঁদছ কেন মিছিমিছি?"

উত্তর, আরও ফুলে ফুলে নিঃশব্দে কান্না।

নিজের চওড়া বুকের ওপর কংসারি হালদার চেপে ধরলেন তাকে, "ছিঃ, কাঁদতে নেই, কেন কাঁদছ শুধু শুধু?"

উত্তর, কংসারি হালদারের চওড়া বুকে মুখ গুঁজে, কংসারি হালদারের বলিষ্ঠ

বাহুর বাঁধনের মধ্যে নিরাপদে নির্ঝঞ্ঝাটে আরও কান্না। যেন কাঁদবার মত এতবড় আশ্রয় আর কোথাও নেই দুনিয়ায়।

আর সেই কান্নার উত্তরে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলেন হালদার মশায়! অনর্থক কান্না তিনি কাঁদতে লাগলেন তার মাথাটার ওপর নিজের মুখখানা গুঁজে দিয়ে। সেই দুর্জয় কংসারি হালদার, যে একটা ক্ষেপা মোষকে দুহাত লম্বা একটা ডাণ্ডা দিয়ে ঠেঙিয়ে মেরে এসেছিল দুদিন আগে, সে অসহায় ভাবে একজনকে বুকের সঙ্গে সবলে আঁকড়ে ধরে তার মাথার ওপর সেই ভযানক গোঁফ সুদ্ধ মুখখানা গুঁজে দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। যেন কাঁদবার জন্যে সেই মাথাটার মত একান্ত নিরাপদ আশ্রয় আর কোথায় ছিল না দুনিয়ায়। চলল কান্নার পাল্লা দেওয়া আরামে। তারপর কেঁদে সন্তুষ্ট হয়ে দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে হাসি। সে হাসিও নিরর্থক হাসি। বোধহয়, শুধু একটু লজ্জার খাদ থাকত সে হাসিতে। শুধু শুধু চোখের জলে দুজনে দুজনের বুক মাথা ভেজানোর জন্যে লজ্জা। হাসির গমকে কাঁপতে থাকত কংসারি হালদারের গোঁফ জোড়াটা, কাঁপতে থাকত সেই নথটি, নথের নিচের মুক্তাটি দুলতে থাকত।

খুট্ করে একটু শব্দ হল।

ঘরে ঢুকলেন হালদার মশায়ের বড় ছেলে। ঢুকে তিনি প্রথমে জানলাগুলো খুলতে লাগলেন।

হালদার মশায় একটি নিঃশ্বাস ফেলে আবার চোখ চাইলেন। নাঃ, সত্যিই আর কাঁদবার মত কোথাও একটু আশ্রয় নেই তাঁর। কার কাছে কাঁদবেন তিনি তাঁর কান্না? কেঁদে কার কান্না থামাবেন এখন? কান্নার শেষে কার সঙ্গে মন মিলিয়ে হাসবেন?

বড় ছেলে ত্রিপুরারি হালদার জানালাগুলো খুলে দিযে বাপের প্রস্রাব-পাত্রটা খাটের পাশে টুলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেজ ছেলে তারকারি ঘরে ঢুকল, এক বালতি জল আর একখানা সাদা গামলা নিয়ে। কংসারি হালদার মশায় চুপ করে দেখতে লাগলেন তাঁর দুই ছেলেকে। বহুদিন পরে এই কয়েকটা দিন তিনি বেশ ভাল করে আর অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন তাঁর দুই ছেলেকে। সত্যিই ওরা এতবড় হয়ে উঠেছে এ তিনি এতদিন সত্যিই খেয়াল করেন নি। রোজই প্রায় এক আধবার দেখতে পেতেন তিনি ছেলেদের। রোজ সকালে যখন ওরা দাড়ি কামাত, ছুটোছুটি করে সাজ-পোশাক পরত বা অফিস বেরিয়ে যেত, এই সব সময়ে তিনি হয়ত এক পলক দেখতে পেলেন কাউকে।

সন্ধ্যার পর ওরা যখন ফিরত বাড়ীতে, তখন ত তিনি থাকতেন তাঁর নিজের ঘরে বন্দী হয়ে ; তখন তাঁর দুই চোখে আঁধার ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না তিনি। কংসারি হালদার মশায় সত্যিই বেশ ঘাবড়ে গেলেন। এঃ, ছেলে দুটোও যে তাঁর বুড়ো হয়ে গেছে। এরা তাঁর সেই ছেলে দুটো, যারা এই বিছানায়, তাঁর পাশে শুয়ে জড়াজাড় করে ঘুমত! এই ভারিক্কি চালের ভদ্রলোক দুজন হল নপু আর তারু। কি আশ্চর্য।

মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছেন শ্রীতারকারি হালদার, মাননীয় সরকার বাহাদুরের একজন উঁচুদরের হিসাব-পরীক্ষক। তাঁর গলায় ঝুলছে একগোছা সাদা পৈতে, যে ধুতিখানা পরে আছেন তার কোঁচাটা খুলে বেশ করে ভুঁড়িটা বেঁধে নিয়েছেন। দাঁত মাজার গুঁড়ো নিজের হাতে ঢেলে বাপের আঙুলটা তাতে লাগিয়ে দিলেন। কংসারি হালদার মশায় সেই আঙুল নিজের মুখে পুরে অনর্থক মাড়িতে একবার বুললেন। তখন কাঁচের বাটিতে করে বাপের মুখের মধ্যে একটু একটু জল দিতে লাগলেন তারকারি হালদার। আর সেই জল কুলকুচো করে ফেলবার জন্যে আর একটা পাত্র এগিয়ে ধরতে লাগলেন মুখের কাছে। খুব সাবধানে খুব সন্তর্পণে সব কাজ চলতে লাগল। ইতিমধ্যে বড় ছেলে ফিরে এলেন আবার। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর স্নান হয়ে গেছে, মাথার সামনের টাকটা ভাল করে মোছারও সময় পান নি। স্নান করে একখানা গরদ পরে কাঁধে ভিজে গামছা নিয়ে আর বাপের কাপড় হাতে করে ছুটে এসেছেন। তারপর দু ভায়ে বাপের কাপড় বদলালেন বিছানা ঠিক করে দিলেন একজন চাকর এসে ঘর মুছে বালতি গামলা ছাড়া-কাপড় সব বার করে নিয়ে গেল। সব কাজ নিঃশব্দে চলতে লাগল। অবশেষে ঘরের কোণের এক কুলুঙ্গি থেকে ছোট্ট একটি তামার কমণ্ডলু এনে বড় ছেলে এক ছিটে জল দিলেন বাপের হাতে। হালদার মশায় আঙুলে পৈতে জড়িয়ে বুকের ওপর হাত রেখে চোখ বুজলেন।

সেই ফাঁকে দুই ভাইয়ের চোখে চোখে কি কথা হয়ে গেল। দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়লেন। হালদার মশায়ের জপ শেষ হল, তিনি দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

তখন ছোট ছেলে তারকারি একটা ঢোঁক গিলে বললেন, "আজ আমাদের পালা বাবা।"

কংসারি হালদার একটু যেন চমকে উঠলেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন কড়িকাঠের দিকে। শেষে তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠল, তিনি কিছু বলছেন কি না তা শোনবার জন্যে দুই ভাই ঝুঁকে পড়লেন তাঁর বিছানার ওপর। শোনা

গেল হালদার মশায় বললেন, "তোশকের তলায় চাবি আছে, নিয়ে লোহার সিন্দুকটা খোল। তোমাদের মায়ের দু একখানা গয়না এখনও আছে। নিয়ে বেচে পালার টাকাটা দিয়ে দাওগে।"

বড় ছেলে ত্রিপুরারি বললেন, "টাকা কাল সকালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে বাবা।"

এবার হালদার মশায় সত্যিই বেশ চমকে উঠলেন, "হয়ে গেছে! কে দিলে?"

"এ ত আমাদের পালা বাবা, আমরাই দিয়েছি।" ছোট ছেলে বললেন।

"তোমরা দিয়েছ! মানে তোমরা পালা চালাবে?" হালদার মশায় যেন আঁতকে উঠলেন।

বড় ছেলে, যেমন সুরে শিশুকে সান্ত্বনা দেয়, সেই সুরে বললেন, "আমাদের পালা আমরা চালাব না ত কে চালাবে বাবা? আমি ত চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। এখন ছ' মাস ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছি। ছুটি ফুরলে আর কাজে যোগ দেব না। বছর পাঁচেক পরে তারকও বেরিয়ে আসবে। ব্যস, তখন আর ভাবনা কি।"

ছোট ছেলে বললেন, "দাদা যাচ্ছে মায়ের বাড়ী এখনই, কি করতে হবে বলে দাও ওকে বাবা।"

হালদার মশায় বলবেন কি, দম বন্ধ করে তিনি চেয়ে রইলেন দুই ছেলের মুখের দিকে। কোথায় গেল সেই কোট-প্যাণ্ট-আঁটা সাহেব দুজন! জলজ্যান্ত দুটো হালদারই ত দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে।

বেশ কিছুক্ষণ লাগল এ ধাক্কা সামলাতে তাঁর। তারপর প্রথম যে কথা তাঁর মুখ থেকে বেরল তা আরও আশ্চর্য ব্যাপার।

"তবু যাচ্ছিস মায়ের বাড়ী! পালা করতে যাচ্ছিস? উপোস করে থাকতে হবে যে রে সেই রাত এগারোটা পর্যন্ত। চা না খেয়ে তুই থাকবি কি করে?"

হা হা করে হেসে উঠল দুই ছেলেই। তপু মানে শ্রীত্রিপুরারি হালদার ছোট ছেলের আবদেরে গলায় বললেন, "বাবা মনে করে, আমরা এখনও সেই তপুআর তারুই আছি। উপোস ত করতেই হবে বাবা, তোমার বৌমায়েরাও সব উপোস করে থাকবে। আজ প্রথম দিন পালা করতে যাচ্ছি বাবা, কি কি করতে হবে বলে দাও। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি চলে যাই।"

হালদার মশাই আরও কিছুক্ষণ রইলেন চুপ করে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "খাঁ। মায়ের পালা মা নিজেই করে নেয় রে পাগল। আমাদের আর করবার কি আছে। ভটচাজ্জি মশায়ের বাড়ীতে ভোগ নৈবিদ্যি যেন ঠিক পৌছয়

আর কাঙালীদের খাওয়াবার সময় যেন কেউ গালমন্দ না দেয়, এইটুকু শুধু নজর রাখিস।"

মায়ের পালা মা নিজেই করে নেয়।

কাংসারি হালদার ফলের রস খেয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে মনে মনে আওড়াতে লাগলেন ঐ কথাটি—মায়ের পালা মা নিজেই করে নেয়।

বহুবার বহুজনের মুখ থেকে শোনা বহু পুরনো কথাটা অনেকবার আওড়ালেন তিনি মনে মনে। আর জ্বলতে লাগল তাঁর বুকের ভেতরটা। একটা মোক্ষম সংবাদ শোনার জন্যে তাঁর চোখ কান মন সব উন্মুখ হয়ে রইল।

একটু পরেই মায়ের মন্দিরের কাজ সেরে ভটচাজ্জি মশায় আসবেন এ বাড়ীতে। তেতলায় উঠে লক্ষ্মীনারায়ণের নিত্যসেবা করবেন। আর তখনই জানাজানি হবে ব্যাপারটা। তারপর এই সংসারে কি ঘটবে আর কি ঘটবে না তা একমাত্র ঐ মা-কালীই জানেন।

কংসারি হালদার মশায় ঘামতে লাগলেন। এগিয়ে আসছে সেই মোক্ষম ক্ষণটি। ঐ মায়ের বাড়ীতে ঢাক বেজে উঠল। প্রথম বলি হয়ে গেল। মায়ের নিত্যপুজোও শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে। এলেন বলে ভটচাজ্জি মশায় খড়ম খট খট করে।

সত্যিই তিনি খড়মের শব্দ শুনতে পেলেন সিঁড়িতে। হালদার মশায় দুই চোখ যতটা সম্ভব মেলে চেয়ে রইলেন দরজার দিকে।

আজকাল ভটচাজ্জি আগে তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে দেখে, তারপর তেতলায় যায়। খড়মের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল তাঁর ঘরের দিকেই।

মুহূর্তের মধ্যে হালদার মশায় মতলব ঠিক করে ফেললেন।

ঘরে ঢুকলেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য মশায়।

"কেমন আছ আজ কাঁসারী?" কংসারি হালদারকে য ' নাম ধরে ডাকতেন তাঁরা কাঁসারীই বলতেন।

"ভাল, সরে এস ভটচায, একটা কথা বলি তোমাকে।" চাপা গলায় বললেন হালদার মশায়।

"ত্রিপুরারি গেছে মায়ের বাড়ীতে। কি মানান মানিয়েছে যদি দেখতে কাঁসারী। গরদ-পরা ধবধব করছে বর্ণ, আমি কপালে বেশ করে লেপে দিয়েছি মায়ের কপালের সিঁদুর, দাঁড়িয়েছে তোমার ছেলে মায়ের দরজায়। আঃ, কি মানান মানিয়েছে। যদি দেখতে কাঁসারী চোখ জুড়িয়ে যেত তোমার। ছেলে-ভাগ্য করেছিলে বটে তুমি।" ভটচায মশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

কংসারি হালদার ফিসফিস করে বললেন, "কিন্তু ভটচায, মায়ের যন্ত্রটা বোধহয় ওপরে গিয়ে আর দেখতে পাবে না তুমি।"

"এ্যা! কি বললে! কেন!" চোখ কপালে উঠল ভটচাযের।

চোখ বুজে বেশ ধীরে ধীরে আউড়ে গেলেন কংসারি হালদার, মা আমায় স্বপ্নে কাল বলে গেল ভটচায যে—" থামলেন হালদার মশায়।

"কি বলে গেল তোমায় মা?" প্রায় ধমকের মত শোনাল ভটচাজ্জি মশায়ের স্বর, "কি তোমায় বলে গেল আবার স্বপ্নে?"

আরও আস্তে আস্তে কোনও রকমে হালদার মশায় বললেন, "আমি চললুম এ বাড়ী থেকে।"

"এ্যাঁ—"মিনিট খানেক চেয়ে রইলেন ভটচায মশায় হালদার মশায়েব মুখের দিকে। তারপর খড়ম ফেলে রেখে শুধু পায়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। তেতলার ঠাকুর ঘরের দরজার শিকল পড়ল আছড়ে। আওয়াজটা চেনেন হালদার মশায়। তিনি শুধু ঘামতে লাগলেন শুয়ে শুয়ে।

আর ঠিক তখন অঝোরে চোখের জল ঝরে পড়ছে একখানি ছোট্ট পাথবেব ওপর ফিনকির মায়ের তুই চোখ থেকে। হতভম্ব ছেলেমেয়ে ফণা আর ফিনকি চেয়ে আছে হাঁ করে মায়ের দিকে। থরথর কবে কাঁপছেন তাদের মা। আধো-অন্ধকার সেই টিনের খুপরির দরজার সামনে তুহাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফণা ফিনকির মা। তাঁর জোড়হাতে একখানি নীল রঙের চৌকো পাথব। পাথর-খানি ইঞ্চিদেড়েক লম্বা চওড়া, বোধ হয় আধ-ইঞ্চিটাক পুরু। ওপবটা চুড়োর মত। বেশ নজর দিয়ে দেখলে দেখা যায়, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আগুন জ্বললে যেমন দেখায়, তেমনি একটু আলো ফুটে বেরচ্ছে পাথরের ভেতব থেকে।

অনেকটা সময় লাগল মায়ের সামলাতে। তারপর তিনি চুপি চুপি কোনও রকমে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় পেলি এটা তুই ফিনকি? কোথায় পেলি এ জিনিস? ঠিক করে বল মা, ঠিক করে বল।"

বলবে কি ফিনকি, গলা দিয়ে স্বর বেরুলে ত বলবে। মায়ের অবস্থ দেখে তার চোখ কপালে ওঠার যোগাড় তখন। কে জানত যে ঐ পাথরের টুকরোটা মায়ের হাতে দিলে মায়ের এ রকম মরোমরো অবস্থা হবে!

আগের দিন সন্ধ্যেবেলা কাগজে মোড়া শক্ত মত জিনিনটা যখন সে ছোঁড়া তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাঁ করে সরে পড়ল, তখন কি সে জানত যে কি অলক্ষণে জিনিস

সে পেটের কাছে গুঁজে বাড়ী নিয়ে আসছে। তারপর রাতে আর কাগজ খুলে জিনিসটা দেখার ফুরসতই পেলে না ফিনকি, খাওয়া দাওয়ার পরে আলো নিভিয়ে দিলে মা। সকালে উঠে যখন মনে পড়ে গেল ফিনকির, তখন কাগজ খুলে দেখে ঐ পাথরের টুকরোটা। পাথরের টুকরো না পাথরের টুকরো, তবে দেখতে বেশ। ফিনকি ওখানাকে তুলে রেখে দিয়েছিল বাসনের চৌকির কোণে। ভেবেছিল, ঘর মুছে বাসন মেজে কাপড় ছেড়ে এসে ওখানা সরিয়ে রাখবে। কোথাও, কোনও বাক্সের ভেতরে ফেলে রাখবে। মা যে ওর মধ্যে ওখানা দেখে ফেলবেন আর দেখেই অমন ভাবে চিৎকার করে উঠে কাঁদতে লাগবেন, এ কি করে জানবে ফিনকি।

"এটা এখানে কে রাখলে," বলে মা চেঁচিয়ে উঠলেন।

ফিনকি বললে "আমি, ঘর ঝাঁট দিতে দিতে পেলাম ঐ কোণায়"

"কোন্ কোণে ছিল রে? কোন কোণে?"

ব্যস্, একেবারে পাগলের মত মা ঠুকতে লাগলেন পাথরখানা তার কপালে। তারপর নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন পাথরখানার দিকে চেয়ে। ব্যাপার দেখে ছেলেমেয়ে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার দিকে তাকিয়ে।

শেষে ফণা বলবার মত কথা খুঁজে পেলে একটা। হাত পাতলে মায়ের সামনে।

"দাও ত মা— দেখি কি ওটা।"

মা তার জোড়হাত বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে লুকিয়ে ফেললেন পাথরখানা। যেন এখুনি ছেলে কেড়ে নেবে তার হাত থেকে। সভয়ে বললেন, "ছুঁবি কিরে। এ জিনিস কি ছোঁয়া যায় যখন তখন। যা, নেয়ে আয় চট করে, তারপর তোর হাতে এটা সঁপে দেব আমি, যা।"

ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে নেয়ে আসতে ছুটল ফণা বালতি নিয়ে রাস্তার কলে। আড্ডায় যেতে দেরি হবে তার। হোক, তবু সে দেখে যাবে জিনিসটা কি।

তখন ফিনকির হুঁশ হল। বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা হতে চলল ত। জিনিসটা যাই হোক, কিন্তু পেয়েছে সে। দাদার হাতে সঁপে দেবার মানে?

ফুঁসে উঠল ফিনকি।

"দাও ত মা, দেখি, কি ওটা।"

মা রেগে গেলেন।

"তুই ছুঁবি এটা। তোর ছুঁতে আছে এ জিনিস? জানিস তুই, কি জিনিস এ?"

ফিনকিও রেগে গেল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, "জানবার দরকার নেই

আমার। আমি ওটা পেয়েছি, ওটা আমার জিনিস, দাও আমায়।"

মাও চেঁচিয়ে উঠলেন, "কিঁ বললি! যত বড মুখ নয় তত বড কথা! তোর জিনিস এটা! তুই পেয়েছিস বলে তোর হাতে দিতে হবে?"

হঠাৎ যে কি হল ফিনকির, ঝাঁপিয়ে পডল সে মায়ের গায়ে। দাঁতে দাঁপ চেপে গর্জে উঠল, "দেবে না তুমি? আমার জিনিস, আমি পেয়েছি, দেবে না আমায়?"

অতি অল্প সময় সামান্য ছটোপটি হল মায়ে ঝিয়ে। হঠাৎ ফিনকি দরজা টপকে বারান্দা ডিঙিয়ে আছডে পডল উঠোনে। চোখে অন্ধকার দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে বসে কপালে হাত দিয়ে দেখল হাতটা চটচট করছে। হাতখানা নামিযে মেলে ধরল চোখের সামনে, টকটক করছে লাল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁডাল। চেয়ে দেখল ঘরের দিকে, মা দাঁডিয়ে আছেন দরজার চৌকাট ধবে, তাঁর দুই চোখে আগুন জ্বলছে।

ফিনকির গলা থেকে বেরোল একটা অস্পষ্ট গর্জন, "আচ্ছা"।

তাবপর সে আঁচলটা কপালে চেপে ছুটে বেরিয়ে গেল বাডী থেকে।

এ গলি ও গলি সে গলি দিয়ে ছুটতে লাগল ফিনকি। শেষ বেরিয়ে এল রাস্তায়। গলির মধ্যে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তবু একটু আডাল ছিল। গলি হল অন্ধ, কিন্তু রাস্তার সহস্র চোখ। গলিতে ছুটে চলা সম্ভব, কিছু রাস্তায় সহস্র চোখের চাউনিকে অবহেলা করে ছোটা কিছুতেই সম্ভব নয়। গলির ভেতর ঠেলে গুঁতিয়ে পথ করে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু রাস্তার বুকে নিজের পথ নিজে করে না নিলে কোথাও পৌঁছন সম্ভব নয়।

ছোটা বন্ধ করে হনহন করে হাঁটতে লাগল ফিনকি। চেয়েও দেখল না মায়ের বাড়ীর দিকে। কোথায় যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, এসব চিন্তা একটি বারের জন্যেও মনের কোণে উদয় হল না তার। বাঁ হাতে আঁচলের খুঁট চেপে আছে কপালে। ডান হাত দিয়ে মাঝে মাঝে চোখের ওপর থেকে চুলগুলো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। পা কিন্তু থামাচ্ছে না কিছুইতেই। ফিনকি হাঁটছে।

রাস্তা, কালীঘাটের কালীবাডী যাবার-পথ। দস্তুরমত তীর্থপথ। যে তীর্থ-পথের প্রতিটি ধূলিকণাই অতি পবিত্র। কিন্তু ধূলিকণার সাক্ষাৎ মেলে না কালী-তীর্থ পথে। পায়ের নিচে যা লাগে তা হল কালো কাদা। সিমেণ্ট পাথর পিচ দিয়ে বাঁধানো রাস্তার বুকে মাটি নেই। যা আছে তার নাম পথের কালি। পেছল প্যাচপ্যাচে কালীবাডীর পথে পথের কালি গায়ে মুখে সর্বাঙ্গে না মেখে কার সাধ্য এগোয়। রোজ জল দিয়ে দুবেলা ধোয়া হয় সে পথ, কাজেই ধুলো থাকবে

কি করে সে পথে। ধুলো না থাকলেও, গড়াগড়ি খাওয়াটা আটকায় না। একটু অসাবধান হলেই পতন। ষাঁড় গরু ছাগল কুকুর সাধু ফকির চোর গাঁটকাটা ফেরিওয়ালা ডালাধরা ঘাটর বামুন কুঠে ভিখিরী খদ্দের-ধরা মেয়েমানুষ আর গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝি গিজগিজ করছে সেই তীর্থ পথে। তার মধ্যে একটু অন্যমনস্ক যে হচ্ছে তার আর পরিত্রাণ থাকছে না। তীর্থপথের কালো পিচের ওপর পবিত্র ধুলো-গোলা কালো কালিতে গড়াগড়ি দিয়ে উঠতে হচ্ছে।

ফিনকিও পরিত্রাণ পেল না।

একটি ষাঁড একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমনো অভ্যাস করেছিল। রোজই বেচারা বেলা বারটার আগে উঠতে পারে না শয্যা ছেড়ে। পার্কের গায়ের ফুটপাথে আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে সে নাক ডাকাচ্ছিল। তার সঙ্গিনী দাঁড়িয়ে ছিল তার পাশেই। সে বেচারা বোধ হয় সূতিকায় ভুগছে, অনবরত তার পেছনের পা আর লেজ বেয়ে পাতলা ময়লা গড়িয়ে নামছিল। ফলে ফুটপাথের সেই জায়গাটায় এমন পিছল হয়েছিল যে ইঁদুরের পা পড়লেও হড়কাবে। ষাঁড়ের এপাশ ওপাশে পার্কের রেলিঙ ঘেঁষে ঘর কন্না সাজিয়ে বসেছিল কয়েকটি কুঠে পরিবার। তাদের ছেলে-পিলেদের পাছে মাড়াতে হয় এই ভয়ে সকলে ফুটপাথের কিনারাটুকুই ব্যবহার করছিল: কিন্তু সেই হাতখানেক জায়গাতেও ষাঁড়ের সঙ্গিনীর সূতিকা রোগের ফল ফলেছে। যেই সেখানে পা পড়া অমনি ঠিকরে ফিনকি ফুটপাথের ধারের নর্দমার ওধারে এক গাদা কাটা কাপড়ের ওপর। ফুটপাথে স্থান না পেয়ে রাজ্যের জিনিসপত্র সাজিয়ে বসেছে ব্যবসাদাররা রাস্তায়। ছোট ছোট খেলনা, বাসন ছুরি কাঁচি, গামলা, গামছা, মোটর টায়ারের স্যাণ্ডেল, কাটা কাপড়, সব রকমের মাল ঢেলেছে ফুটপাতের ধারে রাস্তায়। ফিনকির কপাল ভাল যে সে পড়ল কাটা কাপড়ের গাদায়। ছুঁরি কাঁচি বাসন কোসনের ওপর পড়লে আর একবার রক্ত ছুটত তার কপাল থেকে।

তেলে বেগুনে তিড়বিড়িয়ে উঠল কাপড়ওয়ালা। সে বেচারা সবে এসেছে চিতোরগড় থেকে। বড়বাজারের দোকানে দোকানে ঘুরে নানা রঙের টুকরো ছিট যোগাড় করেছে। মনে তার আগুন জ্বলছে, বড়বাজার ঘুরে জাত ভাইয়েদের সাত আটতলা বাড়ী আর গদি দেখে তার রক্তে তোলপাড় লেগে গেছে। টুকরো বেচার অবসান হবে থান থান কাপড় বেচায়, তারপর গিয়ে পৌছবে গাঁট বেচা পর্যন্ত। শেষে একেবারে খুলে বসবে কাপড়ের মিল একটা, এই হল তার স্বপ্ন। সে স্বপ্ন এ ভাবে ভেঙে যাবে শুরুতেই, কোথাকার একটা কে আছড়ে এসে পড়বে তার টুকরোর ওপর, এ সে সহ্য করবে কেন। হাতে ছিল এক গজি একখানা

লোহার শিক, আঁতকে উঠে সে শিকখানা উচিয়ে ধরল ওপর দিকে। ব্যস—হা হা হা হা করে ঝাঁপিরে পড়ল বাস্তসুদ্ধ মানুষ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কিল চড়ে থেঁতো হয়ে গেল চিতোরগড়ের বীর। ছিটের টুকবোগুলো উধাও হযে গেল চক্ষের নিমেষে। লোহার শিকের বাড়ী মেরে মেয়েছেলের মাথা ফাটনো, একেবাবে রক্ত বার কবা—এ ত যা তা কাণ্ড নয়। বারোয়ারি মার ধাক্কাব চোটে এক মুহূর্ত সে তিষ্ঠতে পারল না। ছিটের টুকবো, ছিট মাপবাব লোহার শিক সব ফেলে সে ছুটতে লাগল। তাতেও কি নিস্তার আছে, কালীঘাটের ত্রিসীমানা ছাডাবার জন্যে এক দল মানুষ ছুটতে লাগল তাব পেছনে।

ইতিমধ্যে ফিনকি পৌছে গেল হাত কযেক দূবের দাতব্য চিকিৎসালযের ভেতর। চোখ চাইবার আগেই কাবা তাকে তুলে ফেললে কাপড়ের গাদা থেকে, হাঁ করবার আগেই সে বুঝতে পারলে যে তাব মাথা কপাল পেঁচিয়ে বাঁধা আরম্ভ হযে গেছে। ছাড়া পেয়ে সে দেখল যে যাবা তাকে ডাক্তাবখানায পৌছে দিয়ে গেল তাদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সুতরাং কি আব কববে ফিনকি তখন, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথা নিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল আবার ফুটপাথে। পাশেই একটা পান বিড়িব দোকান, দোকানেব আযনায ফিনকি দেখতে পেলে নিজেব ছাযা। একটু এগিযে গিযে ভাল করে সে দেখে নিলে নিজেকে। বাঃ—একেবাবে চেনাই যাচ্ছে না তাকে। কান মাথা ফর্সা কাপড দিযে পেঁচানো ঐ মেযেটাই যে ফিনকি, তা সে নিজেই সহজে বিশ্বাস করতে পাবল না।

অনেকটা নিশ্চিন্তও হল ফিনকি। সহজে কেউ আব তাকে চিনতে পারবে না ভেবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। কিন্তু কাপড়ময কাদা আব বক্তের দাগ। কাপড়খানার সঙ্গে মাথাব ফর্সা ব্যাণ্ডেজটা একেবারে বেমানান দেখাচ্ছে। তা আর কববে কি ফিনকি, ফর্সা কাপড এখন জুটছে কোথা থেকে। ফিনকি হিসেব করে দেখলে যে, এখনও তিনখানা কাপড তার বযেছে বাক্সে। তাব মধ্যে একখানা একটু ছেঁড়া। কিন্তু পবা চলত আরও অনেক দিন। যাক্ গে চুলোয় সে সব কাপডচোপড, যার ইচ্ছে পরুক এখন তার জামাকাপড। ফিনকি আব ওমুখো হচ্ছে না।

উত্তরমুখো এগিয়ে চলল সে। আবার না আছাড খায এই ভয়ে সাবধানে হুঁশ রেখে লোকের ভিড ঠেলে এগিয়ে চলল। চেনা লোকের সামনে পড়বার ভয় নেই আর, পড়লেও কেউ চিনতে পারবে না তাকে! কান মাথা ভুরু পযন্ত এমন ভাবে ঢাকা পড়েছে যে ফিনকি নিজেই নিজেকে চিনতে পারছে না পান বিড়ির দোকানগুলোর আযনায়। কিন্তু কানে যেন কম শুনছে সে, আর তেষ্টাও পেয়েছে

তেমনি। আঙুল দিয়ে ঠেলে ঠেলে কানের ওপর থেকে কাপড়টা খানিক ওপরে তুলল। এবার বেশ শুনতে পাচ্ছে সব। কিন্তু তেষ্টা পেয়েছে তার খুবই, একটা কল পেলে এক পেট জল খেয়ে নিতে পারত। নজর রেখে চলতে লাগল ফিনকি, একটা কল দেখতে পেলে হয়।

বাজার ছাড়িয়ে গেল ফিনকি। বাজারের সামনে রাস্তার ওপর পেঁপে কমলা কলা সাজানো দোকানগুলোর সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল সে। কমলা দেখে মনে হল তার অনেক কষ্টে জমানো পয়সাগুলোর কথা। কত জমেছে কে জানে, দু তিন টাকাও হতে পারে হয়ত। চার পয়সা দিয়ে ছেঁদা করা একটা মাটির লক্ষ্মীর ঝাঁপি কিনে সেই ছেঁদার মুখে যখন যা পেয়েছে ফেলেছে ফিনকি। অনেক দিন ধরে ফেলছে, সেই স্নানযাত্রার দিন থেকে। চার পাঁচ টাকাও থাকতে পারে। যদি দু আনা পয়সাও থাকত এখন কাছে, ফিনকি একটা কমলা কিনে খেত। এখন সেটা ভেঙে পয়সাগুলো নিয়ে দাদা রেস খেলবে। খেলুক গে, গোল্লায় যাক সে পয়সা, ফিনকি আর ওমুখো হচ্ছে না।

কিন্তু জল কোথায়!

কলের কলও কি নেই নাকি এধারে?

আর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকেই একটু গলির ভেতর একটা কল দেখতে পেল ফিনকি। অনেকগুলো বালতি ঘড়া জমে রয়েছে সেখানে, নানা রঙের কাপড় পরে অনেকগুলো মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক গে, কারও দিকে না চেয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। সত্যিই প্রাণ ছাতি ফাটছে তখন তেষ্টায়—। একটা ঘড়া বসানো ছিল কলের মুখে, ঘড়াটা ভরতি হতে সে আর এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি একটু জল খাব।"

ভয়ানক মোটা ভয়ঙ্কর কালো একটা মেয়েমানুষ কোমরে একখানা আর গায়ে একখানা গামছা জড়িয়ে ঘড়াটা তুলে নিচ্ছিল। হঠাৎ একেবারে তেড়ে কামড়াতে এল সে।

"আহা হা, কোথা থেকে মরতে এল রে ঘেয়ো কুত্তিটা, জল খাবার আর ঠাঁই পেলে না কোথাও। উনি এখন এঁটো করে যান কলতলাটা, আবার আমি ছিষ্টি ধুয়ে মরি আর কি।"

পেছন থেকে কে বলে উঠল, "আহা দাও না গো একটু জল খেতে মাসী, দেখছ না মাথা ফাটিয়ে এসেছে।"

আর যাবে কোথা, একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল। মাসী গায়ের গামছাখানা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে এল হাঁ করে।

"তবে র‍্যা হারামজাদা, আমি কলে এলেই যত ধম্মজ্ঞান তোদের চাগিয়ে ওঠে—"

হারামজাদীরাও ছেড়ে কথা কবার পাত্রী নয় কেউ। চক্ষের নিমেষে এমন কাণ্ড বেধে গেল যে ফিনকিকে জল তেষ্টা ভুলে পিছিয়ে যেতে হল কয়েক পা। কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে, গলির মুখের একটা চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। লোকটা যেমন জোয়ান তেমনি তার চোখদুটো আর গোঁফ জোড়াটা। পরে আছে একটা রঙ্‌চঙে লুঙ্গি আর একটা ফতুয়া। লুঙ্গিটা গুটতে গুটতে এগিয়ে গেল সে কলের দিকে। গিয়েই সর্বপ্রথম লাথি মেরে মেরে ঘড়া-বালতিগুলোকে ছিটকে ফেললে চতুর্দিকে। তারপর মার, এলোপাতাড়ি চালাতে লাগল তার হাত দুখানা। মেয়েমানুষগুলো ছুটতে লাগল। চক্ষের নিমেষে তারা অন্তর্ধান করলে দুদিকের খোলার বাড়ীর ভেতর। মোটা মেয়েমানুষটা ছুটতে পারল না। পেছন থেকে তার চুল ধরে ফেলল সেই লোকটা। চুল ধবেই মাব, সে কি কিলের আওয়াজ। কিলের আওয়াজ ছাপিযে পরিত্রাহি চিৎকাব কবতে লাগল মেয়েমানুষটা। গামছা দু'খানা খসে পড়ে গেল তার গা থেকে। ধপাস করে সে নিজে পড়ে গেল মাটিতে। তাতেও রেহাই নেই, তখন আরম্ভ হল লাথি। গোটা কতক লাথি মেরে তাকে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে এল সেই লোকটা ফিনকির দিকে।

ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল ফিনকি।

এই সর্বপ্রথম লোকটা কথা বললে। ভয়ঙ্কর গলায় জিজ্ঞাসা করলে, "কে রে তুই? এলি কোথা থেকে মরতে এখানে?"

জবাব দেবে কে? ফিনকির প্রাণ উড়ে গেছে তার চোখের দিকে তাকিযে। মুখে আঁচল পুরে সে কান্না চাপতে গিয়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

লোকটা একটুখানি চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁকার দিয়ে উঠল, "এবে এ বেট্টা, এ শালে দেখো, ইধার আয় বে।"

চায়ের দোকান থেকে জন চার পাঁচ মানুষ বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ফিনকির চার পাশে।

"চিনিস নাকি বে এটাকে?" জিজ্ঞাসা করলে সেই যমের মত লোকটা।

কেউই চেনে না, সবিনয়ে তা নিবেদন করলে তারা।

তখন পেছন থেকে শোনা গেল মেয়েমানুষের গলা। কে বললে, "ও কলে জল খেতে এসেছিল খোড়াদা, বেঙা মাসী মুখ করে উঠল।"

"জল খেতে এল এই কলে! এই কলের জল মানুষে খায় নাকি? যত শালী

পচা শকুন জল খায় যে কলে সে কলে ও জল খেতে এল কেন ?”

ক্রমে চড়তে লাগল ঘোড়াদার গলা। টুঁ শব্দটি নেই আর কোথাও।

“আচ্ছা ঠিক আছে। চল বেটি আমার সঙ্গে, জল খাওয়াব আমি তোকে—” বলেই টপ করে তুলে নিলে ফিনকিকে ঘোড়াদা। নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল সেই গলি থেকে। তার হাতের ওপর কাঠ হয়ে রইল ফিনকি, এতটুকু নড়াচড়া করারও সাহস হল না তার।

ঘোড়া পৌঁছল তার আস্তাবলে ফিনকিকে নিয়ে। কোথা দিয়ে কোন পথে কতক্ষণ ধরে এল ফিনকি তার হিসেব রাখতে পারে নি। একরকম দম বন্ধ করেই ছিল সে ঘোড়ার হাতের ওপর। নামিয়ে যখন দেওয়া হল তাকে তখন সে দেখল একটা টেবিলের সামনে দাড়িয়ে আছে। টেবিলের ওধারে বসে আছেন একজন ভদ্রলোক, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিনকি বুক খালি করে নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণে এমন একজন মানুষের সামনে সে পৌঁছল যার চোখের দিকে চাইলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় না। সোনার ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন ফিনকির দিকে। তারপর ঘোড়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, “কি গো পালোয়ানজী, এর মাথাটা ফাটল কি করে ?”

“কি করে জানব সে খবর বড়দা। সত্যপীর তলার কলে গিয়েছিল জল খেতে এ, বেঙা বাড়ীউলী তেড়ে কামড়াতে যায় এতটুকু মেয়েটাকে। তখন লাগে চুলোচুলি অন্য মাগীগুলোর সঙ্গে বেঙা বাড়াউলীর। গোলমাল শুনে আমি গিয়ে মেয়েটাকে ছো মেরে তুলে নিয়ে এলাম।” নরম সুরে জবাব দিলে পালোয়ানজী।

“আর সেই সঙ্গে তাদের ঠেঙিয়ে একটু হাতের সুখ করে এলে, কি বল ?” বলে হো হো করে হাসতে লাগলেন সেই ভদ্রলোক। হাসি শেষ হলে বললেন, “হাত তুমি তুলবেই যে কোনও ছুতোয়, একটা ভাল কাজ করতে গিয়েও কাউকে না কাউকে না মেরে থাকতে পার না তুমি। এ স্বভাবটা আর তোমার গেল না শশী। শরীরে শক্তি থাকলেই যদি মেরে বেড়াতে হয় মানুষকে তবে না থাকাই বরং ভাল। তা যাক, বোস না শশী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।”

শশীর সুর আরও নরম হয়ে গেল। বসল না সে, ফতুয়ার দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুব মিনতি করে বললে, “না মেরে আমি থাকতে পারি না যে বড়দা। যত মনে করি আর ঠেঙাব না কাউকে, তত দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট যেন ঝেঁটিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শালা আমারই ঘাড়ে। যাক্, যেতে দাও বড়দা, এখন এ মেয়েটাকে নিয়ে কি করব বল। না জেনে খাস সত্যপীর তলার নরকে ঢুকে পড়েছিল একেবারে,

ঠিক সময়ে আমার নজরে না পড়লে এতক্ষণে কোথায় যে পাচার হয়ে যেত, কার খপ্পরে যে গিয়ে পড়ত, তাই বা কে বলতে পারে। এখন একে নিয়ে কি করা যায় তাই বল।"

ভদ্রলোক তাঁর পাশ থেকে ফোনটা তুলে বললেন, "ব্যবস্থা যা করার করা যাচ্ছে। তুমি কিন্তু এবার তোমার ঐ হাতদুটো একটু সামলাও শশী।"

বাড়ী থেকে বেরোবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিনকির পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল। সত্যপীর তলার নামকরা মুরব্বী শশী গুণ্ডা ওরফে ঘোড়াশশী তাকে তুলে নিয়ে যাঁর কাছে পৌঁছে দিল তিনি পাকা ব্যবস্থা করার জন্যে যাকে ফোন করতে গেলেন তাকে তখন না পেয়ে শশীকে বললেন, "এখন আর কাউকে ফোনে পাব না শশী। কোর্ট থেকে আবার আমি ফোন করব। এখন এ মেয়ে রইল আমার এখানেই, দেখি কি করা যায় একে নিয়ে।"

আকর্ণ হাঁ করে কৃতার্থ শশী বললে, "ব্যস-ব্যস। খাসা ব্যবস্থা হল বড়দা। আমার ত কোথাও চাল-চুলো নেই যে সেখানে নিয়ে যাব এটাকে। যে সব আড্ডা আছে আমার, সেখানে যত শালা ঘড়েল হাঁ করে রয়েছে। যাক্, দরকার পড়লে ঘোড়াশশেকে একটা ডাক দিও বড়দা, আমি চলি এখন।" বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে শশীর বড়দার পেছনের পর্দা ঠেলে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁর দিকে চেয়ে হাঁ করে রইল ফিনকি। তারই মত বা তার চেয়ে মাথায় হয়ত একটু বড় হবেন তিনি, কিন্তু তিনি ছোট মেয়ে নন। দস্তুরমত একজন গিন্নীবান্নী মানুষ। কপালে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা, টকটকে লাল পাড় গরদ পরে আছেন। চোখে মুখে এতটুকু ছেলেমানুষি নেই।

ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, "আরে এ কে! মাথা ফাটল কি করে?"

বলতে বলতে টেবিলের পাশ দিয়ে এসে একেবারে মাথার ওপর হাত রাখলেন ফিনকির। মুখখানাকে একটু তুলে ধরে বললেন, "এ হে হে রক্ত গড়িয়ে শুখিয়ে রয়েছে যে নাকের ওপর পর্যন্ত। এ রকম হল কি করে?"

শশীর বড়দা বললেন, "যত পার প্রশ্ন করে যাও এক নিশ্বাসে। তারপর ওকে নিয়ে যাও বাড়ীর ভেতর, সারাদিন ধরে ঐ সব প্রশ্নের জবাব বার করে সন্ধ্যেবেলা আমায় জানিও। আমি এখন চললাম কোর্টে।'

"মানে!" আশ্চর্য হয়ে তিনি চাইলেন আবার ফিনকির মুখের দিকে। তার-পর তার হাত ধরে বললেন, "সেই ভাল, আমি নিয়ে যাচ্ছি একে। তুমি কিন্তু আর দেরি করো না যেন। চল ত ভাই, চল তোমার চোখ মুখ ধুইয়ে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি আমি।"

আপত্তি করল না ফিনকি, আপত্তি করার সামর্থ্যও ছিল না তার। এমন একজন লোক ফিনকির হাত ধরবে এ যে স্বপ্নেও কখনও ভাবে নি ফিনকি। শান্ত মেয়ের মত সে চলল তাঁর সঙ্গে, কি রকম একটা মিষ্টি গন্ধ তখন সে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। গন্ধটা আসছিল তাঁর গা থেকেই।

আচ্ছন্নর মত কাজকর্ম সব করে গেলেন ফণা ফিনকির মা। বাসন কখানা না মেজেই মেয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে, একটু কিছু হলেই বাড়ী থেকে ছিটকে বেরোয়। এবার আসুক ফিরে, বাড়ী থেকে বেরোন জন্মের মত বন্ধ করবেন তিনি মেয়ের।

যে জিনিস হারিয়ে তিনি পথের ভিখিরী হয়েছিলেন সে বস্তু আবার ফিরে এল তাঁর হাতে। এবার আবার দিন ফিরবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি এবার চলে যাবেন কালীঘাটের ত্রিসীমানা ছেড়ে। আড়তের দাঁড়িপাল্লা আর ছুঁতে হবে না তাঁর ছেলেকে, মেয়েকে তিনি চৌকাঠ পেরোতে দেবেন না কখনও। অত রাগ মেয়ের, এবার নিজে থেকেই কমবে। রাগ হবে না কেন, পেট ভরে খেতে পায় না, পরনের কাপড় পায় না, মাথায় একটু তেল পর্যন্ত পায় না। জন্মদুখিনী মেয়েটা তা., ..নু মেযে একটুও বেচাল হয় নি। চারটে পয়সা হাতে পেলেও তাঁর হাতে এনে তুলে দেয়। আর তিনি নিদারুণ অভাবের তাড়নায় হাত পেতে নেনও মেয়ের ভিক্ষে করা পয়সা। কিন্তু আর না, এই শেষ হল তাঁর দুর্দশার দিন। ফিরবেই দিন এবার, ঠিক আগের মত হবে সব কিছু। কি করে হবে তা অবশ্য তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু হবেই, ও জিনিস ঘরে থাকলে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন। কখনও এব অন্যথা হয না, হতে পারে না।

মনে মনে তিনি আর একবার প্রণাম করলেন সেই পাথরখানিকে। ছেলে স্নান করে আসতে তাকে দিয়ে তিনি স্নান পুজো করিয়েছেন সেই পাথরখানির। তারপর ছেলের হাত দিয়েই সেখানিকে ফুল বেলপাতা তাম্রকুণ্ড সুদ্ধ বাক্সের মধ্যে রাখিয়ে বাক্সে চাবি দিয়ে রেখেছেন। চাবি ঝুলছে তার আঁচলে, সুতরাং নিশ্চিন্ত আছেন তিনি। এখন মেয়েটা ফিরলে হয়। ফণা বোনকে খুঁজতে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি মানা করলেন। কি হবে সাধতে গিয়ে, সাধলেও সে আসবে না—যতক্ষণ না রাগ পড়বে। ফণাকে বলে দিয়েছেন তিনি, একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে আর বিকেলে ছুটী নিয়ে আসতে। বিকেলে তিনি ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে বসিয়ে বলবেন যে কী জিনিস ফিরে পেল আজ তারা। তাদের বংশের চোদ্দ পুরুষ ঐ সাক্ষাৎ কালীর সেবা করেছে। ঐ আসল কালীযন্ত্র, নীল পাথরের

ওপর খোদাই করা রয়েছে মায়ের যন্ত্র। ফণা ফিনকির মা চেনেন ওর সব কটা দাগ, তাঁর শ্বশুর তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। ঠিক মাঝখানে একটি বিন্দু, বিন্দুকে ঘিরে পরপর পাঁচটা ত্রিকোণ, ত্রিকোণ ঘিরে অষ্টদল আর পদ্ম আর অষ্টদল পদ্ম ঘিরে চতুর্দ্বারযুক্ত চারকোণা বন্ধনী। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ লাভ হয় ঐ যন্ত্রের সেবায়। ছিলও তাঁর শ্বশুরকুলে লক্ষ্মী-সরস্বতী বাঁধা। কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেল যেদিন ঐ যন্ত্র নিয়ে ভিটে ছেড়ে নামতে হল পথে। তারপর ঐ সাক্ষাৎ মা কালীকে অবজ্ঞা কবে যেদিন এই বংশেব ছেলে কালীঘাটের কালীর দরজায় পয়সা কুডোতে গেল সেদিন এই বংশের কুললক্ষ্মীও হাতছাড়া হলেন। আবাব নিজের ইচ্ছেয় ফিরে এসেছেন মা, সুতরাং আবার সব হবে। হযত—

একটু অন্যমনস্ক হযে পডলেন ফণা ফিনকির মা। তাঁর হাত দুটো একটু থামল কাজ করতে কবতে। বেশ আচ্ছন্ন হযে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ। হয়ত —পযন্ত ভেবে তার পরের ভাবনাটা ভাবতে আর সাহস হল না তাঁব। থাক, যেখানে সে আছে শান্তিতে থাক। ফিরে এলে এখন কি যে হবে আব কি কি যে হবে না তার সবটুকু কল্পনা করার সামর্থ্যও নেই তার। তাব চেযে সুখে থাক সে, যেখানে আছে সেখানে যেন একটু শান্তি জোটে তার কপালে। তার কপালের সিঁদুর আর হাতের নোয়া নিযে যদি তিনি মবতে পারেন তাহলেই তাঁর যথেষ্ট পাওয়া হল জীবনে। কালীঘাটের কালীদ' থেকে যদি তিনি কখনও উদ্ধাব পান, ছেলেমেযে-দুটোকে যদি এই বংশের ছেলেমেয়ের মত দাঁড কবাতে পারেন তিনি কখনও, তাহলে মরেও তিনি শান্তি পাবেন। বেঁচে থাকতে তাঁর কপালে সুখ শান্তি জুটল না, তার জন্যে কখনও তিনি কাউকে স্বপ্নেও দায়ী করেন নি। শেষের দিন কটাও নিজের পোড়া অদৃষ্ট ছাড়া আর কাউকে তিনি দোষ দেবেন না।

কিন্তু এখনও ত ফিরল না ফিনকি। এত দেরী ত সে করে না কোনও দিন। বারোটা বোধহয় বেজেই গেল!

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে ফিনকির মা আর একবার দরজাব দিকে তাকালেন।

সত্যিই বেজে গেল বারোটা।

হালদার মশায় অনেকক্ষণ একভাবে চেয়ে আছেন দরজাটার দিকে। যেন একটা কিছু অঘটন ঘটার প্রতীক্ষা করছেন তিনি ঐ দরজার বাইরে। হযত এই মুহূর্তে একটা ছায়া পড়বে বাইরের বারান্দায়, তারপর ছায়াটা এগিয়ে এসে দাঁড়াবে তার দরজায়, তারপর ঘরে ঢুকবে সেই ছায়া। ঘরের মধ্যে ছায়াটা আর ছায়া

থাকবে না, কথা বলে উঠবে। বলবে, "চল, তোমায় তুলে নিয়ে যেতে এসেছি আমি, আর এখানে এমন ভাবে একলা তোমার পড়ে থাকা চলবে না।" তা শুনে হালদার মশায় হাসবেন, নিঃশব্দে একটু হাসবেন শুধু। সে হাসির মানে কি সে বুঝতে পারবে। বুঝবে কি সে যে অনেক দেরী হয়ে গেল, একেবারে বারোটা বেজে গেল এই ডাকার ক্ষণটি এসে পৌছতে। হালদার মশায়ের হাসি কি এ বারতা বলতে পারবে তাকে, যে ঠিক সময় ঠিক ডাকটি না দিতে পারলে সাড়া পাওয়ার এতটুকু সম্ভাবনা থাকে না আব। তেল ফুরোবাব পবে পিদিমটা জ্বলেও যদি আরও কিছুটা সময়, তাহলে তা থেকে শুধু খানিক বিকট গন্ধই বেরোয়। তখন সে পিদিমের কাছ থেকে আলোব আভা আশা করা শুধু অন্যাযই নয়, সেটা সেই বুকজ্বলন্ত পিদিমটাকে মুখ ভেংচানোব শামিল হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু বারোটাও যে অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল।

আর একটু পরেই যে আঁধাব ঘনিযে উঠবে তাঁর দুই চোখে। তারপর যে ছায়াটুকুও আব দেখতে পাবেন না তিনি। তখন তিনি বোঝাবেন কি তাকে তাঁর বোবা চাউনি দিয়ে। মুখ ফুটে ত আর কিছু বলতে পারেন না হালদার মশায়। অসংখ্যবার অসংখ্য বলার ক্ষণ এসেছে আর চলে গেছে। হালদার মশায় শুধু চোখেব ভাষায বলতে চেযেছেন তাকে তাঁর বলার কথাটা, মুখ ফুটে একটিবাবের জন্যেও এতটুকু দযা চান নি তার কাছে। আর এইভাবে দিনের পব দিন বছরেব পব বছর চোখ দুটোকে কথা বলার কাজে ব্যবহার কবার ফলেই তিনি হারিয়েছেন তাঁর চোখের আলোটুকু। দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের আলো নিভে যায়। কালির সমুদ্রে ডুবে যান তিনি, তলিয়ে যান মৌনতার অতল গহ্বরে। তখন তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত গুনে গুনে কাটে আলোর প্রতীক্ষায়। কারণ আলোই হল ভাষা, ভাষাই হল আলো। যেখানে আলো নেই, ভাষাও নেই সেখানে। হালদার মশায় মর্মে মর্মে জানেন যে আলোহীন ভাষাহীন জীবনের নামই মৃত্যু। যে মৃত্যুকে তিনি সুদীর্ঘকাল ধবে চুষে চুষে পান করছেন। যে মৃত্যুকে তিনি ভয় ত করেনই না, এমন কি ঘৃণা পর্যন্ত করেন না, একান্ত বন্ধুর মত জ্ঞান করেন যে মৃত্যুকে। সেই মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে তাঁর মাথার শিয়রে, আর একটু পরেই তাঁকে গ্রাস করবে। এবং আবার তাঁকে উগরে দেবে কাল ভোরে, যখন আকাশের গায়ে আলোর ভাষায় কথা কয়ে উঠবেন আলোর দেবতা।

কিন্তু কই এল না ত সে এখনও!

আলো মুছে যাবার আগে তবে কি আসবে না সে তাঁর সামনে! কিংবা এও

কি সম্ভব যে কংসারি হালদারের সামনে এসে দাঁড়াবার বিন্দুমাত্র গরজ নেই আর তার।

সেও কি তাহলে মনে করলে নাকি যে কংসারি হালদার ফুরিয়ে গেছে একেবারে?

কিংবা যা তারা হাতে পাবার জন্যে এতকাল সহ্য করেছে কংসারি হালদারকে, সে জিনিস হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে কংসারি হালদার একেবারে মুছে গেল তাদেব মন থেকে?

ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হালদার মশায। আবার ঘামতে লাগলেন তিনি, আবার তাঁর শিবদাঁড়ার মধ্যে যন্ত্রণাটা শুরু হযে গেল। সমস্ত প্রাণটুকু গিয়ে জমা হল তাঁর দুই চোখে। জলন্ত দৃষ্টিতে তিনি তাকিযে রইলেন দরজাটার দিকে।।

শেষ পর্যন্ত একটা ছায়া পড়ল দরজাব সামনে। ঘরে ঢুকলেন হালদাব মশায়েব বড় বৌমা বেদানাব রস এক গেলাস হাতে নিযে। এইবার নিয়ে সকাল থেকে চারবার আসা হল তাঁর হালদার মশায়ের ঘবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি শ্বশুরকে যা খাওয়াবার তা খাইয়ে যাচ্ছেন নিঃশব্দে। নিঃশব্দে হালদার মশায সেবার অত্যাচাব সহ্য করে চলেছেন। ঘড়ির কাঁটাব মত চলেছে তাঁব সেবা, একেবারে কলের মত চলেছে ছেলে-বৌদের কর্তব্য পালন কবা। কোনও দিকে এতটুকু ত্রুটি নেই, বিন্দুমাত্র ছিদ্র নেই তাদের আন্তবিকতায়। সেবা আন্তবিকতা আব কর্তব্য পালনের জগদ্দল পাথরটা নির্ঝঞ্ঝাটে গড়িয়ে চলেছে হালদার মশাযের বুকেব ওপর দিয়ে। এতটুকু নড়াচড়া করারও শক্তি নেই তাঁর।

ভিজে তোয়ালেব খুঁটে শ্বশুরের ঠোট দুখানি অতি যত্নে মুছিযে দিযে বড় বৌমা খালি গেলাসটা হাতে নিয়ে ফিরে চললেন ঘব ছেড়ে। বৌমাযেরা কখনও কথা বলেন নি তাঁদের শ্বশুরের সঙ্গে, কখনও মুখ তুলে তাকাননিও শ্বশুরেব মুখের দিকে, শ্বশুরের এতটা কাছে কখনও আসতেও হয় নি তাঁদেব। এখন স্বহস্তে সেবা করতে হচ্ছে শ্বশুবের। নিখুঁত ভাবে করে যাচ্ছেন তাঁরা যা কবার, কারণ যে বংশের মেয়ে তাঁরা সে বংশের মেযেরা জানে কি করে শ্বশুরের সেবা করতে হয। দেখে শুনে ভাল বংশের মেয়েই ঘরে এনেছেন কি না হালদার মশায়, কাজেই সেদিকে এতটুক্ আক্ষেপ করার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। তবে একটা কথা তিনি ভাবছেন মাঝে মাঝে। ভাবছেন যে তাঁর বৌ দুটো বোবা নয়ত। মরতে বসেছেন তিনি, আর কয়েকদিন পরে এই খাটেও তিনি থাকবেন না, তবু এরা তাঁর সঙ্গে এক আধটাও কথা কয় না কেন? শেষের দিন কটা তাঁর পাশে

বসে তাঁর সঙ্গে ভাল মন্দ দুটো কথা বললে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ? ওরা কি ওদের শ্বশুরকে কাঠ পাথর লোহা গোছের কিছু মনে করে নাকি ! না ওরা এই মনে করে যে এ লোকটার সঙ্গে আলাপ করার মত কিছু নেই এই দুনিয়ায় ! কেন ওরা এমন ব্যবহার করে ওঁর সঙ্গে ?

কেন সকলে এ রকম ব্যবহার করছে তাঁর সঙ্গে ?

কেন ?

হঠাৎ ডেকে ফেললেন হালদার মশায় তাঁর বৌমাকে, "বড বৌমা।" চৌকাঠের ওধারে এক পা দিয়েছেন তখন বড বৌমা, পা টেনে নিয়ে ঘুরে দাঁডালেন। দুই চোখে তাঁর উপচে উঠেছে তখন ভয় আর বিস্ময়। এক মুহূর্ত দাঁডিয়ে থেকে তাডাতাডি এগিয়ে এলেন তিনি খাটের পাশে। নীচু হয়ে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমায় ডাকলেন বাবা ?"

হালদার মশায় তখন বুজে ফেলেছেন তাঁর চোখ। ঠোঁট একটু নডে উঠল তাঁর, অস্পষ্ট কণ্ঠে বলতে পারলেন শুধু, "তপু ত ফিরল না মা এখনও।"

অনেকক্ষণ আর কোনও সাডাশব্দ পেলেন না হালদার মশায়। চোখ মেলে দেখলেন, ঘরে কেউ নেই। মনে মনে হাসতে লাগলেন তিনি। ভয় করে সবাই তাঁকে বিষম ভয় করে। উত্থানশক্তি-রহিত হয়েছেন তিনি, তবু তাঁকে যমের মত ভয় করে সকলে। ভয় পেয়েই পালিয়ে গেল বৌটা। জীবনে কখনও শোনে নি ত তাঁর ডাক, তাই ডাক শুনে কি যে করবে বুঝতেই পারল না। ভয় পেয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে গেল ঘর ছেডে। যতই এ কথা ভাবতে লাগলেন হালদার মশায় ততই হাসিতে তাঁর শরীর দুলিয়ে উঠতে লাগল। মন মেজাজ বেশ হালকা হয়ে উঠল তাঁর, বহুকাল পরে খুশী হবার মত একটা কিছু পেয়ে তিনি খুশিতে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

ভয় করে সকলে, বিষম ভয় করে এখনও সকলে হালদার মশায়কে।

ভয়ে একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম হল ত্রিপুরারি হালদারের। সামনে যাকে দেখতে পেলেন তাকেই সংবাদটা জানিয়ে তিনি ছুটলেন বাডীর দিকে। মুহূর্ত মধ্যে কালীবাডীতে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে শেষ সময় উপস্থিত কংসারি হালদারের। পিলপিল করে মানুষ ছুটল হালদার বাডীর দিকে। পঞ্চানন ভট্টাচার্য মশায়ের কাছেও সংবাদটা পৌঁছল। কে আবার ফোন করে দিলে তারকারি হালদারের অফিসে। হালদার মশায়ের চেয়ে বয়সে বড যাঁরা তাঁরাও ঠুকঠুক করে এগোলেন শেষ দেখাটা দেখবার জন্যে। কেউ বললেন, ভাঙল এবার

একটা পাহাড়ের চূড়া, কেউ বললেন, মস্ত বড় একটা নক্ষত্র গেল খসে কালীঘাটের আকাশ থেকে। কয়েকজন ডালাধরা কেঁদেই ফেলল একেবারে। কংসারি হালদার চললেন, এ সংবাদে তাদের বুকের ভেতরটায় মোচড় দিতে লাগল। একদিন ঐ বদরাগী গম্ভীর মানুষটার সামনে কোনও না কোনও ছুতায় পড়ে গিয়েছিল তারা, তাই তারা আশ্রয় পেয়েছে কালীবাড়ীতে। প্রথমে খেতে হয়েছে ধমক, "মরবার আর ঠাঁই জুটল না কোথাও তোমার, তাই মরতে এসেছ পোড়া পেট নিয়ে কালীবাড়ীতে। আচ্ছা থেকে যাও, চুরি ছ্যাচড়ামি করো না যেন। বামুনের ছেলে যখন—তখন দুটো অন্ন জোটাবেই বেটী। কেউ এখেনে উপোস করে থাকে না।" তারপর তারা থেকে গেছে, ডালা হাতে চরে বেড়াচ্ছে কালীবাড়ীর আশেপাশে। মা সত্যিই উপোস রাখেন না কাউকে, কিন্তু সে ঐ একটা পেটের দায়ই মা বইতে পারেন। একটা পেটের সঙ্গে আরও পাঁচটা পেট যে এসে জুটেছে কালীঘাটে, মা তাদের জন্যে দায়ী হন না। তাই ডালাধরার সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়, ডাইনে টানলে বাঁয়ে থাকে না কিছুই। তা না থাকুক, তবু ঐ কংসারি হালদারের মুখের বাক্য না পেলে কি ওদের সাধ্য ছিল ডালা হাতে মায়ের বাড়ীতে ঢোকার। টিপে পিষে থেঁতলে শেষ করে দিত তাদের আগে যারা এসেছে তারা। সেই আশ্রয়দাতা কংসারি হালদারের যাবার সময় এগিয়ে এসেছে, তাই তিনি বড় ছেলেকে কাছে ডেকে পাঠিয়েছেন, এই সংবাদ শুনে হতভাগা ডালাধরাদের চিরশুষ্ক চোখও ভিজে উঠল। পায়ে পায়ে তারাও গিয়ে দাঁড়াল হালদার বাড়ীর দরজার সামনে।

ছুটল সবাই, অনেকে কিছু না জেনেই ছুটল। চলেছে যখন সকলে তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটনার মত ঘটছে ওখানে, এই আশায় ছুটল অনেকে। ভিখিরীরা ছুটল কিছু দান হচ্ছে ভেবে, বামুনরা ছুটল কোনও রাজা গজা এসেছে ভেবে। কেউ বা ছুটল শুধু মজা দেখবার আশায়। হয়ত ধরা পড়েছে একটা গাঁটকাটা, কিংবা কোনও মেয়েমানুষ নিয়ে কেলেঙ্কারি লেগে গেছে। কিংবা হয়ত কোনও অসাধারণ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, তিনি যাকে সামনে দেখছেন তাকেই একেবার রাজা করে ছেড়ে দিচ্ছেন। কিছুই অসম্ভব নয় কালীঘাটে, মুঠো মুঠো গিনি মোহর ছড়িয়ে উধাও হয়ে যায় এমন মহাপুরুষেরও আবির্ভাব ঘটে কালীঘাটে। কিন্তু মজা হচ্ছে, গিনি মোহরগুলো কুড়িয়ে ঘরে আনলেই অমনি উবে যায় সেই সব মহাপুরুষদের মত। কাজেই কালীঘাটের আইন হল কোথাও একটা কিছু হচ্ছে শুনলেই ছোটা। কালীঘাটের আইন অনুযায়ী ছুটতে বাধ্য সকলে। সুতরাং ছুটল মানুষ হালদার বাড়ীর দিকে।

ত্রিপুরারি হালদার পা টিপে টিপে ঢুকলেন বাপের ঘরে। বাবা চোখ বুজে আছেন। দম বন্ধ করে অনেকক্ষণ তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন বাপের বুকের ওঠা-নামা। ইতিমধ্যে নিঃশব্দে ঘর বোঝাই হতে লাগল। বউ দুজন পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। ছেলে মেয়েরা স্কুলে, তাদের আনবার জন্যে চাকর ছুটেছে তখন স্কুলেব দিকে। খড়ম ছাড়া ভট্চায এসে দাঁড়ালেন মাথার কাছে, বড মিশ্র মশায় ধনুকের মত শরীর নিয়ে ঘরে ঢুকে এক কোণে বসে পড়লেন। বড বড়রা একে একে ঢুকতে লাগলেন ঘবে। সকলেই নির্বাক নিস্পন্দ নিস্তব্ধ, এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন হালদাব মশায়ের মুখের দিকে। একবার অন্তত: চোখ খুলবেনই কংসারি হালদার, শেষ দেখা তিনি দেখবেনই তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের। এই আশায় সকলে গলা বাড়িয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন হালদার মশায়ের মুখের দিকে।

বাইরেব বারান্দায জুতোব আওয়াজ উঠল। ঘরের মধ্যে নড়েচড়ে সরে দাঁড়াবার শব্দ হল। সকলে রাস্তা করে দিলেন। ডাক্তার নিয়ে ছোট ছেলে তারকারি দুই লাফে বাপেব খাটেব পাশে উপস্থিত হল। চমকে উঠে চোখ চাইলেন হালদাব মশায। চোখ চেয়ে একেবাবে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। একি, এত মানুষ কেন তাঁব ঘবে।

ততক্ষণে তাঁব ডান হাতখানা ধবে ফেলেছেন ডাক্তাব, নাড়ী ধবে ঘড়ির দিকে চেয়ে আছেন তিনি। বাপেব বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাবকারি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু কবেছে। বড মিশ্র মশায ক্ষীণকণ্ঠে তারকব্রহ্মনাম জুড়ে দিয়েছেন। পঞ্চানন ভট্চায বিড়বিড় করে করে বীজ গাযত্রী জপছেন শিয়রে দাঁড়িয়ে।

সকলের মুখেব দিকে একবার তাকিয়ে দেখে হালদার মশায় আবার চোখ বুজলেন। ত্রিপুরারি আব থাকতে পারলেন না, চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, "বাবা, বাবা গো—" চোখ আব চাইলেন না হালদাব মশা-, বাঁ হাতখানা তুলে ছেলের গায়ে রাখলেন। গুজগুজ ফুস ফুস আরম্ভ হল ঘরের [illegible]। ডাক্তাব নাড়ী দেখা বন্ধ করে বললেন, "ঠিক আছে, এখন আর কোনও ভয নেই। ওষুধটা আনিয়ে নিন। ওয়াচ রাখবেন, একটু অস্বস্তি বোধ করলেই দুফোঁটা দেবেন জিভের ডগায়।"

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন ঘব ছেড়ে, তাঁর জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই রৈ রৈ আওবাজ উঠল হালদার বাড়ীব সামনে। হাতে পায়ে গলায় কোমরে সর্বাঙ্গে নানা রঙের ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে বাঁধা রাজ্যের ইট পাটকেল খোলামকুচি ঝুলিয়ে বিকট দর্শন একটা পাগল ঢুকে পড়েছে ভিড়ের মাঝখানে। খুব সম্ভব আপাদমস্তক লোকটা ময়লা মেখে আছে। দুর্গন্ধে মানুষ অস্থির হয়ে তাকে তাড়াবার জন্যে রৈ রৈ করে উঠেছে। সে কিন্তু ঢুকবেই বাড়ীর মধ্যে,

জোর করে ঢুকবে। পথ না ছেড়ে দিলে আঁচড়ে কামড়ে নিজের পথ করে নেবে সে। দু একজনকে জাপটেও ধরেছে তার সেই বীভৎস চেহারার সঙ্গে। পাছে আবার কাউকে ছুঁয়ে ফেলে এই ভয়ে লোকজন ছুটতে আরম্ভ করেছে। আবার কেউ কেউ দূর থেকে গলার জোরে তাড়াবার চেষ্টাও করছে লোকটাকে। কিন্তু সে ক্রমেই এগিয়ে যেতে লাগল হালদার বাড়ীর দরজার সামনে। বাড়ীর ভেতর এখন ও ঢুকে পড়লে কি সর্বনাশ হবে এই ভেবে প্রাণপণে চেঁচিয়ে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল সকলে।

হঠাৎ সমস্ত গোলমাল ছাপিয়ে শোনা গেল—

"হরি নাম লিখে দিও অঙ্গে।"

হালদার বাড়ীর দরজার সামনে পৌঁছে ওপর দিকে মুখ তুলে পাগলটা আবার চেঁচিয়ে উঠল—

"হরি নাম লিখে দিও অঙ্গে।
তোমরা সকলে এই করিও মিলে
আমার প্রাণ যেন যায় হরি নামের সঙ্গে॥"

ওপরের ঘরে হালদার মশায় আবার চোখ চাইলেন। অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন তিনি চতুর্দিকে। যেন ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছেন তিনি, যেন ওঠবার শক্তি থাকলে এখনই উঠে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে ফেলতেন নিজেকে, যেন কেউ ধরতে আসছে তাঁকে। মরণের চেয়ে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনার মধ্যে যেন এখনই তাঁকে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

পঞ্চানন ভট্চায চেঁচিয়ে উঠলেন, "কি হল! হল কি কাঁসারী? ও রকম করছ কেন?"

হালদার মশায় জবাব দিতে পারলেন না। আবার তিনি চোখ বুজলেন, চোখ বুজে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইলেন। ওপরে ওঠবার সিঁড়িতে তখন শোনা যেতে লাগল—

"আনিও তুলসী দল যত্ন করে তুলে
তারি মালা গেঁথে পরাইও গলে
হরেকৃষ্ণ নাম দিও কর্ণ-মূলে
জাহ্নবীর কোলে নিয়ে যেও সঙ্গে।
হরিনাম লিখে দিও অঙ্গে।"

একেবারে ওপরে উঠে এল যে!

কে চেঁচিয়ে উঠল, "বার করে দাও, দূর করে দাও ব্যাটাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন হৈ হৈ করে উঠল। ত্রিপুরারি তারকারি ঘুরে দাঁড়ালেন ঘর থেকে বেরোবার জন্যে।

হালদার মশায় চোখ চেয়ে হাত বাড়িয়ে বড় ছেলের হাতখানা ধরে ফেললেন। যেন ভিক্ষা চাইছেন তিনি, এই রকমের ভাব ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। কি যে বললেন ঠোঁট নেড়ে তা কেউ শুনতে পেল না। কিন্তু বুঝল সকলে যে তিনি ওকে আসতে দিতে অনুরোধ করছেন।

ইতিমধ্যে একেবারে দরজার সামনে শোনা গেল—

"কফে কণ্ঠরোধ হইবে, না সরিবে বুলি
আমায় বলিতে না দিবে রাধাকৃষ্ণের বুলি
আমার মাথায় বেঁধে দিও হরি নামাবলী"

ঘরের মধ্যে পা দিল। ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করে সরে দাঁড়াল সকলে, ছুঁয়ে না ফেলে লোকটা কাউকে। সে এগিয়ে আসতে লাগল বিছানার পাশে।

"আমার মাথায় বেঁধে দিও হরি নামাবলী
নিদান কালে যেন হেরি গো ত্রিভঙ্গে।
আমার নিদান কালে যেন হেরি গো ত্রিভঙ্গে"—

খাটের পাশে দাঁড়িয়েছে একেবারে। সামান্য একটু ঝুঁকে পড়েছে হালদার মশায়ের ওপর। ভয়ানক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন হালদার মশায় ওর মুখের দিকে। ঘরের মধ্যে অন্য সবায়ের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। তখনও গান চলছে তার, "হরি নাম লিখে দিও অঙ্গে।"

তারপর থামল গান।

সঙ্গে সঙ্গে এমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘরের ভেতরটা যে এক গাছা চুল পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। পাথরের মত দাঁড়িয়ে সকলে দেখতে লাগল। এতটুকু নড়াচড়া করারও শক্তি নেই কারও।

কি করবে এবার পাগলটা।

করবে কি ও!

পাগলটা কিছুই করলে না। প্রায় মিনিটখানেকের মত নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইল হালদার মশায়ের চোখের ওপর। তারপর খটখট খটাখট শব্দ উঠল তার শরীরে ঝোলানো ইট পাটকেলগুলো থেকে। ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগল লোকটা। হাসতেই লাগল সে অনেকক্ষণ ধরে হালদার মশায়ের দিকে তাকিয়ে।

তবু কেউ নড়ল না একটু। হাসির শেষে আর কি করবে ও, তাই দেখবার

জন্যে রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে রইল সকলে তার দিকে।

শেষে বন্ধ হল হাসি। তারপর গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠল পাগলটা—

"হালদার, সময় ত হয়েছে এখন। এবার ফিরিয়ে দাও আমায় সেটা। আর ত তোমার দরকার নেই হালদার সে জিনিসের।"

নিস্তব্ধ হল ঘর। পাগলটার দুই চোখে ফুটে উঠেছে ব্যাকুলতা। তার চোখ কান মুখ সর্ব-অবয়ব জবাব শোনার জন্যে ক্ষুধার্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত ভাবে সে চেয়ে রয়েছে হালদার মশায়ের মুখের দিকে।

অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর আবার গমগম করে উঠল তার গলা।

"দেবে না হালদার? ফিরিয়ে দেবে না আমায় সে জিনিস? কি লাভ হবে তোমার জিনিসটা নষ্ট করে? তুমি চলে যাবার পরে ও জিনিসের দাম বুঝবে কে? কার কি উপকাবে আসবে ওটা তখন? ফিরিয়ে দাও হালদার, শেষ সময় আমার হাতে আমার জিনিস তুলে দিয়ে যাও।"

আবার নিস্তব্ধ। ঘরের প্রতিটি মানুষ তখন একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় চেয়ে রয়েছে ওদের দুজনে দিকে। আবার কি বলে পাগলটা, কি জবাব দেন হালদার মশায, শোনার আশায সকলের সর্বেন্দ্রিয সজাগ হযে উঠেছে তখন। কিন্তু এ-পক্ষ ও-পক্ষ কোন পক্ষেরই আর সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ কাটল সেই ভাবে। তারপর নড়ে উঠল হালদার মশায়ের ঠোঁট। স্পষ্ট শোনা গেল তিনি যা বললেন। সর্বস্ব খোযালে যে স্বর বেরোয় মানুষের গলায়, সেই স্বরে বললেন তিনি, "নেই, বিশ্বাস কর তুমি, নেই সে জিসিস আমার কাছে। আমি সেটা খুইযেছি।"

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ কবে রইল পাগল। তারপব আবার কেঁপে ফুলে ফুলে আরম্ভ হয়ে গেল তার হাসি। উদ্ভট হাসি হাসতে লাগল সে, খট খটাখট আওয়াজ উঠল তার সর্বাঙ্গে ঝোলানো ইটপাটকেল থেকে। তারপর সে ফিরে দাঁড়াল, এগিয়ে যেতে লাগল আস্তে আস্তে। পার হয়ে গেল দরজা। তারপর সিঁড়ির মুখে শোনা গেল—

"কাজ কি মা সামান্য ধনে।
আমার কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে।
কাজ কি মা সামান্য ধনে॥"

হালদার মশায় কাঠ হয়ে শুনতে লাগলেন—

"সামান্য ধন দেবে তারা

পড়ে রবে ঘরের কোণে!
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ
রাখি হৃদি পদ্মাসনে।
কাজ কি মা সামান্য ধনে।
আমার কাজ কি মা সামান্য ধনে॥"

পৌঁছে গেছে নীচে। এগিয়ে যাচ্ছে সদরের দিকে। রাস্তায় গিয়ে পড়ল এবার। রাস্তা থেকে শোনা গেল—

"গুরু আমায় কৃপা করে মা
যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র ও মা
তাও হারালাম সাধন বিনে।
কাজ কি মা সামান্য ধনে।"

হঠাৎ প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন হালদার মশায়, "ওরে ফেরা, ফেরা ওকে। ওকে বুঝিয়ে বলি, সত্যিই আমি হারিয়েছি সে জিনিস, সত্যিই সেটা আমার হাত-ছাডা হয়ে গেছে।"

কেউ নডল না, ঘরেব ভেতর সব কটা মানুষ যেন পঙ্গু হয়ে গেছে।

আবও দূরে হালদাবপাডা লেনের মুখে শোনা গেল—

"প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা
মা মাগো মা—"

ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল সেই কান্না, "মা মাগো মা"

অনেক দূর থেকে ভেসে এল—

"প্রসাদ বলে কৃপা যদি ম'
হবে তোমার নিজ ˆণ।
তবে অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে
স্থান পাই যেন ঐ চবণে।
কাজ কি মা সামান্য ধনে॥"

আচম্বিতে যেন ককিযে কেঁদে উঠলেন হালদার মশায়, "ভট্‌চায—কি হবে? কি উপায় হবে ভট্‌চায? ও যে ফিবে গেল কাঁদতে কাঁদতে, ফিরে গেল যে ও।"

পঞ্চানন ভট্টাচার্য একটিও কথা বললেন না। নীরবে হা'লদার মশায়ের কপালে হাত বুলতে লাগলেন। ঠোঁট তাঁর নডতেই লাগল। কান পেতে শুনলে শোনা

'যেত তিনি জপ করে চলেছেন সমানে—'কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নোঘোরে প্রচোদয়াৎ।'

ফণা ফিনকির মা জপছেন।

জপছেন তাঁর ইষ্টমন্ত্র। জপের সঙ্গে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন তিনি—ফিরিয়ে দাও মা, আমার মেয়েকে দাও। না হয় মরা মেয়েই ফিরিয়ে দাও মা, তবু ফিরিয়ে দাও।

দিন গড়িয়ে গেল প্রায়, বাইরের কাজ সেরে গলির মানুষ ফিরে আসছে সকলে গলিতে। ফণা কাজ থেকে ফিরেছে অনেকক্ষণ, ফিরেই বেরিয়েছে বোনকে খুঁজতে। একবার দুবার তিনবার সে ফিরে এল বাড়ীতে, ফিরে একই দৃশ্য দেখল। মা ঠায় একভাবে বসে আছেন দরজার দিকে তাকিয়ে। মায়ের ঠোঁট নড়ছে, আঁচলের মধ্যে হাতের আঙুলও নড়ছে, কিন্তু চোখের পাতা নড়ছে না। শেষবার, তা প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়েছে ফণা, সেও আর ফিরছে না।

ফণা ফিনকির মা জপছেন, জপে চলেছেন তাঁর ইষ্টমন্ত্র। ইষ্টমন্ত্র ফিরিয়ে আনবে তাঁর মেয়েকে। নয়ত তিনি ইষ্টমন্ত্র ভুলেই যাবেন যে। মেয়েকে যদি যমে নিত তাহলেও তিনি ইষ্টমন্ত্র ভুলতেন না। সর্বস্ব খুইয়েও তিনি ভোলেন নি তাঁর ইষ্টমন্ত্র। সব দুঃখ তিনি ভুলেছিলেন ইষ্টমন্ত্রের প্রভাবে। কিন্তু এতবড় সর্বনাশটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তাঁর পেটের মেয়ে বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে গিয়ে নাম লিখিয়ে রোজগারে নামবে, তারপরও তিনি জপবেন নাকি তাঁর ইষ্টমন্ত্র! তাঁর পেট থেকে যে রক্ত-মাংসের ডেলাটা পড়ল, যেটাকে তিনি বুকের রক্ত দিয়ে অত বড়টা করে তুললেন, যেটা তাঁর শরীরেরই অংশ, সেটা এখন বিক্রি হতে শুরু হবে। অসহ্য, এই ভাবনাটাই কিছুতে ভাবতে চান না তিনি, এতবড় সর্বনাশের ছায়াটা তাঁর মনের কোণে উদয় হলেই তিনি সজোরে সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেন মন থেকে। আর মানুষে ঠিক ঐ জায়গাটাতেই দাগ দেয়।

এ বাড়ীর অন্য ভাড়াটেরা বার বার খোঁজ নিচ্ছে, "ফিরল না কি গো তোমার মেয়ে?"

জিজ্ঞাসা করার সুরটাই কেমন যেন হাড়-জ্বালানে গোছের। যেন ফিরবে না মেয়ে, এটা জেনেই ওরা প্রশ্নটা করছে বার বার। প্রশ্ন করে জবাব শোনার অপেক্ষা না করেই আরম্ভ করে দিচ্ছে ফিসফিস কথাবার্তা আর চাপা হাসি। নাড়ু ঠাকুরের পিসি ত বলেই ফেললে, "ফিরবে গো ফিরবে। কেন অমন আউরে উঠছ

বাছা। মেয়ে তোমার সেয়ানা, কাজ গুছিয়ে ফিরবে একেবারে।" পিসীর কথা শুনে চাপা হাসি আর চাপা রইল না। প্রত্যেকের ঘরেই সেয়ানা আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে। তা সেই মেয়ের সঙ্গেই গলা মিলিয়ে মা মাসী পিসী ঠাকুমা হিলহিল খিলখিল করে হেসে উঠল।

শেষে পাড়াতেও ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। ফিনকিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই সকাল থেকে। শুনে পাড়ার মানুষ এ ওকে ও তাকে চোখ ঠেরে বললে যে, এটা সকলের জানাই ছিল। ও মেয়ের চালচলন দেখেই সকলে জেনে ফেলেছিল যে, ঘরে থাকার জন্যে ও জন্মায় নি। আবার পাড়ার মধ্যে যাঁরা আরও বেশী ওয়াকিফহাল, তাঁরা বললেন, "যাবেই মা ও মেয়ে, যাবেই ও। ঐ মায়ের পেটে ও মেয়ে ঢোকবার আগেই ওর বাপ মরেছে ত, ও যে কোন গাছের ফল তা কি আর আমরা জানি না মা। ধম্মের কল বাতাসে নড়ে মা, ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। দিন রাত মুখ টিপে ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকে যে ঐ মাগী, সে কি শুধু শুধু নাকি। মুখ ও দেখাবে কি করে পাঁচজনকে।"

অতএব পাঁচজনে যাতে তাঁর মুখ দেখতে পায় এ জন্যে দরজার সামনে মুখ খুলে ঠায় একভাবে বসে আছেন ফিনকির মা। ধম্মের কল বাতাসে নড়ছে, নড়ছে তাঁর ঠোঁট দুখানি। ফিনকি তাঁর রক্ত মাংস থেকে যদি জন্মে থাকে, যদি সত্যিই তিনি মেয়েকে পেটে ধরে থাকেন দশ মাস, তাহলে জ্যান্ত না হোক অন্ততঃ মরা মেয়েটা ফিরিয়ে দাও মা। সেও তিনি সহ্য করতে পারবেন, তাহলেও তিনি জপে যেতে পারবেন তাঁর ইষ্টমন্ত্র। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে তিনি ইষ্টমন্ত্রও যে ভুলে যাবেন।

ভোলবার মত অনেক কথা অনেক ছবিই ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। কত কি যে ভুলতে হবে ইষ্টমন্ত্রের সঙ্গে, সব পর পর ছবির মত দেখতে লাগলেন তিনি। সে দিনটির কথা মনে পড়ে গেল। রক্তবর্ণ বেনারসী, তাঁর বিয়ের বেনারসীখানি পরে তিনি বসেছেন বাঁ দিকে, ডান দি · বিয়ের জোড় পরে যিনি বসেছিলেন তাঁকেও মনে পড়ে গেল। গুরুদেব বসেছেন সামনের আসনে। পূজা হোম হয়ে গেছে। যজ্ঞের গন্ধে আর ধোঁয়ায় ঘরের ভেতরটা থমথম করছে। গুরুদেব অভিষেকের কলস তুলে পঞ্চপল্লব ডুবিয়ে ঘটের জল ছিটতে লাগলেন দুজনের মাথায়। ফণা ফিনকির মা অভিষেকের শেষ মন্ত্রটি আওড়ালেন মনে মনে।

"নশ্যন্তু চাপদঃ সর্বাঃ সম্পদ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেন শাক্তেন পূর্ণা সন্তু মনোরথা॥"

হঠাৎ কি হল তাঁর। মুখের ওপর আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন তিনি। ইষ্টমন্ত্র ইষ্টদেবতা সব ভুলে গিয়ে অন্ত একজনের কাছে একান্ত সংগোপনে জানাতে লাগলেন তাঁর আকুল আকুতি, "আর যে পারিনে আমি, আর যে সইতে পারিনে আমি গো। একলা আর সইতে পারি না আমি এ ভার। মেয়েও আমায় ছেড়ে চলে গেল। এবার অন্ততঃ একবার তুমি এস, যেখানে থাক একবার এসে খুঁজে এনে দাও তোমার মেয়েকে।

হয়ত আরও অনেকক্ষণ চলত তাঁর গোপন আবেদন নিবেদন। কিন্তু বাধা পড়ল। ফণার মনিবকে নিয়ে ফণা ঢুকল বাড়ীতে। আড়তদার মশায় একেবারে তৈরী হয়ে এসেছেন। যা করার সব শেষ করে এসেছেন একেবারে। থানা পুলিস হাকিম কাউকে আর বাদ দেন নি তিনি। পয়সা আছে, লোকজন আছে, আর আছে সাদামাটা বোধজ্ঞান। তিনি মনিব, তাঁর আডতের কর্মচারী ফণা। সুতরাং তাঁরই লোক। তাঁর লোকের বোন চুরি গেছে, এ তিনি মুখ বুজে সহ্য করবেন কেন? মানে, তাঁর কি একটা মানইজ্জৎ নেই নাকি? কালীঘাট শালার পাজরী জায়গা। নোংরার জায়গায় কিই না হতে পারে। ওকি আর দেরি করতে আছে? লাগাও থানা পুলিস উকিল হাকিম। যায় যাক দু চার শ খসে। তা বলে তাঁর লোকের অপমান তিনি মুখ বুজে সহ্য করবেন নাকি? শুধু তাই নয়, এখনই নিয়ে আয় ফণা তোর মাকে। চল, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে, ঠাকরুণকে পায়ে ধরে নিয়ে আসব ঐ নরক থেকে তুলে। তারপর দেখাচ্ছি সব হারামজাদাদের। আমার লোকের গায়ে হাত দেওয়া, দেখাচ্ছি। ছুটে এসেছেন আড়তদার মশায়। ফণার মাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন ওপারে। ইজ্জৎ যেখানে থাকে না সেখানে মানুষ থাকে নাকি।

•

বাস্তবিকই বিন্দুমাত্র ইজ্জৎ নেই বিচারালয়ের। বিচারালয় না বলে ওটাকে বলা উচিত একটা মস্ত বড় ভিখিরীদের আড্ডা। হাত পেতেই আছে সকলে, উকিল মোক্তার মুহুরী পেশকার থেকে শুরু করে আদালতের ছুঁচো ইঁদুরটা পর্যন্ত সবাই পেতে আছে হাত। ঘুষ নিচ্ছে বলে কেউ মনেই করে না, ঘুস দিচ্ছে বলেও কেউ মনে করে না। আদালতে এসেছি দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখতে, আদালতে যখন ঢুকতেই হয়েছে তখন সর্বস্বান্ত হতেই এসেছি—এই হল দু-পক্ষের মত। ওখানে টাকার খেলা, ওটা আদালত এই রকম যেন ধারণা মানুষের। ছি ছি ছি ছি ছি—মহাবিরক্তি হয়ে একটা ঢোক গিললেন চতুরানন চৌধুরী। বেশ তেতো লাগল মুখ-গলার ভেতরটা হাকিম সাহেবের। তেতো মুখ নিয়েই বাড়ী ফেরেন

রোজ। সারাটা দিন এক পাল ঘুঘু ঘড়েলের বাক-চাতুরী শুনে আর নাকের ডগায় ঘুষ নেওয়া দেওয়া দেখে মন মেজাজ তেতো হয়ে যায় তাঁর। আইন আইন আর আইন! চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছেন তা যত বড় বে-আইনীই হোক, তাঁকে মুখ বুজে বরদাস্ত করতে হচ্ছে। কারণ আইনের ফাঁদে পা না দিলে আদালতের কিছুই করবার নেই। আবার পা দিলেও পা ফসকে যায় যদি টাকার জোর থাকে। টাকার ছিনিমিনি খেলার একটা আড্ডা হচ্ছে ঐ আদালত। বড় বড় করে লিখে দেওয়া উচিত ঐ আদালতের গায়ে যে, টাকা দিয়ে এখানে যে কেউ যা খুশি কিনতে পার। টাকা খরচ করতে পারলে আইন তোমায় আইনসঙ্গত উপায়ে বে-আইনী করতে বাধা দেবে না।

পোলের ওপরে আদালত, এপারে কালীঘাট। হাকিম চতুরানন চৌধুরী এপারে থাকেন, ওপারে গিয়ে বিচার করে এপারে ফিরে আসেন। যেমন ওপারের আদালতে বিচারের লড়াইয়ে জিতে এপারে আসে মানুষ, কালীঘাটের মা কালীকে পূজো চড়াতে। ওপারের পূজো চড়ানো শেষ হলে তবে এপারের পূজো চড়ানো। সবই পূজো চড়াবার ব্যাপার। হাকিম সাহেব একটু হাসলেন নিজের মনে। হাসলেন এই ভেবে যে, মা কালী এপারে বসে ওপারের হাকিমের কলম এমন ভাবে ঘুরিয়ে দিতে পারেন, যাতে হয় হয়ে যায় নয়, নয় হয়ে দাঁড়ায় হয়। এইটুকু ক্ষমতা আছে বলেই মা কালী বেচারা করে খাচ্ছেন। আদালত ওপারে এত কাছে না থাকলে সত্যিই দিন চলা ভার হত মা কালীর। মামলায় যে হারে আর যে জেতে, দু পক্ষই যেমন উকিল পেশকারকে টাকা খাওয়াতে বাধ্য, তেমনি মা কালীকেও উভয় পক্ষ ঘুষ দিচ্ছে। মামলা জেতবার জন্যে আগে থাকতে পূজো পড়তে থাকে মায়ের পায়ে। মামলা জিতলে ত পড়েই। হেরে গেলেও মানুষ পূজো দিয়ে যায় কালীঘাটে এসে। এই প্রার্থনা জানায় পূজো দিয়ে যে, এবারটা যা হবার তা ত হল, কিন্তু আসছে বারটা সামলে দিও মা। আসছে বারটা মুখ রেখো জননী। এই বলে ঘরে গিয়ে সলা-পরামর্শ করে আবার একটা মিথ্যে মামলা লাগায়।

চতুরানন চৌধুরী সাহেবের গাড়ী পোলের ওপর উঠল। বাঁ দিকে জেলখানা, জেলখানাটার দিকে তিনি তাকালেন একবার। রোজই তাকান। কালীঘাট আর আদালতের মাঝখানে এই জেলখানা। আদালত থেকে কালীঘাটে সবাই পৌছতে পারে না। মাঝখানে এই জেলখানায় আটকা পড়ে। তিনি আটকেছেন কত মানুষকে, পূজো চড়াতে আসতে দেননি কালীঘাটে। অর্থাৎ মা কালীর

হাতযশ তিনিই অনেকবার খাটো করেছেন। কিছু আয়ও কমেছে মা কালীর। এ জন্যে তিনি এবং তাঁর মত লোকেরাই দায়ী। সুতরাং মা কালী যদি মনে করেন যে চতুরানন তাঁর ব্যবসার কণ্টক তাহলে কিছুই বলবার নেই। তবে একটু বুঝলে মা কালীও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে হাকিম, জেলখানার ভয় না থাকলে মানুষ আর তাঁর কাছে গিয়ে আছড়ে পড়বে না। কস্মিনকালে যদি কখনও আদালতটা উঠে যায় ওখান থেকে, তাহলে মা কালীর দিন চলাও মুশকিল হবে।

গাড়ী নকুলেশ্বরতলার পেছনে নতুন রাস্তায় একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে পৌছল। চতুরানন চৌধুরীর পৈতৃক সম্পত্তি। রাস্তা বেরোবার দরুন বাড়ীর সামনেটা ভেঙে নতুন হারে গড়া হয়েছে। অনেক কালের বাড়ীটা, একদা ওটা বানিয়েছিলেন যিনি, তিনি ভয়ঙ্কর মানুষ ছিলেন। নাম ছিল তাঁর সহস্রানন চৌধুরী। চতুরাননের ওপর দিকে সাত আট পুরুষ আগের পুরুষ তিনি। তাঁর সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গল্প বলে এখনও কালীঘাটের পুরনো লোকে। তিনি নাকি আস্ত একটা পাঁঠা প্রত্যহ জলযোগ করতেন। একবার তিনি একশ আটটা নরবলি দিয়েছিলেন মা কালীর বাড়ীতে। দক্ষিণের একটা তালুকের বজ্জাত প্রজাদের শায়েস্তা করবার জন্যে এই কর্ম করতে হয়েছিল তাঁকে। ছিপ পাঠিয়েছিলেন একশ-খানা প্রজাদের ধরে আনবার জন্যে। ধরে আনিয়ে স্রেফ বলিদান। একটার পর একটা, একেবারে একশ আটটায় পৌছে তারপর থেমেছিলেন।

একথাও নাকি লেখা আছে কোন দলিলে যে, সাবর্ণ গোত্রীয় এই চৌধুরী বংশই মা কালীর সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন সেই মহারাজ মানসিংহের আমলে। হাকিম চতুরানন চৌধুরী তাই কালীঘাটের সঙ্গে সম্বন্ধ তুলে দিতে নারাজ। অবশ্য নরবলি দেবার লোভে নয়, নরবলি এমনিই কত হচ্ছে এখন মায়ের বাড়ীর চতুর্দিকে। ধড় থেকে মুণ্ড খসাবার জন্যে সহস্রানন মাত্র একটি করে চোপ দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই, এখন ঐ চোপের কায়দাটা একটু পালটেছে। এখন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটা হয়। সাবর্ণ চৌধুরী বংশের বংশধর চতুরানন কালীঘাটে বাস করছেন ঐ পেঁচিয়ে কাটাদের গায়ে একটু হাত বুলোবার জন্যে। তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী দেবী নিয়েছেন অন্য এক ব্রত। তিনি কালীঘাট থেকে নারীবলিটা উঠিয়ে দিতে চান। আর বলিদান হয়েই গেছে যে সব নারীর, সেগুলোকে আবার জুড়েতেড়ে কালীঘাটের কালী' দ থেকে উদ্ধার করতে চান।

হাকিম নামলেন গাড়ী থেকে। নেমেই তাঁর মনে হল সেই মেয়েটার কথা। মাথাফাটা মেয়েটাকে সকালে দিয়ে গেল শশেঘোড়া। কে জানে ওটা আবার আমদানি হল কোথা থেকে! যাক, তবু ভাল যে জাহান্নমে নামবার আগের

মুহূর্তে ও পড়ে গেল শশেঘোডার নজরে। নয়ত এতক্ষণে ওর কপালে কি যে ঘটত, তা ভেবে হাকিম সাহেবের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। অদ্ভুত মানুষ ঐ শশী, দিন রাত নিজে ডুবে আছে নরকে। কিন্তু কাউকে সেই নরকে নামতে দেখলেই তাড়া করবে। সেদিন ধরে এনেছিল কয়েকটা স্কুলের ছোঁড়াকে। গলা টিপলে দুধ বেরোয় এতটুকু সব বাচ্ছা, গিয়ে জুটেছে সত্যপীবতলার মেলায়। মেরে একেবারে হাড গুঁড়ো গুঁড়ো করে ধরে এনেছিল সব কটাকে শশী। হাকিম চতুরানন তখন অভিভাবকদের তাকিয়ে তাদে‍র হাতে ছেলেদেব সঁপে দেন।

কিন্তু গাযে হাত তোলাটা যদি বন্ধ কবতে পারত শশী। ঐ একটা রোগেই একদিন ওকে খাবে। শুধু ওকেই খাবে না, হাকিম চতুবাননকেও ডোবাবে। সেই ছেলেদের অভিভাবকরা এসে দস্তুরমত শাসিযেই গেলেন হাকিমকে বে-আইনী কাজ সমর্থন করাব দরুন। গাযে হাত তোলাটা বে আইনী কাজ যে, কিন্তু বেশ্যা যখন পয়সা দিলে মেলে বাজাবে তখন বেশ্যাবাডী যাওযাটা বে আইনী নয়। ভাগ্যে ছেলেগুলোর বয়স চোদ্দ বছবের কম ছিল, তাই অভিভাবকদের চোখ রাঙিয়ে সেদিন তাডাতে পেরেছিলেন চতুবানন। সব কটা ছেলেকে রিফর্মেটরিতে ঢুকিযে চিরকালেব জন্য মাথা খেযে দেবেন দাগী কবে, এই কথা বলতে তবে তাঁরা আইনের ভয দেখানো বন্ধ করেন।

এ মেয়েটার বযসও বোধ হয় চোদ্দ বছরের কমই হবে। এই বকমের ছোট মেযে কত যে বয়েছে তীর্থস্থানের নবকে, কে তাব হিসেব রাখে। আইন বাঁচিয়ে বেচা-কেনা চলে ঐ সব ছোট ছোট মেয়ের। কাজেই ওপারের আদালতের নাগাল এপাবে পৌঁছয না।

চতুবানন বাডীর ভেতর ঢুকলেন। শোনা যাক, গাযত্রী কি সংবাদ বার করেছে মেয়েটার পেট থেকে।

গাযত্রী দেবীব সঙ্গে মুখোমুখি হয়েই এমন সংবাদ শুনলেন হাকিম সাহেব যে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছুটতে হল যে ঘরে ফিনকি শুয়ে আছে সেখানে। বেহুঁশ ফিনকি জানতেও পারল না যে, একজন হাকিম তার পাশে বসে তাব হাতখানা ধরে তার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বইলেন। গায়ত্রী দেবী শোনালেন, ডাক্তার ডাকা হয়েছিল, ইন্‌জেকসন দিয়ে গেছেন। রক্তও নিয়ে গেছেন। বলে গেছেন টিটেনাস বোধ হয়, সাবধান না হলে টিকনো মুশকিল।

আবার আঁধার।

একটু একটু করে আবার ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার হালদার মশায়ের দুই চক্ষে। আবার তিনি চলে যাচ্ছেন মরণের জঠর গহ্বরে। কালিতে ছেয়ে যাচ্ছে তাঁর দৃষ্টি, কালিতে ডুবে যাচ্ছে তাঁর অন্তর। সত্যিকারের মরণ কি এর চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর!

এ মরণ রোজই তিনি মরেন একবার করে। কিন্তু এতদিন এ মরণে দুঃখ ছিল, ভয় ছিল না। আজ যেন ভয় করছে তাঁর। যদি তিনি আর ফিরে না আসেন এই কালো অন্ধকারের গ্রাস থেকে! যদি কাল ভোরে আবার না দেখতে পান জানালার কাঁচগুলো! যদি কাল তপু তারুকেও চিনতে না পারেন হালদাব মশায়!

আজ জীবনে সর্বপ্রথম তিনি জানতে পেরেছেন যে, মানুষ তাঁকে কি ভালোটাহ বাসে। আজ তিনি তাঁর ছেলেদের বৌদের ভট্চাযকে বুড়ো মিশ্রকে সকলকে নতুন চোখে দেখেছেন। জীবনের ওপর আবাব নতুন করে মায়া জন্মেছে তাঁর। তাই হালদাব মশায় ভয় পাচ্ছেন আবার মরণের মাঝে তলিয়ে যেতে।

তা ছাড়া—

হাঁ, তা ছাড়া একটা বোঝাপড়া এখনও বাকী থেকে গেল। সেটা চুকিয়ে ফেলবার জন্যেও তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে আরও কিছুদিন। চোখের আলো কিছুতেই নিভে গেলে চলবে না এখন। চোখ না থাকলে যে কিছুই করতে পারবেন না তিনি। শুয়ে শুয়েও তিনি অনেক কিছু করতে পারবেন, সেটাকে উদ্ধার করে এনে, যার জিনিস তার হাতে দিয়ে যেতে পারবেন, যদি চোখের আলোটুকু বজায় থাকে। নয়ত ঐ পাগল ঐভাবে কেঁদে কেঁদে ঘুরতে থাকবে আর যারা সেটা হাতে পেল তারা সেটা নিয়ে মজা করবে। ভাববে কাঁসারী হালদারকে ঠকিয়ে কি বস্তুই না হাতে পেয়েছি। বেটা হালদার চেয়েছিল যে, ঐ জিনিসের বদলে চিরকাল ওর পালা চালিয়ে মরতে হবে। গোল্লায় যাক, হালদার আর হালদারের পালা। আর ত বেটা উঠে এসে দাঁড়াতে পারবে না আমাদের দরজায়।

মাড়ি দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন হালদার মশায়। সবাই এল, আদিগঙ্গার এপার ওপার দুপারের চেনা জানা কেউ বাদ রইল না আসতে। কাঁসারী হালদার মরছে শুনে রাস্তার ভিখিরী থেকে লাখপতি কোটিপতি পর্যন্ত সবাই ছুটে এল, এল না শুধু তারা। তার মানে কংসারি হালদার একেবারে উবে গেছে তাদের জীবন থেকে। কারণ যা তাদের পাবার ছিল কংসারি হালদারের কাছে, সেটা তাদের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়েছে।

পড়াচ্ছি, ঐ মুঠো আলগা করার মন্ত্র জানি আমি। যদি কাল ভোরে আবার চোখের আলো ফুটে ওঠে কাংসারি হালদারের, তাহলে ভেব না তোমরা, যে কাঁসারীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। তোমাদের সর্বনাশ করে তবে আমি মরব। সে মরণের সময় একটি প্রাণীও আসবে না আমার ঘরে, হয়ত ঐ ছেলে বৌরাও মুখে একটু জল দেবে না, তাদের মুখ চিরকালের জন্য হেঁট করিয়ে দিয়ে গেলাম বলে। হয়ত ভট্‌চায প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্রগুলো পড়াবে না। সমস্ত কালীঘাট কংসারি হালদারের নাম করে তখন থুতু ফেলবে। কংসারি হালদারের উর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষের নাম চিরকালের জন্যে কালিতে কালো হয়ে যাবে। যাক, তবু এত বড় বেইমানির শাস্তি না দিয়ে কংসারি হালদার মরবে না। জিনিসটা হাতে পেয়ে একটিবার দেখতেও এল না। মরণ-শয্যায় শুয়ে আছেন তিনি, তবু তাঁর পালার ব্যবস্থা করলে না তারা। ভাবলে, হালদারের বিষদাঁত আর নেই। আচ্ছা, সকালটা হোক, তারপর তাদের দেখাচ্ছি। যত বড় সর্বনাশই হোক কংসারি হালদারের, তবু হালদার তাদের দংশন না করে মরবে না।

আঃ—

একশটা বিছেয় যেন একসঙ্গে হুল ফুটিয়ে দিলে হালদার মশায়ের শিরদাঁড়ার ওপর। আড়ষ্ট হয়ে গেলেন তিনি।

একদিন আগেও যদি তিনি জানতে পারতেন যে তার ছেলেরা তাঁর পালা চালাবে। যদি তিনি একটিবারের জন্যেও বিশ্বাস করতে পারতেন এই বংশের ছেলেদের! যদি তাঁর বৌমায়েরা একবারও জীবনে এত কাছে এসে দাঁড়াত তাঁর!

এই ত, এক বৌ বসে আছে তাঁর পায়ের কাছে। নিঃশব্দে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওরা এবার তাঁর কাছে বসে রাত জাগবে। এক মুহূর্ত আর ওদের সজাগ সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে যেতে পারবেন না তিনি। আঃ, এই সেবাযত্ন আত্মীয়তার ছিটে-ফোঁটার আস্বাদও যদি তিনি পেতেন এর আগে!

তাহলে এত বড় সর্বনাশ কিছুতেই হত না। কিছুতেই হাতছাড়া করতেন না তিনি সেই যন্ত্র। এ বংশের মান-ইজ্জৎ কখনও ধূলায় লোটাত না। ঐ যন্ত্র ঘরে থাকলে লক্ষ্মী সরস্বতী ঘরে বাঁধা থাকেন। তিনি পুরুষ পর্যন্ত লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন ঘরে, সরস্বতী বাস করেন মুখে। মনে মনে একবার আওড়ালেন হালাদর মশায়—

স্পর্দ্ধামুজ্জ্বয় কমলা বাগেদবী মন্দিরে মুখে।
পৌত্রান্তং স্থৈর্য্যমাস্থায় নিবসত্যেব নিশ্চিতম্॥

সেই লক্ষ্মী সরস্বতীকে তিনি স্বহস্তে বিদেয় করেছেন ঘর থেকে। মা নিজের পালা নিজেই চালিয়ে নেন, এ কথাটা জীবনে বহুবার তিনিও উচ্চাবণ করেছেন। কিন্তু সেই পালা চালাবার গবজে মাকেই তিনি ঘর-ছাড়া করে ছেড়েছেন। আর তাঁর ছেলেরা এই বংশেব ছেলের মত সারা দিন উপোস করে আজ পালা চালাচ্ছে।

মনে মনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করলেন হালদার মশায়, কাল যদি আবার আলোর মুখ দেখতে পান তিনি, তাহলে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, একবার দেখে নেবেন তাদেব। হয় তাবা ফেরত দেবে সেই যন্ত্র, নযত জাহান্নমে যাবে। হালদার মশায়েব বংশও সেই সঙ্গে নামবে জাহান্নমে। তা নামুক, তবু তাদের ছাডবেন না কংসাবি হালদাব। এত বড বেইমানি কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করবেন না।

অন্ধকার নেমে এল ফিনকিদের গলিতেও।

সেই অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে গলিতে ঢুকে পডল ধনা। সারা দিনে অনেকবাব সে হাঁটাহাঁটি করেছে গলির মুখে, যদি একবার দেখাটা হয়ে যায় এই আশায়। একবার সে বেরোবেই, তেল, নুন, লঙ্কা, হলুদ একটা কিছুব দরকার হলেই বেরোতে হবে তাকে গলি থেকে। আর তখন ধনা তাকে আবাব একবাব ঘাটে যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে সুট্ করে মিশে যাবে রাস্তার ভিডে। ব্যস, সোজা কাজ।

কিন্তু গলির ভেতর ঢোকা সোজা কাজ নয়। ধর, যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে বসে কোনও কথা? কেন সে ঢুকল গলিতে, কাকে সে চায়, কি দরকার আছে তার ও পাডায়, এই জাতের কোনও প্রশ্ন যদি কবে বসে কেউ? কিংবা হয়ত ধর, দেখা হয়ে গেল খোদ সেই ফিনকির সঙ্গেই? গলিতে ভিড নেই, কারও না কারও নজরে পডবেই যে, ধনাতে ফিনকিতে কথা বলছে। তাহলেই সেরেছে কর্ম, যা ছ্যাচডা মানুষ সব, তৎক্ষণাৎ যার যা মুখে আসবে রটাতে শুরু করবে।

তাছাডা যা ভয়ানক মেজাজ মেয়ের, গলির ভেতর কিছু বলতে গেলে যদি অমনি

চেঁচামেচি করে লোক জমা করে ফেলে! কোনও কিছুই অসম্ভব নয় ও মেয়ের পক্ষে। এই সব সাত-পাঁচ বিবেচনা করেই ধনা দিনের বেলা গলিতে ঢুকতে সাহস করেনি।

কিন্তু সন্ধ্যার পর আর সে থাকতে পারলে না, ঢুকে পড়ল গলির ভেতর। সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই সে বেরোবে না বাড়ী থেকে, দেখা হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই তার সঙ্গে। তবু তাদের দরজার সামনে দিয়েও ঘুরে আসা হবে একবার। ভাল করে দেখে আসা হবে তাদের বাড়ীটা। আর সম্ভব হলে, অবশ্য কি করে যে সম্ভব হবে তা ধনার মাথায় এল না কিছুতে, মোটের ওপর সম্ভব হলে তাকে একটু জানিযে আসা যে, ধনা ছায়ার মত আছে তার সঙ্গে। কারণ দেখাটা একবার হওয়াই চাই যে, আজ হোক কাল হোক, যেদিনই হোক। দেখা হলে ফিনকিকে বেশ করে সাবধান করে দেওয়া চাই ঐ পাথরখানা সম্বন্ধে। জিনিসটাকে যেন হেলাফেলা না করে ফিনকি, কোনও রকমে যেন যত্ন করে লুকিয়ে রাখে আর কয়েকটা দিন। কংসারি হালদার চোখ ওল্টাল বলে, আজই যাচ্ছিল বুড়ো খতম হয়ে। তারপর ঐ পাথরখানা দিয়েই তাদের কপাল ফিরে যেতে পারে। তাদের মানে, তার আর ফিনকির দুজনেরই। দুজনের কপাল একসঙ্গে ফিরে যাবে ঐ পাথরখানার পয়ে মানে, ঐ পাথরখানার পয়েই হয়ত জোড়াও লেগে যেতে পারে দুজনের দুখানা কপাল, জুড়ে এক হয়ে যেতে পারে। ধনা ত একরকম সব ঠিকই করে ফেলেছে। চুরি-ছ্যাঁচড়ামি আর কস্মিনকালে হবে না তার দ্বারা। ওসব গুণ্ডামির কাজে আর সে নেই। খামকা মারধর খেয়ে মরা যার-তার হাতে। তাতে না ভরে পেট, না বাঁচে ইজ্জৎ। আর বিয়ে হয়ে গেলে তখন দু-দুটো পেট, দু-দুজনের ইজ্জৎ। কাজেই ওসব কাজে হাত দিয়ে আর হাত ময়লা করবে না ধনা। বরং সে সাইকেলের দোকানে একটা কাজ জুটিয়ে নেবে।

এ কথাটাও ফিনকিকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে যে সাইকেলের কাজে দিনে তিন সাড়ে তিন টাকা পযন্ত অনায়াসে কামানো যায়। ধনাই পারে সাড়ে তিন টাকা পর্যন্ত কামাতে, যদি বড় একখানা সাইকেলের দোকানে কাজ জোটাতে পারে। সেই ধান্দাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ধনা। ওধারে ধনার ঠাকুমা বুড়ীও হন্যে হয়ে উঠেছে নাতির বিয়ে দেবে বলে। কিন্তু ধনা ঠাকুমাকে সাফ বলে দিয়েছে, যে, বিয়ের আগে কাজ পাওয়া চাই। ডালাধরা হয়ে চিরকাল সে মায়ের বাড়ীতে পচে মরতে পারবে না। আর মায়ের বাড়ীতে ধনা টিকতেও পারবে না কিছুতে। কোথাও একটা কিছু ঘটলেই লোকে খুঁজে বার করবে ধনাকে। ব্যস, তারপর চড়-থাপ্পড় আরম্ভ হয়ে গেল ফ-খরচায়। সেইটুকুই ভাল করে বুঝিয়ে

বলতে চায় ধনা ফিনকিকে যে, বদনাম যখন একটা উঠে গেছে তার নামে কালীঘাটে, তখন কালীঘাটে থাকা তাদের কিছুতে পোষাবে না। সাইকেল সারাবার দোকান দুনিয়াময় আছে, পেটের ভাতও আছে সবখানে। এখন কোনও রকমে বিয়েটা হয়ে গেলে হয়। তারপর ধনা আর ফিনকির জায়গার অভাব হবে না কলকাতা শহরে।

কিন্তু—।

ধনার পা ফেলা অনেকটা আড়ষ্ট হয়ে এল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কপাল কুঁচকে সে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু সে মেয়েই যদি বলে বসে—না। যা মেয়ে ও, ওই হয়ত বেঁকে বসবে ধনাকে বিয়ে করতে। হয়ত বলে বসবে, ঐ চোরটার সঙ্গে বিয়ে দিলে বিষ খাব, গলায় দড়ি দেব। কিছুই অসম্ভব নয় ও মেয়ের পক্ষে।

সেইজন্যেই বিশেষ করে একটিবার দেখা করতে চায় ধনা তার সঙ্গে। মুখের কথায় যদি বিশ্বাস না করে তাহলে ধনা ওর গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করবে। বলবে, এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি যে চুরি-ছ্যাচড়ামি আমি ছেড়ে দিয়েছি। সেদিন মা কালীর মন্দিরে লোকে আমায় মেরেই ফেলত। তুমিই আমায় বাঁচিয়ে দিলে, নয়ত অত দামী হারছড়া ফেরত না দিলে, করত কে কি তোমার! সেদিন থেকেই ওসব ছোট কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি জন্মের শোধ। ও সব কথা মনে উঠলেই সেদিনের তোমার সেই চোখ মুখ আমার মনে পড়ে যায়। হারছড়া ঝুলিয়ে ধরে হাতখানা মাথার ওপর তুলে নিচে থেকে তুমি চেঁচিয়ে উঠেছিলে, "হালদার মশায়, পেয়েছি আমি, পেয়েছি সেই হার।" হাজার মানুষ সেদিন তাকিয়েছিল তোমার মুখের দিকে। সে মুখ আমিও দেখেছিলাম। সেইজন্যে ওসব কাজ মনে উঠলেই তোমার সেই মুখ আমি দেখতে পাই। আর অমনি মনে হয়, আবার ঐ ছোট কাজে হাত দিলে তোমার মুখ ভার হয়ে উঠবে। তাই আমার আর কিছুই করার উপায় নেই। বিশ্বাস করাতে হবে তাকে, যে হাজার ইচ্ছে থাকলেও ধনা আর জীবনে কখনও ছোট কাজ করতে পারবে না।

কিন্তু দেখা পেলে ত বিশ্বাস করাবে তাকে। বেরুলই না যে সারাদিন সে গলি থেকে। অগত্যা ধনাকেই ঢুকতে হল গলির মধ্যে। যদিও সে ভাল করে জানে যে, এখন সন্ধ্যার পরে কিছুতেই দেখা হতে পারে না তার সঙ্গে। তবু ধনা চলল এগিয়ে, শুধু শুধু একবার ফিনকিদের দরজার সামনে দিয়ে ঘুরে আসতে পারবে ত! আর ধর যদি তেমন বরাত হয় ধনার, তা হলে টপ করে একবার সাবধান করে দেবে পাথরখানা সম্বন্ধে। যেন কিছুতেই না খোয়া যায় ওখানা।

ভয়ানক দামী জিনিস ওটা, ফিনকি ত আর জানে না ওটার দাম। হালদার মশায় বার বার না বলে দিলে ধনাই বা বুঝত কি করে ওটার মূল্য কত। বুঝতে পেরেই ত ধনা ওখানা সঁপে দিলে ফিনকির হাতে। যেভাবে হালদার মশায় পাথরখানা ঠাকুরঘর থেকে আনালেন ধনাকে দিয়ে, যেভাবে তিনি ধনাকে ওখানা পৌঁছে দিয়ে আসতে বললেন খালের ওপারে একজনের নাম ঠিকানা দিয়ে, যেভাবে বার বার হালদার মশায় সাবধান করে দিলেন ধনাকে যেন কিছুতেই না হারায় সেটা, তাতেই ধনা বুঝে নিয়েছিল যে ঐ পাথরখানা যা-তা জিনিস নয়। পাথরখানাকে ধনার হাত থেকে নিয়ে বার বার কপালে ঠেকালেন যখন হালদার মশায়, আবার ধনার হাতে দিতে গিয়ে ওঁর মত লোকের চোখে যখন জল এসে গেল, তখনই ধনা বুঝে নিয়েছিল যে একটা কিছু ব্যাপার আছে ঐ পাথরের মধ্যে।

কালীঘাটের হালদারদের বাড়ীতে অমন কত কি সব মহামূল্য বস্তু আছে। তাই জন্যেই না হালদাররা লোকের মাথায় পা দিয়ে হাঁটে। আর তাই জন্যেই ধনা তৎক্ষণাৎ মতলবটা ঠিক করে ফেললে, ও জিনিস কখনও হাতছাড়া করতে আছে হাতে পেয়ে। কিন্তু রাখবে কোথায় সে লুকিয়ে ঐ পাথর? ঠাকুমা বুড়ীর হাতে দেওয়া যায় না বিশ্বাস করে, কারও হাতেই দেওয়া যায় না। বিশ্বাস ধনা কাউকেই করে না এই দুনিয়ায়। অগত্যা শেষ পর্যন্ত একমাত্র যাকে সে বিশ্বাস করে, তাকে গঙ্গার ঘাটে ডেকে এনে তার হাতে গুঁজে দিয়ে সরে পড়ল। মানে, কি যে হল সেদিন ধনার, একটা কথাও বলতে পারলে না তার সঙ্গে। যা ধমকা-ধমকি আরম্ভ করল মেয়ে চোখ পাকিয়ে। নয়ত সেই সময়েই ধনা সাবধান করে দিত তাকে পাথরখানা সম্বন্ধে। কিন্তু কি যে হল তার তখন, না পারলে চোখ তুলে তার মুখের দিকে চাইতে, না পারলে পাথরখানা সম্বন্ধে দুটো কথা বুঝিয়ে বলতে। এমন কি সব চেয়ে দরকারী কথাটাও বলা হল না।

সেটাও কিন্তু জানাতে হবে মেয়েকে। এ খবরটি দিতেই হবে যে ধনা তার ঠাকুমাকে বলেছে, বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে করবে সে ঐ ফিনকিকেই। ঠাকুমা বুড়ী প্রথমে বেঁকে বসেছিল, কারণ ফিনকির মা-ভাই এক পয়সা খরচা করতে পারবে না। না পারে না পারুক. তবু ঐ মেয়ে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না ধনা। এইটুকু বেশ বুঝতে পেরে শেষে ঠাকুমা রাজী হয়েছে। ফিনকির মা-ভাইও নিশ্চয়ই রাজী হবে। কারণ বিয়ে দিতে গেলে পয়সার দরকার। মেয়েকে খেতেই দিতে পারে না ত বিয়ে দেবে কোথা থেকে। কাজেই রাজী হয়ে বসে আছে ওরা, যখন জাত গোত্র সব ঠিকঠাক মিলে গেছে। এখন ঐ মেয়েই না বেঁকে বসলে হয়। সেই ভয়েই আগে থাকতে আর একটিবার তার সঙ্গে দেখা

করাটা একান্ত দরকার ধনার।

তাই এ গলি ও-গলি দিয়ে এগিয়ে চলল ধনা সন্ধ্যার পর। শেষ পর্যন্ত পৌঁছল, শেষ মোড়টা ফিরতেই দেখা গেল ফিনকিদের দরজা।

কিন্তু ও কি! বাড়ীর দরজায় ভিড় কেন? জিনিসপত্রই বা সব বার করা হয়েছে কেন বাড়ী থেকে সন্ধ্যার পর?

ধনা ভুলে গেল যে, এ-সময় তাকে ওখানে দেখলে লোকে পাঁচ রকম প্রশ্ন করে বসতে পারে। সোজা সে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফিনকিদের দরজাব সামনে। প্রথমেই যে কথা তার কানে গেল, তাতে তার দুই চোখ কপালে উঠে গেল একেবারে। শুনলে, ফিনকির মা কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, "আজ রাত্তিবটা অন্ততঃ আমায় নিয়ে যাসনি ফণা এখান থেকে। ফিববেই ফিনকি, ওরে আমি বলছি সে ফিরবে। ফিবে আমাদের দেখতে না পেলে সে কববে কি? যাবে কোথায়?"

যাবে কোথায়? গেল কোথায় সে?

কোথায় যেতে পারে ফিনকি? কেন সে পালাতে গেল?

ও মেয়েকে কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাবে এ কি কখনও সম্ভব হতে পারে? ধনা নিজের মনেই নাড়লে একবাব নিজের মাথাটা। না, কিছুতেই ফিনকিকে কেউ চুরি করে নিয়ে যায়নি। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে, ফিনকির চোখের ওপর চোখ রেখে যা তা কিছু একটা বলবে। আব জোর করে, তাকে আটকে রাখা, ওরে বাপরে! তাহলে এতক্ষণে হয়ত আঁচড়ে-কামড়েই তাদের দু-একজনকে খতম কবেছে ফিনকি। নয়ত নিজেই গেছে শেষ হয়ে, মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে। সবই সম্ভব ওই মেয়ের পক্ষে, শুধু সম্ভব নয় একটি জিনিস। ধনা বার বার মনে মনে ঘাড় নাড়ল। না, কিছুতেই তা সম্ভব নয় কোনও লোভেই ফিনকি খারাপ কাজ করতে পারে না, না!

অতএব এখন প্রধান কাজ হল তাকে খুঁজে বার করা। চুলোয় যাক সে পাথর-মাথর, কুচুপোড়ার পয় আছে সে পাথরে। ঐ পাথরখানাব জন্যেই হয়ত কোনও বিপদে পড়েছে ফিনকি। ঐ পাথরখানার লোভেই কেউ আটকাযনি ত তাকে? কাউকে হয়ত দেখিয়ে থাকবে পাথরখানা, যে জানে ওটা কি। ব্যস, তারপর সেই অলক্ষুণে পাথর নিয়ে লেগে গেছে খেয়োখেয়ি। যা সাংঘাতিক মেয়ে ফিনকি, কিছুতেই দিতে চায়নি সেই পাথর। শেষ পর্যন্ত পাথরের জন্যেই বেচারাকে পড়তে হয়েছে কারও ফাঁদে। পাথর হাতছাড়া না করলে আর ফাঁদ কেটে বেরোবার উপায় নেই তার।

কিন্তু পাথরখানা এখন আছেই বা কোথায় ?

পাথরখানা কি এখনও সঙ্গে আছে ফিনকির ?

ওঁরা ত চলে গেলেন আড়তদারটার সঙ্গে ওপারে। ঐ ঘরেই কোথাও লুকিয়ে রাখেনি ত ফিনকি পাথরখানা ?

কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে ধনা, কে-ই বা উত্তর দেবে তাকে ? সর্বপ্রথম ধনার জানা দরকার কখন গেল ফিনকি, কি অবস্থায় গেল সে। বাড়ী থেকেই সোজা চলে গেল, না অন্য কোনও কাজে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরেনি ? অনেক কথাই জানা দরকার এখন ধনার, কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে সে কাকে ? ও-বাড়ীর বা ও-পাড়ার কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে উল্টে বিপদ ঘটবে। আড়তদার মশায় যে পুলিসটাকে ফিনকিদের বারান্দায় বসিয়ে রেখে গেল, সেই পুলিসটাকে তখন জানিয়ে দেবে লোকে যে এই ছোঁড়া মেয়েটার খোঁজ করছে। ব্যস, তার মানে তাকেই ধরে টানাটানি জুড়ে দেবে তখন। থানায় নিয়ে গিয়ে মারধর করে আটকে রাখবে সারা রাত। তাহলেই সব কাজের দফা রফা একেবারে। এখন কিছুতেই কোথাও আটকে থাকলে চলবে না ধনার। খুঁজে বার করতেই হবে তাকে, এই রাতেই খুঁজে বার করতে হবে। কে বলতে পারে এখন কি অবস্থায় অ... সে। কিন্তু যে অবস্থাতেই পড়ুক, যেখানেই থাকুক, খুঁজে তাকে বার করবেই ধনা। ধনার ইচ্ছে করতে লাগল, নিজের গালে থাপ্পড় লাগাতে। কেন সে মরতে দিতে গেল সেই সর্বনেশে পাথরখানা ফিনকির হাতে। যাদের দেবার জন্যে হালদার মশায় বিশ্বাস করে তুলে দিলেন পাথরখানা ধনার হাতে, তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এলেই ত চুকে যেত লেঠা। কেন ঐ দুর্বুদ্ধি হঠাৎ ঘাড়ে চাপল ধনার ? মরণাপন্ন একজন মানুষ তাকে চোর জেনেও বিশ্বাস করে একটা কাজের ভার দিলেন। কাউকে না জানিয়ে ধনাকেই বিশ্বাস করলেন হালদার মশায়। আর ধনা তাঁর সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। অথচ হালদার মশায় যদি না বাঁচাতেন সেদিন, তাহলে কিছুতেই পুলিস তাকে ছাড়ত না। মাল পাওয়া যাবার পরেও পুলিসসাহেব চোরকে চালান দিতে চেয়েছিল। হালদার মশায় সাহেবের হাতে ধরে তবে ছাড়ালেন। সেই জন্যেই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তাকে, মনে করেছিলেন ধনা অন্ততঃ তাঁর সঙ্গে নিমকহারামিটা করতে পারবে না। নিমকহারামি করার ফল হাতে হাতে ফলল, সর্বনাশ হয়ে গেল ধনার। ধনার ইচ্ছে করতে লাগল রাস্তার গ্যাসপোস্টের গায়েই নিজের কপালটা ঠুকতে। এখন কোথায় যাবে সে ? কার কার কাছে গিয়ে ফিনকির কথা জিজ্ঞাসা করবে ?

হঠাৎ একটা মতলব খেলে গেল ধনার মাথায়।

আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে, যে তারাই আটকে রেখেছে ফিনকিকে। যাদের কাছে পাথরখানা পৌঁছে দেবার ভার দিয়েছিলেন হালদার মশাই। কোনও রকমে হয়ত তারা জানতে পেরেছে যে, পাথরখানা আছে ফিনকির হাতে। তাই তারা ধরে নিয়ে গেছে তাকে। কিছুই অসম্ভব নয়, যে রকম ভাবে সকলকে লুকিয়ে হালদার মশায় ধনাকে দিয়ে সরাতে চেয়েছিলেন পাথরখানা তাঁর নিজেরই বাড়ী থেকে, তাতে এটুকু ত স্পষ্ট জানা গেছে যে, হালদার মশায়ের ছেলেরা জানতে পারলে কিছুতেই ওটা বাড়ী থেকে বেরতে দিত না। আর এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে যাদের হাতে ও জিনিস পাচার করতে চেয়েছিলেন হালদার মশায়, তাদের উনি ওঁর ছেলেদের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করেন বা আপন জন মনে করেন।

কিন্তু কে তারা। কি সম্বন্ধই বা আছে তাদের সঙ্গে হালদার মশায়ের? এমনও ত হতে পারে যে তাদের খোঁজ করতে পারলেই ফিনকির খোঁজ পাওয়া যাবে। কি যেন ঠিকানাটা তাদের।

ধনা নিজের মনে বিড়বিড় করে আওড়ে নিল তাদের ঠিকানা। প্রথমে পার হতে হবে খালটা মা কালীর ঘাট থেকে। তারপর কোন্ দিক দিয়ে কোন্ গলির ভেতর যেতে হবে, কতবার ডাইনে বাঁয়ে ঘুরতে হবে, শেষে কোন্ বাড়ীর কোন্ জানালার নীচে দাঁড়িয়ে কি রকম ভাবে ডাকতে হবে, সব পাখি-পড়ানো করে পড়িয়ে দিয়েছিলেন তাকে হালদার মশায়। একটুও কষ্ট হবার কথা নয় সে বাড়ী খুঁজে বার করা। অতএব ধনা চলল ঘাটে, সর্বপ্রথম আগে সেই বাড়ীতেই খোঁজ নিয়ে আসা যাক, যে ফিনকিকে তারা ধরে রেখেছে কি না।

ধনা পার হল খাল। খালের ওপারে হয়ত পাওয়া যাবে তার ফিনকিকে, এই আশায় সে খাল পার হয়ে গেল।

হালদার মশায়ও খাল পার হয়ে গেলেন মনে মনে। ওপারে তাঁরা এপারে তিনি, মাঝে বয়ে চলেছে ঐ খাল। শুকনো মরা খাল, কখনও এক ছিটে ময়লা-গোলা ঘোলা জল থাকে, কখনও একেবারে খটখট করে। তবু ঐ আদিগঙ্গা, আরও ভক্তিভরে যাকে বলা হয় কালীগঙ্গা। তীরে বসে লোকে চোদ্দপুরুষের পিণ্ডি দেয়, কেওড়াতলার ঘাটে নাভি বিসর্জন দেয়, আরও কত কি বিসর্জন দেয়, ঐ খালে। বিসর্জনের বিষে শেষ পর্যন্ত মা গঙ্গা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেন দেখতে দেখতে, যেমন হালদার মশায় নিজেও বিষের জ্বালায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছেন।

ঐ খালের পচা পাঁকে কতটা পরিমাণ বিষ জমে আছে তাও যেমন কেউ বলতে পারে না, তেমনি হালদার মশায়ের ভেতরে যা জমা আছে তাও কেউ জানে না।

জানে না তাই রক্ষে, নয়ত পালাত সকলে তাঁর ত্রিসীমানা ছেড়ে। এই যে ছেলেরা, বৌমায়েরা তাঁর আশেপাশে বসে রাত জাগছে, ওরা কেউ তিষ্ঠতে পারত না বিষের জ্বালায়। সহ্য করতে পারত না সেই আঁচ, যা সদাসর্বক্ষণ হালদার মশায়ের বুক, পিঠ, পাঁজরা, শিরদাঁড়া ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে পোড়াচ্ছে। তিন কুড়ি বছরের ওপর মা কালীর সেবায়েত কংসারি হালদার মশায় নিবিড় আঁধারের মাঝে ডুব দিয়ে হাতড়াতে লাগলেন, এমন কিছু একটা হাতে পাবার জন্যে আঁকুপাঁকু করতে লাগলেন, যেটা ধরতে পারলে আবার তিনি ভেসে উঠতে পারবেন, আলোর মুখ দেখতে পারবেন, নিশ্বাস নিয়ে বুকটা জুড়তে পারবেন। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত কিছুই ঠেকল না তাঁর হাতে, দম ফেটে যাবার উপক্রম হল। অবশেষে আবার সেই খাল, মরা খালের এপারে এতটুকু আলো নেই, হাওয়া নেই, কিচ্ছু নেই। কাজেই হালদার মশায় আবার খাল পার হয়ে গেলেন মনে মনে। গিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলেন। এতটুকু হাওয়া নেই এপারে কংসারি হালদারের জন্যে, আলো ত নে-ই। মরা খালের এপারটা অনেক কাল আগে মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আশা-নিরাশা ভয়-ভক্তি প্রেম-করুণা পাপ-পুণ্য সব চেটেপুটে খেয়ে বসে আছে ঐ কালামুখী কালী। তার দোহাই দিয়ে হেন ব্যবসা নেই যা চলছে না এপারে। কংসারি হালদার মশায় তাঁর তিন কুড়ি বছরের কারবারের জের টানতে গিয়ে দেখলেন মজুদ তবিলে একটা কানা কড়িও পড়ে নেই। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে গেছে।

এলোমেলো ভাবনা সব দল বেঁধে হুল্লোড় করতে লাগল হালদার মশায়ের মাথার মধ্যে। এক দল এসে আসন পেতে বসতে না বসতেই আর এক দল এসে তাদের ঘাড়ের ওপর বসে পড়ল। যেন কালী বাড়ির কাঙালী ভোজন, ভাবনাগুলো সব কাঙালী যেন। হালদার মশায়ের নজরটা একটু যাতে পড়ে তাদের ওপর, এই আশায় সবাই হুড়-হুজ্জত হেঁড়োলি জেঙুলি জুড়ে দিয়েছে। ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন হালদার মশায়, ভয়ে একেবারে শিটিয়ে পড়ে রইলেন।

ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না ত তাঁর ভাবনাগুলোকে।

ওরা যে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি মেলে বসে আছে ওঁর চারিদিকে। একা হালদার মশায় কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু ওদের চোখে ত আঁধার নামেনি। সর্বনাশ হালদার মশায়ের বুকের ভেতর থেকে তিনকুড়ি বছরের ইতিহাস সাকার রূপ ধরে বেরিয়ে পড়ে যদি ছেলে বৌদের চোখের সামনে! সর্বনাশ, সর্বনাশ হয়ে যাবে একেবারে।

দূর, দূর, দূর হয়ে যা সব। দে দে ব দূর করে খেদিয়ে, তাড়া আমার সামনে

থেকে। ঝাঁটা মেরে, জুতিয়ে বিদেয় কর সবাইকে।

বিড়বিড় করতে লাগলেন হালদার মশায়। তারকারি হালদার ঝুঁকে পড়লেন বাপের মুখের ওপর।

"বাবা, বাবাগো, কি বলছ বাবা?"

চটকা ভেঙে গেল হালদার মশায়ের। চোখ মেললেন তিনি, কিন্তু মেলেও কিছু দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন খুব ঠাণ্ডা গলায়, "রাত কত?"

রাত তখন অর্ধেকও পার হয়নি। শুনে হালদার মশায় আবার চোখ বুজলেন। ভয়টা কিন্তু কিছুতেই ছাড়ল না তাঁকে। ওরা কেউ দেখে ফেলেনি ত তাঁর ভাবনাগুলোকে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন হালদার মশায়। আঃ, পোড়া রাতটা কি আর পোহাবে না কিছুতে! রাত পোহালে তাঁর চোখের আলো ফিরে পাবেন তিনি। তখন ভাল করে একবার ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবেন যে, ওরা কতটুকু কি জানতে পেরেছে। ভয়ানক সাবধান হয়ে গেলেন হালদার মশায়। না, আর কিছুতেই ঘুমে না পেয়ে বসে তাঁকে। স্বপ্নে যদি কিছু প্রকাশ হয়ে যায় তাঁর মুখ থেকে। খুব সজাগ থাকতে হবে রাতটা, কারণ অত জোড়া সজাগ দৃষ্টির সামনে তিনি অন্ধ হয়ে পড়ে আছেন। এরা একটু বেরোয় না কেন তাঁর ঘর ছেড়ে। একলা থাকতে পারলে এখন স্বস্তি পান তিনি। কিন্তু ওরা নড়বে না, কোনও মতেই আর তাঁকে একলা ফেলে রেখে যাবে না কোথাও। আঃ, কি যন্ত্রণা। রাতের যে এখনও অর্ধেকটা বাকী।

আর একটা রাত, অনেক বছর আগের এই রকমের এক রাতের অর্ধেকটা তখনও পার হয়নি। হালদার মশায় সে রাতে বাড়ী ফিরতেও পারেননি। রাত একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল বাড়ীতে ফিরতে তাঁর। তপু আর তারু সে বছরই বোধ হয় ম্যাট্রিক দেয়! ওদের মা সেই বছরই রোগে পড়ল। আর হালদার মশায় সেই যে গোঁফ কামিয়ে ফেললেন তারপর আর তিনি গোঁফ রাখেননি।

হাঁ, সেই রাতটির অর্ধেকও তখন পার হয়নি। হালদার মশায়ের দুহাত ধরে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠেছিল সে। প্রাণপণে চেঁচালেও তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়নি তেমনি। বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল যে, আওয়াজ বেরবে কেমন করে। কি বিপরীত লাশ! এক কুড়ি মানুষ লাগল কেওড়াতলায় নিয়ে যেতে। এককুড়ি মানুষ জুটিয়েছিলেন হালদার মশায় সেই রাত্রেই। কিছুই অসম্ভব ছিল না তখন কংসারি হালদারের। একটি করে মদের বোতল, পাঁচটি করে টাকা আর

এক জোড়া করে ধুতি চাদর প্রত্যেককে। এক কুড়ি মানুষ দিয়ে লাশ নিইয়েছিলেন তিনি কেওড়াতলায়। তিন টিন ঘি ঢেলে ঘণ্টা তিনেকের ভেতর কাবার করে দিয়েছিলেন সেই লাশ। ব্যস, নেয়ে ধুয়ে যখন বাড়ীতে ফিরেছিলেন হালদার মশায় তখন আর একটুও বাকী ছিল না রাত কবার হতে। মনে পড়ে গেল, স্পষ্ট মনে পড়ে গেল হালদার মশায়ের যে তখন মায়ের বাড়ীর পায়রাগুলো বুম বুম বক বকম বুম, জুড়ে দিয়েছিল। বাড়ীতে ঢোকার আগে বেশ কিছুক্ষণ তিনি ওদের বক বকম বুম শুনেছিলেন কান পেতে। সেই ভয়ঙ্কর নিশুতি ভোরে পায়রার ডাক শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন হালদার মশায়। বিশ্রী রকম চমকে উঠেছিলেন তিনি, মনে হয়েছিল পায়রার বক বকম বুমের মধ্যে একটা কথা লুকিয়ে রয়েছে যেন। মনে হয়েছিল, পায়রাগুলো বক বকম বুম করে যা বলতে চাইছিল তাঁকে তা তিনি ধরতে পারছেন, মানে বুঝতে পারছেন ওদের ভাষার। তখন থেকে তিনি পায়রা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। আরও একটা মুশকিল হয়েছে, তখন থেকে তিনি মায়ের বাড়ীর পায়রার চোখের দিকে চাইতে পারেন না। অনেকবার তিনি এ প্রস্তাবও করেছিলেন যে, ঐ পায়রার গুষ্টিকে মায়ের বাড়ী থেকে বিদেয় করা হোক। অনর্থক ঐ আপদে নোংরা করছে মায়ের মন্দির, নাটমন্দির, বারান্দা। কিন্তু পায়রা মায়ের বাড়ী থেকে তাড়ানো যায়নি। নেপালী ব্যাটাদের জ্বালায় সম্ভবও নয় পায়রা নিকেশ করা মায়ের বাড়ী থেকে। প্রত্যেকটি নেপালী এক জোড়া পায়রা এনে কপালে সিঁদুর লাগিয়ে ছেড়ে দেবে। ডালাধরা চার আনা দক্ষিণা পায়, পায়রার কপালে সিঁদুর লেপে নিবেদন করে দেবার জন্যে। কাজেই মায়ের বাড়ী থেকে পায়রা দূর করা সম্ভব হয়নি কিছুতেই।

হালদার মশায় দেখতে লাগলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। অনেকগুলো পায়রা তাঁর চারদিক ঘিরে ঘাড় ফুলিয়ে নাচছে। নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে আসছে তাঁর খুব কাছে, এসে মাথা বেঁকিয়ে তাঁর দিকে এক চোখে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকছে কিছুক্ষণ। পায়রার চোখ কত রকমের হয়! সব পায়রার চোখই কি ঐরকম লালচে গোছের হয়। যেন ছোট্ট গোল এক টুকরো গোমেদ, পায়রার চোখে কি গোমেদ জ্বলে। কি রকম যেন একটা আতঙ্ক হয় পায়রার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে, যেন খুব ছোট্ট একটু আগুনের ফিনকি লুকিয়ে রয়েছে সেই চোখে। সেই চাউনি বলতে চায়, জানি, সব জানি আমরা হালদার, কিছুই লুকোতে পারনি তুমি, কিছুই লুকোনো যায় না আমাদের দৃষ্টি থেকে। আমাদের বলিদান হয়েই গেছে কি না মায়ের স্থানে। বলিদানের পর আমরা বেঁচে আছি, তাই আমরা সব দেখতে পাই। দুনিয়ার যেখানে যা কিছু ঘটছে তার কোনও

কিছুই আমাদের দৃষ্টি থেকে লুকোনো যায় না। যেখানে যে বলিই হোক, মায়ের বাড়ীর ভেতর থেকে আমরা দেখি সেই বলি। দিনরাত অষ্টপ্রহর বলি দেখতে দেখতে আমাদের চোখ থেকে এই রকম লালচে ছটা ঠিকরোয়।

হালদার মশায় হিসেব করে দেখেছেন, মানে অনেকবার মনে মনে মিলিয়ে দেখেছেন ভূধর ভৌমিকের সেই চাউনির সঙ্গে পায়রার চোখের চাউনিরও যেন কেমন একটা মিল আছে। শেষ পর্যন্ত ভূধর ভৌমিক ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, ছটফট-ধড়ফড় আছাড়-পাছাড় বন্ধ হয়ে গেল তার, গলা দিয়ে আর আওয়াজও বেরল না। শুধু লোকটা ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রক্তবর্ণ দুই চক্ষু, পায়রার চোখের চেয়ে অনেকগুণ বড় সেই চোখ, কিন্তু দৃষ্টিটা যেন ঐ পায়রার দৃষ্টির মত। কিছুতেই ভুলতে পারেন না সেই চাউনি হালদার মশায়, জেগে বা ঘুমিয়ে বা স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ সেই রক্তবর্ণ চোখ দুটো তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর তিনি সজোরে নিজের দুই চোখ চেপে ধরেন। দুই হাতে দুই চোখ কচলাতে থাকেন প্রাণপণে। এই ভাবে চোখ কচলাতে কচলাতেই তিনি রাতের দৃষ্টিটুকু খুইয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, দিনেও তিনি খুব স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পান না। তবু হালদার মশায় চশমা নেননি, কারণ চশমা নিলে তিনি চোখ কচলাতে পারবেন না। চোখ কচলাতে না পারলে চোখের করকরানিতে প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে তাঁর। এই ভয়েই তিনি চশমা নেননি।

চোখ দুটো আবার করকর করে উঠল হালদার মশায়ের। দুহাতে তিনি দুচোখ কচলাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারকারি বলে উঠলেন, "বাবা, দু'ফোঁটা গোলাপ জল দিয়ে দি তোমার চোখে। হাতটা একটু সরাও।"

গোলাপ জল দেওয়া হয়ে গেল চোখে। একবার একটু জ্বালা করে উঠল চোখ দুটো, তারপর বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হালদার মশায় আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়লেন।

ভূধর ভৌমিকও নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু চোখ দুটো সে বোজেনি। কেওড়াতলায় যখন তাকে তোলা হল চিতায় তখনও সে একভাবে চেয়েছিল। একটিবার মাত্র হালদার মশায় তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সে সময়। দেখেছিলেন, ভৌমিক তখনও সমানে চেয়ে রয়েছে। মনে হয়েছিল হালদার মশায়ের যে ভৌমিক তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। সে চাউনিতে কি ছিল। ওই ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে কি বলতে চাইছিল ভৌমিক। কি সে বোঝাতে চাচ্ছিল তাঁকে।

কিছুই নয়, ভৌমিক তাঁকে কি বলতে পারে? তখন তাঁর কাছ থেকে কি

আশা করতে পারে ভৌমিক? কি-ই বা তিনি করতে পারতেন সে সময়? সব শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে ডাকা হয়েছিল, বিষ ত তখন পেটেই ঢুকে পড়েছিল ভৌমিকের। বিষের চরম ফল ফলেই গিয়েছিল তখন। ডাক্তার বদ্যি জড করে সেই অন্তিম মূহুর্তে কতটুকু লাভ হত? বাঁচাতে কি পারতেন তখন ভৌমিককে হালদার মশায়? কিছুতেই নয়, কিছুতেই ভৌমিক বাঁচত না তখন। শুধু হত খানিক কেলেঙ্কারি, থানা পুলিস কোর্ট কাছারি পর্যন্ত গড়াত ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণও হত যে, কে কি উদ্দেশ্যে বিষ খাইয়েছিল, ভূধর ভৌমিককে, তাহলেই বা হত কি? কিছুই হত না, আসামীর গলার দিকে তাকিয়ে হাকিম নিশ্চয়ই ওই গলায় দড়ি বেঁধে ঝোলাবার হুকুম দিতে পারত না নরম তুলতুলে মোমের মত গলাটা, পর পর তিনটি রেখা সাজানো রয়েছে গলায়। আর কি তার রঙ, পিচটুকু গিললেও দেখা যায় গলার ভেতর দিয়ে নামতে। ওই গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখার হুকুম দিতে পারত কোনও হাকিম! অসম্ভব, অসম্ভব, একি পাঁঠা ছাগলের গলা নাকি যে ঝপ করে কোপ বসালেই হল।

আচ্ছা, প্রথমেই কি হালদার মশায়ের নজর পড়েছিল তার গলার ওপর। উঁহু, গলার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি অনেক পরে। প্রথমে নজর পড়ল শুধ দুখানা হাতের ওপর, হাত দুখানি চেপে বসে রয়েছে তাঁর পায়ের পাতায়। নজর পড়তেই তাঁর পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কেমন যেন কেঁপে উঠল, শিরশির করে উঠল তাঁর শরীরের ভেতরটা। অত নরম অত ফর্সা আর অমন গড়নের তুলতুলে হাতের স্পর্শ তাঁর কাদকার পায়ের ওপর, এ যেন তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। পা ছাড়িয়ে নেবারও শক্তি ছিল না তখন তাঁর। কাঠ হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে।

তারপর, তার অনেকক্ষণ পরে, আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠল একখানি মুখ। তখন দেখতে পেলেন হালদার মশায় চোখ দুটি। হাঁ, ত কক্ষণ লেগেছিল তাঁর সেই চোখ দুটি দেখতে, অনেকক্ষণ পরে তিনি সরাতে পেরেছিলেন তাঁর নজর, সেই চোখ দুটির ওপর থেকে। সামান্য একটু জলে ডুবে ছিল সেই চোখ দুটি তখন, জল কিন্তু একটু গড়িয়ে নামেনি চোখ উপছে। জলে ডোবা সেই চোখে কি যে পড়েছিলেন হালদার মশায়, তা এতদিন পরে আর ঠিক মনে করতে পারেন না। মানে, মনটা এখন তাঁর ভয়ানক বুড়ো হয়ে দরকচা মেরে গেছে কিনা।

চোখের ওপর থেকে নজর সরিয়ে আনতে গিয়ে নজর পড়ল সেই গলায়। গলাটাও তখন ওপর দিকে চিত হয়ে রয়েছে। তিনটি সরু রেখা পরপর সাজানো ছিল সেই গলায়। গলায় নজর পড়তেই তিনি চমকে উঠেছিলেন। 'না, ওরকম

গলায় দড়ি বেঁধে ঝোলাবার ব্যবস্থায় কিছুতেই কংসারি হালদার সাহায্য করতে পারেন না।

ব্যস, ও-পক্ষের যা কিছু বলার ছিল তা বলা হয়ে গেল। এ-পক্ষের বোঝবার যতটুকু তাও বোঝা হয়ে গেল। ঠোঁট নাড়তে হল না, গলা দিয়ে স্বর বার করতে হল না, কোনও কিছু ইঙ্গিতও করতে হল না। চোখ দুটি, গলাটি আর হাতের পাতা দুখানি সব বলে শেষ করে ফেললে। বললে অতি সাদা কথা। বললে, "এই গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে, এই কি তুমি চাও?"

তখন পা টেনে নিয়েছিলেন হালদার মশায়। তারপর ভূধব ভৌমিকের ম্যানেজাব জয়গোপাল সামন্ত তাঁব সামনে দাঁড়াতে সাহস করেছিল। কিছুই নেননি হালদার মশায, কিছুই দাবি করেননি তাদের কাছে। শুধু একটি কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, বছরে যে কটা পালা পড়বে তাঁর, সে কটা পালা চালিযে দিতে হবে। অতবড় স্টেট হাতে পেযে, বছবে আড়াই হাজাব তিন হাজার খবচ করা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। নগদ এক আধলাও নিতে পারবেন না হালদার মশায়, একটি কানা কড়িও তিনি নেবেন না তাঁর নিজের জন্যে। তবে মাযের পুজো দিতে হবে, বছবের পব বছব যতদিন কংসারি হালদার বেঁচে থাকবেন ততদিন তার পালা কটার খরচা দিতে হবে। ভূধর ভৌমিক যখন হালদাব মশাযের যজমান, আর সেই যজমান যখন তাঁর কাছে এসেই অপঘাতে মল তখন যজমানের স্টেট থেকে মায়েব পালাব খরচাটুকু যদি পান তিনি চিরকাল, তাহলে যজমানের সৎকারটুকু যাতে নির্বিঘ্নে নিঝঞ্ঝাটে সমাধা হয তার ব্যবস্থা করতে রাজী আছেন তিনি।

ও-পক্ষও রাজী হয়ে গেল। যে কোনও শর্তে তখন বাজী হত ওরা। ভূধর ভৌমিকেব লাশ পোড়ানো হয়ে গেল। মুখে আগুন দিতে গেল স্ত্রী, ম্যানেজার গেল সঙ্গে। হালদার মশায় উপস্থিত বইলেন আগাগোড়া শ্মশানে। এবং উল্লেখযোগ্য একটি কর্ম সমাধা হযে গেল সেই সময়টুকুর মধ্যে। বড়লোক ভূধর ভৌমিক সস্ত্রীক তীর্থ করতে এসেছিলেন গোটাচারেক তোরঙ্গ স্যুটকেস নিযে। ম্যানেজারেরও ছিল স্যুটকেশ বিছানা। পাছে সব চুরি যায এই ভযে, হালদার মশায় সমস্ত সরিয়ে ফেললেন নিজের হেপাজতে। যাত্রীতোলা বাড়ীতে ত আর সে সব জিনিস বিশ্বাস করে রাখা যায় না। শ্মশান থেকে ফিরে আসবার ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরিয়েও দিয়েছিলেন তাদের যথাসর্বস্ব। শুধু খানকয়েক চিঠি খুঁজে পেতে বার করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। চিঠিগুলো পাওয়া গেল ভূধর ভৌমিকের বিধবা জয়জয়ন্তী দেবীর হাত বাক্সের ভেতর। ঐ চিঠি কখানি মাত্র

সরিয়ে রেখেছিলেন হালদার মশায়। চাবিওয়ালাকে ডাকিয়ে বাক্স খুলিয়ে মাত্র চিঠি-কখানি বার করে নিয়ে সোনাদানা সমস্ত ঠিকঠাক সাজিয়ে রেখে বাক্সটি ফেরত দিয়েছিলেন। হালদার মশায় ওঁদের তীর্থগুরু, তীর্থগুরু কখনো অবিশ্বাসী হতে পারে না। ওঁরা সব জিনিসপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। একটি কানাকড়িও এধার ওধার হয়নি।

সেই চিঠিগুলো এখনও রয়েছে ঐ দেয়াল-আলমারির ভেতর। এমনভাবে লুকানো আছে যে সহজে কেউ টের পাবে না। আর চাবিটা রয়েছে হালদার মশায়ের গদির তলায়। আছে ত ঠিক! হঠাৎ চাবির কথা মনে পড়তেই অস্থির হয়ে উঠলেন হালদার মশায়।

ডাক দিয়ে ফেললেন, "তারু, তারু আছিস নাকি রে এখানে?"

পর মুহূর্তে সাড়া পেলেন তিনি তাঁর মাথার কাছ থেকে, "হ্যাঁ বাবা এই যে আমি। কষ্ট হচ্ছে নাকি আবার? দু ফোঁটা ওষুধ খাবে?"

একটু চুপ করে থেকে চাপা শ্বাসটুকু ফেলে হালদার মশায় বললেন, "না, কষ্ট হচ্ছে না। বলছিলুম, এবার একটু ঘুমিয়ে নে না তোরা। রাত আর কত বাকী রে?"

তারকারি হালদার ঘড়ি দেখে বললেন, "পৌনে দুটো হল এখন। আমার ত ঘুম পাচ্ছে না বাবা, তুমি একটু ঘুমোও না। রাত ত আর বেশী নেই।"

হালদার মশায় আর বললেন না কিছুই। রাত বেশী নেই, এবার শুনতে পাওয়া যাবে তার গান, তারপর জানালার কাঁচ কখানা গুনতে পারা যাবে।

তার মানে আর খানিক পরেই আবার তিনি উদ্ধার পাবেন অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে। মাড়িতে মাড়িতে চেপে চোখ মেলে কান পেতে শুয়ে রইলেন হালদার মশায়। রাতের আর বেশী বাকী নেই।

ধনারও সেইরকম ধারণা হল। আকাশের যেটুকু ফালি তার নজরে পড়ল ছোট্ট জানালাটার গর্ত দিয়ে তা থেকে এই আন্দাজই করতে পারলে ধনা যে, রাত কাবার হতে আর বড বেশী দেরী নেই। একটা নিঃশ্বাস ফেলল ধনা, কোথায় কি অবস্থায় যে ফিনকির কাটছে এই রাতটা! কোথায় রইল ফিনকি আর কোথায় রইল সে। অনর্থক খাল পার হয়ে এ বাড়ীতে মরতে এসে ধনা বন্দী হয়ে রইল সারাটা রাত। খামকা এ হেন ফ্যাসাদে পড়ে যেতে হবে জানলে কি ধনা পার হত না কি খাল। হারামজাদা খুনের পাল্লায় পা দিচ্ছে এ ধারণা করতে পারলে টপকাতে যেত নাকি সে এ বাড়ীর পাঁচিল। কি প্যাচেই না পড়ে গেছে ধনা

মিছিমিছি। রাত ত পোহাল বলে, এখন এই জাল কেটে বেরবে কি করে সে, সেই হল কথা। সকাল হলে কেউ না কেউ এ ঘরের শিকল খুলবে আর তখন দেখতে পাবে তাকে। তারপর যে কি ব্যবস্থা করবে এরা! পরিণতিটা ভাবতে গিয়ে ধনার মাথা খারাপ হবার যোগাড় হল। দুহাতে সে নিজের মাথার দু-মুঠো চুল ধরে টানাটানি করতে লাগল।

অথচ ভেবে দেখতে গেলে কোনও অপরাধই নেই তার। হালদার মশায়ের নির্দেশমত বাড়ী খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয়নি তাকে। বাড়ীর পাশে পৌঁছে রাস্তার ধারের ছোট জানালাটাও সে দেখতে পেয়েছিল। জানালাটায় টোকা দিলে হয়ত কেউ খুলেও দিত বাড়ীর দরজা। কিন্তু তারপর তাকে বলত কি ধনা? হালদার মশায় বলে দিয়েছিলেন, পাথরখানা হাতে দিলেই এরা সব বুঝতে পারবে। কিন্তু পাথর দিতে ত আসেনি সে। এসেছে ফিনকিকে খুঁজতে। ফিনকি যদি বন্ধ থাকত এই বাড়ীতে তাহলে এরা তা মানত নাকি। না তাকে আদর করে ঢুকতে দিত বাড়ীতে। ঢুকতে হয়ত দিত, কিন্তু ফিনকিকে নিয়ে বেরতে দিত না। কাজেই সব দিক বিবেচনা করে পাঁচিল টপকানই উচিত বলে বিবেচনা করলে ধনা। পাঁচিল টপকাতেও একটু কষ্ট হল না। যে সরু পথটির ওপর এ বাড়ীর সদর দরজা, সে পথের দুধারের দেওয়ালে দু-পা দিয়ে অনায়াসে সে উঠে পড়ল পাঁচিলের মাথায়। তারপর আর কিছু বিবেচনা না করেই আরও অনায়াসে নেমে পড়ল বাড়ীর ভেতর। নেমেই এমন এক কাণ্ড ঘটছে দেখল ঘরের মধ্যে যে, বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেল তার। আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠত ধনা! ভাগ্যে ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েমানুষটার গলা ছেড়ে দিয়ে লোকটা এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল, নয়ত তখনি হয়ত চেঁচিয়ে উঠে ধরা পড়ে যেত সে। তখনই হয়ত সে পালাত, কিন্তু তারপর লোকটা এমন সব কথা বলতে লাগল যার একটু-খানি কানে যেতেই সে নিঃশব্দে উঠে পড়ল বারান্দায়। একেবারে ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। কারণ ভয়ানক চাপা স্বরে আর সাপের মত হিসহিস শব্দ করে শাসাচ্ছিল লোকটা মেয়েমানুষটাকে। খুব কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল বলেই খানিকটা তবু বুঝতে পেরেছিল ধনা। উঃ, কি সাংঘাতিক কথা, হালদার মশায়কে খুন করতে চায় ও! এরা কিন্তু জানেও না যে হালদার মশায় মরতে শুয়েছেন। হয়ত এতক্ষণে মরেও গেছেন তিনি। দিনের বেলা ত একটা টাল গেছে। ঐ রকমের আর একটা টাল যদি এসে থাকে রাতে, তাহলে তা আর সামলাতে হয়নি হালদার মশায়কে। এতক্ষণে তাঁকে কেওড়াতলায় নিয়ে তোলা হয়েছে।

ধনা ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল হালদার মশায়ের কথা মনে পড়তেই। কি ভয়ানক অবস্থায় নিজে পড়েছে তা ভুলে সে হালদার মশায়ের কথাই ভাবতে লাগল। আহা রে, বুড়ো মানুষটার ও দশা হবার জন্যে ধনাই দায়ী। মায়ের মন্দিরের ভেতর পেছন থেকে ধাক্কা না দিলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন না হালদার মশায়। অবশ্য ধাক্কা না দিয়ে উপায়ও ছিল না ধনার। হালদার মশায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আর সেই ফাঁকে সে একটানে খুলে নিতে পেরেছিল হারছড়াটা বৌটির গলা থেকে। হালদার মশায়কে ফেলতে না পারলে সাধ্য ছিল না কি ধনার তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরই যজমানের গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেওয়ার। যে বাঘা হালদার, বুড়ো হলে তবে কি এখনও ওঁর নজর থেকে হাজারটা ধনার মত ওস্তাদের ওস্তাদি পার পায় না।

যে ধনা এতবড় সর্বনাশটা করলে তার, পাঁঠার শিরদাঁড়াটা জখম করে জন্মের শোধ বিছানায় শোয়ালে, তাকেই তিনি বিশ্বাস করে গুরুতর কাজের ভার দিলেন। আর কাউকে বিশ্বাস হল না হালদার মশায়ের, ধনাকেই বিশ্বাস হল। কাউকে না জানিয়ে চাকরকে দিয়ে ডাকিয়ে পাঠালেন তাকেই। সে যেতেই তাকে চুপিচুপি তেতলায় উঠে ঠাকুরঘর থেকে সর্বনেশে পাথরখানাকে নামিয়ে আনতে বললেন। তারপর তার দু হাত ধরে ভার দিলেন পাথরখানাকে এই বাড়ীতে পৌঁছে দেবার। কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মরণাপন্ন হালদার মশায়ের সঙ্গে। তার শিরদাঁড়া ভাঙবার জন্যে যে ধনা দায়ী, সেই ধনাকেই তিনি উদ্ধার করলেন পুলিসের হাত থেকে। সেই ধনাই করে বসল, তার সঙ্গে এতবড় নিমকহারামিটা। এর ফল হাতে হাতে ফলল, ফিনকি গোল্লায় গেল, রাতটা কাবার হলেই সে নিজেও গোল্লায় যাবে।

যাক, তাতেও আর দুঃখ নেই ধনার, কিন্তু হালদার মশায়ের শেষ সময় যদি সে পৌঁছতে পারত তাঁর কাছে। তাহলে সকলের সামনে নিজের সব দোষ কবুল করে তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমাটা চেয়ে নিতে পারত। কিন্তু সে উপায়ও আর নেই।

আর একটা টাল যদি এসে থাকে আবার, তাহলে হালদার মশায়কে আর সামলাতে হয়নি। এতক্ষণে তাঁকে কেওড়াতলায় নিয়ে তোলা হয়েছে।

আর এ ব্যাটা খুনে এখানে মতলব ভাঁজছে তাঁকে খুন করবার। আর একটু হলেই মেয়েমানুষটাকে শেষ করে দিয়েছিল আর কি। যে ভাবে দেওয়ালের সঙ্গে গলাটা চেপে ধরেছিল মেয়েমানুষটার, যেরকম ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল মেয়েমানুষটার চোখ

ছুটো তাতে আর মিনিটখানেক বড়জোর টিকত ওর দম। উঃ গলা টিপেই খতম করে দিত ব্যাটাচ্ছেলে একটা মেয়েমানুষকে!

কিন্তু ঐ খুনেটার সঙ্গে ও একলা এ বাড়ীতে থাকেই বা কেন। আর খুনেটা ওকেই বা দায়ী করছে কেন। হালদার মশায়ের কাছে কি সব চিঠিপত্র আছে তার জন্যে। গলা ছেড়ে দিয়ে লোকটা হিসহিস করে যে-সব কথা বলে শাসালে ওকে তা স্পষ্ট শুনেছে ধনা। হাঁপাতে হাঁপাতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল লোকটা, "কেন আর আসে না সে? কেন আসে না? তুই তাকে মানা করেছিস আসতে। তুই তার হাতে তুলে দিযেছিলি আমার চিঠিগুলো। সেইগুলো হাতে পেয়েই ত তার এত তড়পানি। এতগুলো বছর ধবে হাজার হাজার টাকা ব্যাটা আদায় করলে। রোজ ভোরে এসে সে তোকে চরণামৃত খাইয়ে যায। চরণামৃত, আহা রে, চবণামৃত। একটি দিন বাদ পড়ে না গুরুদেবের ভোরবেলা এসে চবণামৃত দিতে। শিষ্যার ওপর কি দরদ গুরুর। মনে করেছিলি, আমি কিছু বুঝি না, না। আমার চোখে ধুলো দিযে বেশ কাটছিল এতকাল, মুখ বুজে সব সহ্য কবেছি আমি। যতবার জিজ্ঞাসা কবেছি চিঠিগুলোব কথা ততবাব মিথ্যে কথা বলেছিস, সব ঠিক আছে। সব ঠিক আছে তোর সেই গুরুবাবা হালদার হারামজাদার কাছে। চিঠিগুলো কিছুতেই আদায় হল না এতদিনে, এখন সে নিজে ডুব মারলে। শুনে রাখ, হারামজাদী মেযেমানুষ, শেষবারেব মত শুনে রাখ আজও তোকে ছেড়ে দিলুম। কিন্তু সেই হালদারটাব কাছ থেকে চিঠিগুলো যদি আদায় করতে না পারিস তাহলে পার পাবি না আমার হাত থেকে। নিজের হাতে বিষ খাইয়ে মেরেছিলি স্বামীকে, সব কবতে পারিস তুই। তা-বলে মনে করিসনি, আমার হাত থেকে রেহাই পাবি।

শেষ কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ লোকটা পেছন ফিরে ছুটে বেবিযে পড়ল ঘর থেকে। ভাগ্যে ধনা সট্ করে ঢুকে পড়তে পেবেছিল এই ঘরে, নয়ত তখনই তার দফারফা হয়েছিল আর কি।

কিন্তু এ ঘরে ঢোকাই কাল হল তার। আর কি ঘটে তা শোনবার আশায় ঘাপটি মেরে বসে রইল সে অন্ধকাব ঘরের ভেতর। ঘটল আর কচু, কিছুক্ষণ পরে কোথা থেকে কার বিকট নাকের ডাক শোনা যেতে লাগল। ধনা তখন ভাবছে ঘর থেকে বেরিয়ে সরে পড়বার কথা। সরে আর তাকে পড়তে হল না, পাশের ঘর থেকে মেয়েমানুষটা বেরিয়ে এসে এ ঘরের দরজা টেনে শিকল তুলে দিয়ে চলে গেল। অন্ধকারের ভেতর থেকে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে রইল ধনা, একটি আঙুল তুলেও বাধা দিতে পারলে না।

তখন একটু চেষ্টা করলেই হত, সারাটা রাত এভাবে বন্ধ থাকতে হত না এ বাড়ীতে। মেয়েমানুষটাকে এক ধাক্কায় এক পাশে সরিয়ে দিয়ে যদি সে তখন লাফিয়ে পড়ত ঘরের বাইরে, তাহলে এ বাড়ী থেকে উদ্ধার পাওয়া হয়ত খুব একটা কঠিন কাজ হত না। হৈ হৈ করে লোক জমা করত এরা, ততক্ষণে ধনা গলি কটা পার হয়ে হয়ত নেমে পড়তে পারতে খালে। কিন্তু মেয়েমানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে গেল সে। দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিয়ে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধনা সেই মুখখানার কথাই ভাবতে লাগল। অমন মুখ অমন চোখ যার, সে কি কখনও স্বামীকে বিষ খাইয়ে মারতে পারে? সেই হারামজাদা খুনে মাতালটা ত বলেই গেল, নিজের হাতে বিষ খাইয়ে মেরেছিলি স্বামীকে। হাত দু-খানাও ধনা দেখতে পেয়েছিল দরজা বন্ধ করার সময়। ঐরকম হাত দিয়ে কেউ বিষ দিতে পারে। অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব কাণ্ড। এ মানুষ কখনও ও সব কাজ করতে পারে না। চোর ডাকাত খুনে অনেক দেখেছে ধনা, ধনাকে আর শেখাতে হবে না কিছু। মানুষ দেখে সে ঠিক বলে দিতে পারে যে তার দ্বারা কি সম্ভব, কি অসম্ভব। ও মানুষ, যার ঐ রকম ঠাণ্ডা মুখ ঐরকম গো-বেচারা গোছের চোখ, আর অত সুন্দর ছোট ছোট যার হাত, সে করবে মানুষ খুন [illegible] অমন মানুষের নামে। নিশ্চয়ই ঐ শালা খুনেটার একটা কিছু বদ মতলব আছে পেটে। এ বেচারাকে এখানে আটকে রাখেনি ত। এমনও হতে পারে যে, কোনও কারণে ও পালাতে সাহস করছে না ওই খুনেটার হাত থেকে। গলা টিপে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল, তবু টুঁ শব্দটি করলে না। আর কি আস্পর্ধা ওর। অমন মেয়েছেলের গায়ে ও হাত তোলে?

খেপে গেল একেবারে ধনা। পেছন থেকে তখনই সেই খুনেটার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েছেলের গলা টিপে ধরার উপযুক্ত ফল দিতে পারেনি এই আপসোসে সে নিজের হাত কামড়াতে লাগল। একবার যদি ছাড় পায় এই ঘর থেকে তাহলে আগে সেই খুনেটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে তবে সে বেরবে এই বাড়ী থেকে, নয়ত লোকে যেন তাকে ধনা বলে না ডেকে শুয়োর, পাঁঠা ছাগল বলেই ডাকে। আর কিছু না পারুক, কামড়ে এক খাবলা মাংসও ত ছিঁড়ে নিতে পারবে সেই হারামজাদার শরীর থেকে। মেয়েমানুষ খুন করার মতলব, আচ্ছা দাঁড়া বেটা, বেরই একবার এই ঘর থেকে। রাগে ক্ষোভে জ্ঞানহারা হয়ে ধনা চেঁচিয়ে বলে ফেললে, "মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা বার করব শালা তোমার, দাঁড়াও একবার বেরিয়েনি এই ঘর থেকে।"

ভয়ানক চমকে উঠল ধনা।

নিজের বলা কথাটা যে মুহূর্তে ঢুকল কানে, সেই মুহূর্তে সে হুঁশ ফিরে পেল। সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে রইল আর কোনও সাড়াশব্দ শোনার আশায়। কেউ শুনতে পায়নি ত। এ হে হে হে, করলে কি সে অন্যমনস্ক হয়ে! যদি কেউ শুনতে পেয়ে থাকে তাহলে হয়েছে কাজের শেষ। আগে ডেকে ডুকে লোক জড় করবে, তারপর ঘরের দরজা খুলবে। কোনও সন্দেহ না করে যদি কেউ খুলত ঘরের দরজা তাহলেও একটা উপায় হয়ত হত। আচমকা লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দৌড়ে পালাতে পারা হয়ত সম্ভব হত। কিংবা অন্ধকারে এক কোণে লুকিয়ে বসে থেকে এক ফাঁকে সকলের নজর এড়িয়ে সরে পড়া, তাও হয়ত অসম্ভব হত না। কিন্তু এ কি করলে সে? নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে বসল।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। ধনার মনে হল, অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল নির্বিঘ্নে। অন্য কোনও সাড়াশব্দ উঠল না কোথাও থেকে। তখন সে দম ফেললে আস্তে আস্তে। যেন তার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজটুকুও কেউ না শুনে ফেলে। নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসেছে আর অমনি শুনতে পেলে। ঠিকই শুনতে পেলে ধনা, দরজার বাইরে থেকে কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। নিঃশব্দে সে সরে এসে দাঁড়াল দরজার গায়ে। কান চেপে ধরল দরজার ওপর। তারপর স্পষ্ট শুনতে পেলে দু-বার।

"কে তুমি? ঘরের ভেতর তুমি কে?"

খুব চুপিচুপি দু-বার করা হল সেই প্রশ্ন। চুপ করে ধনা ভাবতে লাগল জবাব দেবে কি না। আবার তার কানে গেল, "বল তুমি কে, নয়ত লোক ডাকব।"

ধনা বুঝতে পারলে মেয়েমানুষের গলা। তখন তার সাহস হল। সেই রকম চুপি চুপি সে বললে, "দরজাটা খুলে দাও মা সব বলছি।"

"না, আগে বল তুমি কে। কেন এসেছ এ বাড়ীতে? এ ঘরে ঢুকেছ কখন?"

ধনা কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, "আমি হালদার মশায়ের কাছ থেকে এসেছি মা, তিনি মরতে বসেছেন। আমায় একখানা পাথর দিয়েছেন আপনাকে দেবার জন্যে।"

ব্যস, আর একটুও সাড়াশব্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ কাটল নিঃশব্দে। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা একটু ফাঁক হল। তখন শুনতে পেল ধনা, "সাবধান, একটুও শব্দ যেন না হয়। বেরিয়ে এস বাইরে।"

একটুও শব্দ না করে দরজাটা আর একটু ফাঁক করে বেরিয়ে এল ধনা। সঙ্গে

সঙ্গে ধরা পড়ল তার একখনা হাত। কানের কাছে শুনতে পেল ধনা "চল আমরা পালাই এখান থেকে। সাবধান, খুব সাবধানে এস।"

হাতখানা ছাড়া পেল না ধনার। তার হাত ধরেই তাকে নামিয়ে আনা হল বারান্দা থেকে। সদর দরজার খিল খোলা হল নিঃশব্দে। সদর দরজা পেরিয়ে এসে নিঃশব্দে আবার সেটা টেনে দেওয়া হল।

তারপর গলি। গলির পর গলি পার হয়ে চলল দুজনে নিঃশব্দে। শেষে খাল দেখা গেল। তখন ধনার হাতখানা ছাড়া পেলে।

আর তখন শুনতে পেল ধনা একটি অনুরোধ। অনুরোধ নয়, যেন ভিখিরী ভিক্ষে চাইছে তার কাছে। "আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে যাবে বাবা?"

একটা ঢোঁক গিলে ধনা বললে, "চলুন মা, সাবধানে আসুন আমার হাত ধরে। এখানটা ভয়ানক পেছল। জল সরে গিয়ে পলি পড়েছে কিনা। খালে এক হাঁটু জলও নেই। আসুন আমরা এখান দিয়ে পেরিয়ে যাই।"

সাবধানে তাঁকে নামালে খালে ধনা, সাবধানে তুলে নিয়ে এল এপারে। এপারে ওঠার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, একটা তারা খুব জলজল করে জলছে মাথার ওপর। মনে হল যেন রাতটা সত্যিই শেষ হয়ে এসেছে।

ফিনকিরও তাই মনে হল।

আস্তে আস্তে সে উঠে বসল বিছানায়। নরম সবুজ আলোয় ঘরটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে বুড়ী ঝি-টা নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিল, ওপাশের জানালার পর্দার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল খানিকটা আকাশ। সেই আকাশটুকুতে জলজল করে জলছিল একটা তারা। তারাটির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর ফিনকির মনে হল রাত শেষ হতে চলেছে।

ঠিক এই রকম ভোর রাতেই তার মা উঠে পড়েন রোজ, উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দার খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তখন তাঁর ঠোঁট নড়তে থাকে। অনেকদিন ভোরে ফিনকিও উঠে গিয়ে বসেছে মায়ের পাশে, মায়ের মত তাকিয়ে থেকেছে ঐ তারাটির দিকে। কিন্তু ঠোঁট নাড়তে পারেনি। নাড়বে কি করে, ফিনকি ত আর মায়ের মত জপ করতে জানে না। তাই সে চুপ করে বসে থেকেছে মায়ের মুখখানির দিকে চেয়ে, অনেকবার ফিনকির মনে হয়েছে যে, ঐ জলজলে তারাটির মত তার মায়ের মুখখানিও জলজল করছে! রোগা শুকনো গালে, হাড় ঠেলে-ওঠা মায়ের মুখখানি অনেকটা

ঐ তারাটির মতই। আর একটু ভাল করে দেখবার জন্যে খাটের ওপর থেকে নেমে পড়ল ফিনকি। নেমে আগে কাপড়খানা খুঁজে বার করলে বিছানা থেকে। একটা খুব পাতলা কাপড়ের সাদা শেমিজ আর একখানি চকচকে কালো পাড কাপড ফিনকিকে পরানো হয়েছিল। ফিনকির মনে পড়ে গেল, পাড দেখে সে বলে ফেলেছিল, 'ওমা, এ যে ধুতি!' শুনে সেই বৌটির কি হাসি, হাসতে হাসতে বলেছিলেন তিনি, "তা ত বটেই, তুমি হলে গিন্নীবান্নী মানুষ, তুমি কি ধুতি পরতে পার।" বলে সেই ধুতিখানিই ফিনকিকে পরিযে দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য অনেকক্ষণ তার হুঁশ ছিল না।

বিছানা থেকে কাপডখানা টেনে নিয়ে কোমরে জডাতে জডাতে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল ফিনকি যে, তারপর আর কি কি হযেছিল। কে কে যেন এসেছিল তাব কাছে! আবছা আবছা যেন সে দেখেছিল অনেক ব্যাপার, একজন সাহেব গোছের লোক এসে বসেছিল তার বিছানার ওপর, তখন খুব লেগেছিল তার হাতে। হঠাৎ ফিনকি কাপড পরা বন্ধ করে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের ওপর দিকটায় হাত বুলোতে লাগল। একটু যেন ফুলে আছে জায়গাটা! আরও ভাল করে সব মনে করবাব জন্যে সে মুখ নীচু করে ছোট কপালখানি কুঁচকে থেমে রইল কিছুক্ষণ। কপাল কোঁচকাতে গিয়েই বোধ হয টান পডল কপালে। তখন তার হাত গিয়ে ঠেকল কপালের ওপব।

এ কি!

কপালের বাঁ ধারে কি একটা সেঁটে বসে রয়েছে যেন।

হঠাৎ আবার মাথাটা যেন গুলিযে গেল ফিনকির। পডেই যেত আব একটু হলে, কোনও রকমে বিছানায় ঠেসান দিয়ে দাঁডিয়ে নিজেকে সামলালে। দাঁডিয়ে রইল সেই ভাবে নিজের পায়ের পাতাব দিকে তাকিযে। একটু একটু করে অনেক কথা তার মনে পডে গেল। সকাল থেকে যা যা ঘটেছে, সব ঠিকঠাক পরপর গুছিয়ে মিলিয়ে নিলে ফিনকি মনে মনে। এ বাডীতে আসার পর থেকে কিন্তু কেমন যেন সব ওলট পালট গোলমাল হতেলাগল। যেন ঘুমেব ঘোরে সে দেখেছে অনেক কিছু, কিন্তু কিছুই ঠিক মনে করতে পারছে না। সেই ভদ্রলোকটিকে মনে পড়ল, যিনি তাঁর বৌয়ের হাতে ফিনকিকে দিয়ে নিজে কাজে বেরিয়ে গেলেন। বৌটি তাকে এই কাপড জামা পরালে, পরিয়ে এই বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে। বোধহয় তখন খানিকটা দুধও খেয়েছিল ফিনকি! তারপর কি হল!

বেশ চেষ্টা করে দেখলে ফিনকি যদি মনে করতে পারে কি কি হয়েছিল তারপর। কিন্তু না, আর যেন কিছু হয়নি।

ওঃ, এবার মনে পড়েছে।

তারপর যেন আর একবার দেখেছিল, সে সেই ভদ্রলোকটিকে আর তাঁর বৌকে! হ্যাঁ, ঠিক দেখেছিল, ওঁরা বসেছিলেন এইখানেই, এই বিছানার ধারেই। এই সবুজ আলোটা থাকার দরুনই ফিনকি ভাল করে চিনতে পারেনি তাঁদের।

তবে শুনতে পেয়েছিল ফিনকি ওঁদের কথা। চুপি চুপি নয়, তবে চাপা গলায় ওঁরা কথাবার্তা বলছিলেন।

কি বলছিলেন যেন।

হাঁ, হাঁ এইবার মনে পড়েছে সব। হাসপাতাল, কাল সকালে হাসপাতালে দিতে হবে।

ভয়ানক রকম চমকে উঠল ফিনকি, যেন ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে সে কোন কারণে। ব্যাকুল চোখে তাকাতে লাগল ঘরের চারদিকে। আবার তার নজর গিয়ে পড়ল জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশে। আকাশের গায়ে জলজ্বল করে জ্বলছে তারাটি। আর একটুও দেরী করলে না ফিনকি, কালো পাড় পাতলা কাপড়খানির আঁচলটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে ফেললে। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ঘুমন্ত বুড়ীকে ডিঙিয়ে যেতে হল ফিনকিকে, বুড়ীটা আবার এখন বিড়বিড় করে কি বকছে। বুড়ীর বকুনি শুনে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল ফিনকি। না, বুড়ীটার ঘুম ভাঙেনি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সে ঝগড়া করছে যেন কার সঙ্গে। [illegible] কিছুক্ষণ, ফিনকি দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিলে বাইরের দু-দিক। তারপর পর্দার বাইরে পা দিলে।

ঘর থেকে বেরিয়েই বারান্দা, ডান পাশে বারান্দার শেষ দিকে একটা দরজা। ফিনকির সব মনে পড়ে গেল। ঐ দরজা দিয়ে বাইরের ঘরে ঢোকা যায়। ঐ ঘরেই সেই মুশকো মিনসেটা ফিনকিকে এনে নামিয়ে দিয়েছিল সেই ভদ্রলোকের টেবিলের সামনে। ঐ ঘরটায় এখন ঢুকতে পারলে হয়। তারপর সদরের দরজা যদি খুলতে পারা যায় তাহলেই রাস্তা।

পাতলা অন্ধকারে দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলল ফিনকি। পর্দা সরিয়ে ঠেলা দিতে খুলে গেল দরজাটা। ঘরের মধ্যে ভয়ানক অন্ধকার। তাতেও ভয় পেলে চলবে না ফিনকির, থামলেও চলবে না। অন্ধকারেই সে পা ঘষে ঘষে এগিয়ে চলল। দু হাত সামনে মেলে দিয়ে এগতে লাগল। হাতে ঠেকল প্রথমবার একটা চেয়ারের পিঠ, চেয়ারখানা ঘুরে যেতেই টেবিলের কোণায় হাত ঠেকল। তারপর আর একটু এগতেই দেওয়াল পাওয়া গেল। এইবার দেওয়াল ধরে ধরে ডান দিকে খানিকটা যেতেই পাওয়া গেল দরজাটা। সন্তর্পণে দরজার খিল খুলে

দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখলে ফিনকি। কিন্তু টেনে দরজা খোলে না। ওপরে বোধহয় ছিটকিনি আছে। ওপর দিকে হাত বুলোতে ছিটকিনি হাতে ঠেকল। খুট করে একটু শব্দ হল ছিটকিনি খুলতে। কুঁচ করে একটু শব্দ হল দরজাটা ফাঁক করতে। দরকার নেই বেশী ফাঁক করে, যদি আবার শব্দ হয়। ঠিক যতটুকু ফাঁক করলে ফিনকি গলে বেরিয়ে যেতে পারে ততটুকুই ফাঁক হল দরজার কপাট। আর হয়ে বেরিয়ে এল ফিনকি!

আবার রাস্তা। ওপরে খোলা আকাশ। সেখানে মায়ের মুখের মত তারাটা জলজল করে জলছে, লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বুকটা ভরে ফেললে ফিনকি। মুখ তুলে আর একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল।

তারাটা হাসছে। ফিনকির কাণ্ড দেখে মুখ টিপে হাসছে তারাটা। যেমন তার মা হাসেন ফিনকি যখন রাগারাগি করে হাত পা ছুঁড়তে থাকে, তেমনি ভাবে মুখ টিপে হাসছে যেন আকাশের তারাটাও!

কি জানি কেন, হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠল ফিনকি। পরমুহূর্তেই সে জোর করে থামিয়ে ফেলল তার কান্না। থামিয়ে মাথা নীচু করে ছুটতে লাগল। কোন্ দিকে যাচ্ছে, কোথায় পৌছবে, এ সমস্ত ভাবনা চিন্তা তার মাথাতেই এল না। ছুটল ফিনকি জনমানবশূন্য পথে। ছুটতেই হবে যে তাকে, পালাতেই হবে, নয়ত আর রক্ষে নেই! ধরা পড়লেই ওরা তাকে দিয়ে আসবে হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে যাবে না ফিনকি, কিছুতেই সে ধরা দেবে না। ছুটে গিয়ে এখনই তাকে পৌছতে হবে তার মায়ের কাছে।

ধরা দেওয়া চলবে না কিছুতেই।

এক ঘর মানুষের সামনে আত্মপরিচয় দেওয়াটা মহাভুল হয়ে গেছে। কংসারি হালদার মরছে শুনে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পাথরখানা আদায় করতে যাওয়াটা মোটেই ভাল কাজ হয়নি। এতক্ষণে সবাই জানতে পেরে গেছে যে পাগলটা কে। সর্বাঙ্গে ইট পাটকেল ঝুলিয়ে কে পড়ে থাকে শ্মশানে, কে রোজ নিশিরাতে মায়ের দরজায় মাথা ঠুকে নকুলেশ্বরের ঘুম ভাঙিয়ে কালীঘাটের পথে গান গেয়ে বেড়ায়, এখন পাগলার পরিচয় জানতে আর বাকী নেই কারও। শয্যাশায়ী হালদারকে যখন চেপে ধরেছে সকলে পাগলার পরিচয় জানার জন্যে, তখন সে বেচারা নিশ্চয়ই বলে ফেলেছে সব কথা, এতদিন পরে ছাড়তেই হল কলিতীর্থ কালীঘাট। আর মাকে গান শোনানো চলবে না, ভৈরবের ঘুম ভাঙাতে আর

কেউ নিশিরাতে আসবে না। আর কেউ কখনও পাগলাকে কালীঘাটে দেখতে পাবে না।

রইল ওরা।

ওরা রইল, সবাই মায়ের আশ্রয়ে। বারটা বছর পূর্ণ হতে আর মাত্র তিনটি বছর বাকী। বার বছরের ব্রত পূর্ণ হলে বাকসিদ্ধ হওয়া যেত, শ্রুতিধর হওয়া যেত, জাতিস্মর হওয়া যেত। এই কালীঘাট আবার জেগে উঠত তাহলে, দেশে দেশান্তরের মানুষ মায়ের মহিমা জানতে পেরে ছুটে এসে আছড়ে পড়ত এই তীর্থে। কলিতীর্থের সমস্ত কলুষ যেত ধুয়ে। ঐ মরা আদি গঙ্গায় আবার জোয়ার ডাকত, সেই জোয়ারের জল কালীঘাটের কূল ছাপিয়ে উঠে সব ধুয়ে মুছে সাফ করে নিয়ে যেত—দীনতা, হীনতা, জাল জুয়াচুরি, পাটোয়ারী বুদ্ধি সমস্ত! তখন লোকে এই তীর্থে এসে মোকদ্দমা জেতবার জন্যে ঘুষ দিত না মাকে, নিজের ছেলের ব্যামো ভাল হবার কামনায় ছাগলের ছেলের গলা কাটতে চাইত না। মানুষ তখন কালীঘাটকে ছাগল বেচার মস্ত বড হাট বলে মনে করত না। ছাগলেরা তখন কালীঘাটে মানুষ কিনতে আসত না। কারণ কলিতীর্থ কালীঘাট থেকে তখন মানুষ বেচা কেনার পাটই উঠে যেত।

একদা এই ঘাটে সত্যিই মানুষ কেনা বেচা হত।

গঙ্গাটা তখন এত বড ছিল যে, পালতোলা জাহাজ সারা জগৎ ঘুরে এসে এই ঘাটে লাগত। নামত জাহাজ থেকে বোম্বেটেরা, পুজো দিত নরবলি দিয়ে ঐ কালীকে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঐ কালী তখন এমন জাগ্রত ছিল যে, দুনিয়ার অন্য প্রান্তের দস্যুরা পর্যন্ত একে মানত। তখন এই ঘাটে বসত হাট, মানুষ বেচা-কেনার হাট। নানা দেশ লুট করে চেনে বেঁধে জাহাজের খোলে ভরে আনত তারা মানুষ, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ সব জাতের সব রকমের মানুষ। কচি, বুড়ো, পুষ্ট, যাকে কালীঘাটের ভাষায় বলা হয় পুরুষ্টু, সব রকমের মানুষ তারা সস্তায় নিলেম হত তখন এই ঘাটে। এখনও হয়, কিন্তু রকমটা একটু বদলেছে। জাহাজের খোলে ভরে আসে না তারা কালীঘাটে, আসে ভাগ্যের পরিহাসে, সমাজের তাড়নায় কোথাও ঠাঁই না পেয়ে, পেটের জ্বালায় অন্ধ হয়ে। তারা কেউ চেনে বা দড়িতে বাঁধা থাকে না। তবু তারা থাকে, পালায় না, কালীঘাটের অদৃশ্য কালো দড়িতে বাঁধা তারা ডালা হাতে শুকনো মুখে ঘুরতে থাকে কালীঘাটে। মেয়েমানুষগুলো মুখে চুণ কালি মেখে নিজেদের ফেরি করে বেড়ায়। আর যারা এটাও পারে না, ওটাও পারে না, তারা কালীঘাটের পথের কাদায় গড়াগড়ি খায়।

এখনও আসে পণ্য কালীঘাটের ঘাটে। শুকনো পথে আসে। আদি গঙ্গাটা

শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যে।

ঐ আদিগঙ্গা।

জলে টইটুম্বুর, দিনে দুবার জোয়ার ভাঁটা খেলত। ঐ মা, সাক্ষাৎ মা, জাগ্রত জননী। ঐ গঙ্গাগর্ভে আবক্ষ নিমজ্জিত সেই মহামানব, দুটি হাত জোড করে মাথার ওপর সোজা করে তুলে আঁচলা ভরতি জল অর্ঘ্য দিচ্ছেন—

হ্রীং হং সঃ মার্ত্ত ণ্ডভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায়
ইদমর্ঘ্যং শ্রীমদ্ সূর্য্যায় স্বাহা—

আঁজলাব জল যে মুহূর্তে পডছে গঙ্গার জলে, সেই মুহূর্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। যেন আঁজলা ভবতি ঘি ঢালা হচ্ছে যজ্ঞকুণ্ডে।

ঠিক এই সময, এই নিশা-মহানিশার অন্তিম লগ্নে এ দৃশ্য দেখেছিল মাত্র দুটি মানুষ। ঐ কংসাবি হালদাব একজন, আব একজন হাবিযে গেছে। দ্বাদশ বর্ষ লুকিযে থাকতে হবে, শ্মশানসাধনা কবতে হবে, কাযমনোবাক্যে সত্যব্রত ধারণ করে থাকতে হবে, তবে মা জাগ্রত হবেন। একটি মাত্র সন্তানেব তপস্যাব ফলে আবার জগজ্জননী মুখ তুলে চাইবেন। সমস্ত জাতটা জেগে উঠবে সেই লগ্নে, মবণেব ভয় আব কেউ কববে না, ধর্ম নিযে ব্যবসা ফাঁদা চলবে না তখন আব এ দেশে, আত্ম-প্রবঞ্চনা কবার প্রবৃত্তিই তখন ঘুচে যাবে মানুষেব। কলিতীর্থ কালীঘাটেব মবণজয়ী সন্তানেবা তখন বিশ্বজগৎকে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে দীক্ষা দেবে।

এই ছিল সেই মহামানবেব আশা, এই তাঁব আদেশ, এই তাব সঙ্কেত। সে আশা, সে আদেশ, সে সঙ্কেত সার্থক কবে তোলবাব জন্যে একজন হাবিযে গেল। কংসারি রইল, তাব অন্য কাজ অন্য ব্রত। সে মাযেব পালাদাব। তাকে মুখ টিপে মাযের পালা চালাতে হবে, মাযেব বাডীব ওপব নজব বাখতে হবে, আব ঐ যন্ত্র রক্ষা করতে হবে। দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে গুরুভাই যখন সিদ্ধিলাভ কবে ফিরে আসবে, তখন মাযেব বাডী থেকে কাজ আবম্ভ করতে হবে। সেই জন্যে হালদার বযে গেল। যন্ত্রটিকে হালদারের হাতে তুলে দিতে হল। পুরুষানুক্রমে এ বংশের সকলেই পূর্ণাভিষিক্ত কৌল, একমাত্র কৌলেরই অধিকাব ঐ যন্ত্র ছোঁবার, ওর নিত্য তর্পণ করবাব। হালদারকে পূর্ণাভিষিক্ত কবে সেই অধিকাব দিযে তার হাতে যন্ত্রটি সঁপে দিয়ে বেরিয়ে পডতে হল। কুলদেবতা কুললক্ষ্মী অন্য কুলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। বারটা বছর পরেই আবার ফিরে আসবেন মা এই বংশে। কিন্তু মা আর ফিরবেন না কখনও। হালদার সেই মহাযন্ত্র খুইয়েছে।

অতএব, সবই যখন গেছে তখন আর ভাবনা কি।

কাজেই ধরা দেওয়া কিছুতে চলবে না। পালাতে হবে কালীঘাট ছেড়ে। কোন্ মুখে আজ তাদের সামনে গিয়ে শুধু হাতে দাঁড়ানো যায়! ধরা পড়লেই তাদের সামনে মানুষে টেনে নিয়ে যাবে যে।

সহধর্মিণী, সহধর্মিণীর মত কাজ করলে। হাসি মুখে বিদায় দিলে। শেষ কথা কটি আজও মনে পড়ে।

"যাও তুমি, কোনও ভাবনা নেই তোমার। গুরুর আদেশে যদি বার বছর বউ, ছেলে-মেয়ের মুখ দেখা বারণ হয়ে থাকে তোমার, তাহলে আমি তোমায় বাধা দেব কেন। যাও, একটুও মন খারাপ কর না, ছেলে মেয়ে ঠিক আমি বড় করে তুলব। দেখ তুমি ফিরে এসে দেখ, আমি কিছুতেই কালীঘাট ছাড়ব না। ছেলে মেয়ে তোমার বড় হবে, ভাল হবে। ডালাধরার ছেলে মেয়ে হয়ে ওরা বেঁচে আছে। তোমার গুরুর দয়ায় যদি তুমি সিদ্ধিলাভ করতে পার, তখন ওদের কেউ ডালাধরার ছেলে মেয়ে বলতে পারবে না। কিন্তু কথা দিয়ে যাও, যেখানেই থাক, যাই কর, বার বছর পরে খবর দেবে আমাদের। আমি তোমার ছেলে মেয়ে তোমার হাতে তুলে দিয়ে তখন ছুটি নেব।"

আরও কত কথা বলেছিল সে। ছেলেটা তখন বছর আষ্টেকের, মেয়েটা সবে পাঁচে পড়েছে। ফ্রক পরে মায়ের বাড়ীতে ছুটোছুটি করে বেড়াত। ধরে নিয়ে বসিয়ে কুমারী করাতে হত। ঐ কুমারী করাবার দরুনও রাগ করত তার মা। মেয়ে তার খারাপ হয়ে যাবে এই ভয়ে।

সেই মেয়ে, সেই ছেলে আর তাদের মা এখন কোথায়! বছর ছয়েক পরে কালীঘাটে ফিরে আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। তেমন ভাল করে খোঁজবার চেষ্টাও করা হয়নি। কারণ বার বছর পূর্ণ হতে অনেক বাকী যে। যদি তারা টের পেয়ে যায়, এই ভয়ে তাদের খোঁজা হয়নি ভাল ক ।

সেই ভয়েই পালাতে হবে এখনই কালীঘাট ছেড়ে।

নয়ত লোকে ধরে ফেলবে, টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের সামনে খাড়া করে দেবে। তারা জানবে যে সমস্ত বিফল হয়ে গেছে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়নি। যে ডালা-ধরা সেই ডালাধরাই আবার ফিরে এল।

এই ন' বছর কি অবস্থায় কাটিয়েছে তারা তাই বা কে জানে! যদি বেঁচেও থাকে কোনও রকমে তবু মরে বেঁচে আছে। শুধু এই আশায় বেঁচে আছে যে, একদিন এমন এক সাধক মহাপুরুষ ফিরে আসবে তাদের কাছে, যার সাধনার মহিমায় সমস্ত দুঃখ কষ্ট গ্লানি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। মাথা তুলে দাঁড়াতে

পারবে আবার তারা। সে আশায় ছাই দিয়ে কোন্ মুখে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারা যায় আজ। এমন কি কুলদেবতা পর্যন্ত খুইয়ে আবার তাদের মুখ দেখান—কথনও নয় কিছুতেই নয়, প্রাণ গেলেও নয়।

ইট-পাটকেল দড়ি-দড়া সমস্ত বিসর্জন দিয়েছে পাগলা। কেওড়াতলার শ্মশানে খুলে ফেলে দিয়েছে সব একটা চিতার মধ্যে। ডোমেদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করেছে একখানা চাদর। মড়া চাপা দিয়ে এনেছিল কেউ, ডোমেরা তুলে নিয়েছিল। পাগলা পাগলামি করে ডোমেদের মন ভিজিয়ে আদর করে নিয়েছে চাদরখানা। তারপর চুপি চুপি তার সাজসজ্জা সব খুলে ফেলে দিয়ে চাদরখানা জড়িয়ে পালিয়ে এসেছে শ্মশান ছেড়ে।

সেই চেনা পথ, সেই ঠিক লগ্ন, গলায় গান নেই, গায়ে ঝুলছে না ইটপাটকেল। চলেছে পাগল, শেষবারের মত চলেছে মায়ের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের ফটকে। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত মাকে প্রণাম করে চলে যাবে।

কত দিন কত রকমের ঠাট্টা করেছে মানুষে।

"হ্যা ঠাকুর, কি দেখ তুমি রোজ ও সময় মায়ের বাড়ীর ফটকের ফাঁক দিয়ে?"

অম্লান বদনে জবাব দিয়েছে পাগলা, "মাকে দেখি।"

হা হা, হি হি হেসে উঠেছে সকলে। হাসবারই কথা, রাতের তৃতীয় প্রহরে মায়ের মন্দির বন্ধ। বন্ধ না থাকলেই বা কি। অতদূর থেকে নাটমন্দির, উঠোন, গেট, সেই গেটের ওধার থেকে মন্দির খোলা থাকলেও কি মাকে দেখা যায় নাকি!

'হ্যা, দেখা যায়। নিশ্চয়ই দেখা যায়। তিনটি চোখ আর মুখখানি স্পষ্ট দেখা যায়। আর কিছু দেখা যায় না।"

শুনে আবার হেসে উঠেছে সকলে।

চুপি চুপি এসে দাঁড়াল পাগল গেটের বাইরে। চোখ বুজে লোহার পাটির ফাঁকে মুখখানা চেপে ধরলে। তারপর বিড়বিড় করে কি বললে। বলে চুপি চুপি আবার পালিয়ে গেল।

এইবার নকুলেশ্বরের মন্দির।

ভৈরবের মন্দির বে-আবরু। চতুর্দিকে দেওয়াল নেই। আছে লোহার গরাদে। দরজাও লোহার গরাদে দিয়ে তৈরী। তিনটি সিঁড়ি উঠে দরজার গরাদের ফাঁকে মুখ চেপে দাঁড়াল পাগল। রাস্তার আলোয় বেশ দেখা যাচ্ছে ভৈরবকে। স্পষ্ট দর্শন হল।

মনে মনে বলতে লাগল পাগলা, "হে গুরু, হে মহাগুরু, আবার চললাম দূরে। এবার যেন সিদ্ধিলাভ হয়। এই কালীঘাট, এই মহাতীর্থ, মহামায়ার এই মহাপীঠে স্থান পাবার উপযুক্ত হয়ে যেন ফিরতে পারি।"

বহুকাল আগে শোনা একটা গানের কলি মনে পড়ে গেল পাগলের—

"পুনঃ যদি তপস্যাতে একটি ব্রাহ্মণ হতে পার
কর্মক্ষেত্রে মায়ের নামে এ জগৎ মাতাতে পার।"

গুন গুন করে গেয়ে উঠল গানের কলিটি ভৈরবের দরজায় মুখ চেপে—

"তবেই যাবে এ দুর্গতি
নইলে রে ভাই অধোগতি"

হঠাৎ ভয়ানক রকম চমকে উঠল পাগলা।

ছুটে আসছে কে। কে যেন ছুটে আসছে ওদিক থেকে।

"মা—মাগো।"—করুণ কণ্ঠ শুনতে পেল পাগলা। সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়বার শব্দ হল ঠিক পেছনে।

ভৈরবের দরজা ছেড়ে তিনটি সিঁড়ি এক সঙ্গে লাফিয়ে রাস্তায় পড়ল পাগলা।

ঐ ত। ঐ না কে পড়েছে রাস্তার মাঝখানে।

ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তার পাশে, বসে মুখখানা উলটে ধরল ওপর দিকে। রাস্তার আলোয় মুখখানা অনেকক্ষণ ধরে দেখা গেল না নিমেষের চোখে। তারপর উঠিয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল মায়ের বাড়ীর দিকে

ঘুমিয়ে রয়েছে তখনও মায়ের বাড়ী।

ঘুম ভাঙান গান শোনা গেল না মায়ের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের গেটের সামনে। বহুক্ষণ কান পেতে থাকবার পর হালদার মশায় মনে মনে বলতে লাগলেন, "থাক, ঘুমিয়েই থাক মা। অনন্তকাল ঘুমও। তোমার এই কাল-নিদ্রা কোন দিন আর কেউ ভাঙাবার চেষ্টা করবে না।"

এল না সে, সত্যিই সে এল না। এই ধারণা মনে নিয়ে চলে গেল সে, যে গুরুভাই কংসারি হালদারও তাকে ঠকালে। ফেরত দিলে না যন্ত্রটা, মিথ্যে কথা বললে যে যন্ত্রটা খোয়া গেছে।

একটি কথাও যে বুঝিয়ে বলার সুযোগ মিলল না তাকে। কংসারি হালদার তাকে ঠকায়নি, ঠকাতে পারে না তাকে কংসারি হালদার। নিশ্চয়ই ফেরত পাওয়া যাবে সেই যন্ত্র, মরবার আগে তার হাতে তার কুললক্ষ্মী সঁপে দেবেই কংসারি

হালদার। কিছুতেই এর অন্যথা হবে না।

শুধু আর একটিবার একটু আলো ফুটে উঠুক হালদারের চোখে। একটু ঘোলাটে গোছের হক অন্তত অন্ধকারটা, ফিকে গোছের একটু আলো ধরা দিক তাঁর চোখে। খুব স্পষ্ট না হোক, অন্তত একটু আবছা দেখা যেন তিনি দেখতে পান আর একটিবার। তাহলে কংসারি হালদার একবার দেখে নেবেন সেই ঠগ, জোচ্চর খুনেদের। সেই চিঠি কখানি, তাদের মৃত্যুবাণ, এখনও হাতে আছে হালদার মশায়ের। যাবে কোথায় তারা।

ঐ যন্ত্রটি কি জিনিস, কি করতে হয় ওটাকে নিয়ে, এ সমস্ত তত্ত্ব বিশ্বাস করে একমাত্র তাদেরই জানিয়েছিলেন হালদার মশায়। যদি তিনি নিজে কখনও অশক্ত হয়ে পড়েন, তখন ঐ যন্ত্রের নিত্য তর্পণ করবে কে। এই ভয়েই তিনি ওদের দীক্ষা দিয়ে পূর্ণাভিষেক পর্যন্ত করেছেন। বার বছর পরে কাকে ওই জিনিস ফেরত দিতে হবে তাও জানিয়েছেন। কিছুই জানাতে বাকী রাখেননি। ভয়ানক বিশ্বাস তিনি করেছিলেন তাদের, তাই শয্যাশায়ী হয়ে যন্ত্রটি ওদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায় ?

হালদার মশায় বারবার নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা কবতে লাগলেন, অন্যায়টা কোথায় তিনি করলেন ?

হঠাৎ একখানি মুখ ফুটে উঠল অন্ধকাবের মধ্যে। জল টলটল করছে দুটি চক্ষু, স্পষ্ট দেখতে পেলেন হালদার মশায়। মনে হল যেন, কানেও তিনি শুনতে পেলেন ছোট্ট একটি কথা, 'এস'। যেন তিনি চিনতে পারলেন একটু ঠোট-টেপা হাসি। হাসিটুকু যেন তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলে, হালদার, তোমার মনের মধ্যে কি লুকিয়ে আছে, তা আমি জানি। কি কথা তুমি বলতে চাও অথচ বলতে পার না। তাও আমি জানি। দীক্ষা দেওয়া, গুরু হওয়া এ সমস্ত শুধু অছিলা তোমার হালদার, নিজেকে তুমি ঠকাতে চেয়েছিলে, সেই ঠকাবার জন্যে একটা অছিলা চাই ত। ঐ ছুতোটুকু না পেলে রোজ তুমি ভোর রাতে আসতে কি করে আমার কাছে।

না না না না, কিছুকেই তা হতে পারে না। কংসারি হালদার মায়ের সেবায়েত, কংসারি হালদার মহাসাধকের শিষ্য, কংসারি হালদারের সামনে কেউ মুখ তুলে কথা বলতে পারে না। কংসারি হালদারের গুরুভাই বনমালী চক্রবর্তী, দ্বাদশ বছর পরে সিদ্ধি লাভ হবে তার। দ্বাদশ বছরের ন'বছর কেটে গেছে। এই কালীঘাটে সে আত্মগোপন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তিনটি বছর কাটলেই এমন মহাশক্তি লাভ করবে কংসারি হালদারের গুরুভাই বনমালী চক্রবর্তী, যে

সেই শক্তির প্রভাবে আবার এই মহাতীর্থ জেগে উঠবে। লোভ, পাপ আর ধর্ম-ব্যবসা লোপ পাবে কালীঘাট থেকে।

হালদার মশায় লোভে পড়ে ধর্ম ব্যবসা করতে চেয়েছেন, এতবড় কথা কার সাধ্য বলবে বলুক ত দেখি হালদার মশায়ের মুখের সামনে। জানে না ওরা, এখনও ভাল করে টের পায়নি যে, কি করতে পারেন কংসারি হালদার। সকালটা একবার হোক, আর একটিবার এই সর্বনেশে আঁধারটা ঘুচুক তাঁর চোখ থেকে। তখন তিনি দেখাবেন মজা। যেখানেই সে থাকুক, যত বড ভুল বুঝেই সে চলে যাক, গুরুর নাম নিয়ে ডাকলে সে ফিরবেই। বিনা অপরাধে কিছুতেই সে গুরু-ভাইকে ত্যাগ করে জন্মের শোধ চলে যেতে পারে না।

কিন্তু যদি সে একেবারে কালীঘাট ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে! যদি তাকে কোথাও খুঁজে না পাওয়া যায়!

হালদার মশায় তলিয়ে যেতে লাগলেন আবার নিবিড় অন্ধকারের অতল গহ্বরে। হয়ত সে গুরুর কৃপায় সবই জানতে পেরেছে, আর মনে মনে হেসে কংসারি হালদারকে ত্যাগ করে চলে গেছে চিরকালের মত। কিছুই অসম্ভব নয়।

তার মানে, আপনার বলতে আর একটি প্রাণীও রইল না হালদার মশায়ের কাছে। ছেলে, ছেলের বউ, পাড়াপড়শী, এরা কে? কেউ নয়, কোনও সম্বন্ধ নেই এদের সঙ্গে। একটি প্রাণীও জানে না কিভাবে তাঁর আর বনমালী চক্রবর্তীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ ঘটেছিল সেই মহাপুরুষের। এরা কি কেউ বিশ্বাস করবে যে, এই কালীঘাটের রাস্তায় ঘাটে গা-ময় কুষ্ঠ ব্যাধির ঘা বানিয়ে যারা পড়ে থাকে, ওদের মধ্যে শিবতুল্য মহাসাধকও আত্মগোপন করে থাকেন। কালীঘাটে মহা-নিশার অন্তে কত কি ঘটে, তার কতটুকু সংবাদ রাখে এরা। কংসারি হালদার আর, বনলালী চক্রবর্তী, মাত্র এই দুটি প্রাণী সেই দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। সারা রাত গুলির আড্ডায় কাটিয়ে বনমালী ফিরছিল ঘরে, হালদার মশাই অন্য এক নেশার টানে চলেছিলেন খালের ওপারে। মায়ের বাড়ীর নহবতখানার সামনে থেকে একটা কুষ্ঠরোগীকে গড়াতে গড়াতে রাস্তাটা পার হতে দেখলেন হালদার মশায়। ঘাটে যাবার রাস্তায় ঢুকে সটান সে উঠে দাঁড়াল, দিব্যি সুস্থ সবল মানুষের মত সোজা চলতে লাগল গঙ্গার দিকে। পেছন পেছন গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে অন্ধ-কারের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুজনে দেখেছিলেন, মানুষটা গঙ্গাগর্ভে গলা পর্যন্ত জলে নেমে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আঁজলা করে গঙ্গাজল তুলে কার উদ্দেশে অর্ঘ্য দিতে লাগল। তিনবার তিন আঁজলা জল অর্ঘ্য দেওয়া হল। আর প্রত্যেকবার সেই

জল গঙ্গায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

এই অবিশ্বাস্য কাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছিলেন হালদার মশায়, আর ঐ বনমালী ঠাকুর। গুলিখোর ডালাধরা একটা কালীঘাটের, এর বেশী কোনও পরিচয় নেই ঐ ঠাকুরের। কিন্তু সীমাহীন সাহস ওর, অসীম ভাগ্যের জোরও বটে। মহামানব গঙ্গা থেকে উঠতেই বনমালী তাঁর পাদপদ্মে আছড়ে পড়ল। দেখাদেখি সাহস হল হালদার মশায়েরও। তিনিও জড়িয়ে ধরলেন তাঁর দু পা। কৃপা করতেই হবে।

কৃপা তিনি করলেনও, করলেন ঐ বনমালীকেই। পুরুষানুক্রমে ওরা শক্তিসাধক, তাই ও কৃপা লাভ করলে তাঁর। কে জানত যে ঐ হাড়-হাবাতে ডালাধরার ঘরে অমন অমূল্য নিধি লুকনো আছে। অন্তর্যামী গুরু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন ওকে, "তোমার কাছে মহামায়ার যে যন্ত্রটি আছে, সেটি তুমি কার কাছে রেখে যাবে বাবা? তোমাদের ঐ জাগ্রত কুলদেবতার ভার কে নেবে? তোমার ছেলে যে একেবারে শিশু।"

বনমালী কি জবাব দেবে, ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল।

তখন তিনিই দয়া করে উপায় করে দিলেন। কংসারি হালদার ভার নেবে ঐ যন্ত্রের, কংসারি হালদারকে পূর্ণাভিষেক করে যেতে হবে। যতদিন না বনমালী ফেরে ততদিন কংসারি রক্ষা করবে ঐ যন্ত্র। সেই কাজই হবে হালদারেব সাধনা। বার বছর বনমালীকে সংসার ত্যাগ করে থাকতে হবে। বার বছর পবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে ফিরবে বনমালী, কংসারির কাছেই ফিরে আসবে। তখন কালীঘাট আবার জাগবে। মহাতীর্থের মহামহিমা তখন বিশ্বজগৎকে শান্তিব পথ দেখাবে। কালীঘাটের সমস্ত কলুষ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। একটি মাত্র শক্তি-সাধকের সাধনার ফলে মা আবার জেগে উঠবেন।

মস্তবড আশা। হালদার মশায় যন্ত্রটির ভার নিলেন। বনমালীব সংসারের ভারও তিনি নিতে চেয়েছিলেন। বনমালী রাজী হল না। প্রতিজ্ঞা করিয়ে গেল হালদার মশায়কে, তিনি কিছুতেই তার ছেলে মেয়ে স্ত্রীর খোঁজ খবর নিতে পারবেন না। গুরুর কৃপায় যদি তারা বাঁচে ত বাঁচবে। নয়ত তাদের বেঁচে দরকার নেই।

ছ' বছর পরে বনমালী ফিরে এসে শ্মশানে আশ্রয় নিলে। শেষ ছ'বছর শ্মশান বাস করতে হবে তাকে গুরুর আদেশে। এই কালীঘাটেই থাকতে হবে আত্ম-গোপন করে। শেষ ছ' বছরের আর তিনটি বছর বাকী।

সেই বনমালী এই ধারণা নিয়ে গেছে যে, গুরুভাই কংসারি হালদার তাকে ঠকিয়েছে। যন্ত্রটা ফেরত দিলে না। উঃ—

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন হালদার মশায়। আলো, আলো কই,? একটু ফিকে গোছের আলো, আবছা গোছের অন্ধকার, অন্তত সামান্য একটু ফুটো নিরেট নিরন্ধ্র নিকষ কালো পর্দাখানার গায়ে। কিছুই কি নেই, কোনওখানে কোথাও একটু ফাঁক নেই, যার ভেতর দিয়ে হালদার মশায় একটিবার একটু উঁকি দিতে পারেন।

হালদার মশায়ের প্রাণটা আনচান করতে লাগল। বালিশের ওপর অনবরত তিনি মাথা চালতে লাগলেন, অবুঝ শিশুর মত অস্থির হয়ে উঠলেন একেবারে।

ধনা পৌঁছল মায়ের বাড়ীর পুবে কুণ্ডের কিনারায়। এবার সে ফিরবে, আর সে এগতে পারে না। পাথরখানা না নিয়ে কোন্ মুখে গিয়ে সে দাঁড়াবে হালদার মশায়ের সামনে। কি জবাবই বা দেবে তাঁকে।

ফিরে দাঁড়াল ধনা। বললে, "এবার আপনি যান। সিধে চলে যান, গিয়ে বাঁ হাতি গলিতে ঢুকুন। ঐ গলি দিয়ে গেলেই—"

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, "তুমি যাবে না বাবা?"

মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল ধনা। কি উত্তর দেবে সে। ফিনকিকে খুঁজে না পেলে কি করে সে ফিরিয়ে দেবে সেই পাথরখানা!

হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে, কে ওখানে?"

চমকে উঠে ধনা জিজ্ঞাসা করলে, "কই? কাকে দেখলেন?"

"ঐ যে কুণ্ডের জল থেকে উঠে আসছে।"

এইবার ধনা দেখতে পেল। দেখল একজন উঠে আসছে কুণ্ডের ভেতর থেকে, স্পষ্ট দেখতে পেল, লোকটার দুহাতের ওপর আর একটা মানুষ। বুকের কাছে ধরে বয়ে আনছে, কাকে ও!

এ কি! কাউকে ডুবিয়ে মারতে এসেছে নাকি কেউ মায়ের কুণ্ডে?

চেঁচিয়ে উঠল ধনা, "কে-কে তুম? তুম কৌন হায়?"

জবাব নেই। লোকটা পালাবার জন্যে জোরে পা চালালে। এক লাফে তার সামনে পড়ে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল ধনা, "চোর চোর।"

তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে ঘুমন্ত কালীঘাট রৈ রৈ করে উঠল। দোকান-পাট ঘর-বাড়ীর ভেতর থেকেই মানুষে চেঁচাতে লাগল, "চোর চোর, ধর ধর, মার মার।" ধড়াধ্বড় আওয়াজ উঠল জানালা দরজা খোলার। চতুর্দিক থেকে দুপদাপ শব্দে ছুটে আ- ত লাগল সকলে। ভিখিরীগুলো তাদের

ফুটপাথ শয্যার ওপর উঠে বসে হাউ মাউ খাউ জুড়ে দিল। মায়ের মন্দিরের চুড়োর ওপর কালীঘাটের শান্ত স্নিগ্ধ উষা তেতে আগুন হয়ে উঠল।

যে পালাচ্ছিল সে ধপ করে বসে পড়ল ধনার পায়ের কাছে। যাকে সে বয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল তাকে কিন্তু ছাড়লে না। দুহাতে তাকে আঁকড়ে ধরে রইল নিজের বুকের সঙ্গে। কিছুতেই যেন কেউ কেড়ে নিতে না পারে তার বুকের ধন, এ জন্যে মাথা নিচু করে আড়াল দিয়ে রইল। ধনা যাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল হালদার বাড়ীতে তিনিও এক অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। ছুটে এসে দুহাত মেলে আগলে দাঁড়ালেন তাদের। পাছে লোকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ভয়েই বোধ হয় আড়াল করে দাঁড়ালেন।

রাস্তার আলো নিভে গেছে তখন, আকাশের আলোয় ভাল করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবু ধনা দেখতে পেলে মুখের পাশটা, লোকটার কাঁধের ওপরে পড়ে আছে মুখখানি। দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ধনা, দুহাতে ধরে ফেললে হাত দুখানি। প্রাণপণে আবার চেঁচিয়ে উঠল, "ফিনকি, ফিনকি।"

ততক্ষণে বহু মানুষ জমে গেছে চারিদিকে। ভাল করে ঘুমের ঘোরও বোধ হয় কাটেনি কারও। কি যে ঘটেছে চোখের সামনে, তার মাথামুণ্ডু বুঝতেই পারলে না কেউ। একটা মানুষ একটা মেয়েকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বসে আছে পথের মাঝখানে, আর একটা ছোঁড়া মেয়েটার হাত দুখানা ধরে মরীয়া হয়ে টানা-টানি করছে। মেয়েটা মরেছে কি বেঁচে আছে তাও বোঝার উপায় নেই।

চীৎকারের চোটে আকাশ বাতাস ফেটে যাবার যোগাড়। যার যা মুখে আসছে তাই বলে চেঁচাচ্ছে। আরও মানুষ ছুটে আসছে চারিদিক থেকে। যে যা হাতের কাছে পেয়েছে নিয়ে এসেছে। কিন্তু হাতের সুখ করার উপায় নেই কারও। সামনে ধনা, পেছনে তিনি, লোকে চোরটার কাছে পৌঁছতেই পারছে না। কাজেই শুধু ঠেলাঠেলি আর গুঁতোগুঁতি। কেউ কারও কথা শুনতেও পাচ্ছে না, শোনার দরকারও নেই। চোর যখন ধরা পড়েছে তখন আর কি। যে যত পার মনের সুখে গলা ফাটিয়ে চেঁচাও।

ইতিমধ্যে কোন্ ভেঁপো দমকল ডেকে ফেলেছে। দূরে কালীটেম্পল রোডের মোড়ে শোনা যাচ্ছে ঢং ঢং ঢং ঢং আওয়াজ। প্রাণ কাঁপান আওয়াজ তুলে ছুটে আসছে দমকল। দমকল পৌঁছবার আগেই পৌঁছে গেল পুলিসের দুখানা লরি। লাঠি হাতে লাফিয়ে পড়ল লরি দুটো থেকে দু তিন কুড়ি লাল পাগড়ি। সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেল দুখানা দমকল। ঢং ঢং ঢং ঢং প্রচণ্ড শব্দে সব রকমের চিৎকার গোলমাল ডুবে গেল।

কে কাকে থামাতে পারে। হকচকিয়ে গেছে সকলে। আগুন লাগল আবার কোথায়।

দমকলওয়ালারা বাজিয়েই চলেছে ঘণ্টা পথ সাফ করার জন্যে। পুলিস ভাবলে, নিশ্চয়ই লেগেছে আগুন ওধারে, ঐ খালের পারে কোথাও, নয়ত দমকল এল কেন। সুতরাং সর্বাগ্রে পথ করে দাও, দমকলের জন্যে, হটাও মানুষ, ভিড হটাও।

আরম্ভ হয়ে গেল পুলিসের আদি ও অকৃত্রিম হাতের খেলা। লাঠি আর লাল পাগড়ি চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষের ওপর। চক্ষের নিমেষে সাফ হয়ে গেল ভিড। বাড়ী-ঘর, মানুষের বুক সব কাঁপাতে কাঁপাতে দমকল দুখানা ছুটে চলে গেল পশ্চিম দিকে।

সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডর মধ্যে হুঁশ ফিরে পেলে ফিনকি। মাথাটা তুললে সে, তারপর লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে চোখ মেললে। চোখ মেলেই সে বুঝতে পারলে যে তার হাত দুখানায় ভয়ানক টান পড়ছে। পর মুহূর্তেই তার মনে হল যে কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। এতটুকু নডবারও তার শক্তি নেই।

আর যাবে কোথা চিল-চেঁচানি জুড়ে দিলে ফিনকি চোখ বুজে। হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মেয়েটা বেঁচে আছে তাহলে। চেঁচানির চোটেই বোধ হয় যে তাকে আঁকড়ে ধরে ছিল তার হাতের বাঁধন গেল আলগা হয়ে, কিন্তু কব্জির বাঁধন আলগা হল না। ফলে এক হেঁচকায় ফিনকি পৌঁছে গেল ধনার বুকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কব্জি ছেড়ে দিয়ে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলে ধনা। সেই মুহূর্তে একটিবার মুখ তুলে চেখে চেয়ে দেখতে পেলে ফিনকি ধনার মুখখানা। দেখেই ফিনকিও তাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরলে। চেঁচানি কিন্তু সে থামালে না। ধনার বুকে মুখ গুঁজে পরিত্রাহি চেঁচিয়েই যেতে লাগল।

চারিদিকে তখন পুলিস। অত জোড়া চোখের সামনে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে। ধনার দুচোখ দিয়ে আগুন ছুটছে। গলা ফাটিয়ে সে বলেই চলেছে এক কথা, "চোর, চোর। একে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল ঐ লোকটা।"

ওদের দুজনের পায়ের কাছে এক মাথা চুল, এক মুখ বিশ্রী গোঁফ দাড়ি, সর্বাঙ্গে ময়লা মাখা সেই লোকটা মাথা নিচু করে বসেই রইল। কিছুতেই সে আর মাথা তুলতে পারে না।

একজন অফিসার পুলিসের ব্যূহ ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পিছনে এলেন পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা চতুরানন চৌধুরী। হাকিম সাহেব ফিনকির দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই যে, এই যে সেই মেয়ে।" টপ

করে একবার মুখ তুলে হাকিমের মুখের দিকে তাকিয়েই ফিনকি আবার মুখটা গুজে ফেললে ধনার বুকে। যেন সে কোনও রকমে ধনার বুকের ভেতর লুকতে পারলে বাঁচে।

অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই যিনি আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন এতক্ষণ চোরটাকে, তিনি এক পা এগিয়ে এসে ধরে ফেললেন ফিনকির কাঁধটা। মিনতি করে বললেন ধনাকে, "ছেড়ে দাও বাবা এবার। এস ত মা আমার কাছে।"

ধনা ছেড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ, ফিনকিকে তিনি টেনে নিলেন নিজের বুকে। নিয়ে তাঁর গায়ের চাদর দিয়ে ঢেকে ফেললেন তাকে।

ব্যাপার দেখে চতুরানন চৌধুরী ঘাড় চুলকতে লাগলেন। অফিসার চড়া স্বরে হুকুম দিলেন, "এই, উঠাও ইস্‌কো।"

তৎক্ষণাৎ আরও কঠিন স্বরে আদেশ হল, "খবরদার কেউ ওঁর গায়ে হাত দেবেন না।" যিনি ফিনকিকে চাদর ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁর দিকে সকলের নজর গিয়ে পড়ল। তিনি তখন অনুনয় করে বলছেন, "উঠুন এবার আপনি, দয়া করে উঠে দাঁড়ান।" কারও মুখে একটি কথা নেই। লোকটা মাটিতে হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। ধনার মাথায় একখানা হাত রেখে অতি আশ্চর্য রকম শান্ত গলায় সে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কে বাবা? তোমায় ত চিনতে পারছি না। এ মেয়ে তোমার কে?"

কি উত্তর দেবে ধনা। ভয়ানক ভ্যাবাচাকা খেয়ে সে তাকাতে লাগল চারিদিকে। বোধ হয় আবার সটকাবার মতলবই এসে গেল তার মাথায়।

কিন্তু অত মানুষের মাঝখান থেকে সটকাবে কি করে সে। তাছাড়া ফিনকিকে ফেলে সটকান, তাই বা কি করে সম্ভব। যা ভয়ানক মেয়ে, আবার হয়ত গা ঢাকা দিয়ে বসবে।

ধনা তোতলাতে শুরু করলে।

"মানে ও হল এই মানে।"

হাকিম চতুরানান চৌধুরী চড়া স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ও তোমার কে হয়?"

আরও ঘাবড়ে গেল ধনা, তোতলানোও বন্ধ হয়ে গেল তার। করুণ চোখে সে তাকাল একবার ফিনকির দিকে। সেই মুহূর্তে ফিনকিও একবার মুখ তুলে তাকাল ধনার চোখের দিকে। সে চাউনিতে কি ছিল ধনাই জানে। মরীয়া হয়ে সে বলে বসল, "ও হল, এই যাকে বলে, পরিবার, আমার পরিবার।"

হো হো শব্দে হেসে উঠল সকলে। দাড়ি-গোঁফ সুদ্ধ সেই বিশ্রী লোকটাও হাসতে লাগল প্রাণখোলা হাসি। পুলিস অফিসারের ত আর বেশীক্ষণ হাসা চলে

না। তিনি লাগালেন এক প্রচণ্ড ধমক পাগলটাকে।

"এই, হাসছ যে? হাসছ কেন দাঁত বার করে? তুমি কে? পেলে কোথায় এই মেয়েটাকে?"

"আমি কে?" পাগলা আবার জুড়ে দিল হাসি। হাসতে হাসতে বলতে লাগল, "আমি কে? তা তো জানি না বাবা। তা জানে কংসারি হালদার। হালদার বলে দেবে, কে আমি। চল, নিয়ে চল আমাদের হালদারের কাছে। ঐ মেয়েটাকে আর বাবাজীকেও নিয়ে চল হালদারের কাছে, সে বলে দেবে, ওরা আমার কে হয়।"

চতুরানন তখন যেন আন্দাজ করতে পেরেছেন খানিকটা। হালদার মশায়ের নাম শুনে বেশ একটু নরমও হয়ে পড়লেন তিনি। বললেন, "হালদার মশায় চেনেন আপনাকে? বেশ, তাহলে চলুন, তাঁর কাছেই যাওয়া যাক।"

হালদার মশায় শান্ত হয়েছেন, বন্ধ হয়েছে তাঁর ছটফটানি। চোখ বুজে স্থির হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। চোখ মেলবার প্রয়োজনই তাঁর ফুরিয়ে গেছে। মেলাই থাকুক, বা বোজাই থাকুক, সবই এখন এক কথা! দিনই হোক বা রাতই হোক, কিছুতেই কিছু আর যায় আসে না হালদার মশায়ের। অন্ধের কিবা রাত, কিবা দিন, দুইই সমান।

বহুক্ষণ ঝড় ঝাপটা খাওয়ার পর একটা আশ্রয় পেলে কাক যেমন ভাবে ঠোঁট ফাঁক করে মুখ ওপর দিকে তুলে চুপ করে বসে থাকে, তেমনি দশা হয়েছে হালদার মশায়ের। বহুক্ষণ তিনি যুঝেছেন ঝড় ঝাপটার সঙ্গে, আশা নিরাশার প্রচণ্ড দুলুনিতে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল তাঁর। আলো-আঁধারের নির্মম নিষ্পেষণে তাঁর প্রত্যেকটি বুকের পাঁজরা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে বোধ হয়। এতক্ষণে মিলেছে পরিত্রাণ, এতটুকু আর সন্দেহের অবকাশ নেই। চরম জানাটা জেনে ফেলেছেন হালদার মশায়। জেনেছেন, অন্ধকার শুধু অন্ধকার। বিরামহীন অনন্ত অন্ধকার মাত্র সম্বল এখন। কোথাও কোনওখানে এক বিন্দু আলোর চিহ্নমাত্র নেই।

কাঁদছে সকলে। তপু, তারু, বৌমায়েরা সবাই নিঃশব্দে কাঁদছে তাঁর চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে। ওদের নিঃশব্দ কান্নার শব্দও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন হালদার মশায়। স্থির হয়ে শুয়ে তিনি শুনছেন ওদের নীরব কান্না। কান্নাই শুধু শুনছেন, শুধু কান্না ছাড়া আর কোনও কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না তিনি।

"ডেকে পাঠানো হয়েছে পঞ্চানন ভটচাযকে, বড় মিশ্র মশায়কেও ডাকতে পাঠানো হয়েছে। তারা আসছে, কংসারি হালদার ডাকছেন শুনলে তারা আসবেই। এলে পর হালদার মশায় সব কথা খুলে বলবেন সকলের সামনে। এতটুকু কিছু রেখে-ঢেকে বলবেন না। তখন সকলে জানতে পারবে কংসারি হালদারের আসল রূপটা। সারা কালীঘাটের মানুষ কখনও মুখ তুলে কথা কইতে পারেনি তাঁর সামনে। যমের মত ভয় করেছে সকলে তাঁকে। এতকাল সকলে জেনেছে যে, এতটুকু অন্যায্য অন্যায়, তিলমাত্র ছ্যাঁচড়ামি ভণ্ডামি, বিশেষত ধর্মের নামে ব্যবসাদারি কংসারি হালদার মশায়ের সামনে চলবে না। সবাই জানে, মায়ের বাড়ী থেকে বহু পাপ দূর হয়েছে কংসারি হালদারের জন্যে। এই একটি মানুষের সদা-সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না বলে মায়ের বাড়ীর মধ্যে টানা-হেঁচড়ান, জোর-জুলুম করা, বা মেয়েমানুষের গা ছোঁয়ার কোন উপায ছিল না কারও। নেশা করে মায়ের বাড়ীতে কেউ ঢুকেছে, টের পেলে হালদার মশায় তাকে পুকুরে চোবাবার ব্যবস্থা করতেন। অত্যাচার, নির্দয় হয়ে শুধু অত্যাচারই চালিয়ে গেছেন জীবনভোর কংসারি হালদার, কালীঘাটের মায়ের বাড়ী চেটে যারা কোনও রকমে বেঁচে আছে তাদের ওপর। মুখ বুজে সকলে সহ্যও করছে তাঁর অত্যাচার। এবার তারা প্রতিশোধ নেবে। এতকাল পবে সকলে জানবে যে, কংসারি হালদারের চেয়ে পাপী আর একটিও নেই কালীঘাটে। টাকার জন্যে লোকটা যা করেছে তা করার সাহস আর একটি প্রাণীরও নেই কালীঘাটের ত্রিসীমানার মধ্যে।

তখন আর এরা কাঁদবে না। তপু, তারু, বৌমায়েরা আর চোখের জল ফেলবে না তখন। তখন ওরা ওদেব মুখ লুকবে কোথায় তাই ভেবে পাবে না।

তারপর কান্না, শুধু কান্না, নিরবচ্ছিন্ন কান্নাই শুধু শুনবেন হালদাব মশায়। কান্নাটা শুনতে পাবেন তাঁর বুকের ভিতর থেকে। কান্নার সমুদ্র ফুঁসিয়ে উঠবে তাঁর বুকের মধ্যে। কিছুতেই সেই কান্নার ঢেউ থামানো যাবে না।

প্রাণপণে নিজেকে নিজে সামলে রাখলেন হালদার মশায়। আঃ এই সঙ্গে যদি শোনার ক্ষমতাটুকুও লোপ পেত। যদি কেউ দয়া করে তাঁর কান দুটো কোনও রকমে বুজিয়ে বন্ধ করে দিত!

তাহলে অন্তত তিনি কান্না শোনার দায় থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচতেন।

হালদার মশায় ডুব দেবার চেষ্টা করলেন নিজের মধ্যে। ডুবে তিনি এড়িয়ে যেতে চান, কান্না, কান্নাকে তিনি ফাঁকি দিতে চান নিজের মধ্যে নিজে তলিয়ে গিয়ে।"

অসম্ভব, আরও অসম্ভব। কান্না তখন নিবিড় কালোরূপ ধরে তাঁর অন্ধ চোখের অন্ধদৃষ্টি জুড়ে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হাসতে লাগল।

সভয়ে বোজা চোখ আরও জোরে বুজে রইলেন হালদার মশায়। জোরে, আরও জোরে, অন্তিম চেষ্টায় তিনি তাঁর অন্ধ চোখের দৃষ্টিশক্তিটুকুকে পিশে মারতে চাইলেন।

উপায় নেই, কোনও উপায় নেই। যতই তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন কিছু না দেখবার জন্যে, ততই সেই কালোরূপ স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট, একেবারে জাজ্বল্যমান স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তাঁর বুকের মধ্যে। চেয়ে রইলেন হালদার মশায় সেই নিবিড় কালো কান্নার দিকে। অসহায় ভাবে চেয়েই রইলেন।

চেয়ে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত যা চাইছিলেন তিনি, তাই পেলেন! শোনার দায় থেকেও অব্যাহতি পেলেন। দেখারও কিছু নেই, শোনারও কিছু নেই, একদম কোথাও কিছু নেই। শুধু আছে একটা অনুভূতি, যেমন শীত বা গ্রীষ্ম। দেখাও যায় না, শোনাও যায় না; কিন্তু বোঝা যায় যে শীত করছে বা গরম হচ্ছে। তেমনি হালদার মশায় বুঝতে পারলেন যে কান্না রয়েছে। কালো কান্না, নীরব কান্না, রূপহীন বর্ণহীন বোবা কান্না। যা শোনাও যায় না, বোঝাও যায় না, শুধু মর্মে মর্মে অনুভব করা যায়।

সে কান্নায় শোক নেই, দুঃখ নেই, হা-হুতাশ নেই, জ্বালাযন্ত্রণাও নেই। সে কান্নায় প্রাণ নেই, মন নেই, হৃদয় নেই, রাগহিংসাও নেই। সে কান্নায় কারও করুণা উদ্রেক করবে না, কারও মন টলবে না, কারও হৃদয় গলবে না। হালদার মশায় পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই নির্দ্বন্দ্ব কান্নার মাঝে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। তাঁর বুকের জ্বালা জুড়িয়ে গেল সেই কালো কান্নার সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে। বহুকাল পরে তিনি নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে কারও হাতে সঁপে দিতে পেরে শান্তি পেলেন। একেবারে ভাবনা চিন্তা শূন্য হয়ে গেল তাঁর মন, ব[illegible] বোঝা নিঃশেষ হয়ে নেমে গেল। একদম নিঃসঙ্গ হওয়ায় যে এত শোয়া[illegible], তা তিনি কখনও জানতে পারেননি জীবনে। নিঃসঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতখানি যে নিঃশঙ্ক হওয়া যায় তা টের পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

কতক্ষণ যে এ অবস্থায় কাটল তাঁর তাও তিনি টের পেলেন না, সময়টাও যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হালদার মশায়ের মনে হল যে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও কোথায় মিলিয়ে গেছে, এমন কি তিনি নিজেও নেই। আছে শুধু নিবিড় নিঃসঙ্গ অন্ধকার। অন্ধকারও তাকে বলা ভুল, বলা উচিত শুধু কালোই আছে, কালোর অন্তরের মধ্যে যে কালো থাকে সেই অনাবিল কালো ছাড়া কোথাও আর কিছু নেই।

তারপর এক সময় সেই কালো কান্নার বুকে ধ্বনি ফুটে উঠল—

"আমি তাই কালোরূপ ভালবাসি"

খুব ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে আবার চেতনার রাজ্যে ফিরে আসতে লাগলেন হালদার মশায়। একটু একটু করে বুঝতে লাগলেন শব্দগুলো—

"আমি তাই কালোরূপ ভালবাসি।
জগ-মনমোহিনী এলোকেশী।
ভালবাসি॥"

ভুল শুনছেন না ত।

হালদার মশায়ের মনে হল, শোনাটা তাঁর মনের ভুল। গাইছে না কেউ ও গান। কে গাইবে এই নিবিড় কালো অন্ধকারের মাঝে। তবু তিনি শুনতে লাগলেন প্রাণ-মন দিয়ে—

"আমি তাই কালোরূপ ভালবাসি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব—
কালোরূপ তার হৃদয়বাসী,
কালোবরণ—"

এ কি। কালো কান্নার বুকে ভাষা ফুটল নাকি।

হালদার মশায়ের মনে হল, কান্নাব ভাষাটা যেন এবার একটু একটু তিনি বুঝতে পারছেন।

"যিনি দেবের দেব মহাদেব
কালোরূপ তার হৃদয়বাসী
কালোবরণ
ব্রজের জীবন
ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
ভালবাসি।
আমি তাই কালোরূপ ভালবাসি॥"

গলাটাও চিনতে পারছেন যেন হালদার মশায়। না না, তা হতেই পারে না। কিছুতেই তা হতে পারে না। কোথা থেকে আসবে সে এখানে? কেন সে আসবে? সবই ত সে বুঝতে পেরেছে, কিছুই ত লুকনো যায়নি তার কাছে। সে জেনে গেছে যে, কংসারি হালদারের ভেতরে কালো ছাড়া অন্য কিছু নেই। কংসারি তাকে ঠকিয়েছে। তাই সে চলে গেছে চিরকালের মত কংসারিকে ছেড়ে। সে আসবে কোথা থেকে এখানে, এই অন্ধকার কান্নার মধ্যে মরতে?

তবু শুনতে লাগলেন হালদার মশায়—

"হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী
বাঁশী ত্যাজে করে অসি,
প্রসাদ ভনে
অভেদ জ্ঞানে
কালোরূপের মেশামেশি।
ভালবাসি।
আমি তাই কালোরূপ ভালবাসি।
শ্যামা মনমোহিনী এলোকেশী।
ভালবাসি॥"

গান শেষ হবার আগেই চোখ মেললেন হালদার মশায়।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠলেন।

এ কি। আলো যে। আলো, আলো, আলো আবার আলো যে রে! আলো যে।

আলোর মাঝে ফুটে রয়েছে দাড়ি গোঁফ শুদ্ধ মুখ একটা, বনমালীর মুখ। বনমালী তাঁর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে গাইছে—

"হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী"

হালদার মশায় মাথা ঘুরিয়ে একে একে সকলের মুখের দিকে তাকালেন। সকলেই এসেছে আবার, আসতে বাকী নেই আর কেউ। ভটচায এসে দাঁড়িয়েছে শিয়রে, এক মনে জপ করে চলেছে ইষ্টমন্ত্র, বড মিশ্র মশাই দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে তারকব্রহ্ম নাম আওড়াচ্ছেন। ছেলেরা, বৌমায়েরা রয়েছে পায়ের দিকে, ওরা কাঁদছে। ওদের চোখে সত্যিই জল। আরে, নাতি নাতনী-গুলোও এসেছে যে। ওরা যে সাহস করে ঢুকল তাঁর ঘরে কাঁদছে না কেউ, মহা-অপরাধীর মত মুখ কাঁচুমাচু করে দাড়িয়ে আছে।

আর ওটা কে। সেই ফিনকিটা নয়। আর ওর ওধারে ও কে।

হালদার মশায় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ফিনকির দিকে। ফিনকিকে সামনে নিয়ে যিনি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন হালদার মশায়। চোখ আর ফেরাতে পারলেন না।

বনমালী ঠাকুর ফিসফিস করে বলতে লাগল, "কি দেখে এলে হালদার?

এতক্ষণ ধরে চোখ বুজে কি দেখলে তুমি ? কালো ছাড়া আর কিছু দেখতে পেয়েছ কোথাও ? বল, হালদার, বল, কি দেখে এলে তুমি।"

অতি কষ্টে একখানি হাত উঠিয়ে বনমালীর গায়ের ওপর রাখলেন হালদার মশায়। অতি কষ্টে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, "না বনমালী, কালো ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।"

নিস্তব্ধ ঘরে আর কারও মুখে কোনও কথা নেই, শুধু অস্পষ্ট শোনা যেতে লাগল বড় মিশ্র মশায়ের মুখে তারকব্রহ্ম নাম।

শেষে চতুরানন চৌধুরী এগিয়ে গেলেন। দু-পা সামনে এসে হালদার মশায়ের নজরে পড়লেন তিনি। তাঁর চোখের সঙ্গে হালদার মশায়ের চোখ মিলতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন কাকা ? একটু ভাল বোধ করছেন ত ?"

"কে ! চতুর, তুমি এত সকালে—।" হালদার মশায় বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

"আপনাকে দেখতে এলাম কাকা। আমি জানতাম না যে আপনার এত বড় অসুখ। এই এঁরা সকলে আসছিলেন আপনার কাছে, আমিও সঙ্গে এলাম।" চতুরানন চৌধুরী আর কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

বনমালী ঠাকুর তৎক্ষণাৎ শুধরে দিলে কথাটা।

"না না হালদার, শুধু তোমায় দেখতেই আসেননি ইনি। এসেছেন আমার পরিচয়টা জানার জন্যে। আমি পালাচ্ছিলাম মেয়ে চুরি করে, হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছি।"

হালদার মশায় আরও আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

"মেয়ে চুরি ! কার মেয়ে ?"

"ঐ ত দাঁড়িয়ে রয়েছে ওধারে। ঐ যে।"

বনমালী ঠাকুর ফিনকিকে দেখিয়ে দিলেন।

"ও মেয়ে ত তোমার। ওকে চুরি করলে কোথা থেকে। ধরলেই বা তোমায় কে ?"

"ধরলেন ঐ উনি, ঐ যে এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবাজী। উনি ধরলেন, সকলের মুখের ওপর বলে ফেললেন যে ওঁর পরিবারকে চুরি করে নিয়ে আমি পালাচ্ছিলাম। তাই এঁরা জানতে এসেছেন আমার পরিচয়।"

কিছুই না বুঝতে পেরে হালদার মশায় ধনাকেই ডাকলেন কাছে, "এধারে আয় ত বাবা, বল্ ত কি হয়েছে ? ওই মেয়েটার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছে নাকি ?"

ধনা সামনে এসে দাঁড়িয়ে ঘাড় চুলকতে লাগল। মুখ সে তুলতেই পারলে না, কাজেই জবাব দেবে কি করে।

তখন ফিনকিকে ধরে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, "ওই ছেলে আমাকে নিয়ে আসছিল এখানে। মায়ের কুণ্ডের ধারে আমরা দেখতে পেলাম, এই মেয়েটাকে কাঁধে করে উনি উঠে আসছেন কুণ্ড থেকে। মেয়েটার তখন হুঁশ নেই।"

চতুরানন বলে উঠলেন, "সেই ত হচ্ছে কথা। মেয়েটাকে আনলে কে আমার বাড়ী থেকে। রাত বারটা একটা পর্যন্ত জ্বরে বেহুঁশ ছিল ও, রাত একটার পর আমি শুতে গেছি। জ্বরটা তখন কমে আসছিল। একটা ঝি ছিল ওর কাছে। ঝি-টা ভোরবেলা চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। উঠে দেখি, মেয়ে নেই। তখনই থানায় জানালাম, তারপর কুণ্ডের ধারে গোলমাল হচ্ছে শুনে এসে দেখি, ইনি ধরা পড়েছেন ঐ মেয়ে নিয়ে।"

ধনা এতক্ষণে কথা বলার ফাঁক পেলে। তোতলাতে তোতলাতে বললে, "মানে আমি এই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম কি না ওকে। ও যে পালিয়েছিল ওদের বাড়ী থেকে। আর আপনার সেই পাথরখানা আমি রাখতে দিয়েছিলাম কিনা ওর কাছে, তাই—"

হালদার মশায় খপ করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন ধনাকে। ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় সেই পাথরখানা? দে ত বাবা, দে ত আমায় সেটা। সে পাথর যার জিনিস তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই আমি।"

ধনা তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে দিলে ফিনকিকে।

"ঐ ওর কাছে জমা দিয়েছি হালদার মশায়। মানে, মনে করেছিলুম, এক ফাঁকে সেটা নিয়ে গিয়ে খালের ওপারে দিয়ে আসব। তা ও যে সটকাবে বাড়ী থেকে তা তো—"

ফিনকি ঝাঁ করে মুখ তুলে বলে ফেললে, "হাড় মিথ্যুক কোথাকার। কিচ্ছু বলেনি ও আমাকে হালদার মশায়। টপ করে পাথরখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সরে পড়ল।"

হাসির ধুম পড়ে গেল ঘরের ভেতর। একটু আগে যেখানে শোকের গুমটে সকলের দম বন্ধ হওয়ার যোগাড় হয়েছিল, সেখানে শান্তির শীতল হাওয়ায় সবাই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। স্বয়ং হালদার মশায়ও হেসে ফেললেন।

ঘরের বাইরে আবার গোলমাল শোনা গেল। কে যেন বলছে, "হাঁ, এই ঘরেই আছে সে মেয়ে। যে চুরি করেছিল মেয়েটাকে সেও ধরা পড়েছে।"

আর একজন হেঁড়ে গলায় বলতে লাগল, "আরে বাব্বা, মেয়ে নিয়ে পালাবে কোথায় বাছাধন। আমার নাম পরাণকেষ্ট গুঁই, আমার লোকের গায়ে হাত

দেওয়া, আমার লোককে বেইজ্জত করা, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজাটা।"

হুড়মুড় করে অনেক লোক ঢুকে পড়ল ঘরে। ফিনকির মা ছুটে এসে দুহাতে জাপটে ধরলেন মেয়েকে। বুক ফাটা একটা আর্তনাদ শোনা গেল, "ফিনকি রে, কি করে তুই তোর মাকে ছেড়ে পালিয়ে এলি।"

ফণাও দৌড়ে এসে ধরে ফেললে বোনের হাত একখানা। একটি কথাও কইতে পারলে না সে। সবাই দেখলে বোনের হাত-ধরা হাতখানা তার ঠকঠক করে কাঁপছে।

আড়তদার পরাণকেষ্ট কাজের মানুষ। তিনি কাজের কথাই বলতে লাগলেন বার বার, "দারোগা সাহেব কই? গেলেন কোথা জমাদার সাহেব? সাবধান, চোরটা যেন না পালায়। হাতেনাতে ধরা পড়েছে বাছাধন, কিছুতেই ছাড়া হবে না। এ শালা হাড়নচ্ছারের স্থান কালীঘাট। মান-ইজ্জত নিয়ে ঘর করতে পারে না কেউ এখানে। এবারে দেখাচ্ছি মজা, আমার নাম পরাণকেষ্ট গুঁই, আমার সঙ্গে—"

হঠাৎ ধনা খেপে গেল একেবারে। এক লাফে ফিনকির কাছে গিয়ে সে তার আর একখানা হাত ধরে ফেললে। নিছক অপরাধীর আকুল আকুতি ফুটে উঠল তার গলায়।

"এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি গালছি, মাইরি আর ছোট কাজ করব না কখনও। পাথরখানা ফেরত দিয়ে যাও, নয়ত হালদার মশায আমাকে মেরে ফেলবে।"

ফিনকিও গেল খেপে। এক ধমক লাগিয়ে দিলে সে, "চুপ চোর কোথাকার। কিসের জন্যে মরতে দিতে গেলে আমার হাতে পাথরখানা?"

আবার হেসে উঠল অনেকে। তাতে ফিনকি আরও রেগে গেল। সে ভাবলে, তাকেও সকলে ধনার মত চোর মনে করছে। চিৎকার করে উঠল সে, "কেন আমায় সকলে চোর মনে করবে তোমার জন্যে? কেন—?"

রাগের চোটে ফিনকির বাক্-রোধ হয়ে গেল। আর কিছুই বলতে পারলে না সে, তার দুই চোখ থেকে আগুন ছুটছে তখন। হাতখানা কিন্তু তখনও ধরাই রয়েছে ধনার হাতে, ধনা তার হাতখানি দুহাতে আঁকড়ে ধরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

হালদার মশায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে ধনাকে বললেন, "ঠিক কাজই তুই করেছিস বাবা। যাকে দেবার তার হাতেই দিয়েছিস সে জিনিস। আমারই মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। যাক, এখন বনমালী, তোমার মেয়ের কাছ থেকে

তুমি নাও তোমাদের কুলদেবতা।"

ফণা ফিনকি, ফিনকির মা এক সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে তাকাল বনমালী ঠাকুরের দিকে। ফিনকির মা একবার হাঁ করলেন কিছু বলবার জন্যেই বোধহয়। বলতে কিছুই পারলেন না, চোখ বুজে মুখ গুঁজড়ে বসে পড়লেন ছেলেমেয়ের পায়ের কাছে।

বনমালী ঠাকুর ফিরেও তাকাল না সেদিকে। হালদার মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, "পাথর হালদার, স্রেফ একটুকরো পাথর। ওতে প্রাণ নেই, হৃদয় নেই, কিচ্ছু নেই। ওই পাথরের টুকরোয আব আমার কোনও দরকার নেই। তুমি মরতে বসেছ শু·· কাল যখন ওই জিনিসটার জন্যে তোমার কাছে এসেছিলাম, তখন আমাবও মতিচ্ছন্ন হযেছিল। এক বোঝা নোড়ানুড়ি, ইট-পাটকেল সর্বাঙ্গে ঝুলিযে বযে মরছিলাম, তাই ওই-পাথবের টুকরোটার মায়া ছাড়তেও প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল। আজ দেখ, সব বিসর্জন দিয়ে এসেছি। শেষ রাতে ঝাড়া হাত পা নিযে সবে পড়ছি কালীঘাট থেকে, পেছনে এসে আছড়ে পড়ল ঐ মেয়ে। ব্যস, সব মতলব ভেস্তে গেল। ওর মুখখানা রাস্তার আলোয় ভাল করে দেখে কোনও কিছু মনে রইল না আব তখন। তুলে নিয়ে কুণ্ডের ধারে এলাম, ওর মুখে চোখে জল দেবার জন্যে। ধবা পড়ে গেলাম, আর আশ্চর্য ব্যাপার কি জান হালদার, জ্ঞান হতে মেয়েটা জোব করে আমাব বুক থেকে ছিটকে গিয়ে তুহাতে আকড়ে ধরলে ঐ ও-কে। তখন ঐ ছেলে ঐ মেযেকে তুহাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচাতে লাগল, 'চোর, এই লোকটা একে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে।' অত লোকের মুখের ওপব জোর গলায বলে ফেললে, 'ও আমার পরিবার।' তখন যদি ওর মুখ চোখের অবস্থা দেখতে হালদার। নিজের পরিবারের মান-ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে ও হন্যে হযে উঠেছে তখন। আসল ব্যাপারটা আমার চোখে ধবা পড়েছে হালদার। পাথরে আব আমার কোনও দরকার নেই। আমি দেখতে পেযেছি ওদের, ওরা জন্মেছে, ওরা ব[illegible] হচ্ছে, ওরা ওদের নিজেদের মান-ইজ্জত বাঁচাতে জানে। কোনও ঢাক ঢাক গুড়গুড়ের পরোয়া করে না ওরা। যদি কোনও দিন এই পীথের উদ্ধার হয ত ওদের হাত দিয়েই তা হবে। গুপ্ত সাধন-ভজন সিদ্ধিলাভ এই সব গোঁজামিলের পথে কোনও কালে কালীঘাটের কালীকে জাগানো যাবে না, যদি ইচ্ছে হয, বিশ্বাস করতে পার, চৈতন্যস্বরূপা আদ্যাশক্তি জেগে উঠেছেন ওদের বুকে। কারণ লুকিয়ে কোনও কিছু করার ওদের গরজ নেই কিনা।"

চতুরানন চৌধুরী আর থাকতে পারলেন না। নিচু হয়ে বনমালী ঠাকুরের দু পা জড়িয়ে ধরলেন। বাব বাব বলতে লাগলেন, "এই কথাই আপনি শোনান

ঠাকুর, এই কথাই মানুষ শুনতে চায় আজ। কালীঘাটের এই হতচ্ছাড়া মানুষ-গুলোকে আপনি ঐ কথাই শোনান ঠাকুর যে, মা কালী সকলের বুকের মধ্যে রয়েছেন। বুকের মধ্যে তিনি জাগলেই সকলের সব দুঃখ ঘুচবে। তখন আর কাউকে ডালা হাতে নিয়ে পোড়া পেটের দায়ে হন্যে কুকুরের মত ছুটে মরতে হবে না।"

আড়তদার পরাণকেষ্ট অতশত কিছুই বুঝলে না। মাঝখান থেকে সে বলে বসল, "মা কালীর দায় পড়েছে আমাদের দুঃখ কষ্ট ঘোচাবার জন্যে। মার যেন চোখ নেই, মা যেন দেখতে পায় না যে, আমরা তাঁর চোখ তিনটেকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে ছাপিয়ে একশ রকম মজা লোটবার ফন্দি আঁটছি মনে মনে। আর মুখে বলছি, 'মা একবার চোখ তুলে চাও গো। একবার চাও চোখ খুলে আর একবার অন্ধ হয়ে থাক চোখ বুজে, যখন যেমন দরকার হবে আমাদের।' আ-হা-হা, আধিক্যেতা দেখ না। চল গো মা ঠাকরুন, নাও ওঠ। নে রে ফণা, বোনাইটাকেও পাকড়ে নিয়ে চল। সামনের একটা ভাল দিন দেখে সাতটা পাক ঘুরিয়ে দিলে হবেখন।"

এক ঝটকায় ধনা আর ফণার হাত থেকে নিজের দুখানা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফিনকি ছুটে এসে জাপটে ধরল তার বাপকে।

বনমালী ঠাকুর চোখ বুজে নিঃশব্দে মেয়ের রুক্ষ মাথায় হাত বুলতে লাগল।

একে একে প্রায় সকলেই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। হাকিম সাহেব পুলিস অফিসারকে নিয়ে চলে গেলেন। তাঁদের যা জানাব ছিল, জানা হয়ে গেছে। যাদের মেয়ে, তারাই ফিরে পেয়েছে মেয়েকে। সুতরাং বে-আইনী কিছু হয়নি। মেয়ে ফিরে পেয়ে মেয়ের মাও চলে গেলেন ছেলে মেয়ে নিয়ে। আড়তদার পরাণকেষ্ট হবু জামাইটিকেও রেখে গেল না। ধনাকেও তিনি কাজকর্ম শেখাবেন তাঁর আড়তে। সাইকেলের দোকান আর তাকে খুঁজে বার করতে হবে না। বনমালী ঠাকুরও চলে গেল, কারণ মেয়ে ফিনকি বাপকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজী হল না। তপু তারু, বৌমায়েরা ছেলেমেয়ে নিয়ে নিচে চলে গেল, তাদের সংসার আছে। তাছাড়া বাপের কাছে ঠায় পাহারা দেবার দরকারও আর নেই। পঞ্চানন ভটচায স্পষ্ট করে বলেই ফেললেন সেই কথা। বললেন, "আর ভাবনা কি গো তোমাদের। এবার তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘর সংসার সামলাওগে যাও। যাঁর দায় তিনিই যখন এসে পড়েছেন তখন আর ভাবনা কি।"

সুতরাং যার দায় তাঁকেই এবার কথা বলতে হল। এতক্ষণ তিনি মুখ টিপে একধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এক পা এগিয়ে এসে বৌমায়েদের বললেন, "হ্যাঁ মা, তোমরা যাও এখন। ছেলেপুলেদের নাওয়ানো খাওয়ানোর ব্যবস্থা কর গে।"

ত্রিপুরারি হালদার একান্ত কৃতার্থ হয়ে বললে, "কাল যদি আপনি আসতেন মাসীমা, কি অবস্থাতেই কাটছে আমাদের কাল থেকে।"

তারকারি বললে, "কালই ত আমি বললাম, ওঁকে নিয়ে আসিগে। তা তোমরা বাবার ভয়ে রাজী হলে না যে।"

ওরা সব বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাপের ভার যার হাতে দেওয়া উচিত, তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। যাবার আগে বৌমায়েরা নিচু গলায় বলে গেল, একটু পরে আপনিও নিচে আসুন মাসীমা। স্নান আহ্নিক সেরে জল মুখে দিয়ে আবার আসবেন।"

সবই শুনলেন কংসারি হালদার মশাই, চোখ পিটপিট করে চেয়েও দেখলেন সব কিছু। তারপর তিনি চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন, কোথায় লুকাবেন তাঁর মুখখানা।

এ কি হল! ওকে এরা চিনলেই বা কেমন করে! ওই বা কেন এল এখানে! লজ্জা শরম ভয় ডর সব বিসর্জন দিয়েছে নাকি একেবারে?

চোখ বুজেই একান্ত কুণ্ঠিত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার কি হবে তাহলে?"

যাঁর দায় তিনিই জবাব দিলেন। অকপট সহজ সুরে বললেন, "হবে আবার কি? এবার আমরা কোনও তীর্থস্থানে চলে যাব। যেখানে গেলে শরীর মন ভাল থাকবে, এমন কোনও ভাল জায়গায় চলে যাব আমরা। কিছুদিন শান্তিতে থাকলেই আবার উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবে তুমি। আজই আমি বলছি ছেলেদের, যাবার ব্যবস্থা করতে। এখন যত তাড়াতাড়ি হয়, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই ভাল।"

হালদার মশায়ের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "কিন্তু সেই লোকটা—"

একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি বললেন, "সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। আমার তপু তারুর মত দুই ছেলে আছে, আমাকে আর কেউ জ্বালাতে সাহস করবে না।"

বড় মিশ্র মশাই এক কোণায় বসে নাম করছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি কথা বললেন। কথা বলতে গেলেই তাঁর মাথাটা দুপাশে দুলতে থাকে আর গলাটা ভয়ানক কাঁপে। বেশীক্ষণ চালাতেও পারেন না তিনি কথা, কাশি শুরু হয়ে যায়।

গলা কাঁপিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "তাই যাও মা, কাঁসারীকে নিয়ে তুমি চলে যাও কোথাও। যেখানে গেলে ও সুস্থ হয়, সেখানে নিয়ে যাও ওকে। কাঁসারী আমাদের ভাল আছে, উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে, এটুকু জানতে পারলেই আমাদের শান্তি। আমার চেয়ে ও অনেক ছোট মা, ঢের ছোট। তবু ও আগে পড়ল আর আমি এখনও চলে ফিরে বেড়াচ্ছি।"

মিশ্র মশায়ের কাশি আরম্ভ হয়ে গেল।

হালদার মশায় আবার বলে ফেললেন, "আপনারা সকলেই চেনেন না কি ওকে!" পঞ্চানন ভটচায হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "চিরকালটাই তোমার একভাবে কাটল কাঁসারী। কোনও কালে কিছু তুমি চোখেও দেখতে পেলে না, কানেও শুনতে পেলে না। কখনও কারও এতটুকু খবর রাখার গরজ ছিল না তোমার, যে তুমি কিছু দেখতে শুনতে পাবে। ওঁকে চেনে না কে এখানে? ঠেকে ওঁর দরজায় গিয়ে হাত পাতেনি এমন কেউ আছে না কি কালীঘাটে? পালপার্বণে কালীঘাট সুদ্ধ বামুনকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে উনি বিদেয় দিয়েছেন। ওই যে হতভাগা ডালাধরাগুলো, কবে ওরা লোপ পেত কালীঘাটের মাটি থেকে যদি উনি বুক দিয়ে আড়াল করে ওদের না বাঁচাতেন। কবে একবার নাকি তুমি ওঁর সামনে বলেছিলে যে, কালীঘাটের মানুষের হাড়ির হাল ঘোচানই তোমার স্বপ্ন। সে স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে তোমার ঐ শিষ্যাণী প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তুমি ত কিছুতেই কিছু দেখবে না চোখ চেয়ে। কংসারি হালদারের মুখের সামনে চোখ তুলে কেউ কথা কইতে পারে না, এই গর্বে অন্ধ হয়ে থেকেছ তুমি চিরকাল। আর স্বপ্ন দেখেছ, একদিন তোমার ঐ মা কালী চার হাতে সবায়ের দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন। কস্মিন কালেও তা হবে না হালদার, মার চারটে হাতই যে জোড়া। তাই তিনি যা করার তা মানুষের হাত দিয়েই করান।"

বড মিশ্র মশায় সামলেছেন তখন কাশি। বললেন, "অত কষ্ট করতেই বা যাবেন কেন মা কালী? সব কাজই কি আমরা মা কালীর সঙ্গে পরামর্শ করে করি, যে মা আমাদের সব কিছু সামলে দেবেন? মা স্পষ্ট জানতে, দেখতে পাচ্ছেন, যে কত কিছু আমরা তাঁকে লুকিয়ে করি। কাজেই তিনি চোখ বুজে আছেন আমাদের দিকে আর কখনও চোখ তুলে চাইবেন না। কি বল গো মা ঠাকরুন?"

মা ঠাকরুনকে আবার মুখ খুলতে হল। বললেন, "না না, তা হবে কেন মিশ্র মশায়। আমরা হলাম সন্তান, আমরা হাজারবার অন্যায় করতে পারি ভুল করতে

পারি। ওই ত আমাদের স্বভাব। তার জন্যে মা কি কখনও মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারেন। তাহলে মায়ের দয়াময়ী নামই যে মিথ্যে হয়ে যায়। মা যা করবার ঠিকই করছেন। ঐ তপু, তারু, ফণা ফিনকি ধনা ওদের বুকে মা জেগে উঠেছেন যা করবার, ওরাই করবে এবার। লুকিয়ে করার মত কোনও কাজ ওরা করতে পারবে না, কাজেই ওদের দিকে নজর রাখতে মায়ের কষ্ট হবে না।

কলি ৄ কালীঘাট।

আদ্যাশক্তি মহামায়ার মহাপীঠ।

ভাগীরথীর কূলে একদা ছিল সেই মহাতীর্থ। তখন কালীঘাটের ঘাটে জোয়ার-ভাঁটা খেলত, আমাবস্যা পূর্ণিমায় পাহাড়-প্রমাণ উঁচু হয়ে বান ডাকত, দেশ বিদেশ থেকে পালতোলা জাহাজ এসে ভিড়ত।

অদ্ভুত সাজপোশাক পরা বোম্বেটেরা নামত সেই সব জাহাজ থেকে কালীঘাটের তটে। দেশ বিদেশ থেকে মানুষ ধরে এনে তারা কেনা বেচা করত কালীঘাটের হাটে। ফিরে যাবার সময় মহাপীঠের মহাশক্তিকে তুষ্ট করাব জন্যে বিস্তর মানুষ বলি দিত তারা। বলি দিয়ে প্রার্থনা জানাত একান্ত সোজা ভাষায়—

"মাগো, এবাব যেখানে চলেছি লুটতরাজ করতে, সেখান থেকে যেন ফিরতে পারি কাজ হাসিল করে।"

সে-সব দিন বড শান্তির দিন ছিল মা কালীর, ভক্ত সন্তানদের প্রার্থনা বুঝতে একটুও কষ্ট হত না তাঁর। তাই তিনি খপ করে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে ফেলতেন।

তারপর একদা ভাগীরথী মরে যেতে লাগল।

জাহাজ আসা বন্ধ হয়ে গেল। লম্বা লম্বা ডোঙা ভরতি পাঁঠার আমদানি হল তখন কালীঘাটে। কালীঘাটেব হাট আর মানুষের হাট রইল না, পাঁঠার হাটে পরিণত হল।

মহামায়ার মহাপীঠে বিস্তর পাঁঠাবলি শুরু হয়ে গেল তখন। পাঁঠার ব্যাপারীরা পাঁঠাবলি দিয়ে ফেরবার সময পাঁঠাব ভাষায় প্রার্থনা জানাতে লাগল মায়ের কাছে। সে প্রার্থনায় যত প্যাচ তত পচা গন্ধ। সেই পেঁচাল প্রার্থনা শুনতে শুনতে আর পাঁঠাবলি দেখতে দেখতে মায়ের কালো মুখ আরও আঁধার হয়ে উঠল।

তারপর একদা ভাগীরথী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল!

পচা পাঁক আর মরা কুকুর বেড়ালে ভরে উঠল ভাগীরথীর বুক। কোনও দেশ

থেকে কোনও তরীই আর আসতে পেল না কালীঘাটের কূলে। মানুষ, পাঁঠা, কোনও কিছুই উঠল না আর কালীঘাটের হাটে। সেই শুকনো ডাঙায় বসে মা, কালী শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন কেওড়াতলার পানে।

তারপর একদা একটা আইনের হাট বসল মরা গঙ্গার ওপারে। আবার জাঁকিয়ে উঠল কালীঘাট। কালীঘাটের হাটে আইনের বেচা কেনা জমে উঠল। মাকে শিখতে হল আইনের মারপ্যাঁচ। এ-পক্ষ ও-পক্ষ দু-পক্ষই মায়ের সামনে প্রার্থনা জানাতে লাগল, "মা, কাজ হাসিল করে দাও। আইনের খাঁড়ায় শত্রু যেন কচুকাটা হয়ে নিপাত যায।"

কোনও পক্ষের প্রার্থনাই কানে তুললেন না মা। কে যায় ঐ বিষম ফ্যাসাদে মাথা গলাতে। এ-পক্ষ ও-পক্ষ দু-পক্ষই ফতুর হয়ে ফিরতে লাগল কালীঘাটের হাট থেকে।

তবু দু-একটা মানুষ তখনও রয়ে গেল কালীঘাটে, যারা স্বপ্ন দেখতে লাগল। স্বপ্ন দেখতে লাগল ভাগীরথীতে আবার বান ডাকবে। কুলকুল করে দুকূল ছুঁয়ে বয়ে যাবে মা গঙ্গা কালীঘাটের ঘাটের সামনে দিয়ে। সেই গঙ্গায় মহানিশার অন্তে আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে মহাশক্তির সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ অঞ্জলি ভরে গঙ্গাজল নিয়ে অর্ঘ্য দেবেন—

ওঁ উদ্যতাদিত্য মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকায়ৈ স্বাহা।

যে মুহূর্তে সেই অর্ঘ্য পড়বে গঙ্গার জলে, সেই মুহূর্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে। জ্বলবেই আগুন, যে সন্তান মহাসাধনার বলে চৈতন্যস্বরূপা আদ্যা-শক্তিকে জাগাবে, তার অর্ঘ্যে আগুন জ্বলবেই। সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে কালীঘাটের সমস্ত কলুষ, ভাগীরথী সেই ছাই বয়ে নিয়ে গিয়ে সাগরের জলে বিসর্জন দেবে।

কংসারি হালদার মশায় স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর কলিতীর্থ মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে আবার। হয়েছে একটি মাত্র সন্তানের মরণজয়ী সাধনার ফলে। সেই স্বপ্ন বুকে নিয়েই তাঁকে কালীঘাট ছেড়ে চলে যেতে হল।

এখন কালীঘাটে গিয়ে মাথা খুঁড়ে মলেও কেউ কংসারি হালদারের দেখা পাবে